মাতৃ-মন্দির

[৩য় বর্ষ, বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৩২]

বিষয় সূচী

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
অকিঞ্চিৎ (কবিতা)	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	১৮৬
অবশেষে (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	২২৫
অভাগিনীর পত্র (কাহিনী)	শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী, বাণীবিনোদ	১৭৪
অভাগী (ছোট গল্প)	শ্রীমতী সুধীরা মজুমদার	৩৫৮
অমৃত (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	২০১
অন্তঃপুরে আচার-নিষ্ঠা ও সংস্কার (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস্-সি	১২২
অন্তঃপুরের আলোচনা (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি এস্-সি	৮২
অন্তঃপুরে রন্ধনশালা (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস্-সি	৩৩৫
অশনি (কবিতা)	শ্রীমতী এ, এম্ সৈয়েদা খাতুন	২৭৪
অসমীয়া মহিলাদিগের কর্ম্মকুশলতা (প্রবন্ধ)	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী	৪০৯
আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা (১৯২৫)	...	১৬০
আগমনী (কবিতা)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	১০৪
আবাহন	শ্রীমতী তমাললতা বসু	২১১
আমাদের একখানা চিঠি	...	৩৬৪
আশান্বিতা (কবিতা)	বন্দে আলী	৩৩০
আহ্বান (কবিতা)	শ্রীসরোজকুমার সেন	৩৮
একটি নবজাত শিশুর প্রতি (কবিতা)	শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	১৮৮
একান্নবর্ত্তী পরিবার (প্রবন্ধ)	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	৩৮৬
এঁচড়ের কালিয়া (রন্ধন-প্রণালী)	শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়	১৭৬
এঁচড়ের চপ ও পোস্তার বরফি (রন্ধন-প্রণালী)	শ্রীমতী হিল্লোলাবালা দেবী	[illegible]
এস মা	...	১৯৩
কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবিকার রিপোর্ট	শ্রীমতী উমালতা ঘোষ	৩৭৭
কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণ	...	৩৩৯
কিশোরী (কবিতা)	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
কুন্তী (উপাখ্যান)	পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী	২০২
কুঞ্জকুমারী (জীবন-কথা)	শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া	৩২৫
ক্ষণিকা (কবিতা)	শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার	৩৫৭
খদ্দর ও পরিচ্ছদ-সমস্যা (আলোচনা)	...	২৫৭

বিষয়		লেখক লেখিকা		পৃষ্ঠা
খাসিয়া নারী (প্রবন্ধ)	...	শ্রীমতী আশালতা দেবী	...	৯৪
খুকুর আদর (কবিতা)	...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	...	৫১
খৃষ্ট (জীবন-কথা)	...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	...	৩০৭
গয়া-কাশী (ভ্রমণকাহিনী)	...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	...	৩৬৯
গান	...	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিভূষণ	...	৩৫৩
গান্ধারীর উপদেশ	...	পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী	...	২৬১
গৃহচিকিৎসা (চিকিৎসাতত্ত্ব)	...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	...	৩৬৭
গোপা (জীবন-কথা)	...	শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ		১৬৩
গ্রন্থ-আলোচনা	...	...	...	১৮৭
গ্রন্থ-সমালোচনা	...	...	...	৪০৬
গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য (প্রবন্ধ)	...	শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা	...	১৯২
ঘৃত-বিজ্ঞান (আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ)	...	শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা	...	৯৩
চরকায় আত্মনির্ভর (প্রবন্ধ)	...	শ্রীমূলচাঁদ মুন্দড়া	...	১০২
চাটনি	...	...	...	৪১২
চাঁদবিবি (কবিতা)	...	শ্রীরাখালদাস গোস্বামী, বি-এ	..	৯৬
চৈত্র (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	...	৩৮৫
জাগরণ (কবিতা)	...	শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য	...	১০৩
জানিনা (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	১৭১
ডিমের পিউলী (রন্ধন-প্রণালী)	...	শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়	...	২০
ডিমের মোহনভোগ (রন্ধন-প্রণালী)	...	শ্রীমতী সুনীতি সেনগুপ্তা	...	৬৬
দয়ার ভিখারী (কবিতা)	...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	...	২৪২
দিদিমার বৈঠক (চিত্র)	...	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	...	৮৫
দিন-মজুরের বউ (কবিতা)	...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৯৩
দেশবন্ধু-তর্পণ	...	...	...	১২১
দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাশ	...	পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	...	১৬৭
দেশবন্ধু স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডার	...	...	...	১৫৬
দোষ ও তাহার শাস্তি (প্রবন্ধ)	...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, এম্-এস্-সি	...	২৪৫
দ্রব্যগুণ	...	...	...	৪১১
নতুন বউ (কবিতা)	...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩০৩
নববর্ষের পূজারি (কবিতা)	...	শ্রীরামেন্দু দত্ত	...	৩০
নর ও নারী (কবিতা)	...	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিভূষণ	...	৪
নারী (কবিতা)	...	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ	...	১৭১
নারী (কবিতা)	...	কাজি নজরুল ইস্‌লাম	...	৩২১
নারীকলঙ্কের প্রতিবাদ	...	...	...	৩৬৬
নারী-চরিত্র গঠন (প্রবন্ধ)	...	শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য এম-এ বি-এল	...	১১৬

বিষয়		লেখক লেখিকা		পৃষ্ঠা
নারী-মঙ্গল (গান)	...	অধ্যাপক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ		৩৯৮
নারীর স্থান (কবিতা)	...	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল্		৩৬৫
নারীর শিক্ষা (প্রবন্ধ)	...	শ্রীমতী স্বরূপাপুরী দেবী, ব্যাকরণতীর্থা		৪২
নানাকথা	...			১১৮, ১৮৯, ২৫৩, ২৮৭, ৩১৯, ৩৫০, ৩৮০, ৪১৪
নাস্তিক (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায়, বি এ, কবিশেখর	...	২১১
নিম ঝোল ও পলতার ঝোল (রন্ধন-প্রণালী)		শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	...	২০
নির্য্যাতিতা (ছোট গল্প)	...	শ্রীমতী সুনীতিপ্রভা দত্ত	...	২৭১
নিরুপায় (গল্প)	...	[illegible]তীশচন্দ্র নন্দী	...	১৩৭
পতিতার কথা (আলোচনা)	...	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ		২৫০
পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ	...	...	...	১৮৮
পরশমণি (গল্প)	...	শ্রীমতী প্রতিভাময়ী বসু	...	৪০৯
পল্লীমায়ের ডাক (কবিতা)	...	শ্রীরামেন্দু দত্ত	...	২৭২
পল্লীর ডাক (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ	...	১৯৫
পল্লীগ্রামের নারী (আলোচনা)	...	শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী	...	৩৫৬
পিনাকীর প্রতি (কবিতা)	...	শ্রীমতী লীলা ঘোষ	...	৭৩
পূজারিণী (কবিতা)	...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৬
পেটের ছেলে (গল্প)	...	শ্রীঅখিল নিয়োগী	...	১৯৯
পৌষ পার্ব্বণ (কবিতা)	...	শ্রীব্রজবল্লভ রায়, কাব্যতীর্থ	...	২৯৫
প্রত্যাখ্যাতা (কবিতা)	...	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	...	১১
প্রত্যাবৃত্ত (উপন্যাস)	...	শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী		২৫, ৫২, ৯৭, ১২৮, ১৬৭, ২০৭, ২৩৬, ২৬৩, ২৯৬
প্রাচীন বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা (আলোচনা)	...	শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী	...	৩১০
ফরাসী-ট্রেণে দুইদিন (ভ্রমণবৃত্তান্ত)	...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	...	২৪৯
ফুলের জন্ম (কবিতা)	...	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	...	৩৬২
বঙ্গবালা (কবিতা)	...	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	...	৮০
বঙ্গমাতা (কবিতা)	...	শ্রীরাখালানন্দ গোস্বামী, বি-এ	...	৩৪৯
বরণ (কবিতা)	...	শ্রীমতী লীলা দেবী	...	২১৪
বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা (আলোচনা)	...	শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা	...	২৭০
বর্ম্মানারীর বিবরণ (প্রবন্ধ)	...	শ্রীসত্যব্রত রুদ্র, বি-এ	...	২৮০
বর্ষশেষে	...	...	...	৪১৩
বাংলার শিশুমৃত্যু (আলোচনা)	...	...	...	১০১
বাংলায় হিন্দুর হ্রাস (প্রবন্ধ)	...	শ্রীবারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ	...	৩৯১
বাঙ্গালার ব্রতকথা (প্রবন্ধ)	...	শ্রীমনোরঞ্জন সরকার	...	৩
বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী	...	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	...	১১৪
বাঙ্গালী মহিলা কর্ম্মী (প্রবন্ধ)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, এম্-আর্-এ-এস্		৩০৪

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
ালীর খাদ্য (প্রবন্ধ) ...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম্-বি ...	৩১৬
ী দেবীর নিবেদন ...	... ...	১৫২
ী দেবীর প্রতি সরোজিনী নাইডুর পত্র	... ...	১৫৫
ী দেবীর প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র	... ...	১৫৪
ী দেবীর প্রতি (কবিতা) ...	শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী ...	১২৭
ী দেবীর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ...	... ...	১৫৩
সায়নের আমলে হিন্দু মহিলা (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম-এ, বি-এল	২৯২
এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৫)	... ...	১৯২
লার বাণী ...	পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী ...	৩৫৪
াসাগর-জননী ভগবতী দেবী (জীবন-কথা)	শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক ...	২১
বার দেবতা (গল্প) ...	শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ...	১১০
নি ও বিশ্বমানব (কবিতা) ...	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ...	২০৫
াহোপলক্ষে অসমীয়া হিন্দু মহিলার সামাজিক প্রথা (প্রবন্ধ) ...	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ...	৯৫, ১৩৩
াত ভ্রমণ (ভ্রমণকাহিনী) ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	১০৩, ১৪১
াতের কথা ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	১৭৭
াতের পল্লীগ্রামের মেয়েদের রীতি-নীতি	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	৩১
লাপ (কবিতা) ...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	১৩২
খের আধার (কবিতা) ...	শ্রীমতী লীলা দেবী ...	৪১
খের দরবারে বাঙ্গালী মহিলা ...	... ...	২৬৭
খের দরবারে মুস্‌লিম মহিলা ...	... ...	১২৫
বয়োগ ব্যথা (কবিতা) ...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	৪০০
র-নারী (কাহিনী) ...	শ্রীবিজকুমার ভৌমিক ...	২৪৮
কার-সমস্যায় নারীর স্থান (প্রবন্ধ) ...	শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্ ...	৩৭৩
ম্বাইএর কথা (ভ্রমণকাহিনী)	শ্রীমতী মোহিনী দেবী ...	৭১
বাম্বাইএর "শ্রীখণ্ড" ও মান্দ্রাজী "বাহুচং" (রন্ধন-প্রণালী) ...	শ্রীমতী মোহিনী দেবী ...	১৯
বৌদ্ধযুগে স্ত্রীধর্ম (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ...	৩২২
খিত (ছোট গল্প) ...	শ্রীমতী চারুলতা দেবী ...	৩৩৩
ক্তিমতী করমেতি (জীবন-কথা) ...	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ...	৬৭
গিনী (প্রবন্ধ) ...	শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ ...	২০৪
র্ণাকিউলার টিচারশিপ পরীক্ষার ফল ...	... ...	৩৭৬
াবিবার কথা ...	... ...	২৮৯
ারতের জ্ঞানভাণ্ডার (প্রবন্ধ) ...	শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা ...	৫০
ারতের নারী-সমস্যা (আলোচনা) ...	শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ ...	১৭

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
ভালবাসা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ...	৮১
মটর ডাইলের বরফি ও ছানার জিলাপী (রন্ধন-প্রণালী)	শ্রীমতী নলিনীবালা রায় ...	২০
মরণপথের যাত্রী (গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব, বি এ ...	৭৭
মহাপ্রয়াণ (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস বসু ...	১৪৬
মহাপ্রাণা ক্যাথারিণ (জীবন-কথা) ...	শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া ...	৫
মহিলা সাহিত্য সমালোচনা ...	কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ...	২৮৬
মাতৃজাতির অপমান (আলোচনা) ...	শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার, বি-এ ...	৪৮
মায়ের প্রভাব (প্রবন্ধ) ...	শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্ ...	১৯৪
মেয়ের মা'র পত্র (কবিতা) ...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	২৪
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৫)	...	১৫২
মায়ের আগমনে (গান) ...	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ...	২১৮
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা (১৯২৫)	... ...	১৫৯
মা (কবিতা) ...	শ্রীমতী মাখনমতী দেবী ...	৩১১
মিনতি (কবিতা) ...	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ...	৪০
পাঁপরের দম (রন্ধন-প্রণালী) ...	শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায় ...	১৬২
রন্ধনে সহজ পন্থা (রন্ধন-প্রণালী) ...	শ্রীমতী সুরবালা দত্ত ...	২৪৩
রমণীর কর্ত্তব্য (সভানেত্রীর অভিভাষণ) ...	... ...	৮৯
রাজপুতানা অঞ্চলের মহিলাদের কথা (প্রবন্ধ) ...	শ্রীমুলচাঁদ মুন্দড়া ...	৪৪, ১৬৫
রাণী শরৎসুন্দরী (জীবন-কথা) ...	শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক ...	৮৫
রাত-জাগা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ...	৩২৪
রূপ ও প্রেম (কবিতা) ...	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ...	১৫৮
রূপকথা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ...	৬৪
রূপান্তর (চিত্র) ...	শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত ...	২২৮
রেখে দিও ব্যথাভরা প্রাণ (কবিতা) ...	৺নবীনচন্দ্র সেন ...	২৮৪
রোগী-শুশ্রূষা ...	শ্রীমতী চারুপ্রভা দেবী ...	৭৯
লক্ষ্মীর দান (কবিতা) ...	শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৬২
লণ্ডন বৃটিশ এম্পায়ার-একজিবিশনে আমাদের কার্য্য	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	৭৪
লণ্ডনের উপপ্রান্তে (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	৩৪৭
লণ্ডন দৃশ্যাবলী ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	২২১
লতার সাধ (কবিতা) ...	"লতিকা" ...	২৩৩
সই (কবিতা) ...	শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ	৩৬১
স্বচ্ছ পরিবারে কয়েক দিন ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	২৭৫
সজিনা ফুলের আচার ...	শ্রীমতী নিকুঞ্জলতা চলিহা ...	২০
স্ত্রীশিক্ষা ও প্যারীচাঁদ মিত্র (প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র ...	৩০১, ৩৪৪
স্ত্রী-স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	৩৭১

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
বাঙালীর খাদ্য (প্রবন্ধ) ...	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম্-বি ...	৩১৬
বাসন্তী দেবীর নিবেদন ...	... ...	১৫২
বাসন্তী দেবীর প্রতি সরোজিনী নাইডুর পত্র	... ...	১৫৫
বাসন্তী দেবীর প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র	... ...	১৫৪
বাসন্তী দেবীর প্রতি (কবিতা) ...	শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী ...	১২৭
বাসন্তী দেবীর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী ...	... ...	১৫৩
বাৎসায়নের আমলে হিন্দু মহিলা (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, এম-এ, বি-এল	২৯২
বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৫)	... ...	১৯২
বিদুলার বাণী ...	পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী ...	৩৫৪
বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী (জীবন-কথা)	শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক ...	২১
বিধবার দেবতা (গল্প) ...	শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ...	১১০
বিধাতা ও বিশ্বমানব (কবিতা) ...	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ...	২০৫
বিবাহোপলক্ষে অসমীয়া হিন্দু মহিলার সামাজিক প্রথা (প্রবন্ধ) ...	শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ...	৯৫, ১৩৩
বিলাত ভ্রমণ (ভ্রমণকাহিনী) ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	১০৩, ১৪১
বিলাতের কথা ...	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	১৭৭
বিলাতের পল্লীগ্রামের মেয়েদের রীতি-নীতি	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...	৩১
বিলাপ (কবিতা) ...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	১০২
বিশ্বের আধার (কবিতা) ...	শ্রীমতী লীলা দেবী ...	৪১
বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী মহিলা ...	... ...	২৬৭
বিশ্বের দরবারে মুস্লিম মহিলা ...	... ...	১২৫
বিয়োগ ব্যথা (কবিতা) ...	শ্রীমতী মানকুমারী বসু ...	৪০০
বীর-নারী (কাহিনী) ...	শ্রীবিজকুমার ভৌমিক ...	২৪৮
বেকার-সমস্যায় নারীর স্থান (প্রবন্ধ) ...	শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্ ...	৩৭৩
বোম্বাইএর কথা (ভ্রমণকাহিনী)	শ্রীমতী মোহিনী দেবী ...	৭১
বোম্বাইএর "শ্রীখণ্ড" ও মান্দ্রাজী "বাদুচং" (রন্ধন-প্রণালী) ...	শ্রীমতী মোহিনী দেবী ...	১৯
বৌদ্ধযুগে স্ত্রীধর্ম্ম (প্রবন্ধ) ...	অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ...	৩২২
ব্যথিত (ছোট গল্প) ...	শ্রীমতী চারুলতা দেবী ...	৩৩৩
ভক্তিমতী করমৈতি (জীবন-কথা) ...	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ...	৬৭
ভগিনী (প্রবন্ধ) ...	শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ ...	২৩৪
ভার্ণাকিউলার টিচারশিপ পরীক্ষার ফল ...	... ...	৩৭৬
ভাবিবার কথা ...	... ...	২৮৯
ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার (প্রবন্ধ) ...	শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা ...	৫০
ভারতের নারী-সমস্যা (আলোচনা) ...	শ্রীযতীকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ ...	১৭

বিষয়		লেখক লেখিকা		পৃষ্ঠা
ভালবাসা (কবিতা)	··	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	···	৮১
মটর ডাইলের বরফি ও ছানার জিলাপী (রন্ধন-প্রণালী)		শ্রীমতী নলিনীবালা রায়	···	২০
মরণ পথের যাত্রী (গল্প)		শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব, বি এ	···	৭৭
মহাপ্রয়াণ (কবিতা)	···	শ্রীকালিদাস বসু	···	১৪৬
মহাপ্রাণা ক্যাথারিণ (জীবন-কথা)	···	শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া	···	৫
মহিলা সাহিত্য সমালোচনা	···	কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন	···	২৮৬
মাতৃজাতির অপমান (আলোচনা)	···	শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সরকার, বি-এ	···	৪৮
মায়ের প্রভাব (প্রবন্ধ)	···	শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্	···	১২৪
মেয়ের মা'র পত্র (কবিতা)	···	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	···	২৪
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৫)			···	১৮২
মায়ের আগমনে (গান)	···	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	···	২১৮
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা (১৯২৫)			···	১৫৯
মা (কবিতা)	···	শ্রীমতী মাধবমতী দেবী	···	৩১১
মিনতি (কবিতা)	···	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক	···	৪০
পাঁপরের দম (রন্ধন-প্রণালী)	···	শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়	···	১৬৫
রন্ধনে সহজ পন্থা (রন্ধন-প্রণালী)	···	শ্রীমতী সুরবালা দত্ত	···	২৪৩
রমণীর কর্ত্তব্য (সভানেত্রীর অভিভাষণ)	···	···	···	৮৯
রাজপুতানা অঞ্চলের মহিলাদের কথা (প্রবন্ধ)	···	শ্রীমূলচাঁদ মুন্দড়া	···	৪৪, ১৬৫
রাণী শরৎসুন্দরী (জীবন-কথা)	···	শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক	···	৮৫
রাত-জাগা (কবিতা)	···	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	···	৩২৪
রূপ ও প্রেম (কবিতা)	···	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	···	১৫৮
রূপকথা (কবিতা)	···	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	···	৬৪
রূপান্তর (চিত্র)	···	শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত	···	২২৮
রেখে দিও ব্যথাভরা প্রাণ (কবিতা)	···	৺নবীনচন্দ্র সেন	···	২৮৬
রোগী-শুশ্রূষা	···	শ্রীমতী চারুপ্রভা দেবী	···	১৯
লক্ষ্মীর দান (কবিতা)	···	শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	···	২৬২
লণ্ডন বৃটিশ এম্পায়ার-একজিবিশনে আমাদের কার্য্য		শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	···	৭৪
লণ্ডনের উপপ্রান্তে (ভ্রমণ-কাহিনী)	···	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	···	৩৪৭
লণ্ডন দৃশ্যাবলী	···	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	···	২২১
লতার সাধ (কবিতা)	···	"লতিকা"	···	২৩৩
সই (কবিতা)	···	শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ		৩৬১
স্বচ্ছ পরিবারে কয়েক দিন	···	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	···	২৭৫
স্কিনা স্কুলের আচার	···	শ্রীমতী নিকুঞ্জলতা চলিহা	···	২০
স্ত্রীশিক্ষা ও প্যারীচাঁদ মিত্র (প্রবন্ধ)	···	শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র	···	৩০১, ৩৪৪
স্ত্রী-স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ)	···	অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ		৩৭১

	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠা
	...	৩১৪
য়)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৬
	...	৩০৮
(সংক্ষিপ্ত জীবনী)	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	৩১২
	শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী	১
তা)	শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ	৩৮৮
বন্ধ)	শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী	১২
ল্পী	শ্রীমতী সুশীলাবালা নন্দী	৩৯৪
কাহিনী)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিভূষণ	২১২
গ)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ	২৪৭
আলোচনা)	...	১৬১
।	...	১৮২
বতা)	শ্রীশোভনারাণী দাস	৩০০
	শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী	৪৩
	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৩৮, ২১৮, ৩৯৮
	শ্রীমতী শশাঙ্কশোভা দাসী	১৭৬
ধ্যান)	শ্রীমতী সুশীলাবালা নন্দী	২১৫
লো (আলোচনা)	শ্রীনরেন্দ্র দেব	৫৭
	শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ	৪০৫
হজ ব্যবস্থা (চিকিৎসা বিজ্ঞান)	কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন	৬১, ১৩৫
ন্ধ)	শ্রীসামুয়েল বিশ্বাস	৮৭
ত্যতত্ত্ব)	ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়, এল্-এম্-এস্	৩৬২
	শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ	৩৮৯
	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	২৯১
বিতা)	শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এল্	২০৬
ান)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	২১০
	শ্রীমতী প্রতিভাময়ী বসু	১৩
তা)	শ্রীমতী চারুলতা দেবী	৮৪
	কুমারী বাণী চাটার্জ্জি, বি-এ	১৫৭
[illegible]	শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী	৩৮২
ার স্থান (আলোচনা)	শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ	২৪১
হৃদয়হীনা (ছোট গল্প)	শ্রীমতী সুনীতিপ্রভা দেবী	১৮৫

মাতৃমন্দির

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি ধ্বনি সে কি মা হর্ষ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল

Bhoodeb Publishing House.
44, Manicktola Street, Calcutta.

৩য় বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩২ | ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

মাতৃ-মন্দিরের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হল। প্রথম বর্ষেই পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে ইহার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়েছেন। বাংলার সমস্ত সংবাদপত্রগুলি বিশেষ প্রশংসার সহিত ইহার আবশ্যকতা ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা বৎসর আমি শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ইংলণ্ডে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে আমি মহিলাদের উপযোগী গৃহ-শিল্প সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয় ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অনেক পল্লীতে গিয়ে সন্ধান নিয়েছি। এই বৎসরটী আমি নিজে পত্রিকার প্রতি মনোযোগ দিতে সুযোগ না পেলেও বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতে পত্রিকাখানি একই ভাবে পরিচালিত হয়েছে।

এই বর্ষে আমি লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকাগণকে নারীকল্যাণ সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা আমাদিগকে লিখে জানাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। মেয়েরাই তাঁদের অভাবগুলি বেশী করে উপলব্ধি করেন। সেই সমস্ত বিষয় তাঁরা যদি আমাদিগকে লিখে জানান তবে বড়ই ভাল হয়। পল্লীগ্রামের মহিলাদের কাছ থেকে আমরা অনেক বিষয় পেতে চাই। পল্লী-মেয়েরা অনভ্যস্ততা বশতঃ পত্রিকায় লিখতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত, কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত, অভাব অসুবিধাগুলি প্রকাশিত না হয়ে চাপা থাকা কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত নয়। অভাব অসুবিধা বিশেষ অনুভব না করলেও, কি করলে আরও ভাল হতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত আমাদিগকে লিখুন। আমরা নারীকল্যাণ-কামী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ করতে আহ্বান করি।

মাতৃ-মন্দিরে নারীকল্যাণ বিষয়ে যে সকল লেখা প্রকাশিত হবে সে সব গুলিই যে ঠিকঠাক হবে, অথবা সকলেরই মনোমত হবে এমন আশা করা যায় না, তবে এটা আশা করা যায়—নানা ভাবের বিভিন্নমুখী লেখার ভিতর দিয়ে আমরা ক্রমে সত্য ধারায় উপনীত হব।

কেবল মাত্র মেয়েদের জন্যই যখন এই পত্রিকা-খানি বের হয়েছে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে মেয়েদের কোন বিশেষ পত্রিকা নাই তখন এই কেই বাংলার মেয়েদের ভালমন্দের সকল হবে। এই পত্রিকার ভিতর দিয়েই ক তাঁদের সমস্ত অন্তরের কথা প্রকাশ।

া, ভগিনীগণ, তোমরা মাতৃ-মন্দিরকে নিজের জিনিষ বলে গ্রহণ কর, বিশেষ সঙ্গে যুক্ত হও, নগর পল্লী সব স্থানের ক্ষের কথা লিখে জানাও। কার কি অভাব করলে কার ভাল হয়, কে কি ভাল কাজ মেয়েদের বিরুদ্ধে কে কি করেছে এ সব কার যা,—মাতৃ-মন্দিরে লিখে প্রকাশ

প্রত্যেক স্থানের কতকগুলি মহিলার চাই যাঁদের কাছে আমরা সেখানকার খাদাদি বরাবর পেতে পারি, দরকার নকার সংবাদ কোন কিছু তাঁদিগকে সা করলে উত্তর পেতে পারি। আশা দের মধ্যে যাঁরা দেশের সেবা করতে । মধ্য থেকে অনেককে আমরা এই

ভগিনীগণ, তোমাদের কি মনে হয় না দের অবস্থা অতি অবনত, তোমাদের র না মেয়েরা অনেক পশ্চাতে পড়ে সহরের দু-চারটী শিক্ষিতা মহিলা—য়টী? লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ভরা, তাঁরা অনেকেই লেখাপড়া —দেশের কোন খবরই রাখেন না। তঃ শান্ত শিষ্ট অতি ভাল মানুষ বটেন, তান্ত ভাল মানুষ হওয়াই তাঁদের দিন করে তুলছে। ভাল হবার কোন চেষ্টা তাঁদের নাই। প্রত্যেকের ভিতর একটা জাগ্রত অবস্থা না এলে কি কোন একটা জাতি জাগে? লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিতাদের বাদ দিয়ে সামান্য দু-চার জন শিক্ষিতার চেষ্টায় আর কতদূর কি হবে?

পল্লীর মেয়েরা অনেক সময় মনে করেন সংসারে পুরুষেরা আছেন তাঁরাই সব করবেন। মেয়েদের পক্ষে যা ভাল তাও পুরুষেরাই করবেন। তাই কি কখন সম্ভব হয়? মেয়েদের কল্যাণের জন্য পুরুষের যে চেষ্টা – মাত্র তাই কি মেয়েদের কল্যাণের পক্ষে যথেষ্ট? নিজেদের কি কিছু করবার নাই? মেয়েরা পুরুষদের উপর ভার দিয়ে এমনই আপনহারা হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁদের কোন অসুখ বিসুখ নিতান্ত প্রকাশ হয়ে না পড়লে তাঁরা আর তা প্রকাশ করেন না। তার জন্য অনেক কুফল হয়। সংসারের সকলকেই সেই ফল ভোগ করতে হয়। বাংলার ঘরের বউদের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল নয়, বউরাই বেশী মুখচাপা—নিজেদের ভাল মন্দের কথা মুখ ফুটে বলতেই সাহস করেন না—কাজেই তাঁদের এ দুর্দ্দশা,—ফলে সন্তানসন্ততিও দুর্ব্বল, রুগ্ন। বাংলার শিশু মৃত্যু যে এত অধিক এই তার বিশেষ কারণ। আহা! সন্তানদের জন্যও অন্ততঃ তাঁদের আপন শরীরের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। আপন-ভোলা হয়ে দিন দিন সবই তাঁরা হারাতে বসেছেন।

জননীগণ, আর চাপা থেকো না, যেমন করে হ'ক শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হও, আপন কর্ত্তব্যের পথ আপনি বুঝতে পারবে।

এই মাতৃ-মন্দির তোমাদের শিক্ষার পথ প্রসারের জন্যই হয়েছে। তোমরা মাতৃ-মন্দিরকে আপন করে লও—মাতৃ-মন্দিরের সঙ্গে আপন সুখ দুঃখের কথা কও।

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

বাঙ্গালার ব্রতকথা

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার।

পরানুকরণমোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালার জনসাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নব্য সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইয়া কোন্ এক অব্যক্ত মরণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল, নব্য সভ্যতার আলোকে মোহাবৃত হইয়া মহিমান্বিত আর্য্যসমাজের কথা ভুলিয়া কোন্ এক অচিন্ত্য স্থানে যাইয়া পৌছিতেছিল তাহা কে নিরূপণ করিবে? আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অচ্ছেদ্য অভেদ্য ও সারগত নিয়মাবলী সমাজ পরিচালনের পক্ষে অদ্বিতীয় পন্থা। তাহাকে উপহাস ও অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করিয়া, হে বাঙ্গালী! তোমরা কতদূর সভ্যতাশৈলের উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলে? তোমরা নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া, নূতন ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার সরলহৃদয়া নারীকর্ম্মানুষ্ঠিত ব্রতপূজাদিকে কতই না ঘৃণার চক্ষে সন্দর্শন করিয়া অবিরত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছ! কিন্তু সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিয়া এই ব্রতপূজাদি সমাজতরুকে লতার ন্যায় বেষ্টন করিয়া ক্ষীণরেখার ন্যায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অতি হীনভাবে জীবন ধারণ করিতেছিল। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙ্গালার জনসাধারণের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত কুরঙ্গ যেমন নব আশায় উৎফুল্ল হইয়া মৃগতৃষ্ণিকার দিকে প্রবলবেগে অনুধাবিত হয়, অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ বাঙ্গালার জনসাধারণও এক সময় নব্য সভ্যতা নিরীক্ষণ করিয়া খরতর বেগে তাহার অনুসরণ করিয়া পরিশেষে বিফল মনোরথ হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি আজ এই সকল দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া আবার তাহাদের পূর্ব্বতম স্বর্গীয় ভাব, সেই যশোমণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর কার্য্যের অবতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই আজ বাঙ্গালার বক্ষে সমাজ-সংস্কারের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। আমরা ব্রতকথা সম্বন্ধে সাহিত্যজগতেও দুই একখানা পুস্তক দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছি। আর বর্ত্তমানে আমাদের দক্ষিণ বিক্রমপুর সম্মিলনীতে এই ব্রতকথা সম্বন্ধে আলোচনা সন্দর্শন করিয়া কি যে এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতি উপলব্ধি করিতেছি তাহা অনির্ব্বচনীয়।

এই ব্রতকথাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী সদৃশ এক ক্ষুদ্র প্রবাহ বাঙ্গালার প্রতি দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত করিয়া আসিতেছে। নিরক্ষর, সাহিত্য-জ্ঞানরহিত, সরলহৃদয়া বালিকা, যুবতী ও নারীর কুসুম-সুকোমল চিত্তে সত্যের, আর্য্যধর্ম্মের বীজ বপন করিবার এমন সুব্যবস্থা, এমন সুন্দর চিরন্তন প্রথা অন্য কোন ধর্ম্মে আছে কি? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতকথার মধ্যে কি সুন্দর ভাবে সামাজিক, সাংসারিক জীবন পরিচালনার মূল মন্ত্রগুলি সন্নিবেশিত আছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি? বিষ্ণুশর্ম্মা যেমন পঞ্চতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া বস্শক্তি, উগ্রশক্তি, ও অনেকশক্তিকে সমগ্র অর্থনীতি, রাজনীতি, ও কামশাস্ত্রের জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, আমাদের ব্রতকথাগুলিও তদ্রূপ নবনীত-কোমলা রমণীহৃদয়ে সংসার পরিচালনার পক্ষে নারীসুলভ কার্য্যকলাপের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। নিয়তির বিচিত্র লীলায় অথবা কালের ঘোর পরিবর্ত্তনে যদি এই ব্রতগুলি দেশ হইতে উচ্ছন্ন যায় তবে আমাদের পৌরাণিক যুগের একটি বিরাট সভ্যতা-

লোৎপাটিত হইয়া যাইবে। এই কথা বিশেষরূপে চিন্তার রাজ্যে স্থান দিতেন এখন সেই যুগের অবসান হইয়াছে। দশের দশান্তর ঘটিয়াছে। জনসাধারণ নি চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। দেশীয় য় লইয়া গবেষণা করিতে শিখিয়াছে। হত্য-সম্মিলনীই তাহার জাজ্জল্যমান

'দুর্গোৎসব সমস্ত গৃহীই ব্যয়সাধ্য বলিয়া রিতে পারেন না কিন্তু এই পারিবারিক ভৃতি সকলেই সুসমাপ্ত করিতে পারেন। হইলেও সমগ্র সমাজের উপর ইহার মহৎ রী ক্ষমতা বিদ্যমান আছে। ব্রতাচরণ ম, উপবাস, ও কষ্টসহিষ্ণুতা অবলম্বন হস্থ্য-ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ পরিচালিকা কামিনী-গণ বাল্যাবস্থাতেই স্বভাবসুলভ চপলতা ও চঞ্চলতার মধ্যে গুরুভক্তি, ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, পরার্থপরতা, সর্ব্বহিতৈষিতা ও ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি গুণাবলী উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া ভাবী জীবন সুখের আগার করিয়া তুলেন। শুনিয়াছি অধুনা ইউরোপে "কিণ্ডার গার্টেন" প্রণালী দ্বারা বিবিধ প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশ সেইরূপ কৌশলেই স্মরণাতীত কাল হইতে "বারব্রত" পদ্ধতি দ্বারা ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। এই শিক্ষার ফলেই এখনও আমাদের দেশস্থ অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ অনেক সংসারে দ্বিতীয় নন্দনকাননের সুখ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, মধুর ব্যবহার দ্বারা দাসদাসী ও অন্যান্য গৃহস্থিত লোক দিগকে আপ্যায়িত করেন এবং পূজার্হদিগের হৃদয়ে শান্তিসুধা ঢালিয়া থাকেন *

নর ও নারী

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্জ্জনে গঠিলা বিধি,
নর আর নারী,
কল্পনার শ্রেষ্ঠ অবদান;
এ কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে
নির্দ্দেশ তাঁহারি,
উভয়ের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান!
পুরুষ ঘর্ম্মাক্ত দেহে
করিবে অর্জ্জন,
শত শক্তিশেল ধরি' বুকে
শৈত্য ঝঞ্ঝাবাত,
প্রচণ্ড তপন;
এই আয়োজন যুগে যুগে!

পুণ্য-পূত অন্তঃপুর
তা'র মাঝে নারী;
স্বাধীকারে রাণীর সমান;
মাতৃত্বের সুমহান
গৌরব তাঁহারি,
বক্ষ-রক্তে বিশ্ব পায় প্রাণ!
এ সংসার মরুভূমি,
স্নেহ দয়া দিয়া,
করে নারী শান্ত, সুশীতল;
শ্রান্ত, ক্লান্ত, করুণার
শান্তি-জল পিয়া
কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ পায় বল!

* দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

মহাপ্রাণা ক্যাথারিণ

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া।

ক্যাথারিণ কৃষক-কন্যা। রুষিয়ার এক অজ্ঞাত কৃষককুলে এক ছায়ানিবিড় ক্ষুদ্র পল্লীর নিভৃত নিকেতনে তাঁহার জন্ম। শৈশবেই তিনি জনক-জননীহারা হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার মাতাপিতা, জন্মভূমি ও জন্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কিছুই ছিলনা। লিভ্‌নিয়া নগরীর জনৈক ধর্ম্মযাজকের দয়া ও স্নেহেই তিনি লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলেন, কাজেই এই সংসারে মাতা পিতা ভাই বন্ধু সবই তাঁহার ছিল সেই পালকপিতা ধর্ম্মযাজক। ধর্ম্মযাজকেরও সংসারে আর দ্বিতীয় কোন বন্ধন ছিল না, একমাত্র ক্যাথারিণই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইয়া তাঁহাকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উভয়েরই জীবন-তরু উভয়ের স্নেহ-রস সিঞ্চনে পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া সংসার-উদ্যানের একটী কোণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু সহসা তাঁহাদের এই স্নেহনিবিড় ক্ষুদ্র শান্তি-কুটীরের উপর ভগবানের রোষ বহ্নি নিপতিত হইয়া তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল।

লিভ্‌নিয়া নগরীতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। রুষিয়ার অধিপতি প্রথম পিটার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর অবসানে উক্ত নগরী অধিকার করেন। এই নগর অধিকারের কালে লিভ্‌নিয়ার অধিবাসিবর্গ তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুষসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ কসাক সৈন্যের অমিতবিক্রমের নিকট তাহাদের তুচ্ছ শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কসাক সৈন্যের অত্যাচারে লিভ্‌নিয়ার গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল,—লিভ্‌নিয়া নগরী শ্মশানের ভীষণতা ধারণ করিল। অধিবাসিবৃন্দের অধিকাংশই সমর-শয্যায় অনন্ত নিদ্রাভিভূত, কতক শত্রুহস্তে বন্দীকৃত, কতক বা পলায়িত! লিভ্‌নিয়ার এই স্বাধীনতার সংগ্রামে উক্ত ধর্ম্মযাজকও অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পালকপিতা যুদ্ধে গিয়াছেন; আজও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না, ক্যাথারিণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অন্তর নানা দুর্ভাবনার ভারে নিপীড়িত হইতে লাগিল,—তবে কি পালকপিতা শত্রু-করে বন্দী হইলেন;—তবে কি পালকপিতা শত্রুর অস্ত্রাঘাতে জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন?—ভাবিতে ভাবিতে ক্যাথারিণ এত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন যে, তিনি আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; অনতিবিলম্বে পালকপিতার অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন।

মেরিয়ানবার্গের গভীর বনভূমির মধ্য দিয়া অশ্ব চালনা পূর্ব্বক জনৈক অশ্বারোহী রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র এক যোদ্ধপুরুষ তাঁহার অশ্বরশ্মি ধারণ করিলেন। অশ্বের গতি প্রতিরুদ্ধ হইল। অশ্বারোহী পুরুষ নহেন, ঈষদ্ভিন্ন যৌবনা এক সুন্দরী পঞ্চদশী রমণী। কিশোরীর মুখমণ্ডল শ্রম-জনিত রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া আরও সুন্দর হইয়াছে। বীরবালা ধীর বিনম্র বচনে অথচ তেজস্বিতা পূর্ণ নয়নে সৈনিক পুরুষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আমার পথাবরোধ করিবেন না, আমি বড়ই গুরুতর কার্য্যে যাইতেছি।"

সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "বালিকা, তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি বোধ হয় জাননা যে, এই প্রদেশ আজ রুষ সম্রাট-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে; তাঁহার আদেশে এস্থলের অধিবাসিবৃন্দের কোথাও

গমনের অধিকার নাই, তাহারা বন্দী। সমস্ত রাজপথ সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, তোমার এই বয়সে, এমন বিপদসঙ্কুল স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তুমিও বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে অতএব বালিকা, তুমি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

যোদ্ধপুরুষের সদয় ব্যবহারে ও মিষ্ট কথায় কিশোরী পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে একটু আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, [illegible]নিক পুরুষের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত [illegible]লে হয়ত তিনি কথঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে [illegible]রন। কিশোরী লজ্জা-রক্তিম সুষমাস্নিগ্ধ বদনে [illegible]র ধীরে কহিলেন, "মহাশয়, আমার পালকপিতা [illegible]সিয়া নগরীর ধর্ম্মযাজক, তিনি স্বদেশ রক্ষার [illegible]নিমিত্ত যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আজও [illegible]প্রত্যাগমন করিতেছেন না। হয়ত পিতার কোনও [illegible] ঘটিয়াছে। আমি তাঁহারই অনুসন্ধানে [illegible]ইয়াছি। আপনি যদি দয়া করিয়া এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, তবে আমার [illegible]ধিত হইতে পারে।"

[illegible]ক পুরুষ কহিলেন, "পালকপিতার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ যথার্থই প্রশংসার যোগ্য, [illegible]মার উদ্দেশ্য বড় ভয়ানক, তাহাতে পদে [illegible]দের সম্ভাবনা। আচ্ছা, যদ তোমার [illegible]তা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া থাকেন, [illegible]স্থলে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে তুমি [illegible]ব?"

[illegible]রিণের সুন্দর মুখখানি বিষাদের কালিমায় [illegible]ইয়া গেল, হৃদয়ের তার বেদনায় বাজে [illegible]ঠিল, নীলায়ত নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত [illegible]হার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। তিনি বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যদি আমার পালকপিতা বন্দী হইয়া থাকেন, আমিও বন্দী হইয়া তাঁহার সেবা করিব, তাহাতে তাঁহার বন্দীজীবনের দুঃখভার অনেকটা লাঘব হইবে।... আর যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমি আর এই আশ্রয়বিহীন স্নেহশূন্য সংসারে থাকিয়া কি করিব? আমিও জীবন বিসর্জ্জন দিব।......" ক্যাথারিণ আর বলিতে পারিলেন না, অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার কপোলযুগল প্লাবিত হইয়া গেল। সৈনিক পুরুষ তাঁহার পথ মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, "তবে যাও, সাবধান, পথ বড়ই বিপৎ সঙ্কুল।"

কিশোরী অশ্বে করাঘাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিয়দ্দুর গমন করিয়াই তিনি যমদূতাকৃতি ভীষণ দর্শন বর্ব্বর কসাক সৈন্যদল কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, এই পাষাণহৃদয় কসাক সৈন্যের হস্ত হইতে আর উদ্ধারের আশা নাই। ক্যাথারিণ যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিয়া সৈন্যদিগের নিকট মুক্তি চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে হৃদয়হীন সৈন্যগণের কোনও প্রকার দয়ার উদ্রেক হইল না। এই সময় ক্যাথারিণের সেই পূর্ব্বপরিচিত সৈনিক পুরুষটী তথায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার আগমন মাত্র সৈন্যদল তাঁহাকে নতজানু হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিল। ক্যাথারিণ ভাবিলেন, এই যোদ্ধপুরুষ সৈন্যবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইবেন, ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সুফল ফলিতে পারে। তিনি সৈনিক পুরুষকে কহিলেন, "মহাশয়, আমার উদ্দেশ্য আপনাকে পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমি রুষসম্রাটের কোনও অনিষ্ট সাধনে গমন করিতেছি না। অতএব আমাকে মুক্তি দিতে অনুমতি করুন।"

সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "বালিকা, তুমি সৈন্যগণের হস্তে বন্দিনী হইয়াছ। সৈন্যগণ রাজাজ্ঞা পালন করিতেছে, আমি ইহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে রাজাদেশের অবজ্ঞা করা হয়, সুতরাং এক্ষেত্রে আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম।"

জনৈক সর্দ্দার সৈন্য ক্যাথারিণের পরিচয় পাইয়া বলিল, "তুমি লিভনিয়াবাসিনী। সম্রাটের আদেশে

আমরা সমগ্র লিভ্‌নিয়াবাসিকে বন্দী করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং তুমিও আমাদের বন্দী, বাক্যব্যয় না করিয়া আমাদের অনুগমন কর, নতুবা বিপদের সম্ভাবনা।"

ক্যাথারিণ কহিলেন, "আপনারা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না। আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের সহিত যাইতেছি। আমার একটী প্রার্থনা, যদি আমার পালকপিতা আপনাদের হস্তে বন্দী হইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া আমাকেও সেখানে লইয়া যাইবেন।" কসাক সৈন্য কঠোর স্বরে বলিল, "আমরা তোমার আদেশের ভৃত্য নই। রাজাদেশ পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কালবিলম্ব না করিয়া এখনই আমাদের সহিত চল।"

যোদ্ধৃপুরুষ সৈন্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও, তিনি যাহা আদেশ করিবেন তদনুসারে ব্যবস্থা করিবে। সাবধান, পথে যেন ইহাকে কোনও প্রকার কষ্ট দিও না।" হতভাগিনী ক্যাথারিণ কসাক সৈন্য পরিবৃত হইয়া সেনাপতির শিবিরাভিমুখে চলিলেন।

সর্দ্দার ক্যাথারিণকে সৈন্য পরিবৃতাবস্থায় শিবির-দ্বারে রাখিয়া সেনাপতির আদেশ গ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ং শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ক্যাথারিণ শিবির-দ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহাদের পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন, "ক্যাথারিণ, ধর্ম্মযাজক শত্রুর অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।" পরিচারিকার কথা শুনিয়া ক্যাথারিণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। হায়, তাঁহার সংসারের একমাত্র আশ্রয় পালকপিতা আর ইহলোকে নাই! এ জীবনে তিনি আর তাঁহার স্নেহভরা মুখখানি দেখিতে পাইবেন না! তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে হাহাকার করিতে লাগিল, তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরিচারিকা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

ক্যাথারিণ সেনাপতির সন্নিধানে নীত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত সেই সৈনিক পুরুষটীও তথায় সেনাপতির পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। সেনাপতি ক্যাথারিণকে তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে কহিলে, ক্যাথারিণ বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার পালকপিতা আপনাদের করে বন্দী, আমিও বন্দী হইয়া তাঁহার নিকট নীত হইব, এই আশায় আসিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের পরিচারিকার মুখে শুনিলাম, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখন আমার বিনীত প্রার্থনা, আমাকে পালকপিতার মৃতদেহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সমাহিত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন।"

সেনাপতি কহিলেন, "বালিকা, তুমি আমাদের বন্দী, বন্দীকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেওয়া রাজ-বিধির বহির্ভূত। তুমি যে পলায়ন করিবে না তাহার বিশ্বাস কি? তবে যদি তুমি জামিন দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার অভিলাষ পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।"

ক্যাথারিণ বাষ্পাকুল লোচনে উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি দরিদ্র কৃষক-কন্যা, একমাত্র পালক-পিতাই আমার সংসারের আশ্রয় ছিলেন। এখন আমি নিঃসহায়, আমার জামিন হইতে পারে এমন ব্যক্তি সংসারে কেহই নাই। আপনি যদি বিশ্বাস করেন, তবে আমি নিজেই আমার জামিন হইতে পারি। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে আমি পুনরায় আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব। শপথ ভঙ্গ করা মহাপাপ, পিতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, জীবন থাকিতেও তাঁহার শিক্ষার অবমাননা করিব না।"

সেনাপতি ক্যাথারিণের সত্যের বিমল বিভায় সমুদ্ভাসিত সরলতাপূর্ণ মুখচ্ছবিখানি দর্শন করিয়া তাঁহাকে আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, সর্ব্বোপরি ক্যাথারিণের কাতর-ব্যাকুল চোখ দুইটী তাঁহার হৃদয়কেও কাতর করিয়া তুলিল, ক্যাথারিণের শপথবাক্যের দৃঢ়তা দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন।

ক্যাথারিণ তদীয় পালকপিতার শবের অনুসন্ধানার্থ রণক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। রজনীর অন্ধকারে বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। অন্ধকার সমাগমে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র আরও ভীষণতর দৃশ্যে পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে। ছিন্নভিন্নাঙ্গ বিকৃত-দর্শন শবদেহসমূহ স্তূপাকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, মরণোন্মুখ যোদ্ধৃবৃন্দ যন্ত্রণায় মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে,—কেহ জল চাহিতেছে,—কেহ মাতাপিতা পুত্র প্রণয়িনীর জন্য বিলাপ করিতেছে। মাংসাশী পশুদলের উল্লাস-চীৎকারে রণস্থল মুখরিত হইতেছে। ক্যাথারিণ আলোকবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া সেই মরণের রঙ্গভূমি মধ্যে শোণিত-কর্দ্দমাক্ত চরণে পালকপিতার শবদেহ অন্বেষণ করিয়া নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রের ভীষণতায় তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। ক্যাথারিণ যে মহাকর্ত্তব্যের অনুপ্রেরণায় মত্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কর্ত্তব্যের নিকট বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় বিপদ চৈত্র-বায়ু-বিতাড়িত তুলাখণ্ডের ন্যায় অন্তরীক্ষে বিলীন হইয়া যায়। অসংখ্য শবদেহ চতুর্দ্দিকে নিপাতিত, ক্যাথারিণ প্রত্যেকটী শব বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। সহসা অশ্বপদশব্দে তিনি মুখ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত সেই সৈনিক পুরুষ তাঁহার নিকট অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছেন। বীরপুরুষ ক্যাথারিণের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "বালিকা, তুমি অত্যন্ত কঠিন ব্রতে ব্রতী হইয়াছ, এই সহস্র সহস্র শবদেহের মধ্য হইতে তুমি একাকিনী অন্বেষণ করিয়া কিরূপে তোমার পালকপিতার শবদেহ প্রাপ্ত হইবে তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তুমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, আমি তোমার পিতার শবদেহ অনুসন্ধান করিয়া দিতেছি।"

ক্যাথারিণ বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এই অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু ক্ষমা করিবেন, আমি স্বয়ং আমার পালকপিতার শবদেহ অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব।"

সৈনিকপুরুষ কহিলেন, "তাহাই যদি তোমার সঙ্কল্প হয় তবে আমি তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যসাধনে একাগ্রতা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার পালকপিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে আমি তোমাকে এখান হইতে পলায়ন করিবার জন্য সাহায্য করিব। তোমার এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে প্রচুর অর্থ দিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি তাহা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আশা করি, তুমি তাহা গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবে না।"

সৈনিক যুবকের কথা শুনিয়া ক্যাথারিণ বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আমি সামান্য বালিকা মাত্র। জ্ঞান, বুদ্ধি, ও প্রবীণতায় আপনি আমাপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে এমন অসত্যের পথে প্রলুব্ধ করিবেন না! আমি সেনাপতির নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, কিছুতেই সেই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারিব না।"

"সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "তুমি তরুণবয়স্কা বালিকা, স্বীয় জীবন রক্ষার জন্য সত্যভ্রষ্ট হইলে তোমার কোনও প্রকার পাপ হইবে না। যাহারা পরিণত বয়স্ক, সত্যভ্রষ্ট হওয়া তাহাদের পক্ষে পাপ। তুমি স্বাধীন থাকিলে জগতের অনেক মহোপকার করিতে পারিবে; কিন্তু বালিকা বন্দী-জীবন বড় ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক, নিজের কোনও স্বাধীনতা সে অবস্থায় থাকে না, এমন কি আহার নিদ্রাটুকু পর্য্যন্ত পরের আয়ত্ত। এই জন্যই তোমার পলায়ন যুক্তি-যুক্ত।"

ক্যাথারিণ বলিলেন, "মহাশয়, পাপপুণ্যের প্রভাব সকলের উপর সমান। পাপপুণ্যের নিকট ধনী নির্ধন, বালক বৃদ্ধ ভেদাভেদ নাই। বিশেষতঃ আমি যখন বুঝিতে পারিতেছি সত্যভ্রষ্ট হওয়া পাপ, তখন আর আমি সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না, দয়া করিয়া আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

সহসা অনৈক মুমূর্ষুর চীৎকারধ্বনি শুনিয়া ক্যাথারিণ সেই দিকে কাণ পাতিয়া রহিলেন। কণ্ঠস্বর যেন তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় বার সেই স্বর শ্রবণ করিয়া ক্যাথারিণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে আমার পিতার কণ্ঠ!" সৈনিক যুবক সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ক্যাথারিণ সমভিব্যহারে তথায় গমন পূর্ব্বক শবস্তূপের মধ্য হইতে আহত মরণোন্মুখ ধর্ম্মযাজককে বাহির করিলেন। তখনো তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছিল, এবং চেতনা লুপ্ত হয় নাই। ক্যাথারিণ পিতাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষলগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজকও এরূপ স্থলে অসম্ভাবিত রূপে স্নেহময়ী দুহিতার সাক্ষাতে পরম বিস্মিত হইলেন, তাঁহার ক্ষতস্থলের ব্যথা যেন অর্দ্ধেক উপশম হইল। সৈনিক পুরুষ অনতিবিলম্বে ধর্ম্মযাজককে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মযাজক ক্রমে সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে সুস্থতা লাভ করিতে দেখিয়া ক্যাথারিণের বিষাদাচ্ছন্ন হৃদয় আনন্দের জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এদিকে সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইবার সময় বিগত প্রায়, ক্যাথারিণের ইচ্ছা পিতার নিকট আর একটু থাকিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করেন। কিন্তু তাহা হইলে যে তাঁহার শপথ ভঙ্গ হয়। ক্যাথারিণ আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, পালকপিতাকে কহিলেন, "পিতঃ, আমায় বিদায় দিন, বেশীক্ষণ আর আমার আপনার নিকট থাকার উপায় নাই, আমি সম্রাটের বন্দী। কেবল আপনার শবানুসন্ধান পূর্ব্বক সৎকারের নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণ সময় পাইয়াছিলাম। আমি সেনাপতির নিকট শপথ করিয়া আসিয়াছি যে, আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব। আমি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না, আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, হয়ত বা শেষে সত্যরক্ষা করিতে পারিব না। আমায় চিরবিদায় দিন পিতঃ; আমার সহিত বোধ হয় আর আপনার দেখা হইবে না।"

ক্যাথারিণের কথায় ধর্ম্মযাজকের নয়নযুগল অশ্রুসমাকুল হইল। তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "ক্যাথারিণ, মা আমার, তোমাকে আজীবন শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে আর আমি বাঁচিয়া সে দৃশ্য দর্শন করিব? হা, ভগবন্!"......

ক্যাথারিণ বলিলেন, "পিতঃ, ব্যাকুল হইবেন না। সত্যরক্ষা পরম ধর্ম্ম, আপনি তাহা আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবানের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, ইহাও আপনার শিক্ষা, আশীর্ব্বাদ করুন পিতা, আপনার শিক্ষার সম্মান যেন রক্ষা করিতে পারি। আপনি আনন্দচিত্তে আমাকে বিদায় দিন, তাহা হইলেই বন্দীজীবন আমি পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে পারিব।"

ধর্ম্মযাজক চোখের জল মুছিতে মুছিতে হস্ত তুলিয়া ক্যাথারিণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যাও মা, চিরমঙ্গলময় ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। দুঃখে কষ্টে সম্পদে বিপদে ভগবানকে ডাকিতে ভুলিও না। আমার শিক্ষা যথার্থই তুমি গ্রহণ করিতে পারিয়াছ দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম।"

ক্যাথারিণ পালকপিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় সেনাপতির শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সৈনিক যুবকও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন, উভয়েই বালিকাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ক্যাথারিণ চলিয়া গিয়াছেন। সেনাপতি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আসিয়াছ বালিকা? আমরা মনে করিয়াছিলাম, তুমি চলিয়া গিয়াছ।" ক্যাথারিণ বলিলেন, "মহাশয়, আমি আপনার নিকট শপথ করিয়া গিয়াছি যে, ফিরিয়া আসিব। আপনার অনুমতি ব্যতীত কিরূপে প্রস্থান করিব? মুমূর্ষু পিতার

সেবা-শুশ্রূষা করিতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় ক্ষেপণ করিয়া আসিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।" সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষ উভয়েই সেই বালিকার সত্যনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। ক্যাথারিণ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত সৈনিক পুরুষকে পরমাত্মীয়র মত সরল ও সহজ ভাবে বলিলেন, "মহাশয়, আমার পালকপিতা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, এখন তাঁহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে। আপনার আনুকূল্য ও দয়া প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার জীবন রক্ষার কোনই আশা ছিল না, আপনার সে ঋণ অপরিশোধনীয়, এজন্য আমি আপনার নিকটে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।"

বীর যুবক সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "বালিকে; তোমার চরিত্রে ও বাক্যালাপে মুগ্ধ হইয়াই তোমার সাহায্য করিয়াছি, যদি তাহা তুমি ঋণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাক, তবে ইচ্ছা করিলেই তুমি সে ঋণ-পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার।"

ক্যাথারিণের মুখখানি সরল স্বর্গীয় হাস্যের অরুণিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি আনত মুখে ধীরমধুর কণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয়, আমি দরিদ্রের কন্যা, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ আমার ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্যাতীত।"

বীর যুবক কহিলেন, "বালিকা, আমি তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করি তাহা তুমি ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে দান করিতে পার। কিন্তু তাহার মূল্য একটাও প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য অপেক্ষাও অধিক,—সে রত্ন তোমার হৃদয়। আমি তোমাকে আমার সহধর্ম্মিনী, জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইলে জীবন ধন্য মনে করিব। তোমার ন্যায় মহাপ্রাণা নারী যাহার গৃহলক্ষ্মী হয়; সত্যইসে ত্রিদিবের রাজত্বও অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে পারে।"

এই অসম্ভাবিত প্রস্তাবে ক্যাথারিণের মুখখানি লজ্জায় অরুণ-কিরণসম্পাতে শিশির বিন্দুটির মত নয়নরঞ্জন হইয়া উঠিল। দরিদ্রের কন্যা ক্যাথারিণ এতাদৃশ উচ্চপদগৌরবান্বিত ব্যক্তির সহধর্ম্মিনী হইবেন, এ কল্পনাও যে তিনি কোন দিন হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারেন নাই। তিনি নীরবে লজ্জা-বিনম্র বদনে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বীর যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ঋণ পরিশোধের তরে তোমার ইচ্ছা নাই?"

ক্যাথারিণ বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহানুভব সহৃদয় বীরপুরুষের সহধর্ম্মিনী হওয়া সে-ত পরম গৌরব ও সৌভাগ্যের কথা, কোন্ রমণী তাহা কামনা না করে? বিশেষতঃ আজীবন বন্দীত্বের গুরুভার বহন করা অপেক্ষা আমার পক্ষে সে সুখলাভ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মহাশয়, আমি পূর্ব্বেই সেনাপতি মহাশয়ের নিকট বন্দী হইয়াছি; বন্দীর হৃদয়দানের অধিকার কোথায়?"

যুবক বলিলেন, "যদি সেনাপতি মহাশয় তোমাকে সে সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করেন, তবে তোমার আপত্তি আছে কি?"

ক্যাথারিণ বলিলেন, "তাহা হইলে আর আমার কোনও আপত্তি নাই।" তখন সেনাপতি বলিলেন, "বালিকা, আমি তোমাকে সানন্দে মুক্তি দিলাম, তুমি ইঁহার সহধর্ম্মিনী হইয়া সুখশান্তি লাভ কর,—তোমার জীবন ধন্য হউক,—ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করি।"

বীর যুবক ক্যাথারিণকে বলিলেন, "আমরা সম্রাটের নিকট হইতে আমাদের এই শুভ বিবাহের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসি।"

ক্যাথারিণ ও যুবক উভয়েই শিবির হইতে বাহির হইয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে এক বিশাল প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে যমদূতাকৃতি সশস্ত্র প্রহরীর দল অনবরত বিচরণ করিতেছে। বীর যুবক ক্যাথারিণকে কহিলেন "আমরা সম্রাট-ভবনে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি কিয়ৎকাল এই স্থানে অপেক্ষা কর, অনতিবিলম্বে আবার আমরা

উভয়ে একত্রে মিলিত হইব।" বীর যুবক প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ক্যাথারিণ বসিয়া বসিয়া স্বীয় অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছেন, এমন সময় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে সম্রাট্ সন্নিধানে লইয়া যাইবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

ক্যাথারিণ রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে এক সুবিস্তৃত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাঁহার সেই পাণিপ্রার্থী সৈনিক পুরুষ পরিষদ্-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া উচ্চ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ক্যাথারিণ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে কি?" রাজকর্ম্ম-চারিটী ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন, সিংহাসনোপবিষ্ট যুবকই রুষিয়ার সম্রাট প্রথম পিটার।

ক্যাথারিণ বিস্ময়াবিষ্টের মত বলিয়া উঠিলেন, "একি স্বপ্ন না সত্য?"

সম্রাট কহিলেন, "ক্যাথারিণ, সমস্তই সত্য। আমি রুষসম্রাট, আর তুমি এই বিশাল রুষরাজ্যের সাম্রাজ্ঞী। তোমার ন্যায় ধার্ম্মিকা, সত্যপরায়ণা, সরলা, নিষ্ঠাবতী ও কর্ত্তব্যশীলা একটী রমণীকে আমার হৃদয়ের অংশভাগিনী করিব ইচ্ছা ছিল, ভগবান্ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। দয়াময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর ক্যাথারিণ, আমাদের এই শুভ পরিণয় জয়যুক্ত হউক।"......এই বলিয়া সম্রাট ক্যাথারিণের হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইলেন।

চরিত্রমাধুর্য্যে ও সত্যনিষ্ঠার বলে দরিদ্র কৃষক-কন্যা রুষ-রাজমহিষী হইলেন। ক্যাথারিণ রাজরাণী হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই, বিলাস-সুখ তাঁহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই! পরদুঃখে কাতরা, ধর্ম্মপ্রাণা ক্যাথারিণ আজীবন দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। যেখানে ব্যাধি নিপীড়িতের হাহাকার, সেখানে ক্যাথারিণ শুশ্রূষারূপিণী; যেখানে দুর্ভিক্ষ, ক্যাথারিণ সেখানে অন্নপূর্ণারূপে প্রকাশিতা; যেখানে নিরাশা, ক্যাথারিণ সেখানে আশারূপিণী; যেখানে অত্যাচার, ক্যাথারিণ সেখানে সাম্যরূপিণী। এতাদৃশা রমণীই জগতে প্রকৃত জননীপদবাচ্যা।

প্রত্যাখ্যাতা

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম

দুষ্মন্তের সভাপ্রান্তে কে তুমি বালা—
অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি, মমতা ঢালা?
বুকে ভরা পবিত্রতা, মোহিনী আশা,
শ্রবণে পশিছে তীক্ষ্ণ নিঠুর ভাষা!
বন-কুরঙ্গিনী সম, বাসনাহতা;
তপোবন-সুশোভিনী কনকলতা।
বিশ্বের রহস্য হায়, কেহ না জানে;
দারুণ বেদনা কেন সরল প্রাণে!

হারাইয়া অভিজ্ঞান আঁচল হ'তে
ভাসিয়া চলিলে আজি কালের স্রোতে!
যাও বালা, শকুন্তলা! কানন-মাঝে,
সাজুক প্রকৃতি আজি বিষাদ-সাজে।
যাও রাজ-রাজেন্দ্রাণি! মহিমময়ি!
গর্ভে তব কোহিনুর,—কাল-বিজয়ী
যাঁর নাম পুণ্যময় ভারতে গাঁথা।
দেবে কবি গাবে তব মহিমা-গাথা!

* শকুন্তলার পুত্র, মহাত্মা ভরতের নামে "ভারত-বর্ষ" এবং প্রসিদ্ধ "মহাভারত গ্রন্থ" অদ্যাপি বিরাজিত আছে।

সস্তায় শিল্প

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী

পূর্ব্বেই ভগিনীদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলি, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যদি কেহ লিখিয়া থাকেন, তাহা আমি অবগত নহি। যিনি যেমন লোক সকলেরই নিজস্ব হাত খরচা আছে, যাঁর যেমন অবস্থা প্রয়োজনও তাঁর সেইরূপ। আমার ধনবতী ভগিনীদের জন্য ইহা গ্রাহ্য শিল্প নহে, ইহাতে লাভও বেশী নাই। জিনিসটা কি, না হ্যাকড়ার পুতুল, ইহা অবশ্য নূতনও নহে, কেননা পশ্চিমের "গুড়িয়া" আবার "গুড্ড গুড়িয়া" নামে বহুদিন হইতেই পরিচিত। নথ-পরা, মাকড়ি-পরা, রঙিন ঘাঘরা কিম্বা সাড়ী ওড়না ঢাকা "গুড়িয়া" অনেকদিন হইতেই মেয়েদের আমোদ ও খেলার সমগ্রী। আজকাল আবার নানান রকম কাচের, চীনেমাটীর, সেলুলয়েডের সুন্দর সুন্দর পুতুল দেখিয়া ওড়না-ঢাকা "গুড়িয়া" শিশুদের পছন্দ না হইবারই কথা। তবে মজা এই, বালক-বালিকারা চিরকালই নূতনত্বের পক্ষপাতী, তাদের স্বভাব—ঘরে নানাবিধ খেলনা পুতুল থাকা সত্ত্বেও নূতন এক পয়সা দামের সোলার পাখী, চরকী, ফুল দেখিলেই ঝুঁকিয়া পড়ে এবং ছুটাছুটি করিয়া ছিনিয়া তবে শান্ত হয় এবং মাকে রেহাই দেয়। ঘরে বসিয়া অবসর মত ছেঁড়া হ্যাকড়া পাকাইয়া হাত, মাথা, পা করিয়া রঙিন ছেঁড়া জামা, কাপড় হইতে জামা কাপড় গড়াইয়া, কাল পাড় কিম্বা কাল পশমে চুল বাঁধিয়া, ঝুটা চুমকি পাঁরা হার, চুড়ী, খোঁপার ফুল পরাইয়া, কানে তারের মাকড়ি দিয়া সাজাইয়া পুতুল তৈয়ার করিলে সহজেই শিশুদের লোভনীয় হয়। আমি নিজে পরীক্ষা করিবার জন্য ২৫।৩০টী ঐপ্রকার পুতুল করিয়া আত্মীয় বন্ধুদের শিশুদের দিয়া দেখিয়াছি, তাহারা অতি আনন্দে ভাল ভাল পুতুল ফেলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে। ছোট করিয়া তৈয়ারী করিলে আমাদের শিশুদেবতাদের পছন্দ হয় না দেখিয়াছি, কেননা তাহা কোলে করিয়া বেড়ানো হয় না। একহাত হইলে বেশ বড় ও পছন্দসই হয়। প্রথমে, যা তা ছেঁড়া হ্যাকড়া, শণ কি পাট মোটা করিয়া বাঁধিয়া তার উপর সাফ্ হ্যাকড়া জড়াইবেন, মাথা, গলা, বুক, পেট ভাগ ভাগ করিয়া শক্ত পাড় কিম্বা সূতা দিয়া আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিবেন। বাঁধার পর সাফ্ হ্যাকড়ায় হাত পা মুখ ঢাকিয়া সেলাই করিবেন। হ্যাকড়ার কান করিবেন এবং কাঠির উপর হ্যাকড়া জড়াইয়া আঙুল করিবেন। কাল পাড়ের সূতায় চোখ, ভুরু, চুলে পাতা কাটা সব ছুঁচ দিয়া সেলাই করিবেন। লাল সূতায় ঠোঁট করিবেন, সিন্দুরের টিপ দিবার ইচ্ছা হইলে লাল সূতায় ফোঁড় দিয়া তুলিবেন। কালি দিয়া চোখ করিলে সহজে ধ্যাবড়াইয়া যায়, ইহাও কাল সূতা দিয়া করিবেন। এ পুতুল সহজে ভাঙ্গিবার ভয় নাই, কাজেই বহু দিন থাকিয়া যায়, আর পাড়ের সূতায় চোখ-মুখ থাকাতে জল দিয়া ছেলেমেয়েরা দুধ খাওয়াইলে বা স্নান করাইলেও নষ্ট হয় না, রৌদ্রে দিলেই আবার শুকাইয়া যায়। যে যে বালিকাদের এই পুতুল দিয়াছি, ৩ বৎসর গিয়াছে এখনও তাঁর চিহ্ন তাদের কাছে বর্ত্তমান। বেশী ময়লা হইলে, জামা সাড়ী খুলিয়া সাবান দিয়া পুতুলটি ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় জামা কাপড় পরাইলে বেশ হয়। আমি কোন পুতুলকে ব্রাহ্ম ধরণের, কোন পুতুলকে হিন্দি ধরণের, কাহাকেও আমাদের মত সাধারণ সাড়ী, কাহাকেও গাউন পরাইয়া এবং ঐরূপ সামঞ্জস্য-মত গহনা দিয়া সাজাইয়াছি, বালিকারা অতি আগ্রহে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। বিক্রয় করিয়া অবশ্য

দেখি নাই কত দাম হয়, তবে একটি ঘটনায় আমি ভগিনীদের জন্য এই সামান্য কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। আমার এক ভগিনীর কন্যার জন্য দুইটি পুতুল ঝিয়ের হাতে দিয়া ভবানীপুর পাঠাই, ঝিয়ের হাতে পুতুল দেখিয়া অনেকে সাগ্রহে কত দাম, কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন, এমন কি গঙ্গাস্নান-ফেরত বৃদ্ধ মাতারা কেহ ।/০ আনা ।৵০ আনা পর্য্যন্ত দাম দিয়া ইহা লইতে চান। আমি একথা শুনিয়া খুব হাসিয়াছিলাম; পরে ভাবিয়া দেখিলাম আমরা ত একেই দরিদ্র জাতি, আমাদেরই কত দুস্থা ভগিনী সামান্য দুচারটি পয়সা অভাবে একাদশীর পরদিন একটু গুড় গালে দিয়া একঘটি জল খান, অনেক ভগিনী পুত্রের এক পয়সার আবদার পুরণ করিতে না পারিয়া নয়নজলে ভাসেন; তাঁরা যদি একবার চেষ্টা করিয়া দেখেন তাহলে মন্দ হয় না। খরচ ত কিছু এমন নয়, পুরাতন ছেঁড়া কাপড়, পাড়ের সুতা, পুঁথি, চুমকি এই ত আবশ্যকীয় দ্রব্য। অবসর সময়ে ২।১টা এই রকম পুতুল করিলে বোধ হয় বিক্রয়ের অভাব হয় না। পুতুল ভাল হইলে পাড়ার ২।১ জন জানিলেই দু একটা বিক্রয় হইবে। পরে বেশী জানাজানি হইলে পয়সা দিয়া লোকে বাড়ী হইতে লইয়া যাইবে। প্রথম খারাপ হইলে দামও সস্তা করিবেন। প্রথমে /০ আনা কি /১০ পয়সা, পরে ভাল হইলে ৵০ আনা ।৵০ আনা পর্য্যন্ত দাম উঠিবে। ভগিনীরা ত বাহিরে বিক্রয় করিবেন না, ঘরে বসিয়া ৵০ আনাও যদি রোজগার হয়, মন্দ কি? পয়সার কাহার প্রয়োজন নাই? আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। তবে যাঁদের দুপাঁচটি পুত্রকন্যা তাঁদের অবসর অল্প, তাঁরা না করতে পারেন, কিন্তু আমাদের ভগিনীদের মধ্যে যাঁর অবসর আছে তিনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। অশিক্ষিতা হিন্দুস্থানী মেয়েদের হাতের "গুড়িয়া" যখন বিক্রয় হয়, তখন সেই প্রকারের শিল্প আমার শিক্ষিতা ভগিনীগণের হাতে হইলে সুন্দর হয় এবং বিক্রয়ের আশা খুবই করা যায়।

শেষ চিহ্ন

(গল্প)

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী বসু।

(১)

জ্যৈষ্ঠ মাস, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তরুলতাগণ শুষ্কপত্রে এক শ্রীহীন ভাব ধারণ করিয়াছিল, মানবগণ মধ্যাহ্নে রবির প্রখর দৃষ্টিতে দগ্ধ হইয়া বৈকালের হাওয়ায় একটু একটু করিয়া স্নিগ্ধ হইতেছিল, কোথায় ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটি কোকিল সবে মাত্র সুর ধরিয়াছিল, এমন সময় প্রকাশচন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী আসিল। তাহার মা শুইয়া ছিলেন আর সরোজ তখনো রান্নাঘরে কি করিতেছিল। প্রকাশকে দেখিয়া জননী তাড়াতাড়ি উঠিয়া সরোজকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "এখনো ঘরে কি হ'চ্ছে? এমন কুড়ে আমি দেখিনি, বাছা এই রোদ্দুরে তেতেপুড়ে এল, ওকে একটু বাতাস কর, মুখ ধোবার জল দাও; তা নয়, এই সময় যত কুজি, সবই কি অনাছিষ্টি তোমার!" সরোজ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কক্ষে আসিয়া দেখিল প্রকাশ ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িয়া

পাখার বাতাস খাইতেছে। সরোজ হাত হইতে পাখা লইয়াই প্রকাশ বলিল "কি ক'র্‌ছিলে?"

সরোজ বলিল "জলখাবার ক'র্‌ছিলাম।"

"সকাল বেলা রান্নার পর ক'রে রাখতে পার না?"

"মা যে বকেন, বলেন ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। বাস্তবিক ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে পারবে কেন?"

"তা হোক, সকাল বেলাই করে রেখো, এতেও ত মা বকছিলেন"—বলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল "রাণী কোথায় গিয়েছে? তাকে দেখতে পাচ্ছি না ত?"

সরোজ বলিল "তাকে রঘুয়া নিয়ে গেছে।"

প্রকাশের জননী সৌদামিনী দেবী অন্য কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন "প্রকাশ, তোর জল খাওয়া হয়েছে?" প্রকাশ তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া বলিল "এই যে যাচ্ছি।"

"যাচ্ছি! এখনো মুখে হাতে জল দিস্‌নি বাবা, মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে যে।" পরে সরোজকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আর তোমাকেও বলি বাছা, এখন কি গল্প করবার সময়? ও এই রোদ্দুরে বাড়ী এল, কোথায় খেতে টেতে দেবে, সেই সকালে কখন দুটো খেয়ে গেছে, তা নয়, এ সময় যত রাজ্যের কথা, তোমাদের বিবেচনা কবে হবে তা বলতে পারি নে।"

সরোজ লজ্জিত ভাবে ধীরে ধীরে জলখাবার আনিতে প্রস্থান করিল।

(২০)

প্রকাশ যখন সবে মাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এস-সি পড়িতে আরম্ভ করে তখন তাহার পিতা উমেশচন্দ্র পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রকাশের বিবাহের পাঁচ মাস পরেই উমেশচন্দ্র পরলোক গমন করিলেন সেই কারণে সৌদামিনী সরোজকে 'অপয়া' মনে করিয়া দেখিতে পারিতেন না। ঐ কারণে কিম্বা বিনাপরাধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেন। উমেশচন্দ্র উকিল ছিলেন, তাঁহার পশারও বেশ ছিল। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন একটা সংসার তাহাতে বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত কিন্তু সৌদামিনী ভয়ানক কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া রন্ধন করিবার লোকও রাখেন নাই। সরোজের উপরেই তিনি রন্ধনাদির ভার দিয়াছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "আমি কি এখন অপর লোকের রান্না খেতে পারি? বামুনরা বড়ই অপরিষ্কার, আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে এখন শুদ্ধাচারে থাকাই নিয়ম, হিঁদুর ঘরের বিধবা জানই ত ভাই," ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবাহের এক বৎসর পরে যখন সরোজ একটি কন্যা প্রসব করিল তখন প্রকাশের জননী বধূ কর্ত্তৃক "সাত হাত মাটি" নীচু হইয়া যাওয়া এবং পিতৃপুরুষ জলগণ্ডূষ না পাওয়ার দরুণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তজ্জন্য সরোজকে মধ্যে মধ্যে বেশ দুচার কথা শুনাইয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। তা ছাড়া তিনি রাণীকেও যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিলেন না।

সরোজের পিত্রালয় কলিকাতাতেই। তাঁহার পিতা এক সওদাগরী অফিসে দেড় শত টাকা মাহিনাতে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার তিনটি কন্যা ও একটি মাত্র পুত্র বিজয়। বিজয় এম-এ পড়িতেছে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সরোজের বিবাহ দিয়াছিলেন, গত বৎসরও মধ্যমা কন্যা সুহাসিনীর বিবাহে তিন চার হাজার খরচ করিয়াছেন, এখনো একটি বিবাহোপযোগ্যা কন্যা বর্ত্তমান, কাজেই সৌদামিনী দেবীর নিকট তিনি তত্ত্ব-তাবাস ইত্যাদি রীতিমত করিতে পারেন না। সেই কারণে সৌদামিনীও সরোজকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে রাজি ছিলেন না। তাহার পিতা বা ভ্রাতা দুমাস যাওয়া-আসা করিলে দয়া করিয়া দুদিনের জন্য তাহাকে

পাঠাইতেন, আবার তাঁহাদেরই রাখিয়া যাইতে হইত।

প্রকাশ সরোজকে যথেষ্ট স্নেহ করিত কিন্তু সে ভয়ানক নিরীহ প্রকৃতির লোক ; মায়ের উপর কথা কহিতে সাহস করিত না। মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া বা অশান্তির সৃষ্টি করা সে মোটেই পছন্দ করিত না।

(৩)

ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী নীলাম্বরী সাড়িখানি পড়িয়া সুস্নিগ্ধ হস্ত বিস্তার করিয়া রোগ শোক দুঃখে জর্জ্জরিত মানব সকলকে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে আহ্বান করিতে করিতে আগমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রদেব রজত কৌমুদী বিকীর্ণ করিতে করিতে উদয়াচল শিখায় আরোহণ করিলেন। এমন সময় একটি যুবক সুদীর্ঘ রাজপথ অতিক্রম করিয়া প্রকাশদের বাটীতে উপস্থিত হইল. যুবক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে সৌদামিনী দেবী কম্বলাসনে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া সবে মাত্র নামের ঝুলিতে হাত প্রবিষ্ট করিয়া জপে বসিয়াছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সৌদামিনী দেবী আগন্তকের মুখের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন স্বরে কহিলেন "কে, বিজয় ? ঘরে গিয়ে বোস, আমি যাচ্ছি।"

বিজয় সেখান হইতে আস্তে আস্তে রান্নাঘরাভিমুখে যাইতে পথিমধ্যে সরোজের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সরোজ একটু বিস্ময়ান্বিত ভাবে চাহিয়া বলিল "দাদা যে ? চল ঘরে চল।" বিজয় সরোজের সহিত শয়নগৃহে গমন করিল এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "প্রকাশবাবু কোথায় ?"

সরোজ বলিল "বোধ হয় পড়বার ঘরে আছেন।"

বিজয় বলিল "সরোজ, তোকে নিয়ে যাবার জন্য মা বড় ব্যস্ত হয়েছেন সেই জন্যে আজ আমি তোর শাশুড়ীকে বলতে এলাম, যদি পাঠান ত ভাল দিন দেখে এসে নিয়ে যাব।" সরোজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল "কেন দাদা তোমরা বার বার এরকম নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'চ্ছ ? মাকে আমার জন্যে ভাবতে বারণ করো, আমার ত কোনও কষ্ট নেই, আর আমি গেলে আমার শাশুড়ীর বড় কষ্ট হবে।" সরোজের কথার ভিতরে কতখানি ব্যথা প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে তাহা বুঝিয়া বিজয় ম্লান মুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

প্রকাশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিজয়কে দেখিয়া কুশলাদি প্রশ্ন করিল, বিজয়ও যথোচিত উত্তর দিয়া কহিল "সরোজকে দেখবার জন্যে মা বড় ব্যস্ত হয়েছেন, যদি দিনকতকের জন্যে পাঠিয়ে দাও তাহলে বড় ভাল হয়, আর সরোজেরও ত দেখছি শরীর ভয়ানক খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

প্রকাশ বলিল "হাঁ, ওকে আমি পাঠিয়ে দেবো আর সেই কথাই আজ কদিন ধরে ক্রমাগত ভাবছি ভয়ানক দুর্ব্বল শরীর, এখানে প্রসব হওয়া কোন মতেই হবে না।"

বিজয় একবার সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "সরোজ কিন্তু যেতে রাজি হচ্ছে না, বলে তোমাদের কষ্ট হবে।

প্রকাশ বিস্ময়ান্বিত ভাবে সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "না, না, তা হবে না, আমি নিজেই রেখে আসব।"

সরোজ মুখখানি নীচু করিয়া বস্ত্রাঞ্চল খুঁটিতে লাগিল।

রাত্রে প্রকাশ বলিল "কাল আমি কলেজ যাবার সময় তোমাকে নিয়ে যাব, ঠিক হয়ে থেকো।"

সরোজ বলিল "না, আমি যাব না।"

"কি ছেলে মানুষের মত কথা বল সরোজ এখানে কে তোমায় দেখবে ? মা একে বুড় মানুষ সংসারের কাজ করে আবার কি তোমায় দেখতে পারবেন ?"

"তা হোক তিনি ত বল্লেন—"

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল "মার সেই সব কথা শুনে বুঝি বলছ যাব না? ছিঃ লক্ষীটি, মার কথায় অভিমান করো না, বুড় মানুষ শোকে তাপে জর্জ্জরিত, কাকে কখন কি বলেন ঠিক নেই, তাতে কিছু মনে করতে নেই।" কথা কয়টি বলিয়া প্রকাশ সরোজের নম্র করুণ নত মুখখানি দুইহাতে ধরিয়া নিজের বক্ষমধ্যে টানিয়া লইল। সরোজ নীরবে তাহার বুকের উপর মুখ রাখিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, দুই ফোঁটা অশ্রু নীরবে তাহার কপোল বহিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশের বক্ষের উপর পড়িল।

(৪)

বিজয় যখন সরোজের যাবার কথা সৌদামিনী দেবীর নিকট উত্থাপন করিল তখন তিনি ভয়ানক রুষ্ট হইয়া বিজয়কে নানা কথা শুনাইয়া দিলেন, সরোজকেও কিছু বাদ দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, সরোজ গোপনে পিত্রালয়ে চিঠি লিখিয়া বিজয়কে আনিয়াছে এবং তাঁহাকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে তথায় যাইতে চাহিতেছে। এইরূপ যে একটা কাণ্ড ঘটিবে তাহা সরোজ পূর্ব্ব হইতেই জানিত, তাই সে বিজয়ের কথার প্রতিবাদ করিয়াছিল কিন্তু প্রকাশ তাহা ঘটিতে দিল না।

যখন প্রকাশের সম্মুখেই সৌদামিনী বিজয়কে ও তাহার পিতার উদ্দেশে নানাপ্রকার অপমান-সূচক কথা বলিতে লাগিলেন, সরোজকেও বিনাপরাধে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন, তখন সে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয় একবার ম্লান দৃষ্টিতে সরোজের মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ বদনে চলিয়া গেল, সরোজ নীরবে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

পরদিন যখন বহির্দ্বারে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, সরোজ ধীরে ধীরে আসিয়া সৌদামিনীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল তখন তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া "আমাকে আর পেরনাম করতে হবে না বাছা, ভক্তি, ত কত, আর লোকদেখানো পেরনামের কাজ নেই, যেখানে যাচ্ছ যাও" বলিয়া দ্রুতবেগে পা সরাইয়া লইলেন।

প্রকাশ সেই সময় রাণীকে ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থানে আসিতেছিল, সৌদামিনীর শেষোক্ত কথাগুলি শুনিতে পাইয়া নিজের অটল গাম্ভীর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বলিয়া ফেলিল "মা, ওকে ওসব কথা বলছ কেন? ও যেতে চায়নি, আমিই জোর করে রেখে আসছি।"

সৌদামিনী সবিস্ময়ে একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে আরো অধিকতর ক্রোধযুক্ত স্বরে "আর বাছা তোমার সে কথা বলতে হবে না, আমি ত ছেলেমানুষ নই, আমি সব বুঝি, রাম রাম, আজকালকার ছেলেগুলো হলো কি?" বলিতে বলিতে উত্তেজনা বশতঃ দ্রুতবেগে অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রকাশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরোজকে বলিল "এস এস, আমার কলেজের দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

(৫)

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা আপন সর্ব্বদেহে চাঁদের কৌমুদী মাখিয়া, অসংখ্য তারার মালায় বিভূষিত হইয়া, হস্তে রত্নদীপ জ্বালিয়া পৃথিবী মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে মলয় পবন ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, কানন মধ্যে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া লুকোচুরি খেলিতে লাগিল, সরসী হইতে কুমুদিনী মুখ খুলিয়া বিমল হাস্যে পুষ্করিণী আমোদিত করিল, পাখিয়া দিগন্ত ভরিয়া আকুল স্বরে ঝঙ্কার করিতে লাগিল।

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল এখনও প্রকাশ কলেজ হইতে বাটি আইসে নাই, সৌদামিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে প্রকাশ শ্বশুরালয়ে গিয়াছে।

সরোজ পিত্রালয়ে যাইবার পর সুদীর্ঘ দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ আরো দুচার

দিন রাণীকে দেখিতে গিয়াছে বটে কিন্তু এত রাত্রি ত হয় নাই, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল, ১১টা বাজিল, তখন সৌদামিনী বড়ই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন এবং আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিলেন "ছিঃ ছিঃ ছেলেটা হোল কি? আর ছেলেরই বা দোষ কি? এমন ছোটলোকের মেয়েও তিনি এনে দিয়ে গেছেন যে, চিরকালটা আমি জ্বালাতন হলুম। বাছা ত আমার এ রকম ছিল না, চব্বিশ ঘণ্টা লাগানিতে ওর পর্য্যন্ত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আজ বুঝি আবার বিশ্রেটা কলেজ থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে! একটু আক্কেলও কি নেই গা যে, আমার বুড় মা সেই জনমানব শূন্য বাড়ীতে কি করে থাকবে? ছিঃ ছিঃ, ছেলেটাকে পর্য্যন্ত জানোয়ার করে তুলেছে! ভগবান, আমার বাছাকে ডাইনির হাত থেকে রক্ষা করো।"

এমন সময় প্রকাশ রাণীকে কোলে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং রাণীকে সৌদামিনীর পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল "মা, সে তোমায় সব জ্বালা থেকে মুক্ত করে গেছে, আর তার এই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকু তোমার পায়ে শেষ উপহার দিয়ে গেছে—"

প্রকাশ আর বলিতে পারিল না, দ্রুতবেগে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। রাণী সৌদামিনীর পায়ের নিকট বসিয়া বসিয়া সান্ধ্যগগনের পাপিয়ার ন্যায় সেই নিস্তব্ধতাকে কম্পিত করিয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—'মা'।

ভারতের নারী-সমস্যা

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ।

যেদিন কবির লেখনী হইতে—"না জাগিলে যত ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না—" এই আক্ষেপ নিঃসৃত হইয়াছিল—তাহার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। এ আক্ষেপ এখন শুধু আর কাব্যজগতে অবরুদ্ধ নাই—কথায় কথায়, বক্তৃতায়, আলোচনায়, নানারকমের পত্রে ও পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে ইহার প্রতিধ্বনি চারিদিকে শুনা যাইতেছে। বিদুষী ভারত মহিলাগণও এ আক্ষেপবাণীর আবৃত্তি করিতেছেন। সুতরাং দেশের অন্যান্য সমস্যার সহিত নারী-সমস্যাও যে ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন মনে করা যাইতে পারে।

ভাবিবার রীতি ভিন্ন দেশে ভিন্ন রকম। ভারতীয় চিন্তার ধারা সকল বিষয়েই অন্য দেশের চিন্তার ধারা হইতে পৃথক্। এদেশের মনীষীগণ কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার চরমে না পৌছিয়া বিরত হইতেন না। সেই জন্য ভারতের ভাবুক জন নারীর মধ্যে মাতৃত্বের প্রকাশ দেখিয়া যখন মুগ্ধ হইলেন তখন নারী-চরিত্রের অন্য দিক্‌গুলির প্রতি তাঁহাদের আর তেমন শ্রদ্ধা রহিল না। দার্শনিক বিশ্ব-বৈচিত্র্যের সমাধান করিতে যাইয়া পরিশেষে মাতৃরূপী মহাশক্তিতে উপনীত হইলেন। সাধক ও ভক্ত দেবতার অন্য রূপ ভুলিয়া তাঁহার মাঝে শুধু মাতৃত্বেরই নানা ধ্যান করিতে লাগিলেন। মায়ের সন্তান স্তব করিলেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেবতাকে মাতৃমূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এতদূর উন্মাদনা লাভ

করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য সভ্য জাতি মধুর মাতৃ-তত্ত্বের আভাষ পাইয়া থাকিতে পারে—কিন্তু এই তত্ত্বকে এত গভীর, এত ব্যাপক করিয়া উপলব্ধি করে নাই।

নারীর মধ্যে কিন্তু দুইটী রূপ আছে—এক রূপে নারী মানবসমাজের প্রসূতি ও পালয়িত্রী; দেহের সকল শক্তি দিয়া, জীবনের রসধারায় সিঞ্চিত করিয়া, হৃদয়ের সকল ভালবাসার আবেষ্টনে, স্তন্যপীযূষ দানে সন্তান পরম্পরার জননী ও ধাত্রী-রূপে সৃষ্টির ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিতেছেন। অন্য দিকে রমণীরূপে পুরুষের হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, পুরুষবৃত্তি সকলকে দমিত করিয়া, যাহা কিছু সুন্দর কোমল ও মধুর তাহার স্পর্শে তৃপ্ত ও সরস করিয়া, নারী মনুষ্যসমাজকে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-লোকে আহ্বান করিতেছেন। এই আহ্বানের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ সভ্যতার মধ্যে যাহা কিছু মনোরম ও চিত্তদ্রাবক তাহার আবিষ্কার করিয়াছে—সমাজকে হিংস্রতা ও কঠিনতার আদিম স্তর হইতে ক্রমশঃ উৎকর্ষের পথে উপনীত করিতেছে। প্রশ্ন উঠে—এ দু'য়ের মধ্যে কে বড়—জননী না রমণী? কালের নিয়মে একই আত্মা রমণী হইতে জননীত্বে উপনীত হয়—রমণী যদি বীজ হয় জননী তাহার অঙ্কুর। বীজ মূল না অঙ্কুর মূল—ইহার সমাধান কে করিবে? ইংরাজ কবির উক্তি—The child is father of the man. ইহার রূপান্তরে বলা যাইতে পারে বালিকাই পরিণত বয়স্কার জননী। জীবনের প্রথম দশায় যে সকল বৃত্তি সূক্ষ্মাকারে বীজের মধ্যে গাছের সকল অবয়বের মত নিহিত থাকে—কালক্রমে বয়ঃপরিণামের সাথে সেগুলিই পুষ্ট হইয়া, প্রবুদ্ধ হইয়া দেখা দেয়। ইহাই কি পুরুষ কি নারী উভয়ের পক্ষেই সত্য। আবার অন্যদিকে দেখি মানবশিশু নিজ জনক-জননী আদি পুরুষ পরম্পরা হইতে বিযুক্ত নহে—বিধাতার মৌলিক সৃষ্টি নহে—জাতি ও সমাজের —— হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। তাহার সত্তার প্রত্যেক অণু পরমাণু অতীতের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই জন্য আজ যে বালিকা বায়ুস্রোতে কম্পমানা দীপশিখার মত মর্ত্ত্যের খেলাঘরে নবাগতের অটুট আশা ও অখণ্ড উৎসাহ লইয়া আনন্দ মূর্ত্তি ও আনন্দের উৎস রূপে নৃত্য করিতেছে ও প্রতি পদক্ষেপে আনন্দের তরঙ্গ উঠাইতেছে—সে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস হইতে বিযুক্ত নহে—তাহার প্রত্যেক অঙ্গসংস্থান ও অঙ্গভঙ্গী পুরাতনের পুনরাবির্ভাব মাত্র। বর্ত্তমান মানুষ আপন পূর্ব্বপুরুষেরই পুনরাবৃত্তি স্বরূপ। সম্পূর্ণ ভাবে নূতন প্রণালীতে চালিত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। জল বায়ু রৌদ্র ও মাটীর তারতম্য অনুসারে বৃক্ষের পুষ্টি ও আকৃতি কতক নিয়মিত হইতে পারে—কিন্তু মূলগত পার্থক্য হইতে পারে না। লিচুর বীজ কখনও খেজুর গাছে দাঁড়াইতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। উদ্ভিদ্‌জগতে এমন অদ্ভুত কর্ম্মী বৈজ্ঞানিকও শুনা যায় আবির্ভূত হইয়াছেন যিনি নিজ চিন্তা ও প্রযত্নের বলে এই-রূপ জাতিগত বিশেষত্বগুলিও বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। মনে হইতে পারে—মানবসমাজেও সেইরূপ জাতিগত বৈশিষ্টের চিরন্তন স্থায়িত্ব নাই—শিক্ষার দ্বারা জাতীয় প্রবণতাগুলিও বিভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব। ফলে ভারতীয় চরিত্রের যাহা বিশেষত্ব তাহাও শিক্ষা ও আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে মুছিয়া গিয়া এদেশের নারীকুল অন্য রূপ ও অন্য চরিত্রের আধার হইতে পারেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাজের অতি সামান্য অংশেই পৌঁছিয়াছে। যে বৃহৎ অংশ বাকী আছে তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেই হতাশ হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নারীসমাজের একটা বিপ্লব সদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিবে—ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু আদমসুমারীর হিসাব

অনুসারে লেখাপড়ার বিস্তার হইবার পূর্ব্বেও যে নূতন ভাব, নূতন বেশ ভূষার ধরণ, বিভিন্ন গার্হস্থ আদর্শ জাতির মন অভিভূত করিয়া থাকে—ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। এসকল বিষয়ে যথাযথ ক্রম রক্ষা না হইয়া বরং ক্রমবিপর্য্যয়ই স্বাভাবিক। শিক্ষা অপেক্ষা অনুচিকীর্ষা প্রবল—উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত আরও দ্রুত কার্য্য করে। সুতরাং শতকরা ৩০।৪০ বা ততোধিক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নারীসমস্যা সম্বন্ধে সামাজিক গণের চিন্তার কারণ ঘটিবে না—এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। বিদেশী আদর্শের সংস্পর্শে আমাদের অনিষ্ট হওয়া যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে সময় থাকিতে সে আদর্শ দূরে রাখিবার প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। কিম্বা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সমন্বয় দ্বারা অভিনব নারীচরিত্রের বিকাশ যদি ভারতভূমিতেই সম্ভব হয়—তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই এদেশের ও বিদেশের আদর্শ কি তাহা যথাযথ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিদেশী দৃষ্টান্ত আমদানী করিবার জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই, কারণ সে দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রকৃতই যদি প্রাণ থাকে—তাহা হইলে আপনার জোরেই তাহা আমাদিগের মন অধিকার করিবে বরং প্রয়োজন সাহিত্যে ও ইতিহাসে প্রাচীনভাবানুপ্রাণিত ভারতীয় নারীচরিত্রের সম্যক্ আলোচনা করা। দেশের জনসমাজ বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ যে অবস্থায় বর্ত্তমানে উপনীত হইয়াছে তাহাতে মাতৃত্বের উদ্বোধন ও পরিপুষ্টি সাধনই এক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ভারতে প্রাণের স্পন্দন যেন স্তিমিত হইয়া আছে। সুস্থ, সবল ও স্বাধীন জাতির জীবনের যে উল্লাস, উৎসাহ ও আনন্দ দেখা যায় ভারতে তাহা কই? রুগ্ন, দুর্ব্বল, নিস্তেজ, বিকলেন্দ্রিয়, অপুষ্ট দেহ, নিরুৎসাহ, নিরানন্দ ও ধ্বংসোন্মুখ সন্তানগণের মুখ দেখিয়া দেশমাতৃকার মুখ ম্লান, চিত্ত অবসন্ন। এই সঙ্গীন সময়ে পরিত্রাণের একমাত্র সম্ভাবনা মাতৃজাতির উন্নতিতে—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে। "মাতৃ-মন্দিরের" ঘণ্টাধ্বনি দেশবাসীর কর্ণে সেই বাণীই পৌঁছাইয়া দিতেছে।

রন্ধন-বিদ্যা

বোম্বাইএর "শ্রীখণ্ড"—

ইহা গ্রীষ্মকালের অতি উপাদেয় খাদ্য। উত্তম দধি কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া বেশ করিয়া ফেনাইবে। ঐ ফেনান দধির সহিত পরিমাণমত চিনি ও অল্প একটু দুধ মিশাইবে। ঐ মিশ্রণ বেশ করিয়া ঘুঁটিয়া উহাতে একটু ভাজা জিরার গুঁড়া ও লবণ দিবে। এইবার একটু নাড়িয়া চাড়িয়া লইলেই "শ্রীখণ্ড" প্রস্তুত হইল। "শ্রীখণ্ড" খুবই মুখপ্রিয় খাদ্য।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

মান্দ্রাজী "বাসুচং"—

উপাদান:—১০।১২টি বড় গলদা চিংড়ি মাছ, লবণ, জিরামরিচ, হলুদ, লঙ্কা, আদা, তেজপাত, চিনি, তৈল, লেবুর রস।

প্রথমে গলদা চিংড়ি মাছের খোলা ছাড়াইয়া মাথা ফেলিয়া দিয়া বেশ করিয়া বাট। মাছ বাটিয়া রাখিয়া হলুদ, জিরামরিচ, লঙ্কা বাটিয়া লও। এইবার কড়ায় তৈল চড়াইয়া বাটা মাছগুলি ভাজিয়া লইয়া অল্প জলে মশলা গুলিয়া ঢালিয়া দাও। পরিমাণমত লবণও এই সময় দেওয়া দরকার। মশলা ও লবণাদি দিয়া খুন্তি দিয়া সমস্ত জিনিষটি বেশ করিয়া নাড়িতে থাক। নাড়িতে নাড়িতে জল শুকাইয়া বেশ মাখা মাখা হইলে একটু লেবুর রস ও কিছু চিনি দিয়া নামাইয়া লও।

এই অম্ল-মধুর "বাসুচং" সুস্বাদু ও বেশ মুখরোচক খাদ্য। প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিও শক্ত নহে। আশা করি বঙ্গমহিলারা এক একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

সজিনা ফুলের আচার—

উপাদান :—উৎকৃষ্ট সজিনা ফুল এক পোয়া, শ্বেত সরিষা অর্দ্ধসের, বীজশূন্য তেঁতুল অর্দ্ধ পোয়া, জীরা অর্দ্ধ ছটাক, আন্দাজ মত লবণ, সরিষা তৈল অর্দ্ধ পোয়া।

সজিনা ফুলগুলির বোঁটা ছিঁড়িয়া ধুইয়া দুই দিন রৌদ্রে শুকাইয়া রাখ। একটু জলে তেঁতুল কাদার মত করিয়া গুলিয়া রাখ। এইবার ঐ গোলায় শুষ্ক ফুল মিশাও। সরিষা বাটিয়া উহার সহিত মিশাও এবং লবণ দাও।

কলা পাতায় একটু তেল মাখিয়া মিশান ফুল রাখিয়া রৌদ্রে দাও। বিকালে একটি হাঁড়িতে অথবা জারে উহা তুলিয়া মুখ উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখ। পরদিন আবার রৌদ্রে দাও। ৪।৫ দিন এই রকম রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, জীরা শুক্‌না খোলায় একটু ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া আচারে মিশাও। এইবার অবশিষ্ট তেল ঢালিয়া মিশাইয়া রাখিলেই উত্তম আচার প্রস্তুত হইবে।

ইচ্ছামত লঙ্কাবাটা অথবা লঙ্কা ফালি করিয়া দেওয়া যায়।

শ্রীমতী নিকুঞ্জলতা চলিহা।

মটর ডাইলের বরফি—

উপকরণ :—মটর ডাইল /।০, চিনি /।০, ঘি /৶০, বাদাম /১০, পেস্তা //০, কিস্‌মিস /৶০।

পূর্ব্বে ডালগুলি বেশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া ভিজাইয়া রাখ। তার পর ঐ ডাল ভাল করিয়া বাটিয়া লও। গজার রসের মত ঘন করিয়া চিনির রস তৈয়ারী কর। পেস্তা বাদাম ভিজাইয়া কুচাইয়া রাখ, কিস্‌মিস্ গুলি বাছিয়া ধুইয়া রাখ। এখন কড়ায় ঘি চড়াও, ঘি পাকিলে ঐ ডাল বাটা উহাতে দিয়া নাড়িতে থাক, আধ ভাজা হইলে উহাতে পেস্তা বাদাম ও কিস্‌মিস্ দাও তারপর এমনভাবে নাড়িতে থাক যেন ধরিয়া না যায়। যখন ডাল বেশ ভাজা হইয়া ঝরঝরে হইবে তখন নামাও এবং উহাতে চিনির রস ঢালিয়া দিয়া পুনরায় নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে রসেতে জলেতে চাপ বাঁধিয়া আসিতেছে, তখন একখানি থালায় একটু ঘি মাখাইয়া উহা ঢালিয়া দাও। থালার উপর একইঞ্চি পুরু এবং সমান করিয়া ঢালিতে হইবে। এইবার বেশ টানিয়া গেলে ইচ্ছামত আকারে কাটিয়া লও। দু-এক ফোঁটা গোলাপী আতর দিলে বেশ গন্ধ হইবে।

শ্রীমতী নলিনীবালা রায়।

ছানার জিলাপী—

উপকরণ :—ছানা /।০, চিনি /১, ময়দা /।০, ঘি, /।০, দুধ পরিমাণ মত।

প্রথমে চিনির রস করিয়া রাখ। তার পর এক খানি পাথরে ময়দায় এক ছটাক ঘিয়ের ময়ান দাও। এইবার উহার সহিত ছানা মাখ এবং পরিমাণমত দুধ দিয়া ভাল করিয়া ফেটাইয়া লও। ফেটান শেষ হইয়া গেলে জিলাপী ভাজা কড়া চড়াও এবং তাহাতে ঘি দাও। ঘি পাকিলে একখানি নূতন পুরু কাপড়ের টুকরাতে মাঝে ছোট একটি ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে ঐ ছানার গোলা দিয়া জিলাপীর মত করিয়া ঘিয়ে ছাড়। এক সঙ্গে আট দশ খানি করিয়া হইবে। লাল হইলে ঝাঁঝরি করিয়া তুলিয়া ঘি ঝরাইয়া রসে ফেলিবে। যখন দেখিবে জিলাপীতে বেশ রস গিয়াছে, তখন আলাদা পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। জিলাপী নরম আঁচে ভাজা দরকার।

শ্রীমতী নলিনীবালা রায়।

নিম ঝোল ও পলতার ঝোল—

নিম ঝোল ও পলতার ঝোল যত্ন সহকারে প্রত্যহ রন্ধন করা কর্ত্তব্য। ইহা ভক্ষণে যে কত প্রকার শারীরিক উপকার হয় তাহা বলা যায় না। প্রথমে নিমের পাতা বাছিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া রাখিয়া দিবে। তার পর কড়াইয়ে তেল ঢালিয়া দিবে। তেলের গাজা মরিলে ৫।৭ টা নিমপাতা তাহাতে ছাড়িয়া একটু ভাজিয়া লইবে। তার পর বেগুন গোলআলু অল্প পরিমাণ তেলে ভাজিবে। ডালের বড়ি ৫।৭ টাও তেলে ভাজিয়া সবগুলি একত্রে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লইয়া এক পোয়া আন্দাজ জল ও সেই পরিমাণে লবণ দিবে। ঐ সঙ্গে কড়াইয়ে নিমপাতা গুলিও দিবে। সবগুলি সিদ্ধ হইয়া আসিলে একটু ঝোল থাকিতে থাকিতে নামাইবে। এই ঝোল রাঁধিতে অন্য কোন মসলার দরকার নাই। বর্ত্তমানে প্রত্যহ এই নিম ঝোল রন্ধন করিবে। ইহা বড় উপকারী খাদ্য।

পলতার ঝোলও ঠিক ঐ প্রকারে রন্ধন করিতে হয়। এই তিক্তরস রন্ধন কোন আয়াসসাধ্য কার্য্য নয়, ইহা প্রত্যহ রন্ধন করিতে আলস্য করা উচিত নহে।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।

ডিমের "পিউলী"—

উপাদান :—ডিম, বেগুন, খেসারী ডাইলের বড়ী, তেল, হলুদ, জীরে, ধনে, লবণ, তেজপাতা ও পিঁয়াজ।

বেগুনগুলিকে চাকা অবস্থায় বা যে অবস্থায় ভাজিবার পক্ষে সুবিধা হয় সেরূপ করিয়া এবং পিঁয়াজগুলিকে কুচো কুচো অর্থাৎ খুব সরু সরু করিয়া কাটিবে। এখন বাটনার কাজ গুলি সারিয়া লইতে হইবে। বাটনার কাজ হইয়া গেলে ডিমগুলি ভাঙ্গিয়া

ভিতরকার অংশ গুলি একটী পাত্রে রাখিয়া সামান্য হলুদ বাটা ও লবণ দিয়া খুব ভালরূপ মিশাইয়া লইবে।

পাকপ্রণালী:—প্রথমতঃ কড়াতে তেল চাপাইয়া বেগুনগুলি ভালরূপ ভাজিতে হইবে। তারপর ডাইলের বড়ীগুলি ভাজিয়া একটী পাত্রে গুঁড়ো করিয়া রাখিয়া দিয়া বেগুন ভাজার খোসা গুলি ছাড়াইয়া তাকে চট্‌কাইয়া একটী পাত্রে রাখিবে। এইবার তেলের উপর কুচো পিঁয়াজ, হলুদ, জিরা, ধনে বাটা গুলি একটু ভাজিয়া কয়েকটী তেজপাতা, চট্‌কানো বেগুনগুলি ও ডাইলের বড়ীগুঁড়োগুলি কড়ায় দিবে এবং পরিমাণমত লবণ দিয়া নাড়িবে। এইরূপে নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হলুদ মিশানো ডিমগুলি একটু একটু দিয়া খুন্তীর সাহায্যে বেশ করিয়া নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে সব ডিমগুলি ঐ বেগুনের সঙ্গে মিশানো হইয়া গিয়াছে এবং বেশ শুকাইয়া উঠিয়াছে তখন নামাইয়া আলদা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এইরূপে ডিমের "পিউলী" তৈয়ার হইবে।

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম এদেশে কাহারও অপরিচিত নহে। তাঁহার অসাধারণ দয়া, মহা তেজস্বিতা, অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার এই গুণরাজির প্রধান উৎস ছিলেন তাঁহার জননী ভগবতী দেবী। তাঁহার নিজ জীবনের কয়েকটি কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

(১)

শৈশবে ভগবতী দেবী মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলালয়ের নিকটে নিম্ন-শ্রেণীর কয়েকটি দুঃস্থ পরিবারের বাস ছিল। ভগবতী দেবী অনেক সময়ে তাহাদিগকে আহার্য্য দিয়া সাহায্য করিতেন। ইহাতে ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলে রাগ করিতে পারেন মনে করিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "মা, পরের বাড়ী থাকিয়া এ-রকম করা ভাল নয়, তোমার মামা রাগ করিতে পারেন।" ভগবতী দেবী তাহাতে উত্তর করিলেন, "মামা কখনই রাগ করিবেন না। যদি তিনি কিছু বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি চরকা তৈয়ারী করাইয়া দিতে বলিব। চরকায় সূতা কাটিয়া যাহা পাইব, তাহা দ্বারা এই দুঃখীদের আহার্য্য কিনিয়া দিব।"

(২)

ভগবতী দেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাহার শ্বশুরগৃহের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—এমন খারাপ যে সবদিন অন্ন জোটে না। একদিন সেই পরিবারে একজন নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবতী দেবীর শ্বশ্রূ গৃহকর্ত্রী দুর্গাদেবী অত্যন্ত কাতর হইয়া অতিথিকে বলিলেন, "আমি অতি হতভাগিনী। আমার পুত্রকন্যারা আজ অনশনে থাকিবে। অতিথি দেবতা; তাঁহাকে গৃহে পাইয়া আজ দু'মুঠা অন্ন দিয়াও তুষ্ট করিতে পারিলাম না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অপরাধ লইবেন না।" বালিকা ভগবতী দেবী গৃহাভ্যন্তর হইতে ইহা শুনিয়া শ্বশ্রূকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা, উঁহাকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখা যাইতেছে। এরূপ অতিথিকে কোনও ক্রমে বিমুখ করা যায় না। আপনি কাতর হইবেন না, আমি ব্যবস্থা করিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি নিজ হস্ত হইতে একগাছি পিতলের পৈঁছা খুলিয়া লইয়া

কোনও প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে তদ্‌বিনিময়ে এক সের চাউল আনাইলেন এবং তাহারই এক পোয়া দিয়া মুদীর দোকান হইতে এক পোয়া ডাল আনাইলেন। পরে ডাল ভাতে ভাত রাঁধিয়া অতিথিকে আহার করাইলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার হস্তে প্রস্তুত এই সামান্য আহার্য্যে অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের একখানির বেশী ঘর ছিল না। আহারান্তে শ্বশ্রূকে দিয়া অতিথিকে এক প্রতিবেশীর গৃহে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

(৩)

অতি শৈশবেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রে দয়া পরিস্ফুট হয় এবং মাতার উৎসাহে ক্রমে স্ফুটতর হয়। এক দিন খেলা করিতে যাইয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একজন সঙ্গী নিতান্ত ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছে। ইহাতে বালকের করুণ হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। তিনি নিজের ভাল কাপড়খানি তাহাকে দিয়া তাহার ছেড়া কাপড়খানি নিজে গ্রহণ করিলেন। এই অবস্থায় গৃহে ফিরিলে জননী ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া কারণ জানিতে চাহিলেন; ঈশ্বরচন্দ্রও মাতাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। নিজের নিতান্ত দুঃখের সংসার হইলেও, ইহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, ভগবতী দেবী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া পুত্রকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাবা, এইত ভাল ছেলের কাজ। আমি চরকায় সুতা কাটিয়া তোমাকে আর একখানি নূতন কাপড় তৈয়ারী করাইয়া দিব।"

(৪)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপার্জ্জনে যখন সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, তখনও ভগবতী দেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন।

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের রন্ধনাদি সারিয়া গৃহস্থ সকলকে আহার করাইয়া তিনি বাটীর দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইতেন। হাটবারে হাটুরিয়াগণ সেই পথে যাতায়াত করিত। তাঁহাদের মধ্যে যাহাকে শুষ্কমুখ দেখিতেন, তাহাকে ডাকিয়া বলিতেন, "আহা বাছা, তোমার বুঝি খাওয়া হয় নাই, ক্ষুধা লাগিয়াছে? এস, এস; গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী দু'টি প্রসাদ পাইয়া যাও।" এই বলিয়া কত লোককে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া খাওয়াইতেন।

(৫)

বাড়ীতে কোনও ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে প্রতিবেশী নিম্নশ্রেণীর দুঃস্থগণ ভগবতী দেবীর নিকট মাছের কাঁটাকুটি লইতে আসিত। তিনি তাহার সহিত প্রত্যেককে কিছু মাছ দিয়া দিতেন। একদিন ইহা দেখিয়া তাঁহার স্বামী ঠাকুরদাস বলিলেন, "ওরূপ করিলে ব্রাহ্মণভোজনে যে মাছ কম পড়িবে।" দয়াময়ী ভগবতী দেবী উত্তর করিলেন, "বেশ, তোমার ব্রাহ্মণেরাই শুধু খাইবে; আর এই গরীবেরা কিছু খাইবে না!"

(৬)

শেষ বয়সে ঠাকুরদাস কাশীবাস করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন পরে মাতাকেও তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। ভগবতী দেবী কিছুদিন কাশীবাস করিবার পর নানা তীর্থ দর্শন করিয়া পুনরায় তথায় ফিরিয়া আসিয়া একদিন স্বামীকে বলিলেন, "এখন হইতে এখানে বাস না করিয়া দেশে বাস করিলে আমি কত গরীব দুঃখীকে অন্ন দিতে পারিব, প্রতি-বেশীগণের কত সাহায্য করিতে পারিব। সে-ই আমার কাশী, সে-ই আমার বিশ্বেশ্বর।" মাতা অন্নপূর্ণা যেখানে বাস করেন, সে-ই ত কাশী। তিনি স্বয়ং যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন!

(৭)

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তখন একদিন গৃহে আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কি কোনও গহনা পরিবার সাধ হয়?" জননী ভগবতী দেবী উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, অনেক দিন হইতে আমার তিনখানি গহনা পরিবার বড় ইচ্ছা আছে; কিন্তু

সুবিধা হয় নাই বলিয়া পারি নাই। দেখ বাবা, দেশের ছেলেমেয়েরা মূর্খ হইয়া যাইতেছে। আমার ইচ্ছা তাহাদের জন্য একটি ভাল অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দেখ, দেশের সব গরীব লোকেরা চিকিৎসার অভাবে রোগে ভুগিয়া মরিতেছে। ইহাদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাও আমার বড় সাধ। আরও দেখ বাবা, অবৈতনিক বিদ্যালয় যদি হয়, তাহা হইলে গরীব দুঃখীর ছেলেরা কোথায় থাকিয়া কি খাইয়া পড়িবে? আমার বড় ইচ্ছা তাহাদের জন্য একটা অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকদিন হইতে এই তিনখানি গহনা পরিবার আমার বড় সাধ। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র; মায়ের সাধ পূর্ণ কর।"

(৮)

গ্রামের লোক বড় দরিদ্র ছিল। ভগবতী দেবী তাহাদের অসময়ে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেন, কিন্তু ফিরিয়া পাইবার আশা রাখিয়া দিতেন না। কেহ দেনা শোধ করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিলে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে বলিতেন, "অবস্থা ভাল হইলে দিবি, না হইলে না দিবি; তা'র জন্য কাঁদিস কেন?"

কখনও অর্থের নিতান্ত দরকার হইলে তিনি এই টাকা আদায় করিতে বাহির হইতেন। তখন সকলে তাঁহাকে নানারূপে যত্ন করিত এবং তিনিও তাহাদের যত্নে টাকার কথা ভুলিয়া যাইতেন। ফিরিবার সময় বলিয়া আসিতেন, "আজ তোরা আমার বাড়ীতে প্রসাদ পাস্।" এইরূপে টাকা আদায়ের পরিবর্ত্তে অধমর্ণদের নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেন।

(৯)

নিষ্ঠাবান হিন্দুগৃহের গৃহলক্ষ্মী এবং নিজে নিতান্ত নিষ্ঠাবতী হইয়াও হৃদয়-নিহিত অতি কোমল দয়া প্রবৃত্তির গুণে ভগবতী দেবী বালবিধবাদের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের পুনর্বিবাহ সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বুঝিতে পারিয়া মাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তিনি আনন্দিত মনে অনুমতি দিয়া বলেন, "আহা বাবা, দুঃখিনীদের যদি একটা উপায় করিতে পার ত এখনই কর; যখন উহা শাস্ত্রসম্মত বুঝিয়াছ, তখন পরে আমি বা কর্ত্তা স্বয়ং বারণ করিলেও অথবা সমাজের অত্যাচারে উহা ত্যাগ করিও না।"

(১০)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিলে গ্রামবাসীগণ তাঁহার বাটীতে নানারূপ অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহা স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি একদিন ঠাকুরদাসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুরদাস তাঁহার আগমনের কারণ জানিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না যে গ্রামবাসীগণ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। ডেপুটী বাবু তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনি প্রমাণ করুন যে গ্রামবাসীরা আপনাদের উপর অত্যাচার করে না, তাহা হইলে আমি ইহাদের নিষ্কৃতি দিব।" ঠাকুরদাস তখন অন্তঃপুরে যাইয়া ভগবতী দেবীকে সমস্ত বলিলেন। ভগবতী দেবীও গ্রামবাসীদের শাস্তি হইতে পারে শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া উপায় স্থির করিলেন এবং ভগবতী দেবী স্বয়ং অত্যাচারকারীদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া সকল ব্যাপার বলিয়া সন্ধ্যার পর বন্ধুভাবে তাঁহাদের গৃহে যাইয়া হাকিমের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সঙ্গে অন্নপূর্ণা সকলকে বলিতে ভুলিলেন না, "তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ রহিল; রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে আহার করিবে।"

মেয়ের মা'র পত্র

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

ওমা আমার স্নেহময়ী
আলোক-আরাম-ছবি খানি,
তোমায় দিয়ে শ্বশুর বাড়ী
বিশ্ব আমার আঁধার জানি!
তুই যে আমার লক্ষ্মী মেয়ে
নিত্য সবার সেবায় রতা,
সহস্র বিরক্তি হ'লেও
বলিস্‌নাকো রূক্ষ কথা;
তাতেই জানি সবাই তোরে
বাস্‌বে ভাল, করবে যত্ন,
জামাই ভাব্‌বেন মনে মনে
সত্য আমি পেইছি রত্ন!
তোর গৌরবের কিরণ এসে
উজল্‌লে দিবে আমার বাড়ী,
কিন্তু একি, কেমন বলে—
"পাড়ার যত লক্ষ্মীছাড়ী!
ভেবেছিলাম তোর বিবাহে –
মুক্তি-প্রাণের গঙ্গা নাওয়া,
এখন দেখি তোর অভাবে
সত্য যমের বাড়ী যাওয়া!
ঠাকু'মা তোর পূজায় বসি,
পা'না ফুল আর চন্দন ঘসা,
গীতা ভারত শুন্‌তে গেলে
থাকে না কেউ পাশে বসা।
উনি আসেন আপিস থেকে
কাপড়, জুতো দেয়না কেহ,
ছোট খুকী বায়না করে—
চায় সে দিদির আদর, স্নেহ!
কমল বিমল ভুলে যায়
খাতা পেন্‌সিল থাকে, ভুলে,
পিছন পিছন ছুটে গিয়ে,
দেয়না তা কেউ হাতে তুলে!
কেউ দেখেনা এ অভাগীর
অসময়টা তেমন বুঝে,
খাবার পরে পানটী ধরে,
দেয়না কেহ মুখে গুঁজে!
ঘুমিয়ে পড়ি ঘেমেই মরি,
চলেনা আর নীরব পাখা,
অসুখ হ'লে সকল ফেলে,
শুনিনা সে মধুর ডাকা!
এটা ওটা সেটা খেতে
দিব্য দেওয়া শত শত—
মনের কথা প্রাণের ব্যথা
আর যে মা কেউ বোঝেনা তো!
কুঁচিয়ে কাপড় বিকেল বেলা
কেউ রাখেনা আল্‌না ভরে,
ইস্কুল আপিস ছুটির বেলায়,
কেউ থাকেনা জান্‌লা ধরে!
ঠাকুরঘরে নিত্য সাঁজে
ছোটেনা কেউ আলো দিতে,
দরজায় সে জলের রেখা,
শুভ শঙ্খ বাজাইতে!
তোরে ছেড়ে এমনি করে,
জীবন মরা আছি হয়ে
পাই যদি তোর সুখের খবর
থাকব সবি সুখে স'য়ে।
তোর আনন্দ-আলোক এসে
উজলে দিবে আঁধার বাড়ী—
আমায় কেন ভয় দে' গেল,
পাড়ার য'টা লক্ষ্মীছাড়ী!

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

১৬)

সেবিকার কোথাও যাওয়া হইল না। শ্বশুরের ভার লইয়া তাহাকে এখানেই থাকিতে হইল।

দীপালি প্রথমটা কাহারও সহিত মিশিতে পারে নাই। সে জানিতেও পারে নাই সেদিন যে মেয়েটী তাহার বাক্স হইতে, নিজের গাত্র হইতে সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল, তাহার ললাটে একটী আবেগপূর্ণ স্নেহ চুম্বন দিয়া যেন তাহাকে জগতের সাম্রাজ্ঞী-পদে অভিষিক্ত করিয়া গেল সে কে? জানিবার জন্য তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। সেই মেয়েটীকে দেখিবার জন্য সে চারিদিকে চাহিতেছিল কিন্তু কিছু জানাও গেল না, সে মলিন অথচ গম্ভীর তেজোদীপ্ত আকৃতিখানা চোখেও পড়িল না।

তাহাকে বাধ্য হইয়া হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল। পূর্ব্বেই সে শাশুরীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সুতরাং একেবারেই মা বলিয়া ডাকিল। খুব নরম সুরে সে বলিল "হাঁ৷ মা, সে মেয়েটী কে, যে সেদিন রাত্রে আমায় এতগুলো গয়না দিয়ে গেল?"

হেমলতার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। উত্তর না দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। নিকটে ঝি টেবিল সাজাইতেছিল; সে ফিরিয়া চাপা সুরে বলিল "ওমা, সে তোমার সতীন; বড় সতীন।"

সতীন? দীপালির মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। তবে যে সকলে বলিয়াছিল তাহার স্বামী মৃতদার, প্রথমা পত্নী মারা গিয়াছে তাই সকলে আবার তাহার বিবাহ দিতেছে।

পরক্ষণে তাহার মনে সেই মেয়েটীর মুখখানা জাগিয়া উঠিল। সে সতীন, কিন্তু কি নিঃস্বার্থ-পরতাই না সে দেখাইয়া গেল। নিজের সর্ব্বস্ব যে কেহ সতীনকে দিয়া এমন নিঃশব্দে সরিয়া যাইতে পারে ইহা তাহার কল্পনারও অতীত।

দীপালি ধারনা করিতে লাগিল কি মহিমময়ী সে মূর্ত্তিখানি। সে কোন্‌ দেশের মানুষ যাহার মধ্যে স্বার্থ জাগিয়া নাই? সে যে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃতের নাম লইল!

দীপালি নিজের হৃদয়খানা দিয়া তাহার হৃদয় অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আকৃতিটা ধারণা করা যায়, অন্তরকে তো অন্তর দিয়াও অনুভব করা যায় না। সে হৃদয় এমন স্থানে অবস্থিত যে দীপালির হৃদয় ততদূর পৌঁছাইতে পারিল না। ভক্তি নম্র চিত্তে সে সেই ক্ষণেকের তরে দেখা সতীনের পা দুখানি মনে আঁকিয়া প্রণাম করিল। প্রার্থনা করিল "যেন তোমার মত নিঃস্বার্থ হৃদয় পেতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।"

কয়েকদিন সে শ্বশুরালয়ে রহিল, ইহার মধ্যে একদিনও সে তাহার সতীনকে দেখিতে পাইল না।

বউ-ভাত শেষ হইয়া গেল। দুদিন পরেই সে

চলিয়া যাইবে। সেদিন দুপুর বেলায় দাসী তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে বসিয়াছিল। দীপালি আজ নানা কথার পরে ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিল "সেদিন যে তুমি বললে আমার সতীন আছেন; তিনি বুঝি এখানে নেই?"

দাসী বলিল "এখানে থাকবেন না তো যাবেন কোথায়? তিনি এখানেই আছেন।"

দীপালি বলিল "কই, তাঁকে তো দেখতে পাইনে।"

দাসী বলিল "তিনি ও মহলে আছেন, এ মহলে তো আসেন না।"

দীপালি বিস্মিত ভাবে বলিল "কেন?"

দাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল "তাঁর ইচ্ছে।"

দীপালি বড় ব্যথা পাইল। সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একা নিজের জীবন যাপন করিতে সরিয়া গিয়াছে! ওই সামনের প্রাচীরটার এদিকে আনন্দোচ্ছ্বাস, ওদিকে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল। আহা! কি বেদনাই না তাহার বুকে!

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইয়া গেল। দীপালি দাসীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আমার একটা কথা শুনবে? কেউ যেন না জানতে পারে। যদি শোনো তবে বলি।"

দাসী কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বলিল "কি বলুন।"

দীপালি বলিল "আমার নাম করে চুপি চুপি আমার এই ঘরে তাঁকে ডেকে আনতে পারবে?"

দাসী মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনি শুধু তাঁকে দেখেছেন, পরিচয় এখনও পাননি, তিনি তেমন মেয়ে নন যে, যা একজনকে দান করে গেছেন তাতে আবার হাত দিতে আসবেন। তাঁর ঘৃণাকে আপনি চেনেন না। তিনি কিছুতেই তাঁর অধিকারের বাইরে আসবেন না।"

দীপালি ব্যথিত কণ্ঠে বলিল "কেন, এ সব কি

দাসী বলিল "তিনি তো সে রাত্রে সবই আপনাকে দিয়ে গেছেন। তাঁর আর তো কিছুই নেই।"

দীপালি গম্ভীর ভাবে খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তবে আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে। আমি তাঁর অধিকারের মধ্যে যাব।"

সশঙ্কিত হইয়া দাসী বলিয়া উঠিল "তা হতে পারে না বউ-মা।"

উত্তেজিত হইয়া দীপালি বলিল "কেন হতে পারে না?"

এ কেনর উত্তর দিতে গেলে অসীমের নিষ্ঠুরাচরণ, হেমলতার ব্যবহার সবই বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে সেবিকাই দেবীর আসন পাইয়া যাইবে এবং হেমলতা ও অসীম নববধূর চক্ষে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িবে দাসী ইহা সহ্য করিতে পারে না। সে কি বলিয়া দীপালিকে নিবৃত্ত করিবে তাহা ভাবিয়াও পাইল না।

দীপালি তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিল "আমি যাব, আমাকে তোমার সেখানে নিয়ে যেতে হবে, এতে এত ভাবনার কারণ কিছু নেই।"

দাসী বলিল "তা হলে মা বকবেন।"

দীপালি বিস্মিত ভাবে বলিল "মা বকবেন কেন?"

দাসী বলিল "বড় বউ-মার তেজ দেখে মাও খুব রাগ করেছেন। ওদিকে যেতে সবাইকে নিষেধ করে দেছেন।"

দীপালি একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ব্যগ্রতার স্বরে বলিল "আমি লুকিয়ে যাব আবার এখনি ফিরে আসব। শুধু একটু দেখে আসব। দেখো তুমি,—কথা বলব না।"

দাসী অগত্যা উঠিল। আপন মনে বলিল "এটা কিন্তু মোটেই উচিত নয়। সতীন দেখবার এত টান, না জানি—"

কথাটা শেষ না করিয়া সে বলিল "আসুন তা

হলে। কিন্তু এটা সত্যি কথা, মা যদি দেখতে পান আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। আপনার আর কি? আপনাকে কিছু তো বলতে পারবেন না, বলবেন আমাকেই। বলবেন কেন আমি আপনাকে নিয়ে গেছি তাঁকে না জানিয়ে।"

দীপালি বলিল "আমি সব দোষ আমার ঘাড়ে নেব। তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি চল।"

হেমলতা তখন রন্ধন গৃহে আহারে বসিয়াছিলেন। পাশ কাটাইয়া দাসী ও দীপালি যে সেবিকার গৃহে চলিয়া গেল তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া সেবিকা একটা কার্পেটে ফুল তুলিতেছিল। কাজটা সে অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই জানিত, কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে বুনিতে দেখে নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে কেবল কাজই করিয়া যাইত, কার্পেট বুনিবার সময় তাহার ছিল না। এখন সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই। তাহার প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে একখানা কার্পেট লইয়া মনটাকে কিছু ঠিক করিয়া লইল।

দীপালি দরজার বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল সে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল সকলি ফুরায়ে যায় মা।" ইত্যাদি

তাহার কণ্ঠ বড় করুণ। দীপালির মনে হইল সে বুঝি চোখের জলও ফেলিতেছে। সে নড়িতে পারিল না। দাঁড়াইয়া সেই করুণ গানটা শুনিতে লাগিল।

দাসী বলিল "চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এখনি মা দেখতে পাবেনখ'ন।"

বাহিরে চুড়ির ঝন্ ঝন্ শব্দ ও কথা শুনিতে পাইয়া সেবিকা বলিল "কে?"

"দিদি আমি তোমার ছোট বোন।" বলিতে বলিতে দীপালি দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কি সুন্দর দৃশ্য। পরস্পর যে পরস্পরের শত্রু তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সেবিকার এলো-চুল দীপালির অর্দ্ধদেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেবিকা তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া দীপালির মুখের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। একজন সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা স্বামী সোহাগিনী, অপরা সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিখারিণী।

দীপালি অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আর কি একবারও দেখা দিতে নেই দিদি! যার ঘাড়ে সব দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়ে এলে, সে সেই দায়িত্বটা নেবার উপযুক্ত কিনা সে ভার বইতে পারবে কিনা তা একবার দেখে আসা কি উচিৎ ছিল না?"

সেবিকা তাহার কানের ইয়ারিংটা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল "আমি জানি যে, যার ঘাড়ে আমি দায়িত্ব দিয়ে এসেছি, সে অনুপযুক্তা নয়। আমার চেয়ে সে কার্য্যক্ষম—"

"না দিদি, ও কথা বলো না—ও কথা বলো না" বলিতে বলিতে দীপালি আবার তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

সেবিকা বলিল "সত্যি কথা বোন। আজ পাঁচ ছয় বছরের বেশী হল আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু একদিন একটা মুহূর্ত্তের জন্যে স্বামীকে আমি সুখী করতে পারি নি, তাঁর মুখে আমি হাসি ফুটাতে পারি নি। আমার মত ঘৃণ্য জীবন কার আছে বল দেখি? আমি নিজেই নিজের দীনতার মধ্যে এমন ভাবে লুকিয়ে পড়েছিলুম যে, নিজেকেই ডেকে সাড়া পেতুম না। আজ আমি গর্ব্ব অনুভব করছি এই ভেবে যে, স্বামীকে সুখী করতে পেরেছি, তাঁর মলিন মুখে হাসি ফুটাতে পেরেছি। আজ আমি আর দীনা নই বোন, আজ আমি সকলের উপরে উঠেছি। আমার মত সুখী আজ কে?"

দীপালি মুখ তুলিল, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "সইতে পারবে?"

সেবিকা হাসিয়া বলিল, "কেন পারব না? আমরা

চলিয়া যাইবে। সেদিন দুপুর বেলায় দাসী তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে বসিয়াছিল। দীপালি আজ নানা কথার পরে ইহাকেই জিজ্ঞাসা করিল "সেদিন যে তুমি বললে আমার সতীন আছেন; তিনি বুঝি এখানে নেই?"

দাসী বলিল "এখানে থাকবেন না তো যাবেন কোথায়? তিনি এখানেই আছেন।"

দীপালি বলিল "কই, তাঁকে তো দেখতে পাইনে।"

দাসী বলিল "তিনি ও মহলে আছেন, এ মহলে তো আসেন না।"

দীপালি বিস্মিত ভাবে বলিল "কেন?"

দাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল "তাঁর ইচ্ছে।"

দীপালি বড় ব্যথা পাইল। সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একা নিজের জীবন যাপন করিতে সরিয়া গিয়াছে! ওই সামনের প্রাচীরটার এদিকে আনন্দোচ্ছ্বাস, ওদিকে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল। আহা! কি বেদনাই না তাহার বুকে!

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইয়া গেল। দীপালি দাসীর পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আমার একটা কথা শুনবে? কেউ যেন না জানতে পারে। যদি শোনো তবে বলি।"

দাসী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিল "কি বলুন।"

দীপালি বলিল "আমার নাম করে চুপি চুপি আমার এই ঘরে তাঁকে ডেকে আনতে পারবে?"

দাসী মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনি শুধু তাঁকে দেখেছেন, পরিচয় এখনও পাননি, তিনি তেমন মেয়ে নন যে, যা একজনকে দান করে গেছেন তাতে আবার হাত দিতে আসবেন। তাঁর ঘৃণাকে আপনি চেনেন না। তিনি কিছুতেই তাঁর অধিকারের বাইরে আসবেন না।"

দীপালি ব্যথিত কণ্ঠে বলিল "কেন, এ সব কি তাঁর নয়?"

দাসী বলিল "তিনি তো সে রাত্রে সবই আপনাকে দিয়ে গেছেন। তাঁর আর তো কিছুই নেই।"

দীপালি গম্ভীর ভাবে খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তবে আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে। আমি তাঁর অধিকারের মধ্যে যাব।"

সশঙ্কিত হইয়া দাসী বলিয়া উঠিল "তা হতে পারে না বউ-মা।"

উত্তেজিত হইয়া দীপালি বলিল "কেন হতে পারে না?"

এ কেনর উত্তর দিতে গেলে অসীমের নিষ্ঠুরাচরণ, হেমলতার ব্যবহার সবই বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে সেবিকাই দেবীর আসন পাইয়া যাইবে এবং হেমলতা ও অসীম নববধূর চক্ষে অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িবে দাসী ইহা সহ্য করিতে পারে না। সে কি বলিয়া দীপালিকে নিবৃত্ত করিবে তাহা ভাবিয়াও পাইল না।

দীপালি তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিল "আমি যাব, আমাকে তোমার সেখানে নিয়ে যেতে হবে, এতে এত ভাবনার কারণ কিছু নেই।"

দাসী বলিল "তা হলে মা বকবেন।"

দীপালি বিস্মিত ভাবে বলিল "মা বকবেন কেন?"

দাসী বলিল "বড় বউ-মার তেজ দেখে মাও খুব রাগ করেছেন। ওদিকে যেতে সবাইকে নিষেধ করে দেছেন।"

দীপালি একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ব্যগ্রতার স্বরে বলিল "আমি লুকিয়ে যাব আবার এখনি ফিরে আসব। শুধু একটু দেখে আসব। দেখো তুমি,—কথা বলব না।"

দাসী অগত্যা উঠিল। আপন মনে বলিল "এটা কিন্তু মোটেই উচিত নয়। সতীন দেখবার এত টান, না জানি—"

কথাটা শেষ না করিয়া সে বলিল "আসুন তা

হলে। কিন্তু এটা সত্যি কথা, মা যদি দেখতে পান আমাকে আর আস্ত রাখবেন না। আপনার আর কি ? আপনাকে কিছু তো বলতে পারবেন না, বলবেন আমাকেই। বলবেন কেন আমি আপনাকে নিয়ে গেছি তাঁকে না জানিয়ে।"

দীপালি বলিল "আমি সব দোষ আমার ঘাড়ে নেব। তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি চল।"

হেমলতা তখন রন্ধন গৃহে আহারে বসিয়াছেন। পাশ কাটাইয়া দাসী ও দীপালি যে সেবিকার গৃহে চলিয়া গেল তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া সেবিকা একটা কার্পেটে ফুল তুলিতেছিল। কাজটা সে অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই জানিত, কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে বুনিতে দেখে নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে কেবল কাজই করিয়া যাইত, কার্পেট বুনিবার সময় তাহার ছিল না। এখন সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই। তাহার প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে একখানা কার্পেট লইয়া মনটাকে কিছু ঠিক করিয়া লইল।

দীপালি দরজার বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল সে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল সকলি ফুরায়ে যায় মা।" ইত্যাদি

তাহার কণ্ঠ বড় করুণ। দীপালির মনে হইল সে বুঝি চোখের জলও ফেলিতেছে। সে নড়িতে পারিল না। দাঁড়াইয়া সেই করুণ গানটা শুনিতে লাগিল।

দাসী বলিল "চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এখনি মা দেখতে পাবেনখ'ন।"

বাহিরে চুড়ির ঝন্ ঝন্ শব্দ ও কথা শুনিতে পাইয়া সেবিকা বলিল "কে ?"

"দিদি আমি তোমার ছোট বোন।" বলিতে বলিতে দীপালি দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কি সুন্দর দৃশ্য। পরস্পর যে পরস্পরের শত্রু তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। সেবিকার এলো-চুল দীপালির অর্দ্ধদেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেবিকা তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছে; তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া দীপালির মুখের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। একজন সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা স্বামী সোহাগিনী, অপরা সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিখারিণী।

দীপালি অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আর কি একবারও দেখা দিতে নেই দিদি! যার ঘাড়ে সব দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়ে এলে, সে সেই দায়িত্বটা নেবার উপযুক্ত কিনা সে ভার বইতে পারবে কিনা তা একবার দেখে আসা কি উচিৎ ছিল না ?"

সেবিকা তাহার কানের ইয়ারিংটা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল "আমি জানি যে, যার ঘাড়ে আমি দায়িত্ব দিয়ে এসেছি, সে অনুপযুক্তা নয়। আমার চেয়ে সে কার্য্যক্ষম—"

"না দিদি, ও কথা বলো না—ও কথা বলো না" বলিতে বলিতে দীপালি আবার তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

সেবিকা বলিল "সত্যি কথা বোন। আজ পাঁচ ছয় বছরের বেশী হল আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু একদিন একটা মুহূর্ত্তের জন্যে স্বামীকে আমি সুখী করতে পারি নি, তাঁর মুখে আমি হাসি ফুটাতে পারি নি। আমার মত ঘৃণ্য জীবন কার আছে বল দেখি ? আমি নিজেই নিজের দীনতার মধ্যে এমন ভাবে লুকিয়ে পড়েছিলুম যে, নিজেকেই ডেকে সাড়া পেতুম না। আজ আমি গর্ব্ব অনুভব করছি এই ভেবে যে, স্বামীকে সুখী করতে পেরেছি, তাঁর মলিন মুখে হাসি ফুটাতে পেরেছি। আজ আমি আর দীনা নই বোন, আজ আমি সকলের উপরে উঠেছি। আমার মত সুখী আজ কে ?"

দীপালি মুখ তুলিল, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "সইতে পারবে ?"

সেবিকা হাসিয়া বলিল, "কেন পারব না ? আমরা

যে মেয়ে বোন, সহ্য করতেই এসেছি। সব সহ্য করতে হবে। আমরা ছোটবেলায় ব্রত করি, তাতে প্রার্থনা করি যেন ধরিত্রীর মত সহ্যশীলা হতে পারি। সে কি শুধু মুখের কথা বোন? অভ্যাস করলে সবই ক্রমে সয়ে যায়। এমন কি আছে জগতে যা সহ্যের অতীত? তুমি তাই ভাবছ যে সইতে পারব না? ভুল ধারণা এটা। আঘাত সয়ে সয়ে এ বুক পাষাণ হয়ে গেছে। কোন দাগ এতে আর এঁকে যেতে পারবে না।"

দীপালি চুপ করিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। কঠিন বুকখানার আড়ালে যে কোমলতা ছিল, তাহাই সে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

ঝি সতীনের সোহাগ দেখিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল। একটু বিরক্তভাবে বলিল "আসুন। মা এখনি ওপরে গিয়ে না দেখতে পেয়ে অনর্থ বাধাবেন।"

সেবিকা দীপালির মুখপানে চাহিয়া বলিল "তুমি লুকিয়ে এসেছ?"

দীপালি একটা নিশ্বাস ফেলিল মাত্র।

সেবিকা বলিল "যাও ভাই, আর দেরী ক'র না, এর পরে হয়তো অনেক কথা হতে পারে। কেন বোন, আমার জন্যে কথা শুনবে?"

দীপালির উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। বলিল "তোমার কাছে আসলে কি ক্ষতি হবে দিদি, কেন ওঁরা এতে রাগ করবেন?"

সেবিকা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "জানতে পারবে সবই দুদিন পরে। এখন যাও বোন। তুমি কবে যাবে এখান হতে?"

দীপালি বলিল "বোধ হয় পরশু।"

সেবিকা বলিল "এবার আসলে অনেক সত্য কথা জানতে পারবে।"

দাসী আবার ডাকিল। দীপালি উঠিয়া বলিল "তা হলে যাচ্ছি দিদি, যদি পারি আবার আসব। যে স্নেহটা তোমার পেলুম আমি, এ যেন না হারাই। আবার আমি যখন আসব, এই স্নেহটাই দাবী করব কিন্তু।"

সেবিকা আবার তাহাকে বুকে টানিয়া পরম স্নেহভরে তাহার ললাটে একটী গাঢ় চুম্বন দিয়া বলিল "আমার বুক যে আজকের মধুমাখা স্মৃতিতেই ভরা থাকবে বোন। সব দিয়ে আমি যা কুড়িয়ে পেলুম তা যে আমার আশারও অনেক বেশী। আমার বুক কি খালি হবে ভাই? আমি আজীবন এই কথাটাই মনে জাগিয়ে রাখব। তুমি যখনি আসবে তোমার দিদিকে এমনই দেখতে পাবে। এমনই বুক তার চিরকালের জন্যে থাকবে।"

দীপালি নত হইয়া সেবিকার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল। দাসীর সহিত সে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া হেমলতা। তিনি দ্বিতলে গিয়া পুত্রবধূ ও দাসীর কোন খোঁজ পান নাই। নামিয়া আসিয়া একটু কান পাতিয়া রাখিতে সেবিকার গৃহে নববধূর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

দীপালিকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "কোথা গেছলে বউ-মা?" দাসীর পানে চাহিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "কোথা নিয়ে গেছলি হারামজাদি?"

দাসী কোনও উত্তর দিবার আগেই দীপালি শান্ত কণ্ঠে বলিল "ওর কোনও দোষ নেই মা। আমিই ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গেছলুম, কারণ ও ঘর আমি চিনতুম না।"

উদ্দীপ্ত নেত্রে পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া হেমলতা বলিলেন "বড় অন্যায় হয়েছে তোমার বউ-মা। যাই হোক, আশা করি এবার থেকে আমার কথার অবাধ্য হবে না। যাও তোমার ঘরে।"

দীপালি উপরে চলিয়া গেল। দাসীকে ডাকিয়া গোপনে লইয়া গিয়া হেমলতা বলিলেন "ওখানে গিয়ে কি কথা হল?"

দাসী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল "ওমা, সে অনেক কথা গো; সব কথা কি ছাই মনে থাকে

আমার ? ইনি গিয়ে দিদি বলে কেঁদেই অস্থির, তিনিও অমনি বোন্ বোন্ করে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। দুজনের চোখে যেন গঙ্গা-যমুনা স্রোত বইতে লাগল। আমি তো ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক। আবার বলে এলেন কাল যাবেন।"

হেমলতার গা জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন "আচ্ছা, আসতে দাও অসীমকে কোর্ট হতে, তারপরে এর একটা বিহিত হবেখ'ন।"

অসীম বাড়ী আসিবামাত্র হেমলতা তাঁহাকে সব কথা জানাইলেন। অসীম গম্ভীর মুখে বলিল "দেখা যাক।"

রাত্রে দীপালি তখন আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। অসীম তাহার পাশে বসিয়া আদর করিয়া মুখের লেপটা সরাইয়া ডাকিল "দীপালি।"

দীপালি উত্তর করিল না।

অসীম তাহার সুন্দর মুখের উপর যে চূর্ণ বিচূর্ণ চুলগুলি আসিয়া পড়িয়াছিল সেগুলি সরাইয়া দিতে দিতে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিল। তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার রেখাশূন্য নির্ম্মল ললাটে কম্পিত অধর দুইখানি স্থাপন করিল, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আবার ডাকিল "দীপালি—আমার দীপালি।"

এত আদর এত সোহাগ সেবিকা জীবনে কখনও পায় নাই।

দীপালি জাগিয়া উঠিল। চাহিতেই স্বামীর মুখখানা চোখে পড়িয়া গেল; হাসিতে তাহার সুন্দর মুখখানা ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া মাথায় সে কাপড় টানিয়া দিতে গেল।

অসীম তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল "না দীপালি, মাথায় কাপড় দিয়ো না। তোমার মধ্যে সঙ্কোচ আমি দেখতে পারব না, সঙ্কোচহীন ভাবই আমি দেখতে চাই।"

দীপালি লজ্জিত ভাবে মুখ নীচু করিল।

অসীমের হৃদয় আজ পূর্ণ হইয়াছিল, সে কত কথাই না বলিয়া গেল, তাহার সবগুলির অর্থও বুঝি নাই।

দীপালি একটু হাসিয়া বলিল "আজ এখন শোও এসে, রাত অনেক হয়ে গেছে দেখছ না ?"

অসীম বলিল "তুমি যে পরশু দিনই চলে যাবে দীপালি, আমি তখন কি করে থাকব তাই কেবল ভাবছি। তুমি তোমার বাপ মা, ভাই বোনের কাছে গিয়ে সুখী হবে, কিন্তু আমি--"

দীপালি বাধা দিয়া বলিল "এতদিন কি করে ছিলে ?"

স্বামীর এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করাটা তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজে যেমন সংযত, সকলের মধ্যে তেমনই সংযত ভাব দেখিতে চায়, তাই তাহার চেয়েও বেশী সংযত সেবিকাকে দেখিয়া সে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

অসীম তাহার মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল "এতদিন যে কি করে ছিলুম তা আর তোমাকে কি জানাব দীপালি ? বড় জ্বালায় বুকখানা জ্বলছিল, কিছুতেই শান্তি পাইনি। তোমাকে পেয়ে আমার সে জ্বালা জুড়িয়েছে, আমি বড় শান্তি পেয়েছি; তাই এখন ভাবছি তোমায় ছেড়ে আমি কি করে থাকব ? তাই তোমায় ছাড়তে আমার ইচ্ছা করছে না।"

তাহার কথার মধ্যে এমন একটা করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে দীপালি আপনার সংযত ভাব ভুলিয়া গেল। সে অসীমের কোলের উপর মাথা রাখিয়া বলিল "আবার তো আমি আসব।"

অসীম তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে বলিল "কিন্তু সে কত কাল পরে দীপালি ? প্রতিদিন কি ছবি নিয়ে দাঁড়াবে সামনে আমার, সেটা একবার কল্পনা করে দেখ তুমি, তারপরে কথা বল।"

দীপালি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "তুমি মাঘ মাসেই আনতে যেয়ো, আমি নিশ্চয়ই আসব তখন।"

উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব। পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অসীম বলিল "তুমি আজ ও মহলে গেছলে কেন দীপালি? আমি যে আগেই তোমায় বারণ করে দিইছি ওদিকে যেয়ো না।"

দীপালি বলিল "কেন?"

অসীম বলিল "যাকে আমি কালনাগিনী বলে ত্যাগ করেছি তার ঘরে যাওয়া তোমার কোন মতে উচিৎ হয়নি। তুমি জাননা দীপালি, সে কতদূর কঠোর ভাবে আমাকে দংশন করেছে। আমি যাকে ঘৃণা করি, তুমি কেন তাকে ভালবাসবে দীপালি? মা আজ তোমার ও ঘরে যাওয়া দেখে ভারি দুঃখিত হয়েছেন। বল, আর কখনও যাবে না, আর তার সঙ্গে কথা বলবেনা?"

দীপালি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল, উত্তর করিল না।

অসীম তাহার কবরীচ্যুত শ্বেত গোলাপটা যথা-স্থানে ন্যস্ত করিয়া দিতে দিতে বলিল "বল দীপালি, আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞাটী শুধু কর তুমি।"

দীপালি মুখ তুলিল; তীব্র ভাবে বলিয়া উঠিল "কেন একথা বলছ, আমায় এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলে কি লাভ হবে তোমাদের? আমি তার মধ্যে যা দেখতে পেয়েছি তা-কি তোমরা আমায় দেখাতে পারবে? কেন তোমরা আমাকে এ রকম নির্য্যাতন করছ, কি করেছি আমি তোমাদের?"

উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া সে আবার মুখ লুকাইল।

অসীম স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আশা করে নাই যে এই কথাতে দীপালি আবার কাঁদিয়া ফেলিতে পারে। অপ্রস্তুত ভাবে সে বলিল "থাক, সে সব অপ্রীতিকর কথা এখন বলে কাজ নেই। মাঝে কালকার দিনটা আছ তুমি, কাল আর যেয়ো না। আবার যখন আসবে তখন যা হয় একটা বিবেচনা করা যাবে।"

নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় দীপালি ভারি লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া সে হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাসি দেখিয়া অসীমও হাসিল, পত্নীর মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল "দীপালি—আমার দীপালি।"

(ক্রমশঃ)

নব বরষের পূজারি

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

যদি, জননী, তোমার পদযুগ ধরি'
যুগ যুগ করি বন্দনা,
মিলিবে না কি গো পরম মোক্ষ
হবেনা কি শেষ যন্ত্রণা?
সেই আশা বুকে বহিয়া জননী,
যাপিতেছি সুখে দিবস রজনী,
তুমি হাসিমুখে চুম্বিয়া মোরে
কবে দিবে বল সান্ত্বনা?

অরুণ পরশে নলিনীর মত
জাগিছে মলিন মন ধীরে—
গুঞ্জরে হিয়া মঞ্জুল তব
চরণের তপোবন ঘিরে!
শাশ্বত ছবি মূরতিটি শোভে,
চরণ-কমল-কিঞ্জল্ক লোভে
দাঁড়াইল আজি এ দীন পূজারি
পুণ্য মাতৃ-মন্দিরে!

বিলাতের পল্লীগ্রামের মেয়েদের রীতি-নীতি

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

গত (১৯২৪) মে মাস থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাস আমি লণ্ডন সহরে ছিলাম, ঐ সময়ে বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের যে ষ্টল হয়েছিল, সেই কার্য্যের তত্ত্বাবধানেই বেশী সময় কাটাতাম। ঐ ছয় মাস সময়ের মধ্যে আমি কেবল মাত্র লণ্ডন সহরের দ্রষ্টব্যগুলি দেখেছিলাম। একজিবিশন শেষ হবার পর নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী—এই তিনটী মাস আমি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডের বড় বড় শিল্প বাণিজ্যের সহরগুলি এবং ঐ সঙ্গে অনেক পল্লীগ্রাম দেখেছি। বড় বড় সহরগুলির সম্বন্ধে নানা সংবাদ আমরা আমাদের দেশে থেকেই সংবাদপত্রাদির ভিতর দিয়ে জানবার সুযোগ পেয়ে থাকি, এজন্য সে সব ঐশ্বর্য্যের বিষয় বাদ দিয়ে আমি বিলাতের পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ-জীবনে যে সব কাজকর্ম্ম দেখেছি তার কিছু কিছু এখানে লিখব।

বিলাতে গৃহিণীরা সাধারণতঃ সকাল ছয়টায় ঘুমথেকে উঠে, আটটার ভিতর প্রাতঃকালের আহারাদি প্রস্তুত সম্পন্ন করে। ছেলে মেয়ে এবং পুরুষেরা সাতটায় উঠে হাত-মুখ ধুয়ে আটটা থেকে নয়টার ভিতর পরিবারস্থ সকলে একত্র হয়ে এক টেবিলে আহার সম্পন্ন করে। কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে—সব জায়গাতেই এদের কাজের সময়গুলি ঠিক-ঠাক বাঁধা-বাঁধি আছে। গৃহিণী ঠিক আটটায় আহার তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে রেখেই ছোট একটী ঘণ্টায় টুন টুন করে শব্দ করে, তৎক্ষণাৎ যে যেখানে যে কাজেই থাকুক এসে খাবার টেবিলে যার যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে। সকালের খাবার—সাধারণতঃ পরিজ (Porridge) অর্থাৎ ওট সিদ্ধ এক ছটাক আন্দাজ সামান্য দুধ ও চিনি মিশ্রিত করে খায়; সামান্য রুটী, মাখন ও এক পেয়ালা চাও ঐ সময় খায়। একটু অবস্থাপন্ন ঘরে তার সঙ্গে আধসিদ্ধ ডিম, একটু Bacon অর্থাৎ আধ ভাজা শুকর-মাংসের পাতলা এক টুকরা খায়। সকালকার সেই খাওয়াটী যেমন সামান্য রকম হয় তাকে আমাদের দেশে আমরা আধপেট খাওয়া বলতে পারি। খাবার সময় সকলেই কাঁটা চামচ ছুরী ব্যবহার করে, খাবার জিনিষ হাতে মুখে মোটেই লাগে না। ছোট ছেলে মেয়েদের খাবার সময় বুকের উপর গলার সঙ্গে ছোট একটু রুমাল বেঁধে দেওয়া হয়, সামান্য টুকরা-টাকরা খাদ্যদ্রব্য পড়লে সেই রুমালের উপর দিয়েই পড়ে, গায়ের জামা কাপড়ে লাগতে পারে না। ১৫ মিনিট মধ্যেই সকলে এক সঙ্গে আহার শেষ করে, পরে যে যার কাজে যায়।

নয়টার পর পুরুষেরা কাজে যায়, ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়। গৃহিণীরা এঁটো বাসনগুলি জলের টবে ফেলে ভিজিয়ে, খাবার টেবিলের কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করে রেখে নিজের কাজে যায়। আর আর সকলে দৈনিক খবরের কাগজ পড়ার কাজটী সকালের আহারের পূর্ব্বেই শেষ করে ফেলে, গৃহিণীরা প্রায়ই কাগজ পড়বার সময় পায় না। তারা ৯টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর মুলতুবী কাজ, অর্থাৎ জামা, কাপড় সেলাই বা পরিষ্কার করা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকে। এর মাঝে একটু সময় পেলে খবরের কাগজাদি দেখে।

গৃহিণীরা ঠিক ১১টা থেকে ১টার পূর্ব্বে মধ্যাহ্নের আহার রন্ধন করে ঠিক ১টায় আবার আহারের ঘণ্টা দেয়। এর আগেই যেখানকার যে এসে বাড়ীতে হাজির থাকে, খাবারের ঘণ্টা পড়লেই

আবার যার যার স্থানে ঠিক হয়ে আহারে বসে। গৃহিণীরা কিছু কিছু খাবার প্রত্যেক ডিসে পরিবেশন করে পরবর্ত্তী খাবারের জিনিষগুলি টেবিলের মাঝখানে রাখে। মধ্যাহ্নের আহার সাধারণতঃ প্রথমে সুপ অর্থাৎ তরকারী বা সামান্য মাংস সিদ্ধ অথবা উভয় মিশ্রিত ক্বাথ। পরে আলু, কপি, সালগম, সিম প্রভৃতি কোন একটা তরকারী সিদ্ধ, কিছু মাংস বা মাছ এবং পাঁউরুটী। তার পরে একটু পুডিং অর্থাৎ মিষ্টান্ন ও ফলাদি।

মিষ্টান্ন—চাউল বা ময়দার সঙ্গে সামান্য দুধ-চিনি মিশ্রিত করে তৈরী করে। মধ্যাহ্নের আহার সাধারণতঃ আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় আর বারো আনা রকম পেট ভরা খাওয়া হয়। আমাদের দেশে যেমন যতদূর সাধ্য পেট পুরে খাওয়ার নিয়ম, বিলাতে তেমন কখনও কেউ খায় না। ভাল ভাল নিমন্ত্রণেও ঠিক রোজকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম-পরিমাণে খাওয়ার ব্যবস্থা। খাদ্য দ্রব্যগুলি প্রস্তুতে স্বাস্থ্যের দিকে যতটা লক্ষ্য রাখা হয়—স্বাদের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখা হয় না। বোধ হয় সাদাসিদে সিদ্ধ জিনিষই এদের মুখে ভাল লাগে। মসলাদির ব্যবহার এরা মোটেই করে না, তবে খাবার সময় লবণ, গোল মরিচের গুড়া, সরিসার গুড়া প্রভৃতি অতি সামান্য মিশ্রিত করে খায়।

ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুল সকালে ৯টা থেকে ১২টা, পরে তারা বাড়ী এসে মধ্যাহ্নের আহার সম্পন্ন করে ও খানিকটা খেলাধূলা করে, তার পরে ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা আবার স্কুলে গিয়ে পড়া শুনা করে আসে।

বিকাল ৫টায় সকলে জলযোগ করে। এ সময় চা, রুটী, মাখন, বিস্কুট প্রভৃতি খাওয়ার ব্যবস্থা। বিকাল ৫টার পর স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা প্রায় সকলেই একটু বাইরে বেড়াতে বা পরিশ্রমের খেলা করতে বের হয়। ছেলে মেয়ে থেকে বুড়ো বুড়ী পর্য্যন্ত সকলেই একটু পরিশ্রমজনক খেলাধূলা করে বেশ আনন্দে কাটায়। পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই চমৎকার খেলবার পার্ক আছে। গ্রীষ্মকালে এই সব পার্ক-গুলি, নানারকম লতা পাতা ফলে অতি মনোরম শোভা ধারণ করে। গ্রীষ্মকালে পার্কগুলিতে লোকে খুবই বেশী সময় আমোদ উৎসব করে। সহরে গ্রীষ্মকালে পার্কগুলি লোকে লোকারণ্য হয়।

আমি বিলাতের স্বাভাবিক বনজঙ্গল বা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন বাড়ী দেখবার চেষ্টায় পল্লীগ্রামে অনেক দূরে যেতাম কিন্তু কোনখানেই তেমন দেখতে পাই নাই, সব যায়গাতেই অতি সুন্দর সাজান বাগান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর বাড়ী। সহরের চেয়ে পল্লীগ্রাম আরও বেশী মনোরম।

রাত্রি আটটার আহারের বন্দোবস্ত সাধারণতঃ মাংসের সঙ্গে চাউল, যব বা ওট্ মিশ্রিত সিদ্ধ। এর সঙ্গে সামান্য নুন ঝাল ব্যবহার করে, আর চা বা কোকো অতি অল্প পরিমাণ পাঁউরুটীর সঙ্গে খায়। যারা একটু ভাল বন্দোবস্তে খায় তাদের প্রত্যেক বারের খাবারের সময়ই টেবিলে জ্যাম, জেলী (আচার বা চাটনী), ভিনিগার (এক রকম টক জল) প্রভৃতি সাজান থাকে, ইচ্ছামত কখন কখন ব্যবহার করে।

বিলাতের বড়লোকদের আহারের বন্দোবস্ত ঠিক এই মতই, তবে কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি জিনিস-পত্র ও নানা রকমের preserved food কিছু কিছু এর সঙ্গে খায়।

রাত্রির আহারের পর ছেলে মেয়েরা ঘণ্টা খানেক পড়াশুনা করে। মেয়েরা কখন কখন পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গীতাদি করে। ছোট বড় প্রায় সকল ঘরেই এক একটা পিয়ানো আছে। সাধারণ গৃহস্থের পিয়ানো একটার দাম কমিবেশী একহাজার টাকা।

ছেলে মেয়েরা রাত্রি ১০টায় এবং বয়স্কেরা ১১টায় নিদ্রা যায়। প্রত্যেকের পৃথক পালঙ্কে বিছানা। ছোট ছেলেরা কচিৎ এক বিছানায় দুইজন শয়ন করে। শীতের ছয়মাস সব ঘরেই সব সময় আগুন জ্বালা থাকে, ঘরের মেঝেয়,

দেওয়ালের গায়ে আগুনের জন্য স্বতন্ত্র রকমের স্থান প্রস্তুত আছে। স্কটলণ্ডে খুব বেশী শীত, সেখানে শীতের দিনে বিছানার মধ্যে গরম জলের বোতল বা ব্যাগ ব্যবহার করে।

লণ্ডন বা অন্যান্য বড় সহরে ঘর গরম রাখবার জন্য গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক তাপের বহু রকম ব্যবহার আছে। ছোট বড় অনেক সহরের রান্নাও গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে সম্পন্ন হয়।

পল্লীগ্রামে কয়লার আগুনের ব্যবহারই বেশী, কোথাও গ্যাসের বন্দোবস্ত আছে। আয়র্লণ্ডের পল্লীগ্রামে দেখেছি সাধারণ অবস্থার গৃহস্থরা ঘরের উত্তাপের জন্য যে আগুন ব্যবহার করে সেই আগুনের উপরেই রান্নার অনেক কাজ সম্পন্ন করে।

সকল বাড়ীতেই সর্ব্বদার জন্য গরম জলের বন্দোবস্ত থাকে, বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া সবই মেয়েরা গরম জলে সম্পন্ন করে। খাবার পরেই এঁটো বাসনগুলি জলের টবে ভিজিয়ে রাখে, তার পর যখন ব্যবহারের দরকার হয় তখন একটা হাতল দিয়ে জলের ভিতর বাসনগুলি তোলপাড় করে চিমটা দিয়ে তুলে অপর পরিষ্কার গরম জলের পাত্রের মধ্যে দু-তিন মিনিট রেখে দেয়। পরে তুলে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে জল মুছে আগুনের উত্তাপের উপর বাসন রাখবার যে স্থান আছে সেখানে রেখে দেয়। খাবার বাসনগুলি সবই চীনা মাটীর তৈরী—খুব সহজেই পরিষ্কার হয়।

কাপড় পরিষ্কারের জন্যও বিশেষ জল ঘাঁটা-ঘাঁটির দরকার হয় না। কাপড়গুলি আগের দিন ক্ষার জলে একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখে, সেই পাত্রটা এমন ভাবে তৈরী যে একটা হাতল ঘুরালেই জল ও কাপড় একসঙ্গে পাত্রের ভিতর তোলপাড় হতে থাকে। ৫।৭ মিনিট হাতল ঘুরাবার পর কাপড়গুলি অন্য একটা পরিষ্কার জলপাত্রে ফেলে ধুয়ে তোলে। অনেক ঘরেই কাপড় নিংড়াবার কাঠের রোলার আছে, তার ভিতর কাপড় দিয়ে রোলার ঘুরালে রোলারের চাপে প্রায় সমস্ত জল নিংড়িয়ে যায়। আমরা যে ভাবে কাপড় কাচি, আর নিংড়াই তাতে কাপড়ের শীঘ্রই পরমায়ু ক্ষয় হয়। কিন্তু ঐ সব উপায়ে কাচায় কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না।

বিলাতের লোকেরা সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার মাত্র স্নান করে। স্নানিকরা মানে সাবান দিয়ে সব গা পরিষ্কার করা। গরম জল ভিন্ন স্নানের উপায় নাই, তাই আবদ্ধ ঘরের মধ্যে লম্বা টবের ভিতর গরম জলে এখানকার লোক স্নান করে। শীতের দেশ বলেই এত কম স্নানেও এদের চলে।

বিলাতের সন্তানপালন-পদ্ধতি বাস্তবিকই আমাদের শিখবার বিষয়। আমি মাত্র একটা কথা এখানে উল্লেখ করব। আমি প্রায় একটা বৎসর পর্য্যন্ত নানা স্থানের ইংরেজদের সঙ্গে বাস করেছি। রোজ রোজ হাজার হাজার ছেলে মেয়ে মায়ের তত্ত্বাবধানে দেখেছি. এর মধ্যে কোন মাকে ছেলে মেয়ে দিগকে কোন শাস্তি দিতে দেখি নাই—গায়ে হাত তুলতেও দেখি নাই। একটা দিন মাত্র একটী শিশুকে তার মা ঠোনা মেরেছিল দেখেছিলুম, শিশুটি কেঁদে ফেলেছিল, দেখে আমার প্রাণে খুবই বেদনা লেগেছিল। দৈবাৎ মাত্র একটী দিন দেখেছি বলেই কথাটার উল্লেখ করলাম। ছেলে-পিলেকে এরা মোটেই মারধর করে না, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেয়, ছেলেমেয়েরা সারাদিন ছুটাছুটী করে কিন্তু কেউ অসভ্যপনা, মারামারি বা ঝগড়া করে না। বিলাতে ঝগড়া-ঝাটী মোটেই দেখি নাই। বার্ম্মিংহামে এক শনিবার রাত্রে দুই-একটা মাতালকে রাস্তায় বকাবকি করতে দেখেছিলাম মাত্র।

বিলাতে প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া শিখান হয়। স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য নানা প্রকার আমোদজনক উপায় আছে, শিশুরা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খেলার সঙ্গে নানা রকম শিক্ষা পায়। তারপর ম্যাজিক লণ্ঠন, বায়স্কোপ প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর শিক্ষা দেওয়া হয়। শিখবার জন্য ছেলে মেয়ে দিগকে বেশী কিছু কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না।

আমাদের দেশে যেমন সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ব্যস্ত, বিলাতে তেমন নহে, অধিকাংশ ছেলে মেয়ে মোটামুটি শিক্ষা শেষ করেই কোন একটা কাজে যোগ দেয় এবং ক্রমে সেই কাজের উন্নতির জন্যই জীবনব্যাপী সাধনা করে। তারপর কাজের অবকাশের ভিতরে জ্ঞানলাভের চেষ্টায় নানাপ্রকার গ্রন্থাদি পাঠ করে। দৈনিক সংবাদপত্র পড়া সকালে চাই-ই। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, নির্ধন, কৃষক, মজুর, স্ত্রীপুরুষ সকলেই সংবাদপত্র পাঠ করে, দেশের যখনকার যে সংবাদ জ্ঞাত হয়।

সেখানকার পল্লীর লোকের ধর্ম্মজীবন দেখে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করেছি। সহরের লোকে রবিবারে কেউ গীর্জ্জায় যায়, কেউবা বাইরে বেড়াতে যায় কিন্তু পল্লীতে প্রায় সকলেই রবিবারে গীর্জ্জায় যায়। ছোট বড় সব পল্লীতে একটি করে সুন্দর গীর্জ্জাঘর আছে। রবিবার ভিন্ন অন্যান্য বিশেষ দিনেও গীর্জ্জাঘরে নানারকম সভাসমিতি হয়। ছোট ছেলে মেয়েরা রবিবারে সণ্ডে স্কুলে যায়। সেদিন কেবল তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বার্ম্মিংহাম সহর থেকে সাত মাইল দূরবর্ত্তী একটী পল্লীতে বেড়াতে গিয়ে একস্থান ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, এই সময়ের মধ্যে একটী ছোট মেয়েকে তাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার কি কি বন্দোবস্ত আছে জিজ্ঞাসা করি। পল্লীগ্রামের ট্রাম ঘন ঘন চলে না, প্রায়ই প্রতি দশ মিনিট অন্তর চলে। পরে ট্রাম এলে ট্রামে উঠে বসতেই একটী বর্ষিয়সী মহিলা ঐখান থেকে ট্রামে উঠে আমার কাছে বসলেন এবং তিনি বল্লেন আপনার সঙ্গে গল্প করতে চাই, আপনি মেয়েটীকে যে সব বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন তা আমি সব শুনেছি এবং বড় আনন্দিত হয়েছি। ট্রামের টিকিট করবার সময় তিনি তাঁর নিজের জন্য এক পেনির টিকিট নিলেন আর আমার বার্ম্মিংহাম পর্য্যন্ত আসবার সাত পেনির অর্থাৎ সাত আনার একটী টিকিট কিনে আমাকে দিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার এ দান আমি হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করলাম।

পল্লীগ্রামের ধর্ম্মচর্চ্চা সম্বন্ধে অনেক বিষয় তাঁর কাছে শুনলাম। ইংলণ্ডবাসী প্রত্যেকের কাছে আমি অতি ভাল ব্যবহার পাচ্ছি এটা এদেশের ধর্ম্মচর্চ্চার সাধারণ ফল এই কথাটী তাঁর কাছে আমি না বলে থাকতে পারলাম না। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে গল্পের ভিতরেই জানলাম, তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের আশীর্ব্বাদ উপলব্ধি করেন। পরে বুঝলাম তাঁর ট্রামে চলবার দরকার ছিল না—একটু-খানি আমার সঙ্গে কথা বলতেই ট্রামে উঠেছেন! ধর্ম্মালোচনার জন্য ট্রামে উঠা—বিশেষতঃ অপরিচিত বিদেশীকে ট্রামভাড়া দেওয়া এ সবের মধ্য দিয়া তাঁর ত্যাগের জীবন আমাকে অনেক শিক্ষা দিল। "ভগবান তোমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন" বলে তিনি আমার কাছে বিদায় নিয়ে ট্রাম থেকে নামলেন। ধর্ম্মচর্চ্চার কথা বাদ দিলেও সততা, ভদ্রতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি সেখানকার লোকদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হই সে দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এই সব ভাব যতদূর দেখা যায়, আমাদের দেশের সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও সে রকম দৃষ্টান্ত অতি কমই দেখা যায়।

আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ। তাই এ দেশে আমরা তাদের কাছ থেকে খুব ভাল ব্যবহার আশা করতে পারি না।

মোটের উপর স্বাধীন দেশের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতির ভিতর দিয়ে তাদের চরিত্রের যতটুকু আমি অধ্যয়ন করেছি তাতে আমি বড়ই তৃপ্ত হয়েছি।

দিদিমার বৈঠক

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

নন্দহরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ী যশোহর জেলার গঙ্গারামপুর। নন্দহরির মা বৃদ্ধা, সত্তর বৎসর বয়স্কা, গ্রামের সমস্ত স্ত্রীপুরুষে তাঁহাকে দিদিমা বলিয়া ডাকে। বৃদ্ধা দুপুরবেলায় আহারান্তে রামায়ণ লইয়া বসেন, গ্রামের বালিকা হইতে পৌঢ়া-বৃদ্ধা সকলেই দিদিমার ঘরে উপস্থিত হইয়া রামায়ণ শুনে। সেদিন সুশীলার মা রামায়ণ পাঠ শুনিতে যাইতেই দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, —হাগা সুশুর মা, কাল আস নাই কেন? কাল অমন মায়া সীতার জায়গা পড়লুম্।

সুশীলার মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, —তা কি কর্ব্ব, ভাগ্যে নেই তা শুনবো কোত্থেকে। কাল ভাই মহা এক ফ্যাসাদে প'ড়েছিলুম।

দিদিমা—কি ফ্যাসাদ?

সু-মা—রান্না বান্না ক'রে বড় ঘরে আস্‌ছি, এর মাঝে ও পাড়ার সেই নন্দা মণ্ডলের ছেলেটা ছুঁয়ে দিলে। কি করি, আবার গাঙে গিয়ে স্নান ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে ঘর দোরে গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে শীতকেলে বেলা কেটে গেল, তাইতে আর পারলুম না।

দিদিমা—কি ঘেন্নার কথা! চাঁড়ালের ছেলের আস্পদ্ধাও ত কম না!

সু-মা—তা কি কর্ব্ব দিদিমা, রোজ খাওয়া হ'লে রান্নাঘরের আস্তাকুঁড়ে দেখি দু'মুঠো পাতের ভাতের জন্যে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। কত দুর্ দুর্ করি, তবু নড়ে না।

দিদিমা—তা বেটার কি ছেলে খেতে দেওয়ার ক্ষ্যামতা নেই?

সু-মা—আর বলব কি দিদিমা ছেলেটার দৌরাত্মি। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে দু'টো মুড়ির জন্যে। দুটো মুড়ি দিতবে ছাড়ে। সকালে উঠে কোথায় বামুন-বদ্যির মুখ দেখ্‌ব, তা না একেবারে চাঁড়ালের মুখ!

সুশীলার মার পাশে ঘোষেদের বাড়ীর অমলা বসিয়া ছিল। অমলার বয়স ১৭।১৮ বৎসর, বিবাহ হইয়াছে কলিকাতায়, অমলা লেখাপড়াও বেশ জানে। বাপের বাড়ীতে আসিলে দিদিমার বদলে সেই সকলকে রামায়ণ পড়িয়া শুনায়। অমলা সুশীলার মার কথা শুনিয়া বলিল—তাহ'লেই বা চাঁড়ালের ছেলে, যখন মা মা ব'লে আসে তখন তাকে ছেলের মত দেখাই উচিত। তা ভাই তোমারও ত কোলে কিছু নেই, না হয় একটা গরীবের ছেলেকে পালনই কর্লে!

সুশীলার মা রাগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—তোরা কল্‌কাত্তার বৌঝি কিনা, তোদের আবার জাত বিচের কি! যাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে নেই, তাদের লালন পালন কর্ব্ব? মরণ আর কি আমার!

অমলা—জাত কি কারো গায় লেখা থাকে? একটা শেয়ালে, কুকুরে কি বিড়ালে ছুঁলে স্নান কর না, আর একটা মানুষে ছুঁলে অমনি জাত যায়! এসব কথা আর বলোনা ভাই।

সু-মা—শিয়াল কুকুর আর নমোশুদ্দুর আকাশ পাতাল তফাৎ, তারা পশু আর এরা মানুষ।

অমলা—তাইত, শিয়াল ঘরে গেলে হাঁড়ী মরে না, আর নমোশূদ্র রান্নাঘরের চালে মাথাটা দিলে হাঁড়ী মরে যায়, জল ফেলে দিতে হয়! মানুষ হ'য়ে মানুষকে এত ঘৃণা কেন দিদি?

সু-মা—তা কর্ব্ব না? ভগবান যাকে যা ছিষ্টি ক'রেছেন। তিনি আমাদের বানিয়েছেন ব্রাহ্মণ, আর তাদের নমোশুদ্দুর, ভগবানই ত তাদের ছোট ক'রেছেন!

অমলা—তা নয় দিদি, তা নয়। ভগবান সকলকেই সমান ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন। তিনি তোমারও যে দু'হাত দু'পা দিয়েছেন, চাঁড়ালেরও তাই দিয়েছেন, তোমার কি চাঁড়ালের চেয়ে দু'খানা হাত বেশী আছে?

সু-মা—তা না থাক্, দেখ আমাদের ভদ্দর লোকের রীতি চরিত্তির আলাদা। আমাদের হাত পা কেমন সাফ্, ওদের মধ্যে সকলেই ত কালো।

অমলা—তা ওরা রোদে পুড়ে মাঠে কাজ করে, ঘরের চালে উঠে চাল ছায় তাই ওদের রঙ কালো, তোমার মত ব'সে ব'সে ছায়াতে পেট ভরে খেতে পেলে ওদেরও রং সুন্দর হ'তো।

সু-মা—তা যাই বল, ওরা বড় ছোটলোক।

অমলা—আর তুমি ভারী বড় লোক! মারা গেলে শ্মশানে যখন পোড়ায় তখন, তোমার গা থেকে চন্দনের গন্ধ বেরোয় না। ওদের গা থেকে যে গন্ধ বেরোয় তোমার গা থেকেও সেই গন্ধই বেরোয়। তবে ওতে আর তোমাতে তফাৎ কি?

সু-মা—তফাৎ যদি না থাকবে তবে তোকে চাঁড়ালের ঘরে বিয়ে না দিয়ে কুলীন কায়েতের ঘরে দিলে কেন?

অমলা—দিলেন কেন তা বাপ-মাই জানেন। তবে জেনো দিদি, এই যে বামুন চাঁড়াল ভেদ—এ মানুষেই সৃষ্টি ক'রেছে, ভগবান করেন নি। আগে সব এক জাত—এক আর্য্যজাত ছিল, জানত?

সু-মা—না, জানি না।

অমলা—সকল জাতই আগে ব্রাহ্মণ ছিল। একই বাড়ীর মধ্যে এক এক জনে এক একরম্ কাজ কর্ত্তেন। শেষে যিনি পূজো, আহ্নিক কর্ত্তেন তিনি হ'লেন ব্রাহ্মণ, যিনি যুদ্ধবিগ্রহ কর্ত্তেন তিনি হ'লেন ক্ষত্রিয়, যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য কর্ত্তেন তাঁরা হ'লেন বৈশ্য আর যাঁরা ব্রাহ্মণদের সেবা কর্ত্তেন তাঁরা শূদ্র।

সু-মা—তা হ'লে তুমি বল্‌তে চাও যে চাঁড়ালেরা ভদ্দর?

অমলা—শূদ্র ত ভাল, আমি বাবার কাছে শুনেছি ওঁরা কশ্যপ ঋষির ছেলে—ব্রাহ্মণ।

সু-মা—আর বলিস্ না, বলিস্ না। ছমাস কলকাতায় গিয়ে একেবারে ব'য়ে গেছিস্। চাঁড়ালকে বলিস্ কিনা বামুন! ঘোর কলিকাল কিনা, তাই ছেলেদের মত মেয়েরাও ব'কে গেছে।

অমলা—বকা নয় ভাই। তোমাদের হাবভাব দেখে আমরা অবাক্ হ'য়েছি। তোমাদের ব্রাহ্মণের মধ্যে কত লোকে সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, মদ খায়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, পরের সর্ব্বনাশ করে, তোমরা তাকে ত দূর দূর ক'রে তাড়াও না, সমাজে সে একসঙ্গে খায়; আর সাহা, নমোশূদ্র, কুলী তোমার বাড়ীতে এলে কুকুর শেয়ালের মত দূর দূর ক'রে তাড়াও কেন?

সু-মা—ওমা! এবার আবার চাঁড়াল ছেড়ে দিয়ে "শুঁড়ীর" পক্ষে ওকালতী আরম্ভ কর্লে! তা উকিলের বৌ কি না, উকিল হ'বে তাতে আর বিচিত্তির কি? বলি, শুঁড়ীরও জল খেতে হ'বে নাকি?

অমলা—শুঁড়ী আবার কোন জাতের নাম নাকি? যারা মদ বিক্রী করে তারাই শুঁড়ী। ব্রাহ্মণেও যদি মদ-গাঁজা বিক্রী করে তবে তাকেও বল্‌তে হ'বে শুঁড়ী। ঐযে ওপাড়ায় গোপীনাথের ভাই মদের দোকান খুলেছে—ঐ-ই ত শুঁড়ী। ওকে সমাজ থেকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দাওনা কেন?

সু-মা—হা-হা-হা! অমলি তুই হলি কি? আরে পাগ্‌লি বামুনের সাত খুন মাপ, এও জানিস্ নি? ভগবান যে বামুনকে ছিষ্টি থাক হ'তে বড় ক'রেছেন। বামুন মদের দোকান ত ভাল, গরুর চামড়া বিক্রী কর্লেও বামুন।

অমলা—হাঁ তাইত, এমন না হ'লে আর মানাবে কেন? তোমার জামায়ের ভাই মদের দোকান খুলেছে তাইতে বুঝি অতটা গায়ে বিঁধেছে?

সু-মা—আরে আমার জামাইয়ের ভাই মদের দোকান করুক আর যাই করুক সে কুলে মেলের

মস্ত কুলীন, তার ঘরে মেয়ে দিতে পার্লে অনেক ব্রাহ্মণমশাই নিজেকে ধন্য মনে করেন।

অমলা—ঐ দোষেতেই আমরা মলুম। কুলীনেরা কোন কৌলীন্য পালন কর্ব্বেন না, অথচ মুখে বল্বেন, আমরা বড় কুলীন, বিয়েতে হাজার হাজার টাকা নেবেন! আর একজন নমোশূদ্র হাজার গুণবান বা ধার্ম্মিক হ'লেও সে চিরকাল নমোশূদ্রই থাক্বে, তাকে তোমরা কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়াবে। ওতে ধর্ম্ম হয় না বোন্, ওতে ধর্ম্ম হয় না।

সু-মা—ওতে ধর্ম্ম হয় না, তবে কি যার তার সঙ্গে বস্‌লে ধর্ম্ম হয়?

অমলা—হাঁ, সবাইকে ঠিক নিজের মত মনে কর্লে ধর্ম্ম হয়। এই যে তোমরা নমোশূদ্র, হাড়ী, ডোম, মেথরদের এত ঘৃণা কর, এতে তারা মনে কত কষ্ট পায় বল দেখি!

সু-মা—তা পেলে আর কি করা যাবে। তারা যেমন কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে ক'রে এসেছে তার ফল পাবেই।

অমলা—এ ফল ত তোমরাই দিচ্ছ দিদি। তোমরা এই যে মানুষ হ'য়ে মানুষকে এত ঘৃণা কর্‌ছ, এর ফল তোমরাই পরজন্মে পাবে। আচ্ছা, সেবার মদন সাহার ছোট ছেলেটি বাবুদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে মা দুর্গার পায়ে একটা ফুল দিবার জন্য কি আছাড়ি বিছাড়ি না খেলে! ছোট লোক—শুঁড়ীর ছেলে ব'লে দারোয়ান তাকে বের ক'রে দিলে! আচ্ছা, সেই অতটুকু দুধের বালকের মনে কি কষ্টটা হ'ল একবার ভাব দেখি!

সু-মা—তাই বলে কি শুঁড়ির ছেলেকে মন্দিরে ঢুক্‌তে দেবে?

অমলা—কে শুঁড়ী? সাহারা কি মদ বিক্রী করে যে তারা শুঁড়ী? তারা ত রীতিমত ব্যবসা বাণিজ্য করে।

সু-মা—আরে যাই করুক তবু তাদের খেতা-বটা ত শুঁড়ী?

অমলা—ওই ক'রেই হিন্দুজাতটা মর্‌তে বসেছে। দেখ্‌ছ না কত নমোশূদ্র গিয়ে খ্রীষ্টান হচ্ছে? তোমাদের নাপিতে তাদের ক্ষৌরি করে না, বেহারায় তাদের পাল্কীতে বহন করে না। দিদি, এগুলো কি সমাজের অত্যাচার নয়?

সু-মা—বাবা রে বাপু, তোর সঙ্গে আর তর্ক কর্ব্ব না, তুই বেহ্ম মেয়েদের সঙ্গে মিশে মিশে বেহ্ম জ্ঞানী হ'য়েছিস্।

অমলা—আমি ব্রহ্মজ্ঞানী নই। ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া খুব বড় কথা। আমি কলকাতায় অনেক মহাপুরুষের বক্তৃতা শুনে থাকি, তাঁরা বলেছেন ব্রাহ্মণরা যদি এইভাবে অন্য জাতির প্রতি অত্যাচার করেন তবে দু'শ বছর পরে হিন্দুজাতির নাম আর থাক্‌বে না।

সু মা—তা না থাকুক। তা ব'লে ছোটলোকের সঙ্গে মিশ্‌তে হ'বে, তাদের জল খেতে হ'বে?

অমলা—কেন, মুসলমানের দুধ খাও না? নমোশূদ্রের সেঁজো রস খাও না? বিলিতি এলোপ্যাথিক ওষুধ খাও না? তার বেলায় বুঝি দোষ হয় না? দোষ যত গঙ্গার জলে?

সু-মা—তা কি করা যাবে, শাস্ত্রে যা বলে তাইত মান্‌তে হ'বেত?

অমলা—শাস্ত্রে তোমায় কাকেও কুকুর শিয়ালের মত ঘৃণা কর্ত্তে বলে না। তোমার মাও ত তোমার কত বিষ্ঠা মূত্র পরিষ্কার ক'রেছেন, তাঁকে "মেথর" বলে ত্যাগ কর না কেন?

সু-মা—দেখ্ অম্‌লি, তুই সেদিনের মেয়ে, মুখ টিপ্‌লে দুধ বেরোয়। তুই শাস্ত্রের বুঝিস্ কি? তোর সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

অমলা—বেশ্, আমিও তোমার মত নীচ মনের মেয়েলোকের সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাই না।

অমলা এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। সুশীলার-মা তাহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল। ভাবগতিক দেখিয়া বৃদ্ধা দিদিমা উঠিয়া সুশীলার মাকে ধরিয়া বলিলেন,—বৃথা কথা কাটাকাটিতে কাজ কি? এস রামায়ণ পড়া যাক্। অমলা চলিয়া গেল, অগত্যা দিদিমাই সেদিন রামায়ণ পড়িলেন।

আহ্বান।

[রচনা—শ্রীসরোজকুমার সেন]

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে
কঠিন কর' কোমল হিয়া;
দহন জ্বালো, দহন জ্বালো,
নয়ন-ঝুরা আগুণ দিয়া।
বিদ্রোহেরি বিষম বেগে
চল্‌না ধেয়ে সমুখ পানে—
মন্থর-বিধি বিকল করি'
শিকল টুটি' আয় ছুটিয়া।

কাল্ সমাজে নিঠুর-ঘাতে
লুটায় কত জীবন-ফুল;
মায়ের-জাতি, ভাঙো এবার
বিষধরের বিষম ভুল।
সত্য সবার চাইতে বড়,
ন্যায়ের-দাবী সবার আগে—
সেই সুরেতে বাজুক আজি,
মুক্তি-বাঁশী ঘুম্ ভাঙিয়া॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ভৈরোঁ—ঝম্পক।

২ ১´ ২
II ণা -া দা | {পা পপা I দা -পা মা | মা গা I
বা ং লা দে শের্ শ্যা ম্ লা মে য়ে

১´ ২ ১´ ২
I পা র্মা -র্গা | র্ঋা র্সা I র্সা র্ঋা -র্গা | (মা মণা I
ক ঠি ন্ ক র' কো ম ল্ হি য়া০

১´ ২ ১´ ২
I ণা -া দা)} | র্ম মা I {দা দা -া | না র্সা |
'বা ং লা' হি য় দ হ ন্ জ্বা লো

১´ ২ ১´ ২
I র্ঋর্ণা র্ঋর্ণা -র্সা | ণা দা I ণা ণা -দা | দা পা I
দ হ ন্ জ্বা লো ন য় ন্ ঝু রা

১´ ২
I পা মগা মগা | মা মণা } II
আ গু০ ণ ০ দি য়া০

অন্তরা।

```
১´                 ২              ১´                          ২
II {দা  দা  দা  |  না   -র্সা  I  ঋর্া   ঋর্া   -র্সা   |  র্সনা   র্সর্ I
    বিদ্ রো  হে     রি    ০      বি     ই      মু        রে০    গে

১´                 ২              ১´                          ২
I র্সনা -র্সা দা |  না   র্সা  I  র্স  নর্সঋর্া  -র্সা  |  ণা   দা} I
  চ০   ল্   না     ধে    য়ে      স    মু০০     খ্        পা   নে

১´                 ২              ১´                          ২
I {র্সনা র্সা -র্মা |  র্মা   র্মা I  র্পর্মা  র্পর্মা  -র্গা  |  ঋর্া   র্সা I
   ম০  হু   র্       বি    ধি     বি০     ক০     ল্        ক     রি

১´                 ২              ১´                          ২
I ন্র্সা  ণা  -দা |  দা   পা I  মপা  -মগা   মগা  |  মা   মণা} II
  শি   ক   ল্     টু    টি    আ     ০য়    ছু০     টি    য়া০
```

সঞ্চারী।

```
১´                 ২              ১´                          ২
II {সা   -া   মা  |  মা   মা  I  মা    মা    -া    |  মা   মগা I
    কা   ল্   স     মা   জে     নি    ঠু    র্        ঘা   তে০

১´                 ২              ১´                          ২
I মা  ণদা  -া  |  পা   মগা I  মা   ণদা   -না  |  র্সা   -া I
  লু   টা০  য়     ক    ভ০    জী    ব০    ন্        ফু    ল্

১´                 ২              ১´                          ২
I র্সনা  র্সা  -দা |  না   র্সা I  ঋর্া  র্সঋর্া  র্সা  |  ণা   -দা I
  মা০  য়ে   র্     জা   তি     ভা    ঙো    এ        বা    র্

১´                 ২              ১´                          ২
I পা  পণা  ণা  |  দা   -পা I  মা   গা   -ঋা  |  সা   -া} I
  রি   ম০   ধ     রে   ত     বি    ষ    মু        ভু    ল্
```

আভোগ।

১´ ২ ০ ১´ ২
I {দা দা দা | না -র্সা I র্ঋা র্ঋা র্সা | র্সনা র্সা I
স ত্য স রা র্ চা ই তে ব ০ ড়

১´ ২ ১´ ২
I র্সনা র্সা -দা | না র্সা I র্সা নর্সর্ঋা -র্সা | পা দা} I
ভা য়ে র্ দা বী স বা০০ র্ আ গে

১´ ২ ১´ ২
I {র্সনা র্মর্মা র্মা | র্মা র্মর্গা I র্পা র্মা -র্গা | র্ঋা র্সা I
সে০ ই ০ সু রে, তে০ বা জু ক্ আ জি

১ ২ ১´ ২
I র্সা -পা দা | দা পা I পা -মগা গা | মা মগা} II II
মু ক্ তি বা শী ঘু ০ ম্ ভা০ ঙি য়া০

মিনতি

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

দীক্ষা দাও নব মন্ত্রে এ সন্তানে আজিকে প্রভাতে,
হীনতা-কালিমা ধুয়ে দাও তব স্নেহধারা মাথে।
সন্তানের বক্ষে মাগো, হাস্যমুখে আজি জাগ,
চেতনা-অঞ্জন ঢালি দাও সুপ্ত আঁখি-তারকাতে,
উজলিয়া দাও হৃদি তব স্নিগ্ধ জ্যোতি-রেখাপাতে॥

* * * *

তোমারি আশীষ লভি' জয়যুক্ত হ'ক মম প্রাণ,
চরণ-পরশে তব পাই যেন শান্তি অফুরান।
তব মন্ত্র যুক্ত করে, গাই যেন মুক্ত স্বরে,
দিবসে নিশীথে কণ্ঠে বাজে যেন তব নামগান;
করুণা মাখান' করে কর পুত্রে বরাভয় দান॥

ECONOMIC JEWELLERY WORKS
CALCUTTA
BRITISH EMPIRE EXHIBITION, LONDON, 1924

৩য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২ | ২য় সংখ্যা

বিশ্বের আধার

শ্রীমতী লীলা দেবী।

একান্তে আমার বলি না পেনু তোমায়
তাই তো পেলাম তোমা সকলের মাঝে,
এ যে চিরন্তন পাওয়া চির যুগান্তের
হেথা নাহি বাধা ভয় লাঞ্ছনা ও লাজে!
দিবা নিশি নাহি পাই দেখিতে তোমায়
রাখিতে আমার হিয়া তোমার হিয়ায়
তাই তো নেহারি শ্যাম তরু বীথিকায়
কভু নব জলদের সাজে,
তাই তো তোমার মুখ হেরি নানা রূপে
সাগরে গগনে মেঘে বনে চুপে চুপে,
শিরীষে তমালে তালে বেতস ও নীপে
নব সহকার শাখে রাজে!
তব ভুজপাশ হ'তে ছিঁড়িয়া আমায়
বিশ্বের আধার বিধি গড়িল যে তায়,
প্রতি অণু মাঝে তাই হেরি যে তোমায়,
আপনার হৃদয়ের মাঝে।

নারীর শিক্ষা

শ্রীমৃতপাপ্রা দেবী ব্যাকরণতীর্থা

মনে হয় সে আজ কোন যুগযুগান্তরের কথা—যেদিন একজন একাদশী কিশোরী তাঁহার সগু মুকুলিত জীবনের সবটুকু নব আশা ও উত্তম লইয়া কোন্ শাশ্বত সত্যের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন! এই পার্থিব মরজগতের বুকভরা স্নেহ-মমতা, শত সহস্র চেষ্টা-যত্ন তাঁহার জীবনের অপার্থিব চিরন্তন সত্য-শিব-সুন্দর চিন্ময়ের পথ হইতে তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে নাই। সেদিন কে জানিত যে এই সুকুমারী কোমলা ক্ষুদ্রা কিশোরীই কালের আবর্ত্তনে একদিন আবার অভ্রভেদী হিমাচলের দুর্গম আঁধার গিরি-গুহায় তপস্বিনী পার্ব্বতীর মত কঠোর তপস্যায় আপন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সেই মহান্ আত্মাকে উদ্বোধিত করতঃ আত্মশক্তিতে প্রকৃত শক্তিশালিনী হইয়া অমিত বীর্য্যে দীনা বাঙ্গালার প্রতি ঘরে অমৃতের সন্ধান দিবেন—'ভূমার' বাণী শুনাইবেন—ভারতের অতীত মহীয়সী, গরীয়সী নারীর স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহার তপস্যা-পূত জীবনের ধারা গঙ্গাযমুনার ধারার মত ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে।

তাহার পর সেই একদিন—যেদিন পরিণত বয়সে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহার প্রিয়ভূমি হিমালয়ের শান্ত স্নিগ্ধ শান্তিচ্ছায়ার ক্রোড় হইতে বিদায় লইয়া আকুমারিকা ভারতবর্ষ ভ্রমণ-কালে অতীত ভারতের কর্ম্ম-জ্ঞান-দীপ্তা মহীয়সী নারীর স্থলে বর্ত্তমান জটিল নারীসমস্যা দর্শন করতঃ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তবেদনায় ব্যথিতা হইয়া সমবেদনার নিরুপায় অশ্রু ত্যাগ করেন, সেদিন সে সমস্যা তাঁহার তাপস চিত্তে কর্ম্মের প্রেরণা নীরবে জাগাইয়া তোলে।

মহান্ হৃদয়ে সদিচ্ছার অঙ্কুর রোপিত থাকিলে ভূমিতে বীজ প্রক্ষেপের ন্যায় তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না, কোন না কোন দিন তাহা মহাবৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া বহুর আশ্রয়স্থল হয়। প্রকৃত ঐকান্তিক শুভেচ্ছার মূলে ভগবৎশক্তি আপনিই কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রয়াসীকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল। যে বিরাট শক্তির মন্ত্রপ্রেরণায় আচার্য্য শঙ্কর সম পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব্ব ধারায় এই দৈন্য-প্রপীড়িত, অবসাদ-গ্রস্থ, অচেতন বর্ত্তমান ভারতের বুকে বজ্র-কঠোর স্পন্দন জাগাইয়া তোলেন, আপন অমানুষী শক্তিতে সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মাঝে এক মহাভাব জাগাইয়া তোলেন, সেই জমাট শক্তির মূলাধার আত্মভোলা ভাববিভোর উদাস সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে কুলু কুলু নাদিনী স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথী-কুলে, নির্জ্জন পঞ্চবটী-প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া, শুভ্র প্রভাতের নবারুণ-রশ্মিতে দাঁড়াইয়া, আপন প্রিয়তমা প্রথমা শিষ্যা সেই আশৈশব তাপসী, চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতাকে করুণ গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া যেদিন কহিলেন—"দেখ্ মা গৌরি, এই ভারতবর্ষের নারীজাতির বড়ই দুঃখ, তাদের শিক্ষাদীক্ষার বড়ই অভাব। এদের শিক্ষার ভার তোকে যে নিতে হবে মা। তোর জীবনে তপস্যা তো অনেক হ'ল, এখন তোর ঐ তপস্যার শরীর দিয়ে দেশের মেয়েদের জন্য খাটতে হবে তোকে—" সেদিনই যে তাঁহার সেই স্বাধীন মুক্ত বাধাবিপত্তিহীন শান্তিময় জীবনের দুঃখময় দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা,—বারাক-পুরে গঙ্গাতীরে বিস্তৃত স্থানে নিরাশ্রয় মহিলা-বৃন্দের আশ্রয় ও মাতৃজাতির প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার জন্য শ্রীশ্রীগৌরীমাতা প্রকৃতিদেবীর লীলা-নিকেতন দিগন্তবিস্তৃত বাঙ্গালায় আবার গার্গী,

মৈত্রেয়ী, সতী গড়িবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম "নারী-মঠ" স্থাপন করিলেন। কিন্তু সহর ব্যতীত অন্যত্র মেয়েদের সর্ব্ববিধ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে না পারায় ১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাসে কলিকাতা গোয়াবাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘপূজিতা জননী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীকে লইয়া "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুদীর্ঘ কাল মাতাজী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী নীরবে, সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে দুঃখদৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটীকে নিখুঁত ভাবে চালাইয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা নিম্নলিখিত উপায়ে করা যাইতেছে :—(১) হিন্দু বালিকা ও মহিলাবৃন্দের হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ও কালোপযোগী শিক্ষা প্রদান, (২) সদ্বংশজাতা অনাথা নিরাক্ষরাগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, (৩) আদর্শ নারীচরিত্র গঠন এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান জাগ্রত করা, (৪) প্রয়োজন হইলে যাহাতে নারীগণ সদুপায়ে শিল্পাদির সাহায্যে স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন এবম্বিধ কার্য্যকরী শিক্ষাপ্রদান এবং (৫) বিভিন্ন স্থানে এইরূপ নারী-মন্দিরের কেন্দ্র স্থাপন।

কুমারী ও মহিলাগণ আশ্রমে সংযম, সদাচার, গৃহকর্ম্ম, সেবা ও শুশ্রূষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রণালী, পূজা, জপধ্যান, গীতবাদ্য এবং গীতা, উপনিষৎ, সাংখ্য, বেদান্ত, সাহিত্য অঙ্ক, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। আশ্রমে সকল প্রকার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, সেলাই, কাটছাঁট এবং নানাপ্রকার গৃহশিল্পেরও বন্দোবস্ত আছে। বালিকাগণ তাঁতে ধুতি, সাড়ী, তোয়ালে, চাদর, নানাপ্রকার ছিট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত একটী বিদ্যালয়ও আছে, উহাতে শতাধিক ছাত্রী অবৈতনিক শিক্ষালাভ করিতেছেন। সুশিক্ষিতা সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণীগণ কর্ত্তৃক আশ্রমের সর্ব্ব-প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

মাতাজী এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছেন, অশীতি বৎসর বয়স তাঁহার অতীত হইয়াছে। তাঁহার সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে আজ আশ্রমের ছাত্রীবৃন্দের জন্য নিজস্ব আশ্রম গৃহ নির্ম্মিত হইল। এখানে বাংলার, শুধু বাঙ্গলার কেন ভারতের সকল জাতির (আসামী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি) লোকই আপন আপন কন্যা ও আত্মীয়াকে নির্ভয়ে রাখিতে পারেন। এইরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালায় এই প্রথম বলা যাইতে পারে।

আশ্রমের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণে প্রায় সত্তর হাজার টাকা ঋণ হইয়াছে, আমরা সহৃদয় দেশবাসীর কাছে সেজন্য এবং উক্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠানটীকে নির্ব্বিঘ্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

সুন্দর

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী

কোটি কোটি নর-নারী আছে এ ধরায়,
কিন্তু, সে হৃদয়খানি যেমন নির্ম্মল,
যেমন মল্লিকা-শুভ্র উজ্জ্বল শীতল,
সপ্ত স্বর্গে তেমন কি মিলিবে কোথায়?
গম্ভীর বিশাল উচ্চ হৃদয় ঘিরিয়া
জগতের ভালবাসা উছলে পরাণে,
কলুষে বলিত স্বার্থ মলিন বয়ানে,
মর্ম্মাহত হ'য়ে বিশ্বে কাঁদিয়া বেড়ায়।
স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া তার করুণা নির্ঝর
বিশ্বের সন্তাপ-বহ্নি দেয় নিবাইয়া,
পাপ-বিষে জর্জ্জরিত অভাগা লাগিয়া
সতত ব্যথিত তার কোমল অন্তর।
এ চিত্ত-সুরভি মাঝে বেঁধেছেন ঘর
সুন্দর হইতে যিনি পরম সুন্দর।

রাজপুতানা অঞ্চলের মহিলাদের কথা

শ্রীমূলচাঁদ মুন্ধড়া।

রাজপুতানা, বিশেষতঃ বিকানীর জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মহিলাদের আচার ও কার্য্য-পদ্ধতি বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু জানাইতে চেষ্টা করিব।

এদেশীয় মহিলারা নিজ নিজ সকল কার্য্যই খুব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এদেশীয় মহিলাদের মধ্যে আলস্য খুব কমই দেখা যায়। খুব ভোরে উঠাই ইঁহাদের অভ্যাস। গরীব ধনী সকল ঘরের মেয়েরাই খুব ভোরে উঠিয়া গোয়ালঘর হইতে গরু খুলিয়া গ্রামের নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখালদের নিকট দিয়া আসেন। এরূপভাবে রাখালদের নিকট ২।৩ শত পর্য্যন্তও গরু একত্রিত হইয়া থাকে। গরু দিয়া আসিবার সময় মেয়েরা একটী পাত্রে গোময় কুড়াইয়া বা চাহিয়া আনেন। এই গোময় দ্বারা গৃহিণীরা ঘর মেরামতের কার্য্য সম্পন্ন করেন ছোট ছোট মেয়েরাও সময় সময় গবাদিকে রাখালদের নিকট পৌছাইয়া দেয়। এই কার্য্যের দ্বারা প্রভাতের মুক্ত বায়ু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্যায়ামের কার্য্যও হয়।

প্রাতঃকালের কার্য্য সারিয়া মেয়েরা সকলেই স্নানাদি সমাপন করেন, স্নানের পর বৃদ্ধারা পূজার্চ্চনাদি করেন। পূজার্চ্চনার পর অল্প কিছু ...াগ করিয়া বৃদ্ধারা দধি হইতে ঘোল এবং কালে অ... ঘৃত প্রস্তুত করেন। এখানকার নারীর স্থলে ব... কেনেন না। গরীব লোকেরা করতঃ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্ত... উৎসবাদি ও ভোজের সময় সমবেদনার নিরুপায় অ... । এদেশে বাড়ীর মেয়েরা সমস্তা তাঁহার তাপস... পাক আরম্ভ করেন এবং ৯টার জাগাইয়া তোলে। করিয়া পরিজন ও সকলকে খাওয়ান'র মহান্ হৃদয়ে ব্য... ...ন। সকলের শেষে তাঁহারা আহার করেন। পুনরায় বিকালে ৪টা হইতে পাক আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব শেষ করেন। বৌরা এই পাক কার্য্যে ছোট ছোট মেয়েদের সাহায্যও গ্রহণ করেন। ইহাতে ছোট ছোট মেয়েদেরও পাককার্য্য বিষয়ে সুন্দররূপে হাতে-কলমে শিক্ষা হইয়া থাকে।

এদেশের বড় বড় ঘরের মেয়ে বৌরা বাসন-কোসন সব নিজেরাই মাজেন। ইহাতে তাঁহারা কিছুই মনে করেন না এবং অপরেও এজন্য তাঁহা-দিগকে কিছু বলে না। মধ্যাহ্নে বৃদ্ধারা কেহ কেহ চরকা কাটেন, বৌরা সেলাই ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করেন আর ছোট ছোট মেয়েরা তাঁহাদের নিকট বসিয়া সেলাই কার্য্য শেখে। মাঝে মাঝে মেয়েরা সূচ দিয়া মোটা মোটা সেলাইয়ের কার্য্যগুলিও সমাপন করে। অপরাহ্নে আবার ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়া ও রান্নাবাড়ির যোগাড় করার ব্যবস্থা এই কার্য্যে বাড়ীর বৌ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত সমান তালে পরিশ্রম করিয়া থাকে।

অপরাহ্নে মাঠ হইতে গরু ফিরিয়া আসে। তাহাদের খাবার দেবার ব্যবস্থাও মেয়েরা করেন। দুধ দোয়ার কার্য্যও মেয়েরা করেন এ কার্য্যে তাঁহারা বিশেষ দক্ষ।

এদেশের মেয়েরা ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। দিনের মধ্যে তিনবার ঝাঁট দেবার নিয়ম। সপ্তাহে দরকার-মত দেওয়াল ও ছাদ প্রভৃতি ঝাঁট-পাট দেন। ঘরের কোনও স্থানে কোনও সময়ে মাকড়সার জাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাকা ঘর এঁরা মাঝে মাঝে জল দিয়া ধুইয়া ফেলেন এবং কাঁচা ঘর

গোময় দিয়া লেপেন। এজন্য বাঙ্গালাদেশ হইতে এঁদের ঘর বাড়ী দেখিতে খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। কোন স্থানে কাঁচা ঘর যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে ইঁহারা নিজেরাই গোময় এবং মাটী দিয়া সুন্দররূপে মেরামত করিয়া লন। যদি কোনও বেশী মেরামত করার দরকার হয়, তবে একজন মজুরাণী লইয়া ঘরের মেয়েরা নিজেরাই খাটিয়া মেরামত কার্য্য সারিয়া নেন। এদেশে মজুর অপেক্ষা মজুরাণীর সংখ্যাই বেশী।

এখানকার মেয়েরা কাপড়চোপড় বেশ সাফ রাখেন। ময়লা হইলে সাধারণতঃ কেহই প্রায় রজকের সাহায্য নেন না, নিজেরাই পরিষ্কার করেন। নিজেদের শরীরও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। ইঁহারা সাবানের পরিবর্ত্তে টক্ ঘোল ব্যবহার করেন। ইহাতে এঁদের শরীর বেশ পরিষ্কার ও নরম থাকে।

এদেশে গোধন রাখিবার খুবই সুবিধা আছে। গরুর যাহা কিছু কাজ সবই মেয়েরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে পুরুষদের কিছুই ভাবিতে হয় না। এ দেশীয় গৃহস্থের ঘরে দুধ, দধি, ঘোল, মাখন, ঘি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দুধ, দধি, ঘোল এত অধিক হয় যে, এঁরা সে সব খাইয়া উঠিতে পারেন না। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী পর্য্যন্ত এই সব দ্রব্য নিত্য পঁহুছায়। এ দেশের প্রায় প্রত্যেকের গৃহেই একটী করিয়া যাঁতা আছে। ঐ যাঁতায় মেয়েরা ময়দা তৈয়ারী করেন। প্রবীণারা একদিন বসিয়া কয়েক দিনের জন্য যাহা দরকার হয় তাহা পিসিয়া রাখেন। হলুদ পিসিতে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম হয়, ইহাও এঁরা পাড়া-পড়সীর ২।৩ জনকে লইয়া একত্র বসিয়া পিসেন। সময়-বিশেষে পাড়া-পড়সীরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশেষ করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সব কাজে এঁদের খুব পরিশ্রম হয়। এইরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করেন বলিয়াই এঁদের স্বাস্থ্য খুব সুন্দর থাকে।

সেলাইএর কার্য্যেও এখানকার মেয়েরা বেশ পটু। অনেক ঘরে মেয়েরা কাপড় পর্য্যন্ত বোনেন। গরীবদের চেয়ে ধনীরা সেলাই কার্য্যে বেশী পটু। ছোট ছোট মেয়েরা এদেশে আশ্চর্য্য রকমের সুচের কার্য্য শেখে। এই সব মেয়েরা কাপড়, কুঁচ, পুঁতি, রঙ-বিরঙের সূতা দিয়া এক প্রকার পুতুল তৈয়ারী করে, তাহার নাম "গুড্ডি"। এই "গুড্ডি" ছেলে-মেয়েদের খুব আদরের খেলনা। এখানকার এই "গুড্ডির" আবার বিবাহ হইয়া থাকে। এই বিবাহের সময় গ্রামের অনেক মেয়ে একত্রিত হন এবং বিশেষ আমোদ আহ্লাদ হয়। বাড়ীর বৌ-ঝি এবং প্রবীণারাও এই উৎসবে সময় সময় যোগদান করেন।

বাড়ীর মা-বোনদের কাছে ছোট ছোট মেয়েরা যে রকম প্রাথমিক সেলাই-শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা কোনও পুস্তক পাঠ কিংবা কোনও বিদ্যালয়ের সাহায্যে হইবার নয়। বৃদ্ধারাও ছোট মেয়েদের জ্যাকেট, টুপি প্রভৃতি সেলাই শিখাইয়া দেন। মেয়েদের শেখবার ঝোঁকও খুব।

আপনারা বাজারে কানপুরের টুপি দেখিয়া থাকিবেন। সেই টুপী রাখিবার একটী পিচবোর্ডের ঘর থাকে। সেই ঘরটাকে আধার করিয়া এ দেশীয় মেয়েরা তার উপর মখমলের কাপড় দিয়া মুড়িয়া জরীর সুন্দর সুন্দর ফিতা দিয়া নক্স ভাবে টুপী তৈয়ারী করিয়া দেন যে, দেখিতে ইচ্ছা করে।

এ দেশীয় মেয়েরা রন্ধনকার্য্য ে সাধারণ রান্নাবাড়ি ছাড়া এঁরা রসগোল্ল সন্দেশ, সরপুরিয়া প্রভৃতি ভাল তৈয়ারী করিতেও খুব পটু। ছোট ে প্রাথমিক শিক্ষার ভার এদেশের মাত গ্রহণ করেন। কার্য্যকরি শিক্ষার লক্ষ্য করা হয়। অল্প অল্প পুস্তকাদিং পড়িতে দেওয়া হয়। প্রবীণারা ছোট ধর্ম্ম শিক্ষা, নীতি শিক্ষা খুব সংগে ভাবে প্রদান করেন। ছেলেমেয়ে

মধ্য দিয়া তাহাদের পূজনীয়াদের নিকট হইতে বহু সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গ দেশীয় মহিলাদের এবং রাজপুতানা দেশীয় মহিলাদের এইটুকু বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যে, ইঁহারা যাহাই করুন না কেন, কোনও সময়ে নাটক নভেল লইয়া বা গল্প-গুজব করিয়া সময় কাটান না। লেখাপড়া অনেকেই জানেন কিন্তু নাটক-নভেল পড়িয়া সময় না কাটাইয়া সব সময়ই কোন একটা কার্য্য লইয়া থাকেন। অবসর সময়ে অবশ্য অনেকে ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করেন। নূতন বউ ঘরে আসিলে প্রথমেই এদেশের প্রবীণারা তাহার সাংসারিক কার্য্যের পটুতা আছে কিনা জানিতে চাহেন। বাংলা দেশের মত বৌ সাদা কি কাল, মুখ দেখিতে সুন্দর কি না, মাথার চুল কয় ফুট কয় ইঞ্চি লম্বা ইত্যাদি কথা এদেশের মেয়েরা কেহ জিজ্ঞাসা করেন না।

স্মৃতি-তর্পণ

(গল্প)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মন্দিরে ঠাকুরের পূজা-উৎসব সেদিনের মত শেষ হয়ে গিয়েছে।

সাঁঝের আঁধার তখনও মাটির বুকে জড়িয়ে যায় নি। দূর মাঠে খেজুর বনের ফাঁকে ফাঁকে অস্ত-রবির শেষ রক্ত রশ্মিটি তখনও ক্ষীণ সিঁদুর রেখাটির মত ঝিক্‌মিক্ করছে।

দেবতার পায়ে অর্ঘ্য পৌছে দিয়ে মন্দির হ'তে যাত্রীরা দলে দলে ফিরে আসছে। কোন কোন যাত্রী দেবতার পূজার উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে সেই ফিরে-আসার পথের ধারের ভিখারীদের দু'একটা পয়সা দিচ্ছিল; আর কেউ বা তাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত পথ চলছিল—ভিখারীর দীন মলিন চেহারা পাছে ঠাকুরের মহিমময়ী মূর্ত্তিকে মন থেকে সরিয়ে দেয়!

সেই পথের ধারে একজন ভিখারী তাদের কাছে ভিক্ষা চাইছিল। তার উন্নত বলিষ্ঠ দেহ যেন কিসের ভারে ঝুঁকে পড়েছে। মাথার লম্বা কোঁকড়ান চুলগুলি অত্যন্ত রুক্ষ, মুখখানি শুষ্ক ও বেদনা ব্যঞ্জক, চোখদুটি তার বসে গিয়েছে। রোজ সমস্ত দিন সে একটীও পয়সা পায়নি। দু'একবার সে যাত্রীদের খুব পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে ভিক্ষা দেবার জন্যে, কিন্তু তাতে কোন সুফল ফলেনি। বিফলতার বেদনা বুকে নিয়ে আবার সে আপন যায়গাটিতে ফিরে এসেছে। তার কাকুতি মিনতি কারো মনে দয়া জাগাতে পারেনি, বরং তার সে পেশী-সবল দেহের জন্য অনেকের অকারণ বিদ্রূপও তাকে সহ্য করতে হোয়েছে। তার সেই সুগঠিত দেহই যেন সবার চোখে কি এক ভয়ানক অপরাধের কারণ।

ক্রমে সূর্য্যের শেষ কিরণ-রেখাটিও দিগন্তে মিলিয়ে গেল। গাছের কোলে কোলে, ঝোপের ধারে ধারে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে জমে উঠছে আর, তারি মাঝে একরাশ জোনাকির মিটমিটে আলোর ঝুরি ঝরে পড়ছিল ফুলঝুরির ফুলের মত।

ভিখারী মন্দিরের পথের দিকে চেয়ে দেখল আর কোনও যাত্রী ফিরছে না। সে হতাশ হ'য়ে সেই পথের ধূলির উপর বসে পড়ল; সারা দিনের

নিষ্ফলতায় তার কালিমা-ঢালা চোখের c জলে ভরে গেল। সে আর কান্না চা পারল না! দুই হাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে এমন সময় কে একজন তার কাছে এসে শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করল "ভিখারী, কাঁদছ কেন? সমস্ত দিন কি কিছুই পাওনি?"

ভিখারী মুখ তুলে চেয়ে দেখল তার সামনে এক বিধবা ভিখারিণী, ছোট একটি মেয়ে তার কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল "ভিখারী, সমস্তদিন কি কিছু পাওনি?"

তার এ সহানুভূতি সহ্য করতে না পেরে সে তিক্তস্বরে জবাব দিল "না, সমস্ত দিন কিছুই পাইনি।"

"তুমি একবার ভাল করে চাইলে না কেন? তাহলে নিশ্চয়ই কিছু পেতে।"

"চাইনি! দু'দিন উপোসী আমি, ভাল করে চাইনি! এই দেহই আমার বাদ সেধেচে। এ বিরাট দেহ দেখে সবাই বিদ্রূপ করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়; কিন্তু কি করব ছাই, তা কেউ বলে না! কত গৃহস্থের দোরে দোরে ঘুরেছি, কত লোকের হাতে পায়ে ধরেছি,—কেউ আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চাইল না। সবাই অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাড়ীর বাহিরে যাবার প্রশস্ত পথটী। তবে না আজ পরের কাছে হাত পেতেছি! কয়েদখানা? হাঁ, সে যে এর তুলনায় শতগুণে ভাল ছিল। সেখানে শত নিষ্ঠুরতার মধ্যে তবু একটু দয়া-মায়া আছে, দুবেলা দু'মুঠো খেতে পেতাম।"

প্রচণ্ড ক্ষুধায় আর অকারণ উত্তেজনায় চুপ করে সে ধুকতে লাগল। ভিখারিণী আনমনে কিছুক্ষণ কি ভেবে তাকে বললে "দেখ, আমি আজ যা পেয়েছি তার থেকে তিন আনা পয়সা তোমায় দিচ্ছি; কিছু কিনে খাওগে।"

...কক্ষণ নিস্পন্দ হোয়ে তার দিকে ...র পরে আস্তে আস্তে বললে ...র উপায়, তোমার ঐ ছোট্ট মেয়েটির উপায় কি হবে?—না, না, আমি ও পয়সা নিতে পারব না।"

সে বললে "মাথা খাও, অমত করো না। আর যে দশ পয়সা আছে তাতে আমাদের দু'জনের বেশ চলে যাবে, তুমি সেজন্যে ভেবো না। এ তিন-আনা পয়সা তোমাকে নিতেই হবে।"

খানিকক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল। তার পর চোখের কোলে গড়িয়ে-পড়া অশ্রু-ফোঁটাটি মুছে ভিখারী হাত বাড়িয়ে পয়সা কয়টি নিয়ে বললে "বেশ, তাই হোক; অনাহারের কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি নে।"

সে পয়সা কয়টি নিয়ে চলে গেল।

ভিখারিণী সেখানে বসে কোলের মেয়েটির মুখের পানে চেয়ে কি সব আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। খানিক পরে হাত জোড় করে অশ্রু-ঢলঢল চোখ দু'টি আকাশের দিকে তুলে বললে, "ঠাকুর, এই অভাগীর স্বামীকে পরলোকে একটু শান্তি দিও; সে যে পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই চলে গেছে! পরজন্মে তাকে সুখী করো, অনাহার অর্দ্ধাহারে যেন আর তাকে মরতে না হয় প্রভু!"—এই বলে সে সেখানে গড় হোয়ে একটী প্রণাম করলে আকাশের উপরের সেই ঠাকুরের উদ্দেশে।

অদূরের প্রাঙ্গণে কোন্ লজ্জাশীলা বধূ তখন সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাচ্ছিল—তারি একটী হিম-স্নিগ্ধ আলোরেখা ভিখারিণীর স্বামী-স্মৃতি-কাতর মুখখানিতে ঝরে পড়ছিল দেবতার প্রীতি-আশীর্ব্বাদ বয়ে।

জাতির অপমান

[illegible] ...ার বি-এ।

বঙ্গদেশে কয়েকটী জেলায় [illegible] যে নারীর প্রতি অত্যাচার প্রযুক্ত হইতেছে তাহার যন্ত্রণাদায়ক অপমান কয়জন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন? খবরের কাগজে দুই একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ, হিন্দুদিগের নিষ্ক্রিয়, কাপুরুষোচিত ভীতির একটু উল্লেখ, কচিৎ রাজপুরুষগণের উদাসীনতার দৃষ্টান্ত—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত! দুই একজনের সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা বলেন অমুক স্থানে এইত নারীরক্ষা-সমিতি হইয়াছে, দেশে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, হিন্দুরা আর এরূপ অপমান সহ্য করিবে না, এবার তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে—ইত্যাদি। কিন্তু শুনিলাম না, নারীর মান রক্ষা করিতে গিয়া একজন সমর্থ পুরুষেরও প্রাণ গিয়াছে, একজনও কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, একটী স্থানেও যুবক সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে নারীনির্য্যাতনের প্রতীকারের জন্য তাহারা সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে এবং সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

আইন সভায় একটী মাত্র সভ্য এ সম্বন্ধে একটু পরিশ্রম করিয়াছেন, বোধ হয়, এখনও করিতেছেন। তিনি পথপ্রদর্শক বলিয়া ধন্যবাদার্হ। কুঞ্জবালার কথা বলিতে গিয়া—সে কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—তিনি বলিয়াছিলেন—নরপিশাচগণ তাহাকে গৃহ, সমাজ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়া, যখন সে কেবল সূতিকাগৃহে নবজাত শিশুর প্রাণস্নিগ্ধকর সুকুমার মুখখানি দেখিয়া তাহার অচির বৈধব্যজনিত অপরিসীম যন্ত্রণার কিছু উপশম বোধ করিতেছিল, তখন—স্ত্রী-জীবনের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহাকে নরকোপম অস্পৃশ্য অঙ্কে স্থাপন করিয়াছিল, তাহার [illegible], মর্য্যাদা, ধর্ম্ম সমস্ত পদদলিত করিয়া দিয়াছিল।

এই প্রকারে কত শত নারী দেশের দিকে দিকে নির্য্যাতিত হইতেছে, এক এক দুর্ব্বৃত্তের গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে! ভগবান্, এই কাপুরুষ জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে, আর তাহাদের গৃহের নারী নরকের আবর্জ্জনায় ক্লেদসংস্পর্শে আপনার অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছে, আপনার বেদনাতুর জীবনের নিঃশব্দ বিলাপরাশি অলক্ষ্যে দেবতার চরণে নিবেদন করিতেছে,—এ চিন্তা যে একান্ত অসহনীয়! আমাদের ভগ্নী, আমাদের সহধর্ম্মিনী, আমাদের মা দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইতেছে আর আমরা শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছি, আমাদের নিদ্রার সুখ, জীবনের আরাম, শিল্পচর্চ্চা, সাহিত্যসাধনা সব চলিতেছে! শিক্ষক উদাসীন, যুবক যৌবনরসে বিভোর, আইনজ্ঞ ব্যবহারশাস্ত্রের সূত্র বিশ্লেষণে ব্যস্ত, ব্যবসায়ী অর্থের অনুসন্ধানে তৎপর, কংগ্রেসকর্ম্মীরা অসহযোগ লইয়া ব্যস্ত, স্বরাজপন্থীরা লোক সংগ্রহের চেষ্টায় নিমগ্ন, কই নারীর আর্ত্তনাদে কাহারও হৃদয় গলেনা ত! জাতির অপমানে কেহ ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই! হায় হিন্দুজাতি, তোমার কুলবালারা জাতিভ্রষ্টা, ধর্ম্মবঞ্চিতা হইয়া পাপাচারীর গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে ইহা যে তোমারই ঘৃণিত চিত্র! তার সঙ্গে সঙ্গে হে হিন্দুজাতি, তুমিই যে অনন্তকাল সেই কলুষ-কারাগারে বন্দী হইয়া রহিয়াছ, সেই পাপস্পর্শ যে তোমার সমগ্র দেহ কলুষিত করিয়া রাখিয়াছ! যে পাপ তোমার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যে কলঙ্ক এবং অশুচি তোমার গায়ে লাগিয়াছে, তাহার জন্য তোমার অনন্তকাল

ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। হায় মহাত্মাজি, আপনি আমাদের লইয়া বড় আশা করিয়াছিলেন,—আমাদিগকে অহিংসার মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন—অহিংসা কি আমরা এই ভাবে শিখিলাম!

হে বঙ্গের নারী, আজ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিতেছি—এই হতভাগ্য দেশে তোমার রক্ষক নাই—তুমি কাপুরুষের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিশাচের গৃহে নীত হইতেছ। তুমি কাতরদৃষ্টিতে তোমার স্বাভাবিক রক্ষাকর্ত্তা আমাদিগের দিকে বড় আশায়, বড় ব্যাকুলতার সহিত চাহিয়াছিলে। আর কাপুরুষ আমরা, মানব নামের অযোগ্য আমরা তুচ্ছ ক্লেশভয়ে, হেয় জীবনের মমতায় তোমার আর্ত্তনাদের কারুণ্যকে এবং তোমার বেদনার গভীর বিষাদকে জড়তার অন্ধ-যবনিকার ওপারে—দৃষ্টির অগোচরে রাখিয়াছি! এই জড়-আতুর—পিশাচ-সমাকুল বিশাল শ্মশান মধ্যে তুমি আজ একা—যে তুমি এই ঘৃণিত জাতির জননী, যে তুমি শুভ্র স্নেহ-পীযূষনিঃস্যন্দিনী, বরাভয়প্রদায়িনী সম্রাজ্ঞী নারী। তোমারই নয়ন-দীপ্তিতে এই হীন দরিদ্র জাতির গৃহাঙ্গণে আলোক ফুটিয়াছে, তোমারই বীণাকণ্ঠে এই প্রেতভূমিতে ত্রিদিব-কিন্নরের সঙ্গীতধারা উৎসারিত হইয়াছে, তোমারই কোমল হস্তের কমচাতুর্য্যে এই লক্ষ্মীহীন দেশে সৌন্দর্য্যের অনাবিল তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, তোমারই ত্যাগ এবং ধর্ম্মে এই ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন অধঃপতিত প্রদেশে আজিও জীবন ধারণ করিয়া আছি—নারী, তুমি আজ অসহায়া!—

তুমি অসহায়া? না, তুমি অসহায়া নও। ভুলিয়া যাও এই বর্ব্বর জাতির সাহায্যক্ষমতা। একবার স্মরণ কর তোমার আত্মশক্তি। তুমিই না শক্তির আধার স্বরূপা?

স্মরণ কর, তোমারই কটাক্ষে এই জগতে কত দেশ কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিয়াছে! তোমারই অঙ্গুলি হেলনে কত শত বীর অবহেলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে! তোমারই সপ্রশংস দৃষ্টির জ্যোতিতে কত বীরজীবনের দীক্ষাস্নানশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে! আবার তু

নারীজীবনের শ্রেষ্ঠরত্ন রক্ষা

হাসিতে সেই সুমহান ভী

করিয়াছিলে; তুমিই পার্থিব সু

করিয়া দয়িতের উদ্দেশ্যে অন

জড়াইয়া অনন্তপথের যাত্রী হ

রণবিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত স

আবির্ভাব কল্পনা করিয়া ব্যা

পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন ক

আপনার স্বরূপ মনে করিয়া জ

একবার জাগ্রত হও

অন্তর্ভেদী বোধ-দৃষ্টিতে পাপ

উৎপাদন করিয়া ক্রূর অট্টহা

শায়িনী মহাশক্তির উদ্বোধন ক

তোমারই প্রভাবে, তোমারই

কাপুরুষতা দগ্ধ হইয়া যাউক

প্রভাবে এবং অনুশীলনে

পূজালাভ করিয়া আসিয়া

তাহার অপেক্ষায় আমরা

আছি। তুমি দেখাও যে,

লইয়া তুমি সংসার করিতে

ব্যতীত তোমার চলে,

তোমার ধর্ম্মরক্ষা চলে, তোম

নারী! এই দুর্দ্দিনে একবার

একবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া স

আকাঙ্ক্ষিত দরবারে বীর

লইয়া আহ্বান কর তাহা

আভরণের মর্য্যাদা রক্ষা করি

কর তোমার স্বামীকে, তো

আত্মজ সন্তানকে—"এস

ক্ষে পরিধান করিবে, এস।

এই অমূল্য ধনের অধিকারী সেই শুধু যে বীর।

ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার

(আয়ুর্ব্বেদীয়)

শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজে Research (গবেষণা) কথাটী খুবই শুনা যাইতেছে। কোন জাতি জাগিতে আরম্ভ করিলেই নানাদিকে নানাবিষয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হয়। উন্নতি সাধনের জন্যই এই ব্যস্ততা। কিন্তু এই জাগরণের নবীন চাঞ্চল্যকে সুপথে চালিত করিতে না পারিলেই জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হয়।

পৈত্রিক জ্ঞানভাণ্ডার-শূন্য জাতির নেতাগণের পক্ষে, পরিণাম চিন্তাপূর্ব্বক, উন্নতির পথ স্থির করা এক দুরূহ ব্যাপার। বিবিধ জ্ঞানের আদি আবিষ্কার-ভূমি ভারতের নেতাগণের কিন্তু ঐ অসুবিধা এবং অভাব নাই। কেবল বর্ত্তমান শিক্ষার দোষে আমরা পৈত্রিক জ্ঞান আলোচনায় শ্রদ্ধাহীন অবহেলায় পৈত্রিক অমূল্য ধনে বঞ্চিত বলিয়াই আজ আমরা এত শক্তিহীন।

দেশ জাগিতেছে। এ সময় ভবিষ্যৎ কর্ম্মীগণের পক্ষে সত্য জ্ঞান আলোচনা একান্ত আবশ্যক। প্রচলিত শিক্ষাবিধান প্রণালীতে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ অভাব। এই জন্য মাতৃমন্দিরের শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, পৈত্রিক জ্ঞান আলোচনায় কোন বিষয় বর্ত্তমান মতের বিরোধী হইলে, তাঁহারা যেন পুরাতন বলিয়া ঐ জ্ঞান আলোচনায় বিরত না হন। একটু ধৈর্য্যের সহিত সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের শ্রম বিফল হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের দোহাই দিয়া আমি পৈত্রিক জ্ঞান আলোচনায় কাহাকেও চক্ষু বুজিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতে অনুরোধ করিব না। সর্ব্বপ্রকার পক্ষপাতশূন্য হইয়া প্রাচীনের প্রতি কুসংস্কার ত্যাগ পূর্ব্বক পাঠক পাঠিকাগণ সত্যানুসন্ধানের হিসাবে বিষয়গুলি বিচার করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, যম-নিয়ম-পরায়ণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞান আলোচনার বিষয়গুলি কত অধিক ছিল এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার হইতে হইয়াছিল।

দুগ্ধ, ঘৃত, জল, তৈল প্রভৃতি আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন প্রথম তাহাই ক্রমশঃ লিখিত হইবে।

দুগ্ধ-বিজ্ঞান

গো, মহিষী, ছাগী, গর্দ্দভী প্রভৃতির দুগ্ধ শ্রম এবং ক্লান্তি দূর করে; ইহাদের দুগ্ধ বলকর ও মেধাজনক। দুগ্ধ নিয়মমত পান করিলে শরীর সহজে জীর্ণ হয় না; ইহা পুষ্টিকর এবং ওজঃ বর্দ্ধনকর। বমন এবং জুলাপ দ্বারা যেমন মল দূর হইয়া শরীর হাল্কা বোধ হয়, দুগ্ধ পান দ্বারাও সেইরূপ নিয়মমত কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং শ্লেষ্মাদি দূর হইয়া শরীর সুস্থ থাকে।

গাভী-দুগ্ধ—বলবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, শীতল; পানে চক্ষের রোগ জন্মায় না, রক্তপিত্ত ও বাতপিত্তজনিত রোগ নষ্ট করে।

ছাগী-দুগ্ধ—গাভী দুগ্ধের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট; শোষ রোগের বিশেষ শান্তিকর।

মহিষী-দুগ্ধ—পানে অতিশয় চক্ষু রোগ জন্মায়, নিদ্রাকর, গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক স্নিগ্ধ, হজম শক্তি কমায়।

গৰ্দ্দভী-দুগ্ধ—উষ্ণ, বলকর, হস্ত পদের বাত নষ্ট করে, রুক্ষ ও লঘু।

প্রাতঃকালের দুগ্ধ ভার ও শীতল হয়। অপরাহ্ন কালের দোহান দুগ্ধ বায়ুর অনুলোমকর, শ্রান্তি নাশক এবং চক্ষুর তেজ বৰ্দ্ধনকর। কাঁচা দুগ্ধ ভার এবং পানে চক্ষের রোগ জন্মায়। গাভীর বাঁট হইতে দোহান মাত্র ঐ গরম দুগ্ধ হিতজনক, কিন্তু ঠাণ্ডা হইলে নয়। দুগ্ধ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে লঘু হয়, সুতরাং দুগ্ধ ফুটাইয়াই গরম করিয়া পান করিবে। সকল দুগ্ধের ক্ষীরই গুরুপাক এবং পুষ্টিকর।

দুগ্ধে দুর্গন্ধ বা টকগন্ধ হইলে, বিবর্ণ হইলে, বিরস বা লবণযুক্ত হইলে এবং ছানা কাটিয়া গেলে নষ্ট হয়, তখন আর উহা পান করা উচিত নয়।

(ক্রমশঃ)

খুকুর আদর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

কোন্ স্বরগের মন্দাকিনীর
পদ্মবনের রাণী,
আমার ঘরে ছুটে এলি
হয়ে একটুখানি!
কোন্ আকাশের চাঁদের কোলে
ঘুমিয়ে ছিলি আপনা ভুলে,
কিসের গানে গেলি গ'লে,
দুখেরে সুখ গণি,
কর্‌লি আলো দীনের বুকই
দীর্ণ কুটীর জানি।
জীর্ণ হিয়ার স্তরে স্তরে
রং বুলালি তুলি ধ'রে,
ফুল ধরালি অ-ফুল গাছে
কিসের আলোক আনি,
বন্ধ মুখের দুয়ার খুলে
ছাড়িয়ে দিলি বাণী।
স্বর্গলোকের স্বর্ণ-সভার
ইন্দ্র-রাণীর দুল,
গোলকধামের কুঞ্জবনের
গান-ভরা বুল্ বুল্!
মেঘের কোলের ইন্দ্রধনু
পাগল করা শ্যামের বেণু,
চির বন্ধুর চরণ রেণু,
ফণির মাথার মণি,—
হেলে দুলে ছুটে এলি
একটুখানি প্রাণী।

ধুপ চিরে তুই রূপ ফোটালি
দুখের দুপুর মাঝে,
প্রাণ চিরে তুই গান ভরালি
তাতেই বীণা বাজে;
ছন্দ-সেরা বন্ধ পায়ে
লাস্য ভরা হাস্য নিয়ে
বেদন মাঝে রোদন চেয়ে
আশায় দিলি আনি!
বিশ্ব-সভায় স্থান মিলালি,
নিজেই ধন্য মানি।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১৭)

পৌষ মাসের বেলা। বড় শীত পড়িয়াছে। আহারাদি সমাপ্তে সেবিকা বারাণ্ডায় রৌদ্রে বসিয়া জানালা পথে যে-রৌদ্র রেখাটা গৃহের মেঝেয় পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল তাহার পানে চাহিয়াছিল। শত শত অতি ক্ষুদ্র কীট সেই ক্ষুদ্র রৌদ্র রেখাটার মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে; কখনও উড়িতে উড়িতে ছায়ায় সরিয়া গিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে, আবার কখনও ভাসিয়া ভাসিয়া আলোতে আসিতেছে।

সেবিকা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সেও তো অতি ক্ষুদ্র। ভাসিতে ভাসিতে আলো রেখাটার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আবার ভাসিতে ভাসিতে আলোরেখার বাহিরে সে চলিয়া যাইবে; সে যে আসিয়াছিল, খেলা করিয়াছিল সে দাগটুকুও থাকিবে না।

এই ক্ষুদ্র সময় মাত্র। কয়টা বৎসর, এ যে দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, ইহারই জন্য মানুষের এত কামনা বাসনা হৃদয়ে পোষণ করা কেন? চক্ষু মুদিলেই যে সব ফুরাইয়া যাইবে।

হঠাৎ নিকটে জুতার শব্দ শুনিয়া সে চাহিয়া দেখিল ললিতবাবু। তাঁহার মুখ লাল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

তিনি পড়িয়া যান দেখিয়া সেবিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "একি বাবা?"

ললিতবাবু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "বড় জ্বর আসছে মা।"

আজ তিন চার দিন আগে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। তাহার পর কয়েকদিন ভাল থাকিয়া আজ মাত্র পথ্য করিয়াছেন।

ব্যস্ত ভাবে সেবিকা বলিল "আপনার ঘরে চলুন বাবা।"

ললিতবাবু উত্তর দিলেন না। প্রবল জ্বরে তাঁহার তখন বাক্য-শক্তি ছিলনা। সেবিকা তাঁহাকে অতি কষ্টে ধরিয়া লইয়া গেল। নিজের গৃহে গিয়া তিনি বমন করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহা পরিষ্কার করিতে সেবিকা পারিল না। সে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিছানায় শুয়াইয়া দিয়া গায়ে দুই তিনটা লেপ চাপাইয়া নিজে চাপিয়া ধরিল।

হেমলতা তখন কলতলায় ছিলেন। নিজের গৃহে বমনের শব্দ শুনিয়া দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখে আয়তো ঝি, আমার ঘরে কিসের শব্দ হল?"

দাসী দরজার কাছে হইতে উঁকি দিয়া দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল "ওমা, দেখে যান মজা।

আপনার বউ-মা যে আপনার ঘরে এসেছেন। কর্ত্তাবাবু বমি করে একাকার করেছেন, সব। আপনার বাক্স টেবিল সব তাতেই বোধ হয় ছিট্‌কে লেগেছে।"

অতিরিক্ত আচারপরায়ণা হেমলতা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইলেন। এত যায়গা থাকিতে গৃহের মধ্যে বমন করা দেখিয়া রাগে তাঁহার গা জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরের ঘর হইতে বেশ আসিতে পারিল আর বমনটা বাহিরে করিতে পারিল না!

উচ্ছ্বসিত ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া তিনি বলিলেন "এ শত্রুতা সাধা বই আর কিছু নয়। আগাগোড়া কেবল আমার সঙ্গে শত্রুতা করা। আমি কি আর বুঝতে পারিনে সব? বাইরের ঘর হতে হেঁটে আসতে পারলেন আর এখান হতে একলা সরে এই বাইরে গিয়ে বমিটা করতে পারলেন না! সব তাইতে আমাকে জ্বালানো। ভাল থেকেও জ্বালাবেন, বিছানায় শুয়েও জ্বালাবেন। কবে যে আমার মরণ হবে জানিনে; মরণ হলেও বাঁচি।"

সেবিকার পানে চাহিয়া তিনি তেমনি ভাবে বলিলেন "আর তোমাকেও বলি বাছা—হাতটা ধরে বাইরে না নিয়ে যেতে পারতে, পিকদানটা তো চোখের সামনেই ছিল। কাণা নও যে অত বড় জিনিষটা সামনে থাকতে দেখতে পাবে না। তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরলেও তো পারতে।"

সেবিকা জড়সড় ভাবে বলিল "যদি বুঝতে পারতুম মা, তা হলে কখনও এমন করে বমি করতে দিতুম না। তা আপনি এত রাগ্‌ছেন, কেন মা, আবার কাঁপুনিটা একটু থামলে আমিই সব পরিষ্কার করে ফেলছি। আপনার, কি ঝির কিছু করতেও হবে না, দেখতেও হবে না।"

হেমলতা একটু নরম স্বরে বলিলেন "শীগ্‌গির করে আগে পরিষ্কার করে ফেল বাবু। এ সব জিনিসে হাইড্রোজেন গ্যাস বড় বেশী, চারদিককার বাতাসও দূষিত করে ফেলে। একে স্বামীর স্বাস্থ্য ভাল নেই, আবার এই বদ্ গ্যাস যদি শরীরে কোনও রকমে একবার যায়, তাহলে আর বাঁচতে হবে না। ওঁর কাঁপুনি তো থেমেছে। অত গুলো লেপ গায়ে আছে, আবার চেপে ধরে রাখবার দরকার কি? উঠে বাপু, আগে এটা পরিষ্কার করে দাও। ওই দেখ টেবিলের দুটো পায়াতে লেগেছে ছিট্‌কে, ওগুলো ধুয়ে দিয়ো, আর আলনার নীচের কাপড় সেমিজ গুলোতেও বোধ হয় একটু আধটু ছিট্‌কে লাগার সম্ভব, ওগুলো কলতলায় নিয়ে গিয়ে একটু আছড়ে কেচে দিয়ো। ওগুলো ঝিই কাচতে পারত, কিন্তু পরের মেয়ে, দাসীবৃত্তি করতে এসেছে বলে এ সব কি বলা যায়? আমরা যদি না থাকতুম, বাধ্য হয়ে করতেই হতো ওকে। এগুলো একটু তাড়াতাড়ি করে শেষ কর বাছা, বড্ড গন্ধ উঠছে।"

নাকে বরাবরই তাঁহার কাপড় চাপা দেওয়া ছিল, তাহা সত্ত্বেও যে তিনি কেমন করিয়া গন্ধ পাইলেন তাহা সেবিকা বুঝিতে পারিল না।

হেমলতা চলিয়া গেলেন। তখন ললিতবাবুর কম্প থামিয়াছে। তিনি ঘুমাইতেছেন ভাবিয়া সেবিকা আস্তে আস্তে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ললিতবাবু মুখের লেপ খুলিয়া ফেলিলেন। সেবিকার পানে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন "মা।"

সেবিকা তাঁহার গায়ে ভাল করিয়া লেপ চাপা দিতে দিতে বলিল "কেন বাবা?"

ললিতবাবু তেমনিই ভাবে বলিলেন "আমি যে তোমার ঘরে যাচ্ছিলুম মা, তুমি আমায় নিয়ে এলে কোথায়, কোন্ হৃদয়হীনার ঘরে? আমার ধর, আমি উঠব।"

তাঁহার চোখের পাশ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। পত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কি অতিরিক্ত জ্বরের জন্য তাহা সেবিকা বুঝিতে পারিল না। সে সযত্নে অঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল "উঠে কি করবেন বাবা?"

ললিতবাবু বলিলেন "আমায় তোমার ঘরে নিয়ে চল। এ ঘরে আমি থাকতে পারব না।"

সেবিকা ছোট শিশুকে যেমন মাতা ভুলায়, তেমনি করিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল "আচ্ছা তা, হবেখ'ন বাবা। এখন এত জ্বরে কি উঠতে পারবেন? আমিই কি আপনাকে নিয়ে যেতে পারব? হয় তো সামলাতে না পেরে আপনিও পড়বেন আমিও পড়ব। ছটা বাজুক, সন্ধ্যের দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাবখ'ন আমার ঘরে। এখন আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন. আমি ওগুলো ততক্ষণ পরিষ্কার ক'রে ফেলি। ফেলে রাখলে এখনি মা এসে আবার বকবেনখ'ন।"

ললিতবাবু আর কথা না কহিয়া আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়া দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইলেন। সেবিকা বসন পরিষ্কার করিয়া টেবিল চেয়ার ধুইয়া, আলনার সমস্ত কাপড় জামা কাচিয়া ছাদে মেলিয়া দিয়া আসিল। তাহার পর সমস্ত ঘরখানা ধুইয়া ফেলিয়া আবার শ্বশুরের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

হেমলতা আবার আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। সমস্ত ঘরখানা এক পলকে দেখিয়া লইয়া তাঁহার অদূরবর্ত্তিনী প্রতিবেশিনী সইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ সই, ব্যাপারখানা দেখ একবার। সাধে কি রাগ হয় গা, একি রাগে রাগে কাজ করা নয়? বললুম টেবিলটার পায়ায় ছিটকে লেগেছে, পায়াটা ধুয়ে দাও আর আলনার নীচের কাপড় সেমিজ কখানা ধুয়ে দাও। দেখে যাও একবার, সব টেবিল চেয়ার, সব কাপড় জামা কেচে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধে কি আর বলি গা? বলা অমনি তো আসে না, কথা অমনি তো ফোটে না, বলালেই বলতে হয়, ফোটালেই ফুটতে হয়। আহা, কি লক্ষ্মী আমার নতুন বউ-মা! সত্যি ভাই অমন বউ আর কারও হবে না। নুতুন বউ, অমন করে বকলুম, বাছার মুখে একটী রা শব্দ নেই। অসীম কি সাধে একে দেখতে পারে না, অশেষ গুণ যে, দেখতে পারবে কি করে?"

সেবিকার পানে বিষদৃষ্টি হানিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ললিতবাবু নীরবে শুনিতেছিলেন। স্ত্রী চলিয়া গেলে মুখের লেপটা সরাইয়া বলিলেন "চলে গেছে?"

সেবিকা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলি "হ্যা।"

তাহার মলিন মুখের পানে চাহিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ললিতবাবু বলিলেন "দুঃখ করো না মা, ওরা আমার অবর্ত্তমানে তোমায় এক মুঠো ভাতও দেবে না তা আমি জানতে পারছি। দুঃখ কি মা? আমি তোমায় রাজরাণী করে যাব। এমন করে যাব যে, তোমার দয়ার দানের জন্যে ওদের মাথা নোয়াতে হবে তোমার কাছে। আমি আগে ভুল বুঝেছিলুম তাই নিজের জিনিস ওদের ছেড়ে দিয়ে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিলুম। ভুল ভেঙ্গেছে মা, আমি আবার আমার জিনিস ফিরিয়ে নিলুম। এ আমারই ঘর, এ আমারই জিনিস, এর মানুষগুলোই কেবল আমার আপন নামে পরিচিত হয়ে পর। কিন্তু এবার দেখবে তুমি, তারা আমার কাছে মাথা নোয়াতে আসবে কারণ সম্পত্তির লোভ আছে। এখনও সব আমার নামে আছে। আমি দেখি ব্যাপার কতদূর দাঁড়ায়। পরশু দুপুর পর্য্যন্ত দেখব, তারপরে আমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব।"

অসীম কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিল। ভৃত্য জানাইল কর্ত্তাবাবুর আজ খুব জ্বর, অচেতন অবস্থায় তিনি পড়িয়া আছেন।

সেদিন দীপালির পত্রখানা কোর্টে অসীম পাইয়াছে। তাহার উত্তর লিখিবার জন্য সে তখন ব্যগ্র। নানা কথায় বুকটা তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। ভৃত্যের কথায় 'কর্ত্তব্যজ্ঞানটা' জাগিয়া উঠিল মাত্র কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে দীপালির উচ্ছ্বাসমাখা পত্র খানা বুকপকেটে খড় খড় করিয়া উঠিল, অসীমের প্রাণটা সেই দিকে ছুটিয়া গেল। সে ভাবিল এখন পিতার নিকট গেলেই দেরী হইয়া যাইবে। রোগের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয়ের এ উৎসাহ ভাবটা চলিয়া যাইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া দীপালিকে পত্র লিখিবার উপযুক্ত কথা সে আর খুঁজিয়া পাইবে না। আগে হৃদয়ের ভাবাগুলা

কাগজে ফুটাইয়া তাহার পর পিতার নিকট গেলেই চলিবে।

সে পোষাকটা ছাড়িয়াই পত্র লিখিতে বসিল। ভৃত্য আসিয়া সেখানেই চা ও খাবার দিয়া গেল।

পত্র লেখা আর শেষ হয় না, কারণ কোন খানাতেই সে নিজের ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই, কাজেই সব গুলাই ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। এমনি করিয়া প্রায় পাঁচ সাতখানা পত্র ছিঁড়িয়া সে একখানা পত্র চলনসই করিয়া দাঁড় করাইল।

তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, আহারের ডাক পড়িয়াছে। আহার শেষ হইলে সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল পিতা নিদ্রা যাইতেছেন।

কাল তাঁহাকে দেখিলেই চলিবে ভাবিয়া অসীম আবার নিজের গৃহে চলিয়া গেল।

হেমলতা আহারান্তে নিজের গৃহে গিয়া দেখিলেন সেবিকা ললিতবাবুর মাথায় বাতাস করিতেছে।

তিনি বলিলেন "জ্বরটা কি সমানই আছে?"

সেবিকা বলিল "সামান্য একটু কমেছে। দুপুরে থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখেছিলুম তাপ পাঁচ ডিগ্রী ছাড়িয়ে উঠেছিল। এখন দেখছি চার ডিগ্রিতে নেমেছে। বড় বকছেন বলে মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস দিচ্ছি।"

হেমলতা অগ্রসর হইয়া স্বামীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন। তাহার পর সেবিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "এই রাত দুপুরে মাথায় ঠাণ্ডা জলপটি দিতে কে তোমায় বলে দিলে? দেখছি ওঁর শক্ত ব্যায়াম না করিয়ে ছাড়বে না তুমি, নিজেই ডাক্তার হতে চাও অথচ অপকার উপকার কিছুই বোঝ না। তুলে ফেল বলেছি ওটা।"

সেবিকা সভয়ে বলিল "উনিই যে রাখলেন দিতে।"

মুখ বিকৃত করিয়া হেমলতা বলিলেন "রোগী যদি বলে আমি তেঁতুল খাব, তাই দেবে তুমি? রোগীর কথা কানে নিতে গেলে চলে না। সে যা হয় বুঝব আমি পরে, তুমি আগে ওটা তুলে ফেল।"

সেবিকা জলপটি নীরবে তুলিয়া ফেলিল। বলিল "কাউকে বলে দিন না মা ডাক্তারকে ডেকে দিতে। এই পাশেই মাধব ডাক্তার থাকেন, একবার ডাকলেই এখনি আসবেনখ'ন। সেই দুপুরে জ্বর এসেছে, প্রায় সমানই রয়েছে। অন্য সময় যে জ্বর হয়, তা এতক্ষণ তো থাকে না।"

হেমলতা বলিলেন "ওগো অত ভয় পেতে গেলে চলে না। প্রথম দিনের জ্বরেই যদি ডাক্তার আসে, তা হলে তো রক্ষে নেই। এখনি মটু করে ছটি টাকা ভিজিট দিতে হবে। দেখা যাকনা দুদিন। ডাক্তারও পালাচ্ছে না, রোগীও পালাচ্ছে না।"

সেবিকা তাঁহার টাকার প্রতি অসীম মমতা দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

হেমলতা গম্ভীর ভাবে খানিক দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর আপন মনেই বলিলেন "কোথায় যে শুই তাই ভেবে পাচ্ছিনে। গরমকাল হলেও না হয় মেঝেয় একটা মাদুর পেতে পড়ে থাকতে পারতুম। এই শীতের দিনে-

সেবিকা অন্য ধারে তাঁহার নিয়ামত বিছানাটা দেখাইয়া বলিল "ওই তো আপনার বিছানা রয়েছে, ওখানেই শোন-না মা।'

হেমলতা বলিলেন "আর তুমি?"

সেবিকা বলিল "আমি আমার ঘরে যাই।"

হেমলতা সশঙ্কিত ভাবে বলিলেন "ও বাবা, তবেই আমি গেছি। সারা রাত রোগীর সেবা করা আমার দ্বারা হবে না বাপু। আমি তোমার ঘরে গিয়ে শুচ্ছি। তুমি এখানে থাক; ঘুম এলে আমার বিছানায় শুয়ো বলে যাচ্ছি।"

সেবিকা বলিল "বাবা যে রকম ছটফট করছেন তাতে সারা রাতি আমায় বসেই থাকতে হবে। আপনি ওই বিছানাটায় শুয়ে ঘুমান না কেন মা?"

হেমলতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না, বাছা, ঘুম না হলে কাল আবার জ্বর এসে পড়বে। রোগীর

ঘরে থাকলে কি ঘুম হয়? আর তুমিই তো রয়েছ আমার থাকবার বিশেষ দরকারও নেই। তুমি যদি না থাকতে, বাধ্য হয়ে আমাকেই সব করতে হত।"

তিনি দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ললিতবাবু যে জাগিয়া স্ত্রীর কথা শুনিতেছেন তাহা সেবিকা জানিতে পারে নাই। হেমলতা বলিয়া যাইতেই তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন "তুমি কার; কে তোমার, কারে বলরে আপন?"

সেবিকা সভয়ে ডাকিল "বাবা।"

সে ভাবিয়াছিল তিনি বুঝি আবার ভুল বকিতেছেন।

ললিতবাবু চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন "ঘুমাইনি মা, সব শুনেছি। এইতো সংসার—এরই মোহে ভুলে রয়েছি আমরা। ওই দেখ উপযুক্ত ছেলে, যার উপরে কত আশা ভরসা ন্যস্ত করেছিলুম, আজ সে একবারও চোখের দেখা দেখতে এল না। দুপুর বেলা ঘরে বমি করে ফেলেছি তাতে স্ত্রীর কাছে কত কথা শুনলুম। আমি যে বুকের রক্ত জল করে টাকা করেছি, সে অথচ ওঁদেরই জন্যে। এই তো সংসার মা, কে কার বল দেখি? সবাই চায় অর্থ, আর কিছু নয়। এরই জন্যে ওদের মায়া মমতা। এইযে এখন এসেছিল, কখনও আসতনা যদি না এখনও বিষয় সম্পত্তি আমার নিজের নামে না থাকত। সব বুঝেছি। যদি তুমি না থাকতে, কি হতো আমার আমি তাই ভাবছি। তুমি এক কাজ করতে পারবে মা?"

সেবিকা উৎসুক ভাবে বলিল "কি বাবা?"

ললিতবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কাল সকালেই রামলালকে লুকিয়ে একবার সরিতের কাছে পাঠাতে পারবে—তাকে ডেকে আনবার জন্যে?"

সেবিকার মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল। অসীম যে তাহাকে ও সরিতকে সন্দেহ করিয়াছে এ কথাটা তাহার মনে হইল। সে সরিতের নাম পর্য্যন্ত আর মুখে আনিত না। সরিতের কথা যেখানে উঠিত সেস্থান তাড়াতাড়ি ত্যাগ করিত। তাহার মনে হইত স্বামী যখন তাহাকে সন্দেহ করিতে পরিলেন তখন অন্য লোকেও নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবে। অন্য লোকে তো কলঙ্ক দিতে পারিলেই বাঁচে, তাহারা তো তাহাই প্রর্থেনা করে।

সেবিকা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল "না বাবা, আমি তা পারব না।"

ললিতবাবু স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন "তুমি তাই ভাবছ মা যে অসীমের কথা আমি বিশ্বাস করেছি? এটা তুমি ঠিক জেনো, সবাই যদি তোমার বিপক্ষে দাঁড়ায়, আমি তোমার পক্ষে থাকবই। আমি জানি তুমি স্বয়ং শক্তি, তোমাকে কি কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারে মা? যারা ভুল ধারণা করেছে তারাও বুঝবে একদিন তুমি কে? একদিন তারাও তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে তাদের অন্যায় সন্দেহ করার জন্যে। সংসারে থাকলে অনেক বিপদ সহ্য করতে হয় মা। তা বলে কি ভেঙ্গে পড়বে? তুমি দাঁড়াও,—আমি বলছি তুমি দাঁড়াও। আমি সরিতকে ডাকাবো, আমার সামনে তোমাকে তার সঙ্গে আবার তেমনি বোনের মত কথা বলতে হবে। সঙ্কোচ কেন মা? ভয় কাকে? এগিয়ে যেতে হবে যে তোমায়। অনেক কাজের ভার তোমার মাথায় পড়বে যে, লজ্জা সঙ্কোচ সব তোমায় বিসর্জ্জন দিতে হবে। পারবে না তুমি সরিতের সামনে দাঁড়াতে, তার সঙ্গে কথা বলতে?"

স্থির কণ্ঠে সেবিকা বলিল "পারব বাবা; আপনার আশীর্ব্বাদে সব পারব।"

কম্পিত হস্ত তাহার মাথায় দিয়া কম্পিত কণ্ঠে ললিতবাবু বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদ সফল হবে মা—সফল হবে। আমি তোমার মাথায় আমার

সব বোঝা চাপিয়ে যাব, সরিতকে তোমার সহকারী রেখে যাব। আমার অন্ধ পুত্র, অন্ধ স্ত্রী দেখবে আমার বৃদ্ধ নয়নের দৃষ্টি সব দেখতে পায় কি না পায়! তুমি যেন ভেঙে প'ড়না, তুমি যেন ভয় পেয়ো না—আমি তাই চাই। তার স্ত্রী বলেই সে তোমায় এতদূর অবহেলা করেছে, তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আর একজনকে সাজিয়েছে। আমি তার বাপ হয়ে তোমাকেই তুলে নেব, আমার যা আছে তাই দিয়ে তোমাকেই সাজাব। দেবার ঘৃণিতা বলে যাকে তারা দূরে ফেলেছে আমি তাকে দেবী রূপেই বরণ করে তুলে নিয়েছি।

(ক্রমশঃ)

শরতের প্রথম আলো

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

প্রথম যেদিন ভারতী পত্রিকায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাক্ষরিত "বড়দিদি" শীর্ষক একটি চমৎকার গল্প বেরিয়েছিল সেদিন বাংলা দেশের পাঠকেরা কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি যে এদেশে রবীন্দ্রনাথের পর আবার আর একজন এত বড় প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে! নিঃস্ব যে সে তার শূন্য কক্ষতলে হঠাৎ একদিন কোনও অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেলে যেমন আশ্চর্য্য হয়ে যায় এদেশের লোকও সেদিন "বড়দিদি" পড়ে তার চেয়ে বড় কম আশ্চর্য্য হয়নি। সেই জন্যই বোধ হয় তারা সেদিন তাদের এ সৌভাগ্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে সাহস করেনি। সেদিন বিনা তর্কে বিনা দ্বিধায় সকলেই স্থির করে নিয়েছিলেন যে বড়দিদির মত এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গল্পটি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর কলম হ'তে নিঃসৃত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব এ গল্পটি যে নিশ্চয় তিনিই বেনামীতে চালিয়েছেন এ বিষয়ে তাঁরা যেমন নিঃসন্দেহ ছিলেন, তেমনিই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কোনও ব্যক্তির অস্তিত্বই যে নেই এ সম্বন্ধেও তাঁরা একেবারে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। "বড়দিদি" প্রকাশ হবার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কোনও গল্প ভারতী বা অন্য কোনও মাসিক বা সাময়িক পত্রে প্রকাশ না হওয়াতে পাঠকদের মনে পূর্ব্বোক্ত ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গেছ্‌ল। আর তারই ফলে "বড়দিদি" গল্পটিতে রচনার বৈশিষ্ঠ্য, পারিপাঠ্য ও অসাধারণত্ব যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও লেখকের নামটা মনে ক'রে রাখা কেউই প্রয়োজন বোধ করেন নি। কেবল জনকতক মেধাবী পাঠক যাঁরা "কুন্তলীন-পুরস্কার" গল্পগুলিও নিয়মিত পড়্‌তেন তাঁদের মনেই শুধু একটা খট্‌কা লেগেছিল যে কুন্তলীন পুরস্কারে "মন্দির" শীর্ষক যে গল্পটি "প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত" বলে মুখপাতেই ছাপা হয়েছিল তার লেখকের সঙ্গে "বড়দিদির" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হয়ত কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু সংশয় ও সন্দেহ তাঁদের সে ধারণাটাকে মোটেই স্থায়ী হ'তে দেয়নি। সুতরাং যদি কেউ বলেন যে "মন্দির" বা "বড়দিদির" ভিতর দিয়েই বাংলার পাঠকদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তাহ'লে সেটা বোধ হয় ঠিক বলা হবে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম নয় এবং ওই নামেই সত্যই যে বাংলাদেশে আর একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক আবির্ভূত হয়েছেন একথা এদেশের লোক সর্ব্বপ্রথম নিঃসন্দেহরূপে বুঝ্‌তে পেরেছিল—যে সময় সহরের

একখানি ক্ষুদ্র মাসিকপত্র 'যমুনায়' "রামের সুমতি" শীর্ষক একটি গল্প 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাক্ষরিত হ'য়ে প্রকাশ হ'য়েছিল। সেদিন এদেশের পাঠকেরা সেই গল্পটি প'ড়ে বিমুগ্ধ, বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল কে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?—বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব, এমন অপ্রমেয়, এমন অমৃত-মধুর স্নেহরসধারার সৃষ্টি ত ইতিপূর্ব্বে আর কেউ করতে পারেনি, এ যেন এদেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটা দুর্লভ নূতন সম্পদ, একটা আকাঙ্ক্ষিত নূতন ঐশ্বর্য্য দান করলে! এদেশের সাহিত্যিক সমাজকে তাই "রামের সুমতি" সেদিন সকলের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যান্বিত করে তুলেছিল। কে এই অসাধারণ কথাশিল্পী?—এই জিজ্ঞাসার চিহ্ন তাঁদেরও অনেকের কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

এমন শক্তিমান, এমন সুনিপুণ লেখকটি কোথায় কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে এতদিন সঙ্গোপনে বসে তদ্গতচিত্তে বাণীর সাধনা করেছিল, আজ একেবারে তপঃসিদ্ধ হয়ে, বাগ্দেবীর আশীষ টিকা ললাটে ধারণ করে, দিগ্বিজয়ী বীরের মতো এসে আবির্ভূত হ'ল। এ যেন সেই 'He came, He saw and He conquered"!—এই ধরণের কত কি চিন্তা, আলোচনা ও প্রশ্ন সেদিন অনেক বৈঠক ও মজলিসকেই চঞ্চল ও ব্যগ্র করে তুলেছিল।

'যমুনা' একখানি সামান্য মাসিক পত্র বলে তার পাঠক সংখ্যা তখন খুব বেশী ছিল না, তবু যে ক'জন ছিল তারা "রামের সুমতি" পড়েই এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে তাদের পরিচিত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সকলকেই তারা ওই গল্পটী পড়তে অনুরোধ করেছিল। "রামের সুমতি" পড়বার জন্য স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে নিজে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় ও ভক্তদের অনুরোধ করতে আমি শুনেছি। দ্বিজেন্দ্রলালকে "রামের সুমতির" সন্ধান দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের অকৃত্রিম বন্ধু ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ 'মিশরমণি' প্রণেতা স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য। এঁর কাছ থেকে 'যমুনা' পত্রিকা চেয়ে নিয়ে যে অনেক লোক "রামের সুমতি" পড়েছিল একথা আমি ভালরকমই জানি কারণ আমিও তাদেরই মধ্যে একজন।

এমনি করে বিদ্যুৎগতিতে "রামের সুমতির" মতো একটী ছোট গল্প শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে 'যমুনা' কাগজ খানিকেও বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে সুপরিচিত করে দিয়েছিল। তারপর একে একে যখন তাঁর "বিন্দুর ছেলে", "চন্দ্রনাথ", "পথনির্দ্দেশ", "আঁধারে আলো", "পণ্ডিত মশাই", "বিলাসী" প্রভৃতি বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য মণিতুল্য গল্পগুলি প্রকাশ হ'তে লাগল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন বাংলা দেশের হৃদয় সম্পূর্ণ জয় করে ফেলেছেন। তাই বোধ হয় শ্রীমতী অনিলা দেবী এই ছদ্মনাম নিয়ে তিনি "নারীর মূল্য" শীর্ষক যে অতুলনীয় প্রবন্ধ ও "আলোছায়া" প্রভৃতি গল্প লিখেছিলেন তাতে তাঁর আত্মগোপন করবার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মবেশ অবিলম্বে সকলে ধরে ফেলেছিল।

কয়েকটি ছোট ও বড় গল্প প্রকাশ হবার পরই তাঁর "চরিত্রহীন" উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে 'যমুনায়' প্রকাশ হ'তে সুরু হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উপন্যাস খানি সম্পূর্ণ হবার আগেই 'যমুনা' পত্রিকার প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছল। তারপর বহু-দিন পরে "চরিত্রহীন" একেবারে প্রকাশ হয়েছিল। "চরিত্রহীন" পুস্তকাকারে প্রকাশ হবার পূর্ব্বে যদিও "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "বিরাজ বউ" "পল্লীসমাজ" প্রভৃতি উপন্যাস বেরিয়েছিল কিন্তু বলতে হ'লে বোধ হয় "চরিত্রহীন"কেই তাঁর সর্ব্ব-প্রথম উপন্যাস বলতে হবে।

যমুনায় "চরিত্রহীন" প্রকাশ হবার বহু পূর্ব্বে আমি "চরিত্রহীনের" পাণ্ডুলিপি অনেকখানি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেম। তখন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

সম্পাদকতায় "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্র প্রকাশের আয়োজন চলছিল। "চরিত্রহীন" প্রথমে ভারতবর্ষে প্রকাশের জন্যই এসেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সময় ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যে দুর্নীতির আতঙ্ক এমনিই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তিনি আমাদের সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে "চরিত্রহীন" ভারতবর্ষে প্রকাশ করতে অসম্মত হলেন। কিন্তু তথাপি আমরা তাঁকে অনেকবার "চরিত্রহীনের" ভূয়সী প্রশংসা ক'রতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন "চরিত্রহীন প্রকাশের প্রধান বাধা হচ্ছে ওই সাবিত্রী। মেসের একটা ঝীকে নিয়ে যদি না এই সুন্দর উপন্যাস খানি আরম্ভ হ'তো তাহ'লে বোধ হয় আমি এখনো ছাপবার লোভ সামলাতে পারতুম না।" আমরা তাঁকে যদিও বলেছিলেম যে মেসের ঝী হ'লেও চরিত্রহীনের সাবিত্রী আমাদের পুরাণোক্ত সাবিত্রীসত্যবান আখ্যায়িকার সাবিত্রীচরিত্র অপেক্ষা কোনও অংশে কম গরীয়সী নয় কিন্তু তাতেও তাঁর মত বদলাতে পারিনি। দুর্নীতির আশঙ্কাই সেদিন তাঁর কাছে সকল যুক্তির চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ধরতে গেলে "চরিত্রহীন"ও ঠিক শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়। কারণ "চরিত্রহীন" লেখবার অনেক আগে তিনি "কাশীনাথ" রচনা করেছিলেন এবং এই "কাশীনাথ" বইখানি "সাহিত্য" সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের কাছে অনেকদিন ধরে অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়েছিল, হয়ত বা নূতন লেখক বলে অমনোনীত হয়েই পড়ে ছিল। কিন্তু যেদিন শরতের প্রথম আলো এক স্মরণীয় পুণ্য প্রভাতে বাংলার সাহিত্য জগতকে দীপ্ত করে তুললে এবং বাঙালা পাঠকেরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠে সকলে কাড়াকাড়ি করে তাঁর লেখা পড়তে সুরু করে দিলে এবং দেখতে দেখতে যমুনার মত কাগজেরও গ্রাহক সংখ্যা যখন দু'শ থেকে একেবারে দু'হাজারে গিয়ে উঠল তখন স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়ও তৎপর হ'য়ে তাঁর পুরাতন ফাইল ঘেঁটে "কাশীনাথ"কে টেনে বার করে এনে অবিলম্বে "সাহিত্যে" প্রকাশ করে ফেললেন।

এইভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শরৎপ্রতিভা শরতের প্রভাত সূর্য্যের মতোই সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং বাংলাসাহিত্যকে শরতের সোনার আলোর মতই উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করে তুললে!

বাংলার কথাসাহিত্যের আদি গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দূর হ'তে প্রণাম ক'রে শরৎপ্রতিভা প্রথম থেকেই রবিরথচক্র রেখার অনুসরণ ক'রেই চলতে আরম্ভ করেছিল বটে কিন্তু একথা এখন বড় গলা ক'রে বলা চলে যে, তাঁর এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি সে রথখানিকেও পশ্চাতে ফেলে আজ অনেকখানি অগ্রসর হয়ে এসেছেন।

তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের প্রভাত, আমাদের সন্ধ্যা, আমাদেরই নিশীথ ও মধ্যাহ্ন যেন অবলীলাক্রমে আসা যাওয়া করছে দেখতে পাই। পৌষের প্রখর শীত, রুদ্র বৈশাখের নিদাঘ তাপ, বসন্তের দখিণ বাতাস, হেমন্তের শিশির স্নিগ্ধ মাধুরী কিম্বা আষাঢ়ের নিবিড় বারিধারা যেন জীবন্ত রূপ ধরে এসে আমাদের প্রাণে তাদের চকিত পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়! এই দক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকা "কাশীনাথ" ও "চরিত্রহীন" থেকে সুরু করে তাঁর "বিরাজবউ", "পল্লীসমাজ", "শ্রীকান্ত," "দেবদাস", "দত্তা", "গৃহদাহ", "বামুনের মেয়ে", "দেনাপাওনা", "পথের দাবী" প্রভৃতি যে ক'খানি অতুলনীয় ছবি আমাদের চক্ষের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে ও তুলছে সেগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যেরই গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু বা আদর্শস্থানীয় নয়, বিশ্বসাহিত্যের কমলবনেও তাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সুরু হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এতগুলি নূতন ধরণের ও উচ্চ অঙ্গের সামাজিক উপন্যাস রচনা করা যে কত বড় দুরূহ কাজ সে কেবল তাঁরাই জানেন যাঁরা কোনও দিন এরস পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন এবং এ সৃষ্টির করবার নব নব উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন। যে দেশের কোনও জীবন নেই, যে

দেশের জীবনে কোনও বৈচিত্র নেই, যে দেশের সমাজের অর্দ্ধাংশের উপর লোক অবরোধের মধ্যে চির শৃঙ্খলবদ্ধ, যে দেশের বিবাহ দোকানদারী কেনাবেচার সামিল, যে দেশের মেয়েরা প্রায় ভূমিষ্ঠ হবামাত্র স্বতিকাগারেই পরিণীতা হন, যে দেশের বালবিধবারাও কঠোর ব্রহ্মচারিণী, যে দেশের নারীদের কাছে তাদের অতি অযোগ্য স্বামীও ইষ্টদেবতাস্থানীয়—সেইখানে, সেই অসাড়, নির্জ্জীব, পাষাণ-শীতল জড়পিণ্ড স্তূপের মধ্যে বসে শরৎচন্দ্রের মতো সজীব সাহিত্য সৃষ্টি করার যে কৃতিত্ব, তা ওই শূন্য ব্যোমে বসে প্রজাপতির ভূমণ্ডল সৃষ্টি করার চেয়ে কোনও অংশে ত কম বলে মনে হয় না।

নিতান্ত গরীবের ঘরের অবিবাহিতা বয়স্থা কুমারী ভিন্ন এদেশের লেখকদের উপন্যাসের জন্য অন্য কোনও নায়িকা খুঁজে নেওয়া যেন একেবারে নিষেধ। হিন্দু বালবিধবাকে ত স্পর্শ করবারও হুকুম নেই কারণ তা'হলে নাকি হিন্দুধর্ম্ম আর ত থাকবেই না, উপরন্তু সমাজে নাকি ঘোরতর দুর্নীতি প্রবেশেরও প্রবল আশঙ্কা আছে। তাই কোনও স্বাধীনচেতা লেখক আর্টের খাতিরে তার ব্যাতিক্রম করলেই অমনি 'ধর্ম্মপ্রাণ' হিন্দু সমালোচকবর্গ Regulation লাঠি নিয়ে তাঁকে তেড়ে এসে আক্রমণ করেন। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করবার জন্য তাঁরা অনায়াসে নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রেও রাত্রি জেগে বড় বড় নীতি উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখে অজীর্ণতার পরিচয় দিয়ে ফেলেন।

এখানে বিবাহিতা নারীর পক্ষে পতি ভিন্ন অপর কোনও পরপুরুষের প্রতি একবার চেয়ে দেখা পর্য্যন্ত পাপ, সুতরাং অপর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভালবেসে ফেলা যে তার পক্ষে কত বড় একটা গর্হিত কার্য্য, কত বড় সমাজদ্রোহিতা ও অধর্ম্মের কার্য্য সে কথা বলাই বাহুল্য। এ দেশের নরনারীর জীবন ও চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে যাওয়া একটা অতি বড় দুঃসাহসিকতার কাজ! নিতান্ত গোঁয়ারগোবিন্দ ও মরিয়া গোছের লিখিয়ে নাহ'লে তাঁর পক্ষে নূতন কিছু করা একেবারেই অসম্ভব, কারণ এদেশের সাহিত্য সাধনার পথটা যে শুধু দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ তাই নয়, বিশেষ বিপদসঙ্কুলও বটে।

রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় কিন্তু পারে না, তেমনি আমাদের শরৎচন্দ্রকেও গ্রাস করবার জন্য অনেক প্রাচীন ও নবীন রাহুই মুখ-ব্যাদান করেছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সফল হ'তে পারেননি। আপন অসামান্য প্রতিভা-শক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে এদেশের সাহিত্য-জগতের সেই সঙ্কীর্ণ অবস্থার বাইরে বেরিয়ে এসে সবগুলি অন্যায় গণ্ডীর সীমাকে লঙ্ঘন করে শরৎচন্দ্র আজ নব নব প্রসর পথের সন্ধান পূর্ব্বক তাঁর সাহিত্য-রথখানিকে সুপরিচালিত করে বিজয়োল্লাসে অগ্রসর হ'য়ে চলেছেন।

অতি সূক্ষ্মতম মনস্তত্ত্বের প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে, বিচিত্র মানবচরিত্রের বিপুল অভিজ্ঞতায়, গুহা-নিহিত স্ত্রীচরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে, যৌন সম্বন্ধের সুসঙ্গত বিচারে তিনি যে অসাধারণ শক্তি ও নিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, এদেশের কিশোর সাহিত্য ক্ষেত্রে যে তা একেবারে অতুলনীয় ও দুর্লভ একথা এখন অনেকেই স্বীকার করছেন।

সহরের বস্তির ও গাঁয়ের সীমানার অধিবাসী দীন দরিদ্র মুটেমজুর চাষাভুষো ইতর অন্ত্যজদের অন্তর-বাহিরের কথা ও তাদের জীবনযাত্রার জলন্ত চিত্র অঙ্কণে সিদ্ধহস্ত অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী রুষমনীষি ম্যাক্সিম্ গোর্কীর মতো শরৎচন্দ্রও আজ বাংলার সাহিত্যমন্দিরে দেশের সেই অবহেলার, অশ্রদ্ধার পাত্র, অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের জীবনযাত্রার করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী চিত্রের উদ্ঘাটন করে দিয়ে এখানে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কোনও চরিত্রটাই অসম্ভব, কাল্পনিক বা "আর্টিষ্ট মডেল" বলে মনে হয় না। তারা কেউই

সাধারণ উপন্যাসের নায়কনায়িকার মতো Romantic নয়, Hysteric নয় এবং নীতিগ্রন্থের আদর্শ চরিত্রও নয়। তারা সবাই সত্যকার মানুষ, সবাই রক্তে মাংসে গড়া সজীব নরনারী। তাদের চলাফেরা, বসা-দাঁড়ানো, তাদের লক্ষ্য, তাদের মতি, তাদের উদ্দেশ্য, তাদের কাজ সমস্তই সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে আমরা আমাদের অপরিচিত ও সুপরিচিত অনেকেরই মুখ দেখতে পাই। তাদের দেখে, তাদের চিনতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠি এবং গ্রন্থকারের প্রতি একটা অসীম কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে ওঠে। যে বাস্তব রচনায় কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের প্রধান বিশেষত্ব তাহাই আজ বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারের এক নূতন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছে, তার একটা প্রকাণ্ড অভাব পূর্ণ করে দিয়ে তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সমান আসন পাবার যোগ্য করে তুলেছে। তাঁর এই দান তাঁকে আমাদের দেশে অমর করে রাখবে বলে মনে হয়।

শিশুচিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন

শিশুর রোগ জ্ঞানের উপায় :—

শিশুরা কথা কহিয়া তাহার কি অসুখ করিতেছে তাহা বলিতে পারে না। শিশুর কোন অসুখ করিলে—রোগের লক্ষণ সকল বিশেষ অনুধাবন করিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করিতে হইবে। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদি কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় অথবা পেট কামড়ায় তাহা হইলে শিশু সেই সকল স্থানে বারংবার হাত দিয়া থাকে ও কাঁদিতে থাকে। এতৎ অবস্থায় ঐ সকল স্থানে বা পেটে হাত বুলাইয়া দিলে শিশু সুস্থ বোধ করে—আর কাঁদে না। মাথায় কোন অসুখ হইলে শিশু মধ্যে মধ্যে চম্‌কাইয়া উঠে ও চিৎকার করিতে থাকে অথবা তন্দ্রার মত চোখ বুজিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে,—মাথা তুলিতে পারে না। শিশুর তলপেটে কোন যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকে না,—কিছুই খাইতে চাহে না। শিশুর মলমূত্র বন্ধ হইলে পেটের মধ্যে যন্ত্রণা হয়,—সর্ব্বদা ছটফট করিতে থাকে ও কাঁদিতে থাকে এবং বমি, পেটফাঁপা, পেটে শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।

শিশুর চিকিৎসা :—

শিশুর অসুখ হইলে সর্ব্বপ্রথমে স্তন্যদাত্রী জননীর বা ধাত্রীর সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই জন্য অনেক সময় শিশুর রোগ আরোগ্যের জন্য জননী বা ধাত্রীর ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হয় এবং উপবাস করিতে হয়। যে সকল শিশু কেবল মাত্র স্তনদুগ্ধে জীবিত থাকে, তাহার কঠিন অসুখ হইলে তাহাকে কদাচ স্তনদুগ্ধ পান করিতে দিতে নাই। শিশুর রোগ আরোগ্যের জন্য জননীকেও রোগিণী সাজিতে হয়—তাহা না হইলে শিশু শীঘ্র আরাম হইতে পারে না। নিম্নে আমরা শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ ব্যবস্থা প্রদান করিলাম।

শিশুর চোখ-উঠা :—

প্রসবের পর অথবা কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা বা ধোঁয়া লাগিয়া অনেক সময় শিশুর চোখ উঠিতে

দেখা যায়। চোখ উঠিলে শিশু চক্ষু চুলকায়, চোখ ফোলে, পিচুটী কাটে, চোখ দিয়া জল পড়ে; শিশু কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের দিকে তাকাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে 'কুকূণক রোগ' বলে।

চিকিৎসা :—(১) হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকটী এক একটী লইয়া আঁটি বাদ দিয়া এক ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে। দুই ঘণ্টা পরে উহা বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল দ্বারা শিশুর চক্ষু দুইটী ভাল করিয়া আস্তে আস্তে ধুইয়া দিবে এবং জলে এক রতি ফিট্‌কারী মিশ্রিত করিয়া একটী শিশিতে রাখিয়া দিবে, মধ্যে মধ্যে এই জল তিন চারি ফোঁটা শিশুর চক্ষুর ভিতরে দিবে। এতদ্ভিন্ন মনসা সিজের পাতার কাজল করিয়া শিশুকে পরাইয়া দিবে ও রক্তচন্দন ঘষিয়া শিশুর চক্ষুর উপর চারিদিকে প্রলেপ দিবে।

(২) ছাগ দুগ্ধের সহিত দারু হরিদ্রা, মুতা ও গিরিমাটী পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে।

(৩) চোখ বেশী ফোলা দেখিলে—একখানি আলতা স্তনদুগ্ধে ভিজাইয়া প্রদীপের শিখায় গরম করিয়া আস্তে আস্তে চোখের উপর স্বেদ দিবে।

এই রকম ব্যবস্থায় বিশেষ ফল না দর্শিলে উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবে। কারণ তা না হইলে চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

শিশুর মূত্রকৃচ্ছতা :-

সদ্যোজাত শিশু ঘন ঘন প্রস্রাব করিয়া থাকে। শিশু যদি প্রস্রাব না করে বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করে তাহা হইলে শিশুর মূত্রকৃচ্ছতা রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রস্রাব রোধ হইলে শিশুর পেট ফাঁপে, তলপেটে যন্ত্রণা বোধ হয়, শিশু ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, পা দুইটা পেটের নিকট লইয়া যায় এবং সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে। এই কারণে শিশুর জ্বরবোধও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—(১) শিশুর মূত্রাশয়ে মূত্র জমিয়া রহিয়াছে অথচ প্রস্রাব হইতেছে না দেখিলে এক টুকরা গরম কাপড় গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া শিশুর তলপেটে সেঁক দিবে। কিছুক্ষণ সেঁক দিলে প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

(২) ইহাতে যদি প্রস্রাব না হয় তাহা হইলে একটী গামলায় শিশুর সহ্যমত ঈষৎ উষ্ণ জলে শিশুর কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে। ইহাতে প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য :—

সদ্যোজাত শিশুর দিনের মধ্যে সাধারণতঃ ৬।৭ বার দাস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুর যদি দিনান্তে একবার কি দুইবার বা একদিন কি দুইদিন অন্তর দাস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। তাহা না করিলে শিশুর নানা রকম রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—প্রথমে শিশুর জননী বা ধাত্রীর আহারাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শিশুর জননীর বা ধাত্রীর যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহা করা আবশ্যক। দুগ্ধের সহিত একটু সর গুলিয়া খাওয়াইবে। সত্বঃ দাস্তপরিষ্কারের জন্য পানের বোঁটা বা একটুখানি নরম সাবান সরু করিয়া লইয়া শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। তবে ইহা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কদাচ করা উচিত নহে।

অনেক সময় যকৃতের ক্রিয়া ভাল না হওয়ায় শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য হইয়া থাকে। সেইরূপ হইলে শিশু যকৃতের চিকিৎসা করা আবশ্যক। নিম্নলিখিত

ঔষধটী ব্যবহার করিয়া শিশু যকৃতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। কালমেঘের পাতা বাটিয়া ২।৩ রতি বটিকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। প্রত্যুহ প্রাতঃকালে মধুর সহিত এই কালমেঘের বটিকা একটী করিয়া শিশুকে খাইতে দিবে। কালমেঘের রস ১২।১৪ ফোঁটা একটু মধুর সহিত প্রাতঃকালে খাওয়াইলেও বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

শিশুর উদরাময় :—

শিশুর পেটের অসুখ সাধারণতঃ জননী বা ধাত্রীর স্তন দুগ্ধ পানেই হইয়া থাকে। পেটের অসুখ হইলে যে সকল খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ স্তন্যদাত্রীকে সম্পূর্ণরূপে সেই সকল খাদ্য খাওয়া একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন স্তন্যদাত্রীর মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্তন্যদাত্রীর মানসিক উত্তেজনার বা অবসাদের জন্য অনেক সময় শিশুর উদরাময় রোগ হইয়া থাকে। যে সকল শিশু বিলাতি দুগ্ধ পান করে তাহাদেরও উদরাময় রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—স্তন্যপায়ী শিশুর উদরাময় হইলেই স্তন্যদাত্রী তাহাকে স্তন দেওয়া বন্ধ করিবেন। স্তন্যদাত্রীর দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া তবে শিশুকে স্তন দেওয়া উচিত। বিলাতী দুগ্ধ শিশুকে খাওয়ান একেবারে বন্ধ করা আবশ্যক, কারণ বিলাতী দুগ্ধপানে শিশুদের যকৃতের দোষ, উদরাময় এবং অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। যে সকল শিশু গোদুগ্ধ পান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে গোদুগ্ধের দ্বিগুণ জল ও দুগ্ধ এবং তাহাতে এক টুক্রা বেলশুঁট, ১০।১২টা যোয়ান ন্যাকড়াতে বাঁধিয়া সবশুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া খানিকটা জল থাকিতে নামাইয়া বেলশুঁট ও যোয়ান ফেলিয়া দিয়া সেই দুগ্ধ খাইতে দিবে। যে সকল শিশু স্তনদুগ্ধ বা বিলাতী দুগ্ধ খাইয়া থাকে তাহাদিগকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ভাল একতোলা পরিমাণ বার্লি একসের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া একটু একটু করিয়া খাইতে দিবে, এবং প্রতিবারে চুনের জল তাহার সহিত মিশাইয়া দিবে।

বিকৃত মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া যে সকল শিশুর উদরাময় রোগ হয় ও একটু একটু জ্বর বোধ হয় তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোন একটী অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে।

(১) হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৵০ আনা লইয়া একটু থেঁত করিয়া অর্দ্ধ পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ ছটাক থাকিতে নামাইয়া এই ক্বাথ দুই তিন বারে শিশুকে পান করিতে দিবে।

(২) হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও গুলফা এই সকল চূর্ণ করিয়া সমান পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ তিন রতি মাত্রায় দিনে তিন ঘণ্টা অন্তর তিনবার শিশুকে মধুর সহিত সেবন করাইবে। শিশুর পুরাতন উদরাময়ে এই ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ।

(৩) ধাইফুল, বেলশুঁট, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব, ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ দিনে তিন ঘণ্টা অন্তর দুইবার বা তিনবার মধুর সহিত সেবন করাইবে।

(৪) মুথা, পিঁপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ এক আনা মাত্রায় দিনে তিনবার মধুর সহিত শিশুকে চাটিতে দিবে। এই ঔষধ শিশুর জ্বরাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ।

(৫) আমড়ার ছাল, আমছাল ও জাম ছাল ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ এক আনা মাত্রায় দিনে তিনবার মধুর সহিত শিশুকে সেবন করাইলে শিশুর উদরাময় ভাল হয়।

(৬) যে সকল শিশুর অনবরত ভেদ ও বমি হইয়া থাকে, কুলের পাতা, আমরুল, কাকমাটী-পাতা ও কয়েদবেলের পাতা বাটিয়া তাহাদের মাথায় প্রলেপ দিলে ভেদ ও বমিজনিত কষ্ট নিবারিত হয়।

শিশুর অসুখে জননীর পালনীয় :—

শিশুর উদরাময় হইলে জননীকে যদি শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে হয় তাহা হইলে জননী এইরূপ পথ্যাপথ্য অনুসারে চলিবেন—

পথ্য :—জননীকে প্রাতে দশটার মধ্যে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের ভাত খাইতে হইবে। মসুরী ডাল, কৈ, মাগুর মৎস্যের ঝোল, পটোল, বেগুন, কাঁচাকলা, মোচা, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী এবং মাছের ঝোলে গন্ধ ভাদুলের পাতা বাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়া দরকার। জলখাবার—প্রাতঃকালে ও বৈকালে বেলপোড়া, বেলের মোরব্বা, দাড়িম, কেশুর ও পানিফল।

নিষিদ্ধ—ঘৃতপক্ক ও গুরুপাক দ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক জলপান, গম, মাষকলাই, শাক, আকের গুড়, নারিকেল, অধিক লবণাক্ত দ্রব্য, ভাজা পোড়া দ্রব্য, পিঠে ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ। রাত্রি জাগরণ এবং দুইবেলা স্নান করাও নিষিদ্ধ।*

রূপকথা

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী

নারী আর পুরুষের এই ভালোবাসা,
লাজে ভরা বরা সুখ, ভয়ে ভরা আশা
অপরূপ রূপ-কথা পরশ মণির ;
অন্ধকার অন্তরের অজানা খনির
সব রত্ন একে একে আসে অধিকারে,
সূর্য্যকান্ত মণিপ্রভা নয়নে বিস্তারে
বিশ্ব হয় আলোকিত, কমনীয় তনু
কান্ত কাঞ্চনের রাগে ভরে অণু অণু।
সংসারের কোলাহল দ্বন্দ্ব নিরন্তর
মাণিক্য নিক্কণে যেন হয় রূপান্তর,
পরশ ভরিয়া ওঠে কি অমৃত রসে,
চন্দ্রকান্ত সারা অঙ্গে জ্যোছনা বরষে,
বজ্রমণি-রূপে জাগে কোমল হৃদয়,
টলেনা, পড়েনা ভেঙে, সব তারে সয়।

---

* শিশু চিকিৎসা সম্বন্ধে আমি অনেক বিষয়ে 'আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজের' অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি।—(লেখক)

রন্ধন-বিদ্যা

পাঁপরের দম—

বক্তব্য:—সাধারণতঃ পাঁপর ভাজিয়াই খায়, আজ তরকারিতে পরিণত করিয়া দেশের নিকট ধরিলাম, জানিনা দেশ কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে। গ্রহণ করিলে ধন্য হইব।

উপাদান :—পাঁপর, ননিতাল আলু, পটল, পিঁয়াজ, ঘি, তেল, হলুদ, জিরামরিচ, ধনে, তেজপাতা, লবণ, দৈ ও গরম মসলা।

কুটনা ও বাটনা :—পটল, আলুগুলি ছাড়াইয়া দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া আলাদা পাত্রে রাখিয়া পিঁয়াজ, হলুদ, জিরামরিচ, ধনে পরিমাণমত লইয়া আলাদা আলাদা পাত্রে বাটিয়া রাখিতে হইবে।

পাক-প্রণালী :—প্রথমতঃ কড়াতে তেল চাপাইয়া আলুগুলি ভাজিয়া পরে পটলগুলি ভাজিবে। আলু পটল ভাজা হইয়া গেলে, পাঁপরগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাজিতে হইবে। ভাজার কাজ হইয়া গেলে আলাদা আলাদা পাত্রে সব রাখিয়া দিয়া কড়াতে পরিমাণ মত ঘি চাপাইয়া পিঁয়াজ বাটা গুলি একটু ভাজিয়া লইয়া তাহার উপর হলুদ, জিরামরিচ ও ধনে বাটাগুলি ছাড়িয়া দিয়া খুব ভালরূপ ভাজিয়া টক দৈ আন্দাজমত দিয়া খুন্তির সাহায্যে খুব নাড়িতে হইবে। যখন দেখিবে বেশ রং হইয়াছে তখন আলু, পটল ভাজা গুলি তার উপর দিয়া একটু একটু জল দিয়া খুব ভালরূপ কসিয়া লইতে হইবে। যখন দেখিবে আলু পটলের সঙ্গে মসলা গুলি মিশাইয়া গিয়াছে তখন কয়েকটা তেজপাতা দিয়া পরিমাণ মত জল দিবে। এমন ওজনে জল দিতে হইবে যাহাতে সুসিদ্ধ হইয়া গেলেও একটু একটু রসা থাকে। জল যখন ফুটিয়া উঠিবে তখন মাপমত লবণ দিয়া পাঁপড় গুলি তার উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। যখন দেখিবে সুসিদ্ধ হইয়াছে তখন গরম মসলা গুলি বাটিয়া ঘিয়ের সঙ্গে মিশাইয়া পাঁপরের দমের মধ্যে দিয়া নামাইয়া ভালরূপ ঢাক্‌নার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিলেই "পাঁপরের দম" তৈয়ারী হইল।

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

এঁচড়ের চপ—

উপকরণ:—মাঝারী এঁচড় ১টি, বড় আলু ৮টি, ঘি /।৫/, দই //০, চিনি //০, বেসম এক তোলা. ছোলার ছাতু আধ তোলা, ৪।৫টি লঙ্কা, আদা দুই গিরা, মুড়ির গুঁড়া /।০, কিছু সরিষা, জিরা, গরম মসলা ও লবণ।

রন্ধন-প্রণালী :—প্রথমে বাটনার কাজগুলি সারিয়া লইয়া জিরাগুলি গুঁড়াইয়া রাখ। অতঃপর এঁচড় বেশ করিয়া ছাড়াইয়া ডুমো ডুমো করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিতে চড়াও, ঐ সঙ্গে আলুগুলিও সিদ্ধ করিতে দাও। বেশ সিদ্ধ হইলে এঁচড় গুলি শিলে বেশ ভাল করিয়া বাটিয়া ফেল এবং আলুগুলি ছাড়াইয়া চটকাইয়া রাখিয়া দাও।

এইবার কড়ায় দুই পলা ঘি চড়াইয়া বাটা এঁচড়ের সহিত অর্দ্ধেক লবণ, মসলা বাটা, আদা বাটা, দধি এবং চিনিগুলি মিশাইয়া কড়ায় দিয়া খুন্তীর দ্বারা বেশ করিয়া নাড়িতে থাক। বেশ ভাজা হইলে নামাইয়া গরমমসলা দিয়া ঘাঁটিয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া দাও।

অতঃপর চটকান আলুর সহিত বাকী মসলাগুলি, লবণ, এবং ছাতুগুলি বেশ করিয়া মিশাইয়া লও। পূর্ব্ববৎ কড়ায় দুই পলা ঘি দিয়া ঐ মিশ্রিত আলু খুন্তী দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখ। বেসম একটী বাটীতে পরিমাণ মত জল দিয়া গুলিয়া ফেল।

এইবার উক্ত আলুর তাল হইতে আবশ্যক মত নেচি করিয়া উহার ভিতর এঁচড়ের পুর দিয়া ডিমের মত করিয়া গড়, বেসম গোলায় ডুবাও এবং উপরে মুড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দাও। কড়ায় ঘি চড়াইয়া ঐ নেচি মৃদু আঁচে আস্তে আস্তে ভাজিতে থাক। সব গুলি ভাজা হইয়া গেলে পরিষ্কার থালায় সাজাইয়া উপরে জিরার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলেই এঁচড়ের চপ হইয়া গেল।—ইহা খুব মুখরোচক খাদ্য। চায়ের সহিত খুবই ভাল লাগে।

শ্রীমতী হিল্লোলাবালা দেবী।

পোস্তর বরফি—

উপকরণ :—পোস্ত /।০, চিনি /।০, পেস্তা /।০, ক্ষীর /।৫/০, ঘি /।০

প্রস্তুত-প্রণালী :—প্রথমে পোস্ত ও পেস্তা আলাদা আলাদা বাট এবং চিনি দিয়া গজার মত রস তৈয়ারী কর। এইবার কড়ায় ঘি চড়াইয়া বাটা পোস্তগুলি খুব ভাল করিয়া ভাজ। এমন করিয়া ভাজিতে হইবে যে পোস্তর রং ঠিক বাদামী রং হইবে। অতঃপর ভাজা পোস্তর সহিত ক্ষীর ও পেস্তা বাটা বেশ করিয়া মিশাইয়া চিনির রসে ঢালিয়া দাও এবং খুন্তী দিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে থাক। যখন একটু আঁটিয়া আসিবে তখন নামাইয়া ফেলিবে। এইবার একখানা থালায় ঘি মাখাইয়া উহা ঢালিয়া দাও এবং বরফির আকারে কাট। ঐ বরফির উপর ইচ্ছামত বাদাম কিস্‌মিস্ দিতে পার।

শ্রীমতী হিল্লোলাবালা দেবী।

ডিমের মোহনভোগ-

১৮টি ডিমের হরিদ্রা অংশ একটা বাসনে রাখিয়া চামচ দ্বারা খুব উত্তমরূপে ফেটাইয়া লও। আধপোয়া আন্দাজ সুজি এবং পরিমাণমত চিনি সেই হরিদ্রাভ অংশের সহিত চামচ দ্বারা মিশাইয়া লও। দুই ছটাক আন্দাজ ঘৃত কড়াইতে ঢালিয়া উনানে বসাও। ঘৃতের ফেনা মরিয়া গেলে সেই মিশ্রিত চিনি সুজি ও হরিদ্রা অংশ কড়াইতে ঢালিয়া দেও এবং চামচ দ্বারা নাড়িতে থাক। সুজিগুলি ঈষৎ লাল হইলে নামাইয়া থালায় ছড়াইয়া দাও। একটু ঠাণ্ডা হইলে চামচ দ্বারা চাকা ভাঙ্গিয়া দাও। প্রত্যেকটি সুজি গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ এবং ঝরঝরে হইবে। ইহা অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। দুই তিন দিন পরেও খারাপ হইবে না। মোহনভোগ বেশী তৈয়ার করিতে হইলে ডিম, সুজি ও চিনির পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলেই চলিবে।

শ্রীমতী সুনীতি সেন গুপ্তা।

পূজারিণী

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ওগো পূজারিণী বালা!
শিশির-সিক্ত প্রভাত কুসুমে
ভরিয়া অর্ঘ্য-থালা—
চলিয়াছ ভাঙা শিবমন্দিরে
ঝরিছে সুষমা সারা দেহ ঘিরে,
ভক্তি মিশেছে প্রীতি সহ আসি
বয়ানে মাধুরী ঢালা!

চন্দন শ্বেত টীকা—
ললাটে তোমার, সাধ্বী গরিমা
জলন্ত যেন লিখা।
রাঙা চেলীখানি কত সুন্দর
পরণে তোমার, গোধূলি ধূসর,
প্রতীচির ভালে আঁকে যেই রঙে—
সন্ধ্যার শেষ শিখা।

মন্ত্র না শুনি কভু,
গেলে তুমি দেবী দেবমন্দিরে,
গদ গদ ভাবে তবু
মনে হয় যেন বেশি তার চেয়ে
মন্দ্রিছে যেথা নব প্রাণ পেয়ে,
সেই নিবেদন চেয়ে কি মন্ত্রে
বিগলিত হ'ল প্রভু!

অর্ঘ্যের ফুলরাশি—
দেবতারে দিয়া বিনিময়ে তুমি
আনিলে স্বর্গ-হাসি!—
আনিলে শান্তি শূন্য থালায়
শান্ত সোহাগ শূন্য ডালায়,
চির উজ্জ্বল প্রদীপ শিখায়—
হিয়া ওঠে উদ্ভাসি।

থামো দেবী একবার!
অর্ঘ্য বহিয়া মন্দিরে আমি
যাবনাক আজি আর।
দেবতার তরে আনিনু যে ফুল
সাজাইব তাহে তব পাদমূল;
এ নব পূজায় নবীন বোধন—
হবে আজি দেবতার।

ভক্তিমতী করেমতী

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

প্রেমময় রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ কখন যে কি ভাবে মানুষকে তাঁহার চরণের দিকে আকর্ষণ করেন, তাহা সেই ভক্তাধীন ভগবানই জানেন—আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানুষ তাহা কেমনে বুঝিব? জগত তাঁহার লীলাভূমি, লীলাময় আমাদিগকে লইয়া কত ভাবে যে তাঁর লীলামাধুরী প্রকাশ করিতেছেন তার কি ইয়ত্তা আছে? কখনও মাতৃঅঙ্কে শিশুরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি সূতিকাগৃহ আলোকিত করিতেছেন আবার কখনও বা মার কোল আঁধার করিয়া সোনার সংসারে বিষাদের কালিমা ছড়াইয়া দিতেছেন। চারিদিকেই নানাভাবে সেই লীলা-ময়ের লীলাখেলা।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাঞ্জল নামে একটি গ্রাম। গ্রামে পরশুরাম পণ্ডিতের বাটী—পরশুরাম রাজ-পুরোহিত, ধনী, মানী, জ্ঞানী, পরম বৈষ্ণব। সংসারে তাঁর আপনার বলিতে কেহ নাই—আছে একটী অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা, নাম করেমতী। স্নেহের দুলালীকে জ্ঞানে গুণে গুণবতী করিতে যত কিছু প্রয়াস করিতে হয় পরশুরাম তার একটুও ত্রুটি করেন নাই। তারপর সুপাত্র দেখিয়া করেমতীর বিবাহ দিলেন, বৃদ্ধের আনন্দের আর সীমা নাই।

বিবাহ কাহাকে বলে করেমতী তাহা জানেন না। শৈশব হইতে বালিকা শুনিয়া আসিয়াছেন এ সংসারে কৃষ্ণই জীবের একমাত্র পতি, তিনি অখিলের স্বামী, সেই স্বামীকে লাভ করিতে পারিলে জীবের আর কিছু কাম্য থাকে না। করেমতী সেই বিশ্বস্বামী শ্রীকৃষ্ণকেই স্বামীত্বে বরণ করিয়া নিশিদিন তাঁরই পূজা করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু একি? আজ করেমতীর প্রাণ এত উচাটন কেন? ব্যাঘ্র-বিতাড়িত কুরঙ্গিনীর ন্যায় আজ করেমতীর চঞ্চল চক্ষু এদিকে ওদিকে ছুটিতেছে কেন? আজ করেমতীর স্বামী তাঁহাকে আপন আবাসে লইতে আসিয়াছে। তাইত! এ আবার কি বিপদ! স্বামী ত একজন আছেন, তিনি বৃন্দাবনে কদম্বতলে মোহনচূড়া মাথায় দিয়া বনমালা গলে পরিয়া রাধা নামের সাধা বাঁশী বাজান, এ আবার কোন্ স্বামী আজ তাঁহাকে লইতে আসিল? এ স্বামী কি তাঁর সঙ্গে অহর্নিশি কৃষ্ণকথা বলিবে? না এযে কামান্ধ পুরুষ! তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবনের সৌন্দর্য্যের পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ভোগাশার বহ্নিতে প্রজ্জলিত হইয়া আজ তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে! করেমতী কি এই ভোগবিলাসীর কামনার আগুনে ইন্ধন জোগাইবেন? না- না কখনই নয় করেমতী এই সব ভাবিয়া বৃন্দাবনে বৃন্দাবনচন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

গভীর নিশীথ রাত্রি। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ। দিবসের কর্ম্মক্লান্ত জগত সুষুপ্তির জড়তায় আচ্ছন্ন। আকাশে চন্দ্র নাই, তারকা নাই, অমানিশার ঘোর তমসায় ধরণীর মুখ সমাচ্ছন্ন। করেমতী পলায়নের মাহেন্দ্রক্ষণ মনে করিয়া আপন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন। দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া দেখিলেন, সব দিকই রুদ্ধ, কোন দিক দিয়াই পলাইবার উপায় নাই। সতর্ক পিতা যেন কন্যার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আজ গৃহের চারিদিক দুর্গ প্রাকারের ন্যায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। করেমতী কালবিলম্ব না করিয়া লম্ফ দিয়া দ্বিতল হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় পায়ে একটুও আঘাত লাগিল না।—ছুট্! ছুট্! ছুট্! ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া করেমতী রাজপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে।
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ অন্বেষণে॥
দৃঢ় করি প্রতিজ্ঞা যে পর্য্যন্ত শ্বাস।
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ॥
এতেক চিন্তিয়া ধনী অর্দ্ধ নিশি যোগে।
ঘর হইতে বাহিরিল মহা অনুরাগে॥
বাটী হৈতে বাহির হৈতে না পারিয়া।
কোঠার উপর হইতে পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কৃষ্ণ অনুরাগ বন্ধু ধরি নামাইল।
কিঞ্চিৎ শরীরে নাহি বেদনা লাগিল॥

—ভক্তমাল।

এদিকে সকালে গাত্রোত্থান করিয়া পরশুরাম দেখেন ঘরে কন্যা নাই। তাড়াতাড়ি রাজার নিকট গিয়া পরশুরাম চুপি চুপি করেমতীর অন্তর্দ্ধানের কথা বলিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য করেমতীর সন্ধানে পাঠাইলেন। পশ্চাতে অসংখ্য সৈন্যবাহিনী যাইতেছে, অগ্রে অগ্রে প্রাণপণে করেমতী ছুটিতেছেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে প্রায় ধর ধর করিয়াছে। করেমতী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন আর পলাইবার রাস্তা নাই। হায়! হায়! হতভাগিনীর ভাগ্যে কি তবে বৃন্দাবন দর্শন নাই! রাস্তার পার্শ্বে একটী মৃত উষ্ট্রের গলিত শবদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। শবের উদরগহ্বরের মাংসরাশি চিল শকুনি কুক্কুর শৃগালে খাইয়াছে, বাহিরের পঞ্জরগুলি একটি ছাউনির মত উটের দেহতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। করেমতী অগত্যা সেই উষ্ট্রদেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের এমনই টান যে সেই গলিত উষ্ট্রের দেহনিঃসৃত পূতিগন্ধ করেমতীর নাকে একটুও লাগিল না। করেমতী স্বচ্ছন্দে তাহার ভিতর বসিয়া রহিলেন।

"বুঝিল আমার তত্ত্বে লোক আসিতেছে।
দ্রুত চলি যায় ক্ষণে ক্ষণে চায় পাছে॥
ময়দান মধ্যে লুকাইতে নাহি স্থান
উদর-ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে।
গহ্বরের ন্যায় চাম শুকাইয়া আছে॥
দুর্গন্ধি কেলেদ তাতে অতিশয় হয়।
ভিতর পশিয়া গিয়া লুকাইয়া রয়॥
বিষয়ের দুর্গন্ধি সদৃশ তা নাহি হৈল।
উটে যে দুর্গন্ধি সেই সুগন্ধি মানিল॥"

ভক্তমাল।

একদিন নয়—দুইদিন নয়—তিনদিন উপবাসী অবস্থায় করেমতী সেই উষ্ট্রদেহে রহিলেন। সৈন্য সামন্তেরা চারিদিকে পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেল। তখন করেমতী উষ্ট্রদেহ হইতে বাহির হইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। ক্রমাগত পথ চলিতে চলিতে অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

বৃন্দাবন! রাধারমণ-শ্রীগোবিন্দের লীলাভূমি বৃন্দাবন! এই বৃন্দাবনে যশোদার নন্দগোপাল মাখন-চোরা কত ক্ষীর নবনী চুরি করিয়া খাইয়াছেন—এই বৃন্দাবনের বনে বনে রাখাল বালকদের সঙ্গে গোপাল আমাদের "গো-পাল"রূপে বেণু বাজাইয়া কত ধেনু চরাইয়াছেন—এই বৃন্দাবনে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম কত রাখালসখা লইয়া গোপাল আমাদের কত খেলা খেলিয়াছেন—ঐ কদম্ব তরুমূলে বসিয়া মোহনমুরলী তানে কত গোপকুমারীর মনপ্রাণ হরণ করিয়াছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার প্রিয়ভূমি বৃন্দাবনে করেমতী আজ উপস্থিত। কত জন্মজন্মান্তরের আকাঙ্ক্ষার ধন আজ তিনি পাইয়াছেন, কত কথা আজ তাঁহার প্রাণে উথলিয়া উঠিতেছে। আজ যে তাঁহার নারীজীবন সার্থক হইয়াছে। করেমতী বৃন্দাবনের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে "চোর" নামক বনের ভিতর বসিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। চক্ষে পলক নাই—ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্বেগ নাই, করেমতী একপ্রাণে একমনে বৃন্দাবন-বিহারীর ধ্যান করিতেছেন। আহা কি সে শান্ত

মূর্ত্তি! কি সে মুখের জ্যোতিঃ। যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী আজ বিষ্ণুর ধ্যানে উপবেশন করিয়াছেন।

এদিকে পরশুরাম নানা স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কত কুঞ্জ কত বন খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তিনি "চোর" বনে গিয়া দেখেন সমস্ত বনভাগ আলোকিত করিয়া একটি চিত্র পুত্তলিকা। কি তাঁর মুখের ছটা! যেন স্বর্গের সমগ্র সুষমা ঘনীভূত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছে। নীরব, নিস্পন্দ, স্থির, নিশ্চল সে দেহ! বিন্দু বিন্দু প্রেমাশ্রু মুদিত নেত্রের ভিতর দিয়া মুক্তাবিন্দুর ন্যায় কপোলে পড়িতেছে—বর্ষান্তে শরতের শিশিরবিন্দু যেন শেফালিকার উপর পড়িয়াছে।

পরশুরাম একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তিমতী ছবিটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আর কি? মাথাটি তাঁর ভক্তিভরে আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল—ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে পরশুরাম কন্যার চরণে প্রণাম করিলেন।

"নামিয়া নিকটে গিয়া দেখে চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহি চক্ষে বহে গঙ্গাধার।
তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক্ ব্যাপিয়া।
মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার।
পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য ব্যবহার॥
কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেহ নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পূজ্যতম হয়॥"

ভক্তমাল।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে করেমতীর বাহ্যজ্ঞান আসিল, পিতা কহিলেন "বৎসে! ঘরে চল, সেখানে গিয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে। আমার আর যে ইহজগতে আপনার বলিতে কেহ নাই, এই বৃদ্ধের অন্ধের যষ্টি যে তুমি।"

করেমতী বলিলেন, "বাবা, কাহাকে তুমি ঘরে ফিরাইয়া লইবে? এই দেহ? এই দেহ লইয়া যদি সুখী হও লইয়া যাও, আমার আত্মা যে কৃষ্ণ-প্রেমসাগরে ডুবিয়াছে। আমি যেদিকে ফিরাই আঁখি সেদিকে যে শুধু কৃষ্ণরূপই দেখি। আর কেন, পিতা, আমাকে এই শান্তি স্নিগ্ধ তপোবনে প্রাণারাম শ্রীনন্দ-নন্দনের ধ্যান করিতে দাও।"

পিতা বলিলেন "মা, আমার মনে কষ্ট দিও না মা, চল গৃহে ফিরে চল, তুমি যে আমার চোখের দৃষ্টি—বাহুর শক্তি, তোমা বিহনে আমি আর ক'দিন বাঁচিব?"

করেমতী বলিলেন "বাবা এ বৃথা মোহ ছাড়, এ সংসার অসার, দেহ দু'দিনের, কেবল কৃষ্ণনামই জগতে সত্য। সংসারে ফিরিয়া এই কৃষ্ণনামে কালাতিপাত কর—সকল দুঃখ দূরে যাবে বাবা।"

পরশুরাম বলিলেন "মা, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম হইল স্বামীর সেবা, ঘর সংসার করা তা' ছাড়িয়া এ সবে কি ধর্ম্ম হয়?"

করেমতী বলিলেন "হয় বাবা হয়। স্বামী আবার কে? স্বামী ত একমাত্র বিশ্বের যিনি স্বামী সেই নন্দদুলাল। আপনার সংসারের স্বামী কি আমার এই কৃষ্ণনামের অপার আনন্দ দিতে পারিবে? সে যে ইন্দ্রিয়ের দাস, রূপের উপাসক। যাও বাবা তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি একবার দেখি সেই মনচোরার নাগাল পাই কি না।"

পরশুরাম বলিলেন "এভাবে তোমায় একাকিনী রাখিয়া যাই কি করিয়া মা?"

করেমতী বলিলেন "সে কি বাবা? বিশ্বনাথ শ্রীকৃষ্ণ যাহার স্বামী তার আবার সংসারে ভয় কিসের? যাঁর নামে জলে শিলা ভাসে, বৃক্ষ লতা কথা বলে, তাঁর আশ্রিতার আবার ভয় কিসের? তুমি যাও বাবা সংসারে ফিরিয়া যাও।"

"শ্যামলসুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ পাথারে।
ডুবিয়াছে মোর মন উঠিতে না পারে॥
দেহ নিয়া মোর কি কাজ আছয়।
বৃথা কেনে আগ্রহ করহ মো বিষয়॥
মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও।
মরিল যে জন তার পাছে কেন ধাও॥

কালিয়া পাথারে যেই ডুবিয়া মরিল।
সংসারের কর্ম্মে সেই অযোগ্য হইল॥
অতএব পিতা শুন ঘরে চলি যাহ।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করহ॥
বিষয় বিষমে বৃথা ইন্দ্রিয় চড়াও।
দূরে ত্যজি তাহা সুধাসাগরে ডুবাও॥
বড় সুখ পাবে দুঃখ যাইবেক দূর।
দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর॥

ভক্তমাল।

পরশুরাম কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার কাছে কন্যার কাহিনী বিবৃত করিলেন। রাজা শুনিয়া করেমতীকে দেখিবার জন্য তখনই যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দেখেন যমুনার তীরে সেই বনের মধ্যে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে করেমতী বসিয়া আছেন। রাজা সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজা কত স্তুতি করিলেন, কত সুপেয় ভোজ্য তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন, করেমতী সেদিকে জ্রক্ষেপও করিলেন না। রাজা তখন ব্রহ্মকুণ্ড তীরে তাঁর জন্য কুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার করেমতী মৌনতা ভঙ্গ করিয়া রাজাকে বলিলেন, "আমার জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিতে গেলে মৃত্তিকা ভিতরস্থ বহু জীবের প্রাণ নাশ হইবে, অতএব অমন কাজ করিও না।" রাজা সে কথা শুনিলেন না। রাজার চেষ্টায় অচিরে পাকা কুটীর নির্ম্মিত হইল। অনেক অনুরোধে করেমতী সেই কুটীরে গিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান ধারণা করিতে লাগিলেন। কত ভক্ত কত সুভোজ্য আনিয়া তাঁহার সম্মুখে দিতে লাগিল, করেমতী সেদিকে জ্রক্ষেপ না করিয়া কেবল জীবনধারণের জন্য বনের শাক ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।

কতদিন হইল করেমতী কৃষ্ণলাভ করিয়াছেন, তারপর কত ভূকম্প, কত ঝঞ্ঝা, কত প্রলয় বায়ু বৃন্দাবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, আজও ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ভক্তিমতী করেমতী বাঈয়ের কুটীর পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্ত নানা ভাবে পায়। কেহ বা তাঁর দাস সাজিয়া, কেহ বা সখা হইয়া, কেহ বা জননী হইয়া, কেহ বা তাঁহাকে স্বামীভাবে পূজা করিয়া, কেহ বা সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, কেহ বা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া আর কেহ বা শুধু তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। ব্রজগোপীরা যে কান্তাশক্তি ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাতে স্বামীত্বের আরোপ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল, ভক্তিমতি করেমতীও সেই কান্তাশক্তির ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ যেমন সামান্য লৌকিক অনুরাগ ছিল না, ভক্তিমতী করেমতীরও তদ্রূপ।

বোম্বাইএর কথা

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

বেলগাঁও কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পথে একমাস বোম্বাইএ ছিলাম। প্রথমেই এই সহরের প্রাসাদসদৃশ হর্ম্ম্যরাজি দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। এখানকার বাড়ীগুলি যেমন বৃহৎ, তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাটও তদ্রূপ। এখানকার কোন রাস্তায় একটি কুটা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে না। দিনের মধ্যে দুইবার রাস্তা ঝাট দেবার ব্যবস্থা। বাড়ীগুলি অধিকাংশই ৭।৮ তলা এবং প্রায় সকল বড় বাড়ীতেই উপরে উঠিবার জন্য liftএর ব্যবস্থা আছে।

বোম্বাই সহর গুজরাটী, ভাটিয়া, পার্শী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া তাঁহারা এক একজন ধনকুবের হইয়াছে। ইংরাজদের প্রভাব একক্ষেত্রে এখানে অনেক কম। দরিদ্রলোকের ঠাঁই এদেশ নয়। ভাড়া এখানে ভয়ানক বেশী সুতরাং তাহারা সহরের আশেপাশে বাস করে। দ্রব্যসামগ্রীর দাম শুনিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে। এখানে ২০ তোলায় সের। অতএব আমাদের দেশের /৪ সের এখানকার /১ সের। একটি কপি ৵০, একটি লাউ ।০, একটি বেগুণ ৵০—এই এখানকার তরি-তরকারির দর। সাধারণ চাউল ১৬৲ টাকা মণ। বড়লোকেরা ২০৲ টাকা মনের চাউল ব্যবহার করে। আটা, ময়দা, ঘৃতের দর আমাদের বাংলার মতই। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সহর বলিয়া নানাপ্রকার মাছ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার মাছে বড় দুর্গন্ধ। মাংস কলিকাতার দরেই মিলে, ডিম একটি চার পয়সা। ফলমূলের দামও এখানে খুব, একটি মূলা আমরা ৵০ আনা দিয়া কিনিয়াছিলাম। এই যে কলিকাতায় এত বোম্বাই আম আসে, বোম্বাইবাসীরা এর আস্বাদও জানে না। নাম বোম্বাই হইলেও ঐ সব আম বাংলার মাটীতে জন্মায় বলিয়া এত মিষ্ট। এখানে আমাদের দেশের মত বোম্বাইআমের নামগন্ধও নাই। নানাজাতীয় কলা এখানে খুব মিলে, দামও সস্তা।

এই সহরটী লম্বায় তিন মাইল, চওড়ায় এক মাইল। বসতি পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায়। দিন দিন বসতির সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া আশেপাশের-স্থানও জনাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যাওয়া আসার সুবিধা এখানে খুব। গাড়ীঘোড়া, মোটর, ট্রাম প্রভৃতি ত আছেই, আধঘণ্টা অন্তর সহর হইতে আশেপাশের গ্রামসমূহে রেল যাতায়াত করিতেছে। স্থানাভাবে বহুলোকে পাহাড়ে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট সমুদ্রতীরের কোন কোন অংশ বুজাইয়া সহরের পরিসর বৃদ্ধি করিতেছেন।

ভাড়াটিয়া ও নিজস্ব গৃহের অভাবে এখানে অনেক লোক হোটেলে বাস করিতেছে। এখানে প্রচুর হোটেল আছে। হোটেলগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাওয়াদাওয়ার চার্জ্জ খুব বেশী। প্রত্যহ খাইতে ২॥০ টাকা লাগে। কেক, বিস্কুট শোভিত চায়ের দোকান এখানে খুব। হিন্দুদের চায়ের দোকানে ডাউল, ভাত, ফুলুরী, চাটনী প্রভৃতি পাওয়া যায় চিনির দ্বারা প্রস্তুত পেড়া ও লাড্ডু এখানে খুব মিলে। পিত্তল ও তাম্রের বাসন-কোসনের দর এখানে সুবিধা। এসব জিনিসের দোকানও এখানে প্রচুর।

বোম্বাইএর সমুদ্রতীরবর্ত্তী পাদদেশের আকার হস্তের অঙ্গুলিগুলি ফাঁক করিলে যেমন হয় তেমনি।

অঙ্গুলিগুলি যেন স্থল এবং ফাঁকগুলি জল। দুই একটি জলখণ্ড বোম্বাইবার সঙ্কল্প সরকার করিয়াছেন। এইরূপ করিলে ৪।৫ মাইল ভূমি প্রস্তুত হইবে এবং ধনকুবেরগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে সেখানে গগনচুম্বিত সৌধরাজি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের ধনগৌরবের" ও ইংরাজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে।

এখানকার রাস্তায় যেমন গাড়ী ঘোড়ার চলাচল তেমনি লোকচলাচল, কিন্তু চাপা পড়িবার ভয় খুব কম। এখানকার ঘোড়া আমাদের দেশের মত পক্ষীরাজ নহে। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সব এখানে ইলেক্‌ট্রিক আলোয় আলোকিত হয়। ক্ষুদ্র কুটীর, সামান্য গলি পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিকে আলোকিত। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এখানে local train গুলি ইলেক্‌ট্রিকে যাতায়াত করিতেছে।

এখানে নানাজাতীয় রমণীগণ বিনা অবগুণ্ঠনে অবলীলাক্রমে পথে, সমুদ্রতটে ভ্রমণ করেন। তাঁহাদের শোভন দেহমাধুর্য্য যেন স্বাস্থ্যের আবাস গৃহ। নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া যখন তাঁহারা তেজের সহিত পথ দিয়া চলিয়া যান তখন কোন হীনচেতার সাধ্য নাই যে তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় দৃষ্টি পাত করে। আমাদের মহারাষ্ট্র ভগিনীগণ একখানি ১২ হাত সাড়ী ও একটী ছোট জামা এমন সুন্দরভাবে পরিধান করেন যে, দেখিলে আমাদের বঙ্গরমণীদের অযথা বস্ত্র ব্যবহারের উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়।

মালবার-হিল বোম্বাইএর প্রধান বেড়াইবার স্থান। প্রাতে, বৈকালে যে কত নরনারী তথায় ভ্রমণ করিতে যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ হিলে গুজরাটী, মাড়োয়ারীদের বড় বড় অট্টালিকা আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এই হিলের ঝুলান' উদ্যান। ঐ উদ্যান নানা জাতীয় পুষ্প ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

এখানে দেশীবস্ত্র ও খদ্দরাদির ব্যবহার খুবই কম। বিলাতী বস্ত্র এবং বিলাতী দ্রব্য এখানে পূর্ণমাত্রায় চলে। পুরুষদের মধ্যে যাও বা ২।৪ জন মিলে, মেয়েদের কাউকে খদ্দর ব্যবহার করিতে দেখি নাই। "অশোক ভাণ্ডার" প্রভৃতি কয়েকটি স্বদেশী দোকানে আমরা গিয়াছিলাম—তেমন বিক্রয় হয় না বলিয়া দ্রব্যাদি সেখানে খুবই কম আছে।

বোম্বাইএর প্রধান দ্রষ্টব্য—মুম্বাদেবী, বাউলনাথজী, মহালক্ষ্মীর মন্দির ও বিগ্রহ এবং এলিফ্যান্টা গুহা। মুম্বাদেবী সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটি পুষ্করিণীর তীরে মুম্বাদেবীর মন্দির। পুষ্করিণীর অন্য পাড়ে পেড়া ও আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের দোকান। মুম্বাদেবীর মন্দির ছোট কিন্তু নানা প্রকার মূল্যবান কারুকার্য্যে শোভিত। মন্দিরগাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরের কোন কোন স্থান রৌপ্য দ্বারা আবৃত। এই মন্দিরের গঠন-কার্য্যও খুব মনোহর। মুম্বাদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি পিতল দ্বারা নির্ম্মিত এবং খুব বড়। রত্নালঙ্কার শোভিতা এই সুন্দর প্রতিমা দেখিলে বাস্তবিকই ভক্তি হয়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শ্বেত মর্ম্মর আবৃত চত্বরে বহু নরনারী পূজার্চ্চনায় ব্যস্ত, বহু সাধু সন্ন্যাসী ধ্যানে নিমগ্ন। এখানে প্রণামী দিতে হয় না। স্থানমাহাত্ম্যে প্রাণ আপনিই ভক্তিতে পূর্ণ হয়।

মহালক্ষ্মীদেবীর মন্দির মহালক্ষ্মী ষ্টেশনের নিকট। ইনি পিত্তলময়ী বালিকা মূর্ত্তি। নীরবে দাঁড়াইয়া যেন সমুদ্র দর্শন করিতেছেন। দেখিলে বাস্তবিকই চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বাবা বাউলনাথের মন্দির সমুদ্রতীরে মালাবার হিলের নিকট। প্রধান প্রধান ধনীব্যক্তিগণ বাউলনাথকে ঐশ্বর্য্য ভূষিত করিয়াছেন। মন্দিরের চারিদিকে মারহাটী ও গুজরাটীদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, মধ্যে পর্ব্বতগাত্রে মন্দির। ৪ তালা আন্দাজ সিঁড়ী ভাঙ্গিয়া তবে মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। বাবা বাউলনাথের গর্ভগৃহে ইলেক্‌ট্রিকে দিনের মত আলো হইয়াছে। মন্দিরের সামনেই কল। সেখান হাত পা ধুইয়া তবে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হয়

৪ পাশে সুদৃশ্য টবে নানাজাতীয় পাম গাছ, মধ্যে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ শ্বেতচন্দন ও মল্লিকা-মালা দ্বারা এমন ভাবে সজ্জিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। চারদিকের দেওয়ালে বড় বড় কুলুঙ্গী, তাহাতে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। একটী কুলুঙ্গীতে স্বর্ণময় শিব স্বর্ণময়ী পার্ব্বতীকে বাম ক্রোড়ে এবং হিরণ্ময় শিশুসন্তানকে দক্ষিণ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। মাঝের কুলুঙ্গীতে মহালক্ষ্মী দেবীর অপূর্ব্ব শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা নানাবিধ হীরক পান্না নির্ম্মিত অলঙ্কারে এবং তড়িদালোকে স্বর্গীয় প্রতিমাবৎ শোভা পাইতেছেন; মুখের ভঙ্গী যেন সজীব। দুই পাশে দুই চামরধারিণী, তাহাদের বসনালঙ্কার ও গঠনচাতুর্য্য দেখিয়া মনে হয় যে তাহাদের হাতের চামর এখনই ব্যজিত হইবে। শেষ কুলুঙ্গীতে শান্ত সমাহিত জগন্নাথের বিগ্রহ মূর্ত্তি।

ব্যানারী গুহা দেখিতে অতি সুন্দর। বোধ হয় এগুলি বৌদ্ধ যতিবর্গের আবাস ছিল। প্রতি গুহার দ্বারে একটী করিয়া ঝরণা আছে। স্থানটী সম্পূর্ণ রূপে নির্জ্জন।

এলিফ্যান্টা—সমুদ্রমধ্যে একটী দ্বীপ, নৌকাযোগে বা জাহাজে করিয়া যাইতে হয়। নৌকায় গেলে ১২।১৪ টাকা ভাড়া লাগে কিন্তু একেবারে পাহাড়ের নীচে পৌছাইয়া দেয়। জাহাজে গেলে বেলা ৮টায় বোম্বাই হইতে জাহাজে উঠিতে হয়, ভাড়াও অনেক কম। জাহাজ এলিফান্টায় যাত্রী পৌছাইয়া অন্য একটী স্থানে গিয়া ৫টার সময় ফেরে। যে স্থানে জাহাজের ঘাট সেখান হইতে গুহা এক মাইল, অতএব সেদিন আর ফেরা যায় না। গুহাটী বড়ই সুন্দর। একতাল মাখমকে শূন্যগর্ভ করিলে যেমন হয় গুহার অভ্যন্তর ভাগ তেমনি এবং দেওয়ালে নানাবিধ মূর্ত্তি। ক্ষোদিত নানাপ্রকার স্তম্ভ দ্বারা ছাদ আটকান। এলিফ্যান্টার জল বড়ই উত্তম। পথ-প্রদর্শক বলিল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ জল বাহিরে লইয়া যাইতে দেন না। গুহার পরিদর্শক একজন ময়মনসিংহবাসী বাঙ্গালী সপরিবারে আছেন। চার ধারে অকূল সমুদ্র, মধ্যে একজন বঙ্গবাসী অকুতো-ভয়ে বাস করিতেছেন দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আপলো বন্দরে বিলাত যাইবার পথ। পূর্ব্বে জাহাজ মধ্য-সমুদ্রে থাকিত, ষ্টীমারে করিয়া জাহাজে উঠিতে হইত। এখন আর তাহা নাই, জাহাজ জেটিতেই আসে। এই স্থানের বড় বড় অফিস-ভবনগুলি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এত বড় জেটি ও অফিস বোধ হয় আর কোথাও নাই।

পিনাকীর প্রতি

শ্রীমতী লীলা ঘোষ।

পিনাকীর শিঙা বাজে কাঁপায়ে গগন,
ফুৎকারে ধরণীবক্ষ হলো ধূলিময়।
রক্ত আঁখি রক্তজবা, দেখে জাগে ভয়—
কারে দাহ' হে ভৈরব! পৃথ্বী কি মদন
পুষ্পধন্বা মধুমাস আগে গেছে সরে,
অগ্ন্যুদগারী নয়নে সে দেয়নি যে ধরা—
ব্যর্থ রোষ পড়িল কি ধরণী উপরে?

মৃত্যুঞ্জয়, একি খেলা? এ কেমন ধারা?
ধরণী পিঙ্গল বাসা বিবর্ণ বদন,
চম্পকে, রসাল ফলে ভরি লয়ে থালি—
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তব; সঘন কম্পন
কাঁপাইতেছে শীর্ণ তনু, পড়ে বুঝি ঢালি!
হে রুদ্র, সম্বর রোষ, শান্ত কর দেহ!
ঝরুক শ্রাবণধারে অবিরল স্নেহ।

লণ্ডন বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের কার্য্য

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

অনেকেই অবগত আছেন বিগত ১৯২৪ সালে লণ্ডন নগরীর ওয়েম্লী পার্ক নামক সুবিশাল উদ্যান-সমন্বিত ক্ষেত্রে 'বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন' বা 'বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী' হইয়াছিল। উহাতে জগতের ইংরেজ রাজত্বের সমস্ত দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের অলঙ্কারাদি এবং উহার প্রস্তুত-প্রণালী দেখাইবার জন্য একজন কার্য্য-কারক গবর্ণমেণ্টের নিজ তত্ত্বাবধানে পাঠাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করায় আমরা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হই নাই, কিন্তু বিলাতে আমাদের অলঙ্কারের প্রচলনের জন্য উক্ত একজিবিশনে স্বাধীন ভাবে একটী ষ্টল করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমি নিজে একাকী মাত্র বিলাত যাত্রা করি। সেখানকার শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে ছিল।

গত ১৯২৪ সালে ১৯শে মার্চ্চ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ১৬ই এপ্রিল তারিখে লণ্ডনে পৌছি। ২৪শে এপ্রিলে একজিবিশন খোলা হয়। একজিবিশনে প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপ তৈয়ারী হইয়াছিল। পরম রমণীয় সুবিশাল ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের বেঙ্গলকোর্ট নামক অংশে আমাদের ষ্টল হইয়াছিল।

শিল্পের দিকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বাংলার নানাবিধ শিল্পের ছয়টী ষ্টল হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত বটকৃষ্ণ পালের ঔষধাদি, বেঙ্গল ক্যানিংএর রক্ষিত ফল ও মিষ্টাদি খাদ্য, এইচ বসুর সুগন্ধি দ্রব্যাদি এবং আমাদের ইকনমিক জুয়েলরী ওয়ার্কসের অলঙ্কার প্রভৃতির কয়েকটী ষ্টল বে-সরকারী অর্থাৎ স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ তত্ত্বাবধানে করা হইয়াছিল।

আমাদের ষ্টলে আমি প্রথমে শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বাঙ্গালী মহিলাকে ষ্টল-পরিচালনের কার্য্যে নিযুক্ত করি। ইঁহার স্বামী লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পড়িতেছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ প্রদর্শনীক্ষেত্রে নানাদেশীয় সুশিক্ষিতা মহিলাদের কার্য্য করিতে দেখিয়া বাঙ্গালী মহিলার যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্যই নিজে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আর একটী বাঙ্গালী মহিলা নিযুক্ত হইয়াছিলেন—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বস্ত্রবিভাগীয় ষ্টলে, ইনি বাংলার সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কন্যা,—শ্রীমতী লীলা পাল।

বিলাতে শ্রমজনিত কাজগুলি পুরুষেরা করেন, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমের কাজ মেয়েরাই করেন। ভাল ভাল দোকানে দ্রব্যাদি বিক্রয় অধিকাংশ স্থানে মেয়েরাই করেন। বৃটিশ এম্পায়ার একজিবি-শনের কার্য্যকারকদিগের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল—সতর হাজার। ইহা হইতেই প্রদর্শনীর বিশালতা কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়।

শ্রীমতী ঘোষ শাদা শাড়ী পরিতেন, কপালে সিন্দুর পরিতেন। অভিনব সাজে সজ্জিতা বাঙ্গালী মেয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলার অভিনব ধরণের অলঙ্কারের দোকান ইয়োরোপীয়দের চক্ষে খুব চিত্তাকর্ষক দৃশ্যই হইয়াছিল।

মে, জুন দুই মাস একজিবিশন চলিবার পর আমাদের ষ্টলের বিক্রি খুব বৃদ্ধি পাইল। তখন আমি আর দুইটি ইংরাজ কন্যাকে আমার ষ্টলে কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। বড়টির নাম Miss Adams,

বয়স ২৪ বৎসর, ছোটটির নাম Miss Jones, বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীমতী ঘোষ এবং এই দুইটি কন্যা ইহাঁরা সকলেই অতি সুন্দর ভাবে কাজ করিতেন। সমস্ত কাজই ইহাঁদের নিজের কাজের মত যত্নের সহিত করিতে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইত। ইহাঁদের প্রত্যেককে আমি সপ্তাহিক পৌনে তিন পাউণ্ড অর্থাৎ মাসিক কমিবেশী পৌনে দুই শত টাকা হিসাবে বেতন দিতাম।*

বিলাতের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত বেশী দামী গহনা পরা মোটেই পছন্দ করে না। মোটামুটি গলায় সরু হার, কানে লম্বা দুল, হাতে একটা আংটি—এই তাদের গহনা। কেউ কেউ মাত্র একটা হাতে এক অতি সাদাসিদে রকমের ব্রেস্‌লেট বা বালা পরে—আজকাল হইয়াছে আর্মলেট, তাগার মত একটা জিনিস ডানায় পরে, আর হারের স্থানে হাল ফ্যাসনে হইয়াছে—এক রকম সরুমোটা মালা, এগুলি হাতিদাঁত, ঝিনুক, রঙ্গিন পাথর প্রভৃতির তৈরী। উপরে সরু সরু আরম্ভ হইয়া ক্রমে নীচেয় মোটা।

আমাদের হাতিদাঁতের উপর গিনিসোনায় মোড়া 'বীণাপাণি শাঁখা' ওদেশে বেশ পছন্দ করিয়াছে। বীণাপাণি আর্মলেট অর্থাৎ তাগা খুবই বিক্রি হইয়াছিল, কারণ তাগা পরা ইংরাজদের মধ্যে হাল ফ্যাসন।

আমরা আমাদের অলঙ্কারের সঙ্গে হাতিদাঁতের প্রস্তুত নানা রকম সেপটীপিন, মালা, ফুল, লকেট, খেলনা, পুতুল প্রভৃতিও বিক্রয় করিতাম; সেগুলি কতক আমাদের ঘরে আর কতকগুলি মুর্শিদাবাদের তৈরী।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ষ্টলগুলিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য ছিল তার মধ্যে বাঙ্গলার মেয়েদের হাতের প্রস্তুত লেস্, রুমাল ও নানা রকম সূচীশিল্প ছিল। অনেকগুলি সুন্দর কাঁথা বাংলার পল্লী থেকে সংগ্রহ করিয়া একজিবিশনে পাঠান হইয়াছিল। সেগুলি দেখিয়া ইংরেজ মেয়েরা বাংলার মেয়েদের ধৈর্য্যের খুবই প্রশংসা করিত। কাঁথাগুলি এতই সুন্দর যে কোন কোন খানা ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন শত টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রি হইয়াছিল।

বিলাতের সর্ব্বত্র সমস্ত জিনিষই এক দরে বিক্রি, মূল্যবান দ্রব্য থেকে শাক তরকারী পর্য্যন্ত কোন জিনিষেই দর দস্তুর করিবার প্রথা নাই। এইরূপ সুনিয়ম থাকায় আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জিনিষ বিক্রি করিতে পারিয়াছিলাম।

তিনটী মেয়ের উপর সমস্ত কার্য্য ভার দিয়া আমি প্রদর্শনীক্ষেত্রের নানাস্থান ঘুরিয়া নানাপ্রকার শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যের বিষয় অবগত হইতাম। ছয়মাস কাল ব্যাপী দীর্ঘ সময় একজিবিশন দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম তথাপি অনেক বিষয় দেখিতে সময় হয় নাই।

প্রদর্শনীক্ষেত্র নানাপ্রকার আমোদ উৎসবাদিতে সর্ব্বদা ভরপুর থাকিত, আমরা অবকাশ মত সেগুলির কিছু কিছু দেখিতাম। বিলাতে পথঘাটে সর্ব্বত্র সমপরিমাণ মেয়েপুরুষের গতিবিধি, কিন্তু প্রদর্শনী বা আমোদ উৎসবাদিতে বেশীর ভাগ মেয়েরাই যোগ দিয়া থাকেন। আমি দেখিতাম একজিবিশনের সমস্ত লোকের মধ্যে তিনভাগের দুই ভাগই স্ত্রীলোক। প্রায় সকলেই ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। শিশুদিগকে রাখিবার একটী চমৎকার বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। যে সকল স্ত্রীলোকের শিশুসন্তান বাড়ীতে রাখিয়া আসিবার সুযোগ নাই, তাঁহারা সন্তান সঙ্গে করিয়াই আসিয়া ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে একজিবিশন দেখিতেন। শিশু-দিগকে সেখানে রাখিবার খরচ ৪ ঘণ্টায় ছয় আনা এবং সমস্ত দিনের জন্য বার আনা নির্দ্ধারিত ছিল। সন্তান রাখিবার কর্ত্তৃপক্ষেরা, সন্তান রাখিয়া অভি-

* পত্রিকার প্রথমে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শ্রীমতী ঘোষের ফটো নাই, ফটো তুলিবার সময় কার্য্যবশতঃ তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

ভাবককে একটি টিকিট দিতেন, সন্তান লইবার সময় ঐ টিকিট দেখাইয়া সন্তান লইতে হইত। শিশুদের আহারাদির ও সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বের চমৎকার ব্যবস্থা সেখানে ছিল, অধিকন্তু সেখানে—শিশুদের উপযোগী এমন সুন্দর সুন্দর আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা ছিল যে, তাহাদের পক্ষে উহাই প্রদর্শনীর আমোদ ভোগের জন্য যথেষ্ট ছিল।

সহর ও পল্লী হইতে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ আপন আপন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণকে লইয়া একটী দল বাঁধিয়া এক্জিবিশন দেখিতে আসিতেন। ঐ সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণকে ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি সন্তানের মত ব্যবহার করিতে দেখিতাম। তাঁদের সকলকারই জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। আমাদের ষ্টলে বিক্রয়ের জন্য হাতির দাঁতের প্রস্তুত তাজমহল, হাওদা অর্থাৎ হস্তীর উপর সজ্জিত বেশে ভারতীয় রাজা, জগন্নাথের রথ, ময়ুর পঙ্খী, বাইচের নৌকা, বজরা নৌকা, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং নানাবিধ ভারতীয় জীবজন্তুর মূর্ত্তি দিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ এবং অনুসন্ধিৎসু দর্শকগণকে আমরা ঐ সমস্ত জিনিষের বিবরণ শুনাইতাম, তাহাতে আমাদের ষ্টলের সম্মুখে অনবরত ২৫ হইতে ১০০ দর্শক উপস্থিত থাকিত।

মিস জোনস্ নাম্নী ১৫ বৎসর বয়স্কা যে মেয়েটী আমাদের ষ্টলে কাজ করিত সে অল্পদিন হইল স্কুলের পড়া শেষ করিয়াই আমাদের কাজে আসিয়াছিল। তাহার সদানন্দ চঞ্চল ছুটাছুটিতে আমাদের ষ্টলটি আনন্দে ভরপুর থাকিত। আমি তাহাকে একখানি বাংলার শাড়ী উপহার দিয়াছিলাম, ষ্টলে সে তাহাই পরিয়া বাঙ্গালী বেশে গ্রাহকদের নিকট জিনিষ বিক্রয় করিত। দর্শকগণ তাহাকে ভারতীয় কন্যা মনে করিয়া কখন কখন ভারতীয় সংবাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, সে হাসিয়া জানাইত সে বিলাতেরই মেয়ে।

আমাদের ষ্টলের শ্রীমতী ঘোষ এবং এই ইংরেজ মেয়ে দুইটি—এরা সকলেই বড় শান্ত স্বভাবের ছিল, গ্রাহকের নিকট বেশী কথা বলিয়া জিনিষ বিক্রির অত্যধিক চেষ্টা এরা কখনও করিত না, আমিও এদের এই ভাব বেশ পছন্দ করিতাম।

শনিবারে এক্জিবিশনে খুবই ভীড় হইত, আমি যে পরিবারে বাস করিতাম সেই বাড়ীর একটী বার বছরের মেয়ে প্রতি শনিবারে এক্জিবিশনে আসিয়া আমার কার্য্যের সাহায্য করিত। শনিবারে বিলাতের ছেলে মেয়েদের স্কুল বন্ধ থাকে তাই এক্জিবিশনে আসিতে তার সুযোগ ছিল। সে ভারী হাসিখুসি স্বভাবের মেয়ে। তার নাম Dolly, তাকে লইয়া মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর উৎসব ক্ষেত্রে বেড়াইয়া বড়ই আনন্দ পাইতাম।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্ত্রী রাণী মেরী একদিন বেঙ্গল কোর্টে আসিয়াছিলেন,—আমাদের তৈরী অলঙ্কার দু-একটী হাতে লইয়া দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আর একদিন স্পেনের রাণী আমাদের ষ্টলে আসিয়া বীণাপাণি আর্মলেট কিনিয়া নিজে পরিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আর একটী রাজপরিবারস্থ কন্যা ছিলেন, তিনিও একটী কিনিয়া হাতে পরিয়াছিলেন।

এক্জিবিশনে সারা পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ দেখিতাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক লোকও সেখানে এক্জিবিশন দেখিতে গিয়াছিলেন। ১০।১২টী বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নানাস্থানের বাঙ্গালী ছাত্রগণ আমাদের ষ্টলে আসিতেন এবং বাংলার শিল্পকে বিলাতে প্রতিষ্ঠান্বিত করিবার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।

মে মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়া অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ছয়টী মাস বেশ সরগরমের সহিত এক্জিবিশনটি চলিয়াছিল। এই ছয়টী মাস আমরা যে কত আনন্দে কাটাইয়াছি, কত নূতনত্বের মধ্য দিয়া চলিয়াছি তাহা মনে করিয়াও আনন্দ হয়।

বেঙ্গল কোর্টে ইংরেজ বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করিতাম, আমাদের

সকলের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। একজিবিশন শেষ হইবার পর আমাদের পরস্পরের এই বিচ্ছেদ আমাদের প্রাণে বড়ই ব্যথা দিয়াছিল।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর কোমর উদ্দিন আহম্মদ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বেঙ্গল কোর্টের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া গিয়াছিলেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই সহায়তায় আমি নানা অযোগ্যতার মধ্য দিয়াও আমাদের ষ্টলের কার্য্যে বিশেষভাবে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছি।

একজিবিশন বন্ধের পর ক্রমাগত তিনটি মাস আমি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আয়র্লণ্ডের বস্ত্রবয়ন এবং সূচীশিল্প দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। শিল্পের কেন্দ্র বার্ম্মিংহামে একমাস থাকিয়া অনেক আবশ্যকীয় বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি। অনেক রকমের হ্যাণ্ড-মেশিন কিনিয়া আনিয়াছি। বার্ম্মিংহামই আমার বিলাতযাত্রা বেশী সার্থক করিয়াছে।

বর্ত্তমান ১৯২৫ সালের মে মাস হইতে বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন পুনরায় আরম্ভ হইয়া ছয় মাস থাকিবে। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে এই বৎসরের জন্যও সেখানে আমরা গত বৎসরের চেয়ে বেশী আয়োজনে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। Miss Adams, যিনি গতবৎসর আমাদের কার্য্য করিয়াছিলেন তিনি এবারও আমাদের কার্য্য করিতেছেন।

আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান অতুলচন্দ্র নন্দী এবার এই উপলক্ষে ১২ই মে তারিখে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

আমাদের আশা আছে শিক্ষিত জগতের সর্ব্বত্র দিন দিন আমাদের কার্য্যের প্রসার হইবে।

মরণ-পথের যাত্রী

(গল্প)

শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব বি-এ।

(১)

রমেন ছিল আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, বরাবরই একটু রুগ্ন গোছের, তবে পড়াশুনাতে বেশ ভালো ছিল; সব চেয়ে কিন্তু আমার ভালো লাগ্‌তো তার মধুর স্বভাব। সে যখন তার বড় বড় টানা টানা চোখ দুটির উদার দৃষ্টি আমার মুখের দিকে ফেরাতো সে সময়ে মনে হত, যেন আমাদের বন্ধু হ'লেও এ জগতের লোক নয় সে—তার চোখের মধ্যে কি যেন একটা ভাব ছিল যেটাকে ছেলেবেলায় মোটেই বুঝ্‌তে পারতুম না, অথচ তার সঙ্গ পেলে কৃতার্থ হ'য়ে যেতুম।

তারপরে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিতে পার্‌লে না সে, শরীর খারাপের জন্য তাকে পড়া ছাড়্‌তে হ'ল। যে জিনিষটার জন্য আমাদের লেখাপড়ার প্রতি লোভ সে জিনিষটা রমেনদের অভাব ছিল না, কাজেই পাশ না করা সত্বেও তার খাবার ভাবনা হয়নি।

ক্রমে পাশ ক'রে কলেজে পড়্‌তে লাগ্‌লুম; স্কুলে পড়্‌তে পড়্‌তে স্বপ্ন দেখ্‌তুম কলেজের ছেলেরা না জানি কি আনন্দেই থাকে, এখন তার অনেকটা সত্যি দেখে বেশ আরামে ছিলুম বন্ধু-

বান্ধব নিয়ে 'হৈচৈ ক'রে। বরাবর চাপের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এখনি হঠাৎ যৌবনের সীমানায় মুক্ত স্বাধীনতায় সারা দেহপ্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে থেকেও রমেনের সেই স্বর্গীয় চাউনিটি নিয়ে যেতো আকর্ষণ ক'রে তাদের বাড়ীতে। দেহ এবং মনের বিকাশ হ'য়ে চলেছিল আমার সমভাবেই, কিন্তু বন্ধুর মনটি ফলে ফুলে সুশোভিত হ'য়ে উঠলেও দেহটি শুকিয়ে যাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে বাইরের গোলমালে এত ব্যস্ত থাকতুম যে তার কাছে যাওয়া ঘটে উঠতো না। তারপরে একদিন গিয়ে দেখি সে আগের চেয়েও অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। রমেন নিজের মনে পড়াশুনা করতো, একটু আধটু লিখতোও। দু একদিন আমাকে শুনিয়ে ছিল, আমার তার লেখা পড়ে হিংসেই হ'ত। আমরা এত শিখছি কিন্তু কই ওরকম জিনিষ তো আমাদের হাত দিয়ে বেরোয় না।

একদিন রমেনের বাড়ী গিয়ে দেখলুম সব বন্ধ হয়ে গেছে, রমেন শয্যাগত হ'য়ে পড়েছে। ঘরে যেতেই রমেন একটু হেসে বল্লে, "আমার এই অচল জীবনটা শীগ্‌গিরই শেষ হ'য়ে যাবে রে সতু!" আমি সান্ত্বনার সুরে বললুম, "দূর তা' কেন, অসুখ করেছে, সেরে যাবে।" মুখে এ কথাটা বললুম বটে কিন্তু এটা যে কত-বড় মিথ্যা, তা' কথার সুরে ঘরের প্রাণহীন তৈজসপত্রের কাছে পর্য্যন্ত যেন ধরা পড়ে গেছে ব'লে বোধ হ'ল। সে তার উত্তরে একটু হাস্‌লে মাত্র, তাকে যে সকলেই এই কথা ব'লে ভোলাবার চেষ্টা করে সেটা'ত তার জানতে বাকী নেই।

রমেনের শরীর দিন দিন খারাপ হ'তে লাগলো। আমার মনের ভিতর এমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল যে আমি রোজ তাদের বাড়ী যেতে পারতুম না; আর গেলেও মনে হ'ত এখনই এমনি একটা খবর পাবো যাতে বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

(২)

দিন কয়েক ধরে গেছি, দেখি একটি তরুণী বসে আছে খোলা চুল একরাশ পিঠের উপর ফেলে। আমি তার স্নিগ্ধ রূপটুকু একদৃষ্টে দেখে নিচ্ছিলুম, এমন সময়ে দ্বারের পাশে অপরিচিত লোককে দেখে সে লজ্জায় বিছানা থেকে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু রমেন তাকে যেতে বারণ করলে ব'লে তার যাওয়া হ'ল না, আমার মুখের দিকে লজ্জাকরুণ ভাবে একটিবার চেয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে বিছানার একটি ধারে বসে পড়লো। আমি ঘরে ঢুকতে রমেন বল্লে, "তোমার একে লজ্জা করবার কোনো প্রয়োজন নেই, এ হচ্ছে বৌদির মাসতুতো বোন নীলিমা। নীলিমা, তুমি এঁকে দাদা ব'লে ডাকবে।" রমেন দেখলুম তখনো সেই ছেলেবেলাকার মতই সরল রয়ে গেছে।

রমেনের বউদির কাছে শুনলুম এই নীলিমা মেয়েটির কেউ নেই বলে তিনি নিজের কাছে এনে রেখেছেন। দিনের পর দিন নীলিমা রুগ্ন রমেনের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিলে। নারীর মোহন যাদুস্পর্শে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, মৃত্যুপথযাত্রীর শুষ্কপ্রাণে রসের উৎস বহিল। কি জানি কেন, এই লাজুক মেয়েটি জগতে এত লোক থাকতে যে মরণ পথের যাত্রী তাকেই সারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসল! তার অক্লান্ত সেবাযত্নে বন্ধু এ যাত্রায় বেঁচে গেল, স্রোতের গতি ফিরলো।

নীলিমার বিয়ের কথা উঠতে রমেন বল্লে, "তবে ওকে এখানে এনেছিলে কেন বৌ-দিদি, ওই-ই বা আমাকে বাঁচিয়ে তুললে কেন?"

সকলেরই মত হ'ল, তাই রমেনের সঙ্গে হ'ল নীলিমার বিয়ে। শেষে দেখলুম যাকে মনে করতুম আমাদের চেয়ে অনেক পেছিয়ে পড়েছে, বছর দুয়েকের মধ্যেই মনের বিকাশের দিক দিয়ে সে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী এগিয়ে গেল—যদিও সংসারী লোকের চোখে সে রয়ে গেল আগেকার মতই অকর্ম্মণ্য। ক্রমে সে আমাদের ছাড়িয়ে অনেক

দূর এগিয়ে গেল, সাহিত্যক্ষেত্রে তার যশের রশ্মি অনেক দূর বিস্তৃত হয়ে পড়লো। যে জীবন মুকুলেই মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেছিল সে যে আবার নারীর আকুল হৃদয়ের আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে ফিরে এসে তার পুষ্পশোভায় আর গন্ধে সকলকে মুগ্ধ করে দেবে একথা যে স্বপ্নেও কেউ ভাবে নি। কিন্তু সত্য অনেক সময়ে কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

তারপরে চাকরী নিয়ে দূরে দূরে ঘুরছি। মাঝে মাঝে রমেনের চিঠি পাই, দু একখানা বইও উপহার পাই। কলিকাতায় এসে রমেনদের বাড়ী গেছি, রমেন ত বালকের মত আনন্দে সমস্ত দেখালে। রোজই যাই তার অফুরন্ত গল্পের স্রোত শুনতে। কথা কইতে কইতে যখনি তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, দেখি যে তার চোখে এখনো সেই স্বর্গীয় ভাব আছে।

হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি রমেন হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নীলিমার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, নীলিমার মুখখানি একেবারে পাথরের মত সাদা হ'য়ে গেছে, চোখের পলক পর্য্যন্ত পড়ছে না—কি করুণ সে দৃশ্য! রমেন আমাদের ছেড়ে চলে গেল, যে মহিমময়ী নারী তাকে ফিরিয়ে এনেছিল, প্রাণ দিয়েছিল, শক্তি দিয়েছিল, আজ আর সে তাকে অনন্তের পথ থেকে ফেরাতে পারলে না, তারই কোলে মাথা রেখে চলে গেল সে যখন জীবনপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

রোগী-শুশ্রূষা

শ্রীমতী চারুপ্রভা দেবী

রোগীকে কিরূপে সেবাশুশ্রূষা করিতে হয় তাহা অনেকেই ভালরূপ জানেন না। অনেকে বুঝেন ঠিক মত ঔষধ পড়িলেই রোগ সারিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নয়। রোগীর ঔষধ যেমন উপকারী, তাহার সেবাশুশ্রূষা ও উপযুক্ত পথ্যও সেইরূপ উপকারী।

সর্ব্বদা রোগীর নিকটে থাকিবার জন্য একটী উপযুক্ত পরিশ্রমী স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

রোগীর প্রত্যেক জিনিসটিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। আহার্য্য দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখা উচিত, নতুবা মাছি বসিলে উহাতে রোগীর অপকার করে। বিছানা দুই প্রস্ত রাখিলে ভাল হয়। অবস্থাপন্ন লোক না হইলে যদি বিছানা দুই প্রস্ত রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে দুইখানি চাদর অনেকেই করিতে পারেন। ঐ চাদর এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রত্যহ সাবান দিয়া, অথবা পরিষ্কার জলে কাচিয়া প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে ভাল হয়। বিছানাদি প্রত্যহ পরিবর্ত্তন করিয়া রৌদ্রে দেওয়া খুব ভাল, ইহাতে দুর্গন্ধ চলিয়া যায়, বিছানা বেশ নরম হয় এবং রোগীরও বিছানায় শুইতে বেশ আরাম লাগে। রোগীর শয্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন এবং সকলেই ইহা করিতে পারেন।

রোগীর গৃহে অতিরিক্ত দ্রব্য রাখা, বহুলোকের সমাগম, গোলমাল ও বৃথা গল্প পরিবর্জ্জনীয়। গৃহটী যাহাতে শুষ্ক থাকে এবং কোনরূপ দুর্গন্ধ না আসিতে পারে এবিষয়ে দেখা দরকার। সমস্ত জানালা খুলিয়া রাখা ভাল। যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু আগমন ও দূষিত বায়ু বহির্গত হইতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।

প্রত্যহ রোগীকে মুখ, জিহ্বা ধৌত করাইয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া লইতে হয়, আবশ্যক

হইলে ভিজা কাপড়ের সাহায্যে গাত্রাদি মুছাইয়া লওয়া ভাল। যে রোগীকে যত পরিষ্কারে রাখা যায়, সে রোগী তত শীঘ্র সারিতে পারে।

রোগীকে অতি সাবধানে পথ্য দিতে হয়। পথ্যগুলি যাহাতে সুচারুরূপে সিদ্ধ হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তরুণ পীড়ায় কঠিন পথ্য দেওয়া উচিত নয়। দুধ সাগু, বার্লি প্রভৃতি যাহা সহজে পরিপাক হইতে পারে এরূপ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। অবস্থা ক্রমে সরবৎ, সুজির রুটি প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে, উদরাময় থাকিলে ফলমূল এবং দুগ্ধ দেওয়া উচিত নয়।

রোগীর গৃহে তাহার কোন পথ্যাদি রাখিতে নাই, কারণ ইহাতে তাহার বারবার দৃষ্টি পড়ায় তাহার অরুচি জন্মাইতে পারে। রোগী যে পরিমাণ পথ্য খাইতে চাহে তাহাকে ঠিক ততটুকু খাইতে দেওয়া উচিত। অনিচ্ছাসত্ত্বে জোর করিয়া খাওয়ান কখনই উচিত নয়। পথ্য অতি অল্প এবং পুনঃ পুনঃ খাওয়ান ভাল।

রোগীর সহিত অতি সাবধানে সরল ভাবে মিষ্ট কথায় তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। সে যাহাতে তাহার নিজ আশঙ্কাজনক ভাবী ফল না জানিতে পারে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। রোগীর প্রাণে আশা এবং উৎসাহ দিয়া তাহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য

বঙ্গবালা

শ্রী প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

স্বরগের দেবী তুমি
মরতের শেফালি,
আদরের ধন তুমি
বাঙালীর দুলালি।
বাঞ্ছিতা বধূ তুমি
বঙ্গের আঙিনায়
গৃহে বহে শান্তির
ধারা—তব করুণায়
সীতা সম সতী তুমি
কল্যাণী প্রতিমা,
চির অক্ষয় তব
সেবাব্রত-গরিমা।
স্নেহময়ী মাতা তুমি
তনয়ের জন্য,
দীনজনে অকাতরে
দাও তুমি অন্ন।

অভয়দায়িনী তুমি
পীড়িতের কক্ষে,
বিতর' শকতি-ধারা
দুর্ব্বল বক্ষে।
বিশ্বের সেবা—তব
হৃদয়ের কামনা,
দেবতা-দেউলে তাই
কর কত সাধনা।
ইন্দিরা রূপে তুমি
বাঙালীর ঘরে রও,
পথহারা শিশু-গালে
চুমু দিয়ে কোলে লও
অয়ি নির্ম্মল-মতি
বাঙালীর দুলালি,
দেবীরূপে যুগে যুগে
জন-মন ভুলালি।

বৰ্দ্ধমান জন-সভায় মান-পত্র দান কালে মহাত্মা গান্ধী চরকা কাটিতেছেন।

পপুলার প্রেস—কলিকাতা।

৩য় বর্ষ | আষাঢ় ১৩৩২ | ৩য় সংখ্যা

ভালবাসা

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ।

দিনে দিনে বেড়ে 'ওঠা', ছেয়ে পড়া এই ভালবাসা
এ বিরহ এ মিলন, চেয়ে দেখা, গিয়ে ফিরে আসা,
সোহাগে পরশ করা, বুকে নিতে এ বাহু বাড়ান,
দূরে গেলে আকুলতা, আপনারে কেবলি জড়ান
নূতন বাঁধন দিয়ে, বেশী করে' কাছে করিবারে
যেথা যে আপন আছে, একি বন্ধু ভ্রান্তি হতে পারে?
আকাশ বীণার তারে, আকাশের অঙ্গুলি পরশে
সে রাগিনী নিরন্তর চরাচরে বাজিছে হরষে,
কিশলয়ে বিকশিত, বসন্তের বনের অন্তরে,
অগণিত তৃণ-শিশু ধরণীরে জুড়াইয়া ধরে,
ফুলের দলের মাঝে অনুরাগে বাঁধা আলিঙ্গনে,
কুলায়ে কাকলি করে, নীলিমার নিলীন গগনে
তারা হয়ে চেয়ে থাকে, ঊষা হয়ে আসে ফিরে ফিরে,
অসীমের অভিনয় কয়ে যায় নিমেষের তীরে॥
চারি চ'কে শুভ দৃষ্টি; অজানার এই পরিচয়
এরি মাঝে খুলে যায় নিখিলের মাধুরী নিচয়,
আমরা ভুলিয়া যাই মৃত্যু বলে আছে কিছু কোথা
আনন্দে বরণ করি নব নব কত দুঃখ ব্যথা।
মন্ত্রে যেন মুহূর্ত্তেকে একেবারে অজানিত জন
প্রাণ হতে প্রিয়তর, জীবনের সব আয়োজন
লভে অর্থ অভিনব, গুরু-দত্ত দীক্ষার সমান,
যা ছিল বিরূপ ব্যর্থ, তারি মাঝে হয় মূর্ত্তিমান
জীবনের নূতন স্বরূপ; নব যুগ দেয় দেখা,
অন্তর বাহির ভরি, দেবতার স্বাক্ষরিত লেখা
মানবের জন্মলিপি লেখে পুনঃ নূতন করিয়া,
লজ্জাভয় মিথ্যা করি বরাভয়ে অন্তরে ভরিয়া।

অন্তঃপুরের আলোচনা

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এস্-সি

আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত নারীগণের গৃহকর্ম্মে অনেক খুঁৎ-খাঁৎ দেখিয়া আসিতেছি। তাহাতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও শান্তিবিধানের পক্ষে বিশেষ বাধা ঘটিতেছে।

যথার্থ হিতসাধনকামী যাহারা, তাহারা দোষের অনুসন্ধানটাই করিবে আগে। আর সেই অনুসন্ধানও অকপটভাবে করা চাই। সংশোধনের ইচ্ছাই এই অনুসন্ধানের কারণ,— সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কোন প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধি নহে। আশা করি এই সরল উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া আমাদের শুদ্ধান্তঃচ রমণীগণ আমার এই তিক্ত কথাগুলির আলোচনা করিবেন। আমি এ কথা বলিতে চাহিনা যে আমি কোন সমস্যার সকল দিকই দেখিয়াছি। যদি কোন দিকে আমার দৃষ্টি নিপতিত না হইয়া থাকে, সেই দিকে হয়ত গৃহিণীগণের দৃষ্টি পড়িতে পারে—কারণ তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে রহিয়াছেন।

গৃহকর্ম্মের কথা আলোচনা করিতে গেলেই ধর্ম্মের কথা আসিয়া পড়িবে। কারণ আমাদের গৃহকর্ম্মের মধ্যে ব্রত পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিই প্রধান। এমন কি শয়ন-ভোজন স্নান-পান, গমনাগমন প্রভৃতি সহজ ব্যাপার গুলিও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। সুতরাং এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে খুব সাবধান হওয় দরকার। তারপর আর এক কথা আছে, "আচার" এই আচারনিষ্ঠার দোহাই বড় ভয়ানক জিনিস। কোন প্রকার যুক্তি-তর্ক, কোন প্রকার বিচার-বুদ্ধি ইহা মানিতে চায়না। সকল শাস্ত্রকে, সকল বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতাকে এই আচার চিরকাল চাপিয়া রাখিয়াছে। সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, অন্তঃপুরের মধ্যে এমন কি ব্যক্তিগত চরিত্রেও এই আচার পূর্ণ পরাক্রমে অধিষ্ঠান করিতেছে।

নিত্য প্রবহমান কর্ম্মস্রোতের বিপুল তরঙ্গাভিঘাত উপেক্ষা করিয়া যে একটী অচল অটল মৈনাক মাথা তুলিয়া রহিয়াছে, তার নাম "সংস্কার"। এই সংস্কারের পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া সকলের জীবন-তরণীই কিছু না কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। যাহারা শিক্ষিত লোক তাঁহারাও এই সংস্কারের আক্রমণ হইতে নিস্তার পান না। সংস্কার জিনিসটী কি? আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শীতকালের আরম্ভে পল্লীগ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা একটা পথের দাগ পড়ে। এই পথটা কিরূপে তৈয়ারী হয়, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম যে লোকটা চলিয়া যায় সে আপনার ইচ্ছা মত কোন কোন স্থলে একটু দেখিয়া শুনিয়াও বা পা ফেলিয়া যায়—তারপর যে লোকটী যায়—সে অনেক স্থলেই প্রথমের অনুসরণ করে। ক্রমশঃ দাগ পড়িতে আরম্ভ করে; তারপরে যাহারা আসে তাহারা সেই অস্পষ্ট দাগেই পা ফেলিয়া চলে। শেষ কালে দাগটী যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল তখন দেখা গেল পথের রেখাটী সোজা হয় নাই,— অনেক যায়গায় আঁকাবাঁকা। কিন্তু লোকেরা চলিবার সময় সেই আঁকাবাঁকা পথেই চলে—সোজা পথে কাঁটা, কাদা, গোময়, পাথর প্রভৃতি বাধা ও অসুবিধা না থাকিলেও কিছুতেই তারা আঁকা বাঁকা পথ ছাড়িয়া সোজা পথে চলিবে না সংস্কারটীও ঠিক এই রকমের। আমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জীবনযাত্রার পথে যে দাগ রাখিয়া গিয়াছেন সেই সুস্পষ্ট পথরেখা আঁকা বাঁকা হইলেও আমরা সেই পথে চলিতেছি। অপর

সোজা পথ চোখে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও তাহা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না।

নারীগণের কর্মক্ষেত্র অন্তঃপুরে এই সংস্কারের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সেই জন্যই নারীজাতির অবস্থার কোন উন্নতি হয় না, কারণ সংস্কারে মানুষের সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও উদ্ভাবন-শক্তিকে দমন করিয়া রাখে, মানুষের চিন্তা ও ক্রিয়াকে জড়ীভূত করে যাহারা যে পরিমাণে এই সংস্কারের হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারে তাহারা তত উন্নতিশীল হয়। একটা বিপুল প্রস্তর ভারের মত যে জাতির স্কন্ধে সংস্কার চাপিয়া রহিয়াছে, সে জাতি কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের হিন্দুসমাজ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। গৃহকর্ম্মের ক্রমশঃ আলোচনাকালীন আমি এই সংস্কারের প্রভাব দেখাইব।

মানুষ সংসারে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে আসে নাই—চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে সে চাহেও না, কারণ তাহা যে অস্বাভাবিক এ কথা মানুষ জানে। তবে যতদিন সংসারে বাঁচিয়া থাকা যায় ততদিন স্বাস্থ্য ও সুখ বজায় রাখিয়া থাকিতে হইবে,—এই হইল জীবন যাত্রার মূল কথা। আমি জীবনের সকল কর্ম্মের গোড়ায় এই প্রশ্ন করি—ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখ বিধান হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরেই সেই কার্য্য ভাল কি মন্দ, প্রয়োজনীয় কি নিষ্প্রয়োজন তাহা ঠিক করিয়া লই। তারপর একটা কাজ করিবার অনেক পন্থা আছে। যে পন্থাটী সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, তাহাই অবলম্বন করা উচিত। জীবনের সুখ শান্তি বিধানের জন্য যে সকল কার্য্য আমরা করি তাহার কেন্দ্রস্থল হইল আমাদের পারিবারিক জীবন,—অন্তঃপুর। পাশ্চাত্য সমাজে অন্তঃপুর বলিয়া কিছু না থাকিলেও পারিবারিক জীবনটী আছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া আমাদের যে জীবনটী গড়িয়া উঠে,—যে আবেষ্টন ও বন্ধন তৈয়ারী হয়, তাহার মধ্যেই আমরা সুখ শান্তি পাই। আর বাইরে যে সুখশান্তি তাহা ভিতরকারই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং পারিবারিক জীবনে সুখ ও স্বাস্থ্যের বিধানই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

আমাদের সমাজে নারীজাতির উপরই অন্তঃপুরের সকল ভার থাকিবার কথা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নাই। রন্ধন ও তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি কার্য্য করাই অন্তঃপুরের একমাত্র কার্য্য নহে। সন্তান পালন ত করিতেই হয়। ইহা ছাড়াও যে আরও অনেক কাজ অন্তঃপুরেই রহিয়াছে, তাহা আমাদের পুরুষেরাও জানেন না,—স্ত্রীলোকেরাও জানেন না। সেই জন্য আমাদের পুরুষেরা তাঁহাদের ষোল আনা কর্ম্মশক্তি বাহিরে দিতে পারেন না। এ দিকে রন্ধনাদি সামান্য কাজেও নারীগণ নিত্য নিত্য যে বোকামীর পরিচয় দেন তাহাতে সুখ শান্তি ও স্বাস্থ্য কিছুই আর থাকে না।

অন্তঃপুরের নানা কার্য্যে যে সকল ত্রুটী, অসুবিধা ও গলদ আছে, তাহার জন্য দায়ী প্রধানতঃ পুরুষগণ। কারণ আচারনিষ্ঠা ও সংস্কারের আক্রমণ হইতে পুরুষেরাও নিস্তার পায় নাই। তাহার উপরে নারীগণকে রাখা হয়েছে অশিক্ষিতা করিয়া। আমরা বাহিরে যে অশান্তির কোলাহল শুনি তাহার উৎপত্তিস্থল অন্তঃপুরে। বাহিরে যে রোগ শোক ও অস্বাস্থ্যের ছবি দেখিতেছি তাহার রং ফলান হইতেছে অন্তঃপুর থেকে। বাহিরে যে অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা শত প্রকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তার মূল রহিয়াছে অন্তঃপুরে। যাহাতে আমরা চির জীবন জড়িয়ে থাকি, সেই সংস্কারের জাল অন্তঃপুরের মধ্যেই আমাদের দেহ ও আত্মার চারি ধারে বোনা হইতে থাকে। আমরা পুরুষেরা শিক্ষিত হইলেও আমাদের মা, আমাদের স্ত্রী, আমাদের বোন, অথবা আমাদের কন্যা প্রভৃতির অজ্ঞতা ও মূর্খতার দ্বারা আমাদের শিক্ষার সকল সুফলকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।

গৃহকর্ম্মের দোষগুণাদি আলোচনা প্রসঙ্গে যখন এই প্রশ্ন উঠিবে 'ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কিনা' তখন

আমি তাহার এইরূপ মীমাংসা করিব। ইহাতে আমার শারিরীক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তিবিধান করে কিনা। যাহা ইহজীবনে স্বাস্থ্য ও সুখশান্তির বিধান করে আমি তাহাকেই ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করি। ধর্ম্মের আর একটি দিক আমরা দেখি,—তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরের অনিষ্ট না করা। মদ্যপায়ী নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে,—নরঘাতক পরের অনিষ্ট করে, সুতরাং মদ্যপান ও নরহত্যা ক্ষণস্থায়ী সুখের কারণ হইলেও তাহা অধর্ম্ম।

গৃহকার্য্যের আলোচনায় আমি আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিব, তাহা কার্য্য করিবার সুবিধা। যদি কোন প্রণালী আমি সুবিধাজনক মনে করি, তবে তাহা সকল সংস্কার ও আচার নিষ্ঠার বিরুদ্ধ হইলেও আমি তাহা অবলম্বন করিব। যে উপায়ে —যে পন্থায় আমার স্বাস্থ্য রক্ষা,—সময় রক্ষা ও অর্থ রক্ষা হয় তাহাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক —অবশ্য তাহাতে যদি অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। মানুষের বুদ্ধি আছে, —ঈশ্বর মানুষকে চিন্তাশক্তি ও অতুলনীয় জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। মানুষ কোন একটা কাজের সুবিধা অসুবিধা না ভাবিয়া —প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা বিচার না করিয়া অন্ধের মত গতানুগতিক ভাবে কেবল পা ফেলিয়া যাইবে? তা ত সে যায় না। চারিদিকেই ও মানুষ তার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। বাহিরে যখন সে এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, —তখন অন্তঃপুরেই কি কেবল তার মন্থর গতি?

আমরা অতীতে যাহাই ছিলাম না কেন, এখন জগতের মধ্যে ঘৃণিত—পদদলিত—পরাধীন। আমাদিগকে বাধা ঠেলিয়া উঠিতে হইবে। এখন আমাদিগকে সকল দিকে খুব হুঁসিয়ার হইয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া চলিতে হইবে। সময় বাঁচাইতে হইবে, কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে, সহজ ও শীঘ্র পন্থায় চলিতে হইবে। আর দীর্ঘকালের ধর্ম্ম সংস্কারের গুরুতর ভার মাথার উপর চাপাইয়া রাখিলে চলিবে না। অন্তঃপুরে আমাদের একটা বিপুল শক্তির অপব্যয় হইতেছে,—তাহার যথার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন।

আমাদের হিন্দু পরিবারে 'আচার' এবং 'সংস্কারে' যে সব অন্ধ অনুকরণ করা হইতেছে কিন্তু সেগুলি উচ্ছেদের মূলে কেবল শারিরীক ও মানসিক শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যমাত্রকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না আরও দেখিতে হইবে উহা সর্ব্বজনিন নীতি ধর্ম্মের অনুকূল কি না।

সম্পাদক।

শেষ-সাধ

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

অস্তর-শোণিমা ঢালি পৃথিবীর বুকে
অস্তমিত রবি সম—আমার জীবন
যে দিন বিদায় লবে বসুন্ধরা হতে,
স্নেহ-প্রীতি-প্রেম ভরা আঁখি দুটি তুলি
সে দিন আমার পানে বারেকের তরে
চেয়ে দেখো চিরপ্রিয়! সকরুণ দুটি
নয়ন-পল্লবে মম, তব আঁখি-তারা
নিমেষের তরে যেন হয়ে' থাকে স্থির।
তার পরে আমি—চিরপরিপূর্ণ বুকে,
পরিতৃপ্ত সুখ ভরে লইলে বিদায়,
স্মৃতির ফলকে এঁকে সেই ছবি খানি
তুমি চলে যেয়ো ঘরে আপনার কাজে।

রাণী শরৎসুন্দরী

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

(১) পুঁটিয়ার পরলোকগতা রাণী শরৎসুন্দরী নিজ হৃদয়-মাহাত্মে বঙ্গদেশে অমর হইয়া রহিয়াছেন। অতি শৈশবেই তাঁহার এই গুণরাজির বিকাশ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় একদিন পিতা ভৈরবনাথ সাম্ন্যাল জনৈক প্রজাকে কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য প্রহার করিতে উদ্যত হন। ইহাতে বালিকার হৃদয়ে বেদনা লাগে এবং তিনি কাঁদিতে থাকেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভৈরবনাথ প্রজাটিকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করেন।

(২) একবার ভৈরবনাথ তাঁহার কোনও কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করেন। বালিকা শরৎসুন্দরী এই সংবাদ পাইয়া ভাবিলেন,—তাহা হইলে ত লোকটি সপরিবারে অনাহারে মারা যাইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার দুঃখে নিতান্ত কাতরা হইয়া পিতাকে তাহার জন্য অনুরোধ করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি পিতার সম্মুখে যাইয়া ক্রন্দনবেগে অনেকক্ষণ বাকশক্তিহীনা হইয়া থাকিলেন। তাঁহার পিতা কন্যার এই অপূর্ব্ব দয়া দেখিয়া কর্ম্মচারীকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

(৩) অন্য আর একবার ভৈরবনাথ বাটীর পাঁচক ব্রাহ্মণকে কোনও কারণে পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার টাকা দিতে হইলে দরিদ্র পাচককে সপরিবারে বহুদিন অনাহারে থাকিতে হইত। শরৎসুন্দরী ইহাতে নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া কোনও কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পাঁচটি টাকা ধার করিয়া গোপনে পাচককে দিলেন। সেই তদ্দারা জরিমানা দিল।

(৪) অল্পবয়সে শরৎসুন্দরীর পুঁটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত বিবাহ হয়। শরৎসুন্দরী স্বামীকে তদ্গতচিত্তে ভক্তি করিতেন। কিন্তু স্বামীর আদেশেও তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সম্মত হইতেন না। যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের তখন বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি বাটীর বাহিরে অন্যজাতীয় পাচকের হস্তে খাইতেন। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল বালিকা পত্নীকে নিজ পাতে খাওয়াইবেন। সেই আদেশ করিলে বালিকা শরৎসুন্দরী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার পাতে আমি নিশ্চয় খাইব! কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে বাটীর মধ্যে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পাচকের হস্তে খাইতে হইবে।" যোগেন্দ্রনারায়ণ কিছুতেই তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিলেন না। সঙ্কল্পচ্যুত হইলেও তিনি একান্ত অনুগতা পত্নীর এই অটল দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

(৫) অল্পবয়সে বিধবা হইয়া শরৎসুন্দরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন এবং বহু টাকা দান ও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিতেন। তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুত্রের বিবাহের জন্য তিনি দুইটী পাত্রী পছন্দ করেন। অবশেষে একস্থলে বিবাহ স্থির করিলেন। অপর পাত্রীর পক্ষীয়েরা ইহাতে আশাভঙ্গের জন্য মনে বেদনা পাইবে ভাবিয়া করুণাময়ী শরৎসুন্দরী অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তাহাকেও সুপাত্রে বিবাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, "দুইটীই আমার ছেলে এবং দুইটিই আমার বৌ হইল।"

(৬) এই পুত্রের বিবাহোপলক্ষে আগত একটি বৃদ্ধা বিধবা একদিন অসামাল হইয়া শয়নগৃহেই মলত্যাগ করিয়া ফেলেন। নিজের এই অবস্থায় তিনি লজ্জায় মৃতকল্পা হইয়াছিলেন; তাহার উপর দাসী আসিয়া তাহাকে বাক্যযন্ত্রণা দিতে লাগিল। রাণী শরৎসুন্দরী ইহা জানিতে পারিয়া আসিয়া স্বহস্তে সেই মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া সকলকে উহা লইয়া আলোচনা করিতে বারবার নিষেধ করিলেন।

ইহাতে বৃদ্ধা অধিকতর লজ্জিতা হইলে করুণাময়ী রাণী তাহাকে বলিলেন, "মা, পীড়ার সময় সকলেরই এরূপ হইয়া থাকে ; তখন নিজজনেই সেবা যত্ন করে। আমাকে আপনার কন্যা বলিয়া মনে করিবেন।"

(৭) বিধবা হইবার পর হইতেই শরৎসুন্দরী অনেকগুলি নিষ্ঠাবতী বিধবা ব্রাহ্মণীকে নিজের নিকট রাখিয়া ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহাদের অনেকেই নিতান্ত গর্ব্বিতা ও কোপনস্বভাবা ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ত করিতেনই, এমন কি অনেক সময় শরৎসুন্দরীকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতেন, কিন্তু তিনি সকল সময়েই তাহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া সেবাযত্ন করিতেন। একদিন তিনি উহাদের একজনকে আধখানি কাঁঠাল দিবার আদেশ দিয়া নিত্য পূজায় বসিয়াছিলেন। যাঁহার উপর কাঁঠাল দিবার ভার ছিল, তিনি আধখানির স্থলে সিকিখানি দিয়া বলেন, "রাণী-মা উহাই দিবার আদেশ করিয়াছেন।" ইহাতে বিধবাটি ক্রুদ্ধা হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছে, সে কি চোখ কাণের মাথা খাইয়াছে, যে কিছু বলিতেছে না! তবে যা'র কাঁঠাল সে-ই খা'ক!" এই বলিয়া তিনি কাঁঠাল খণ্ড লইয়া শরৎসুন্দরীর পূজোপকরণের উপর ছুড়িয়া ফেলিলেন। পূজা করিতে বসিয়া শরৎসুন্দরী কথা বলিতেন না; এ সময়ে সাংসারিক বিষয়ে কথা বলিলে দেবতার অপমান করা হয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সেই জন্যই তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এই তাঁহার অপরাধ! এখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কথা বলিতে হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কাহারও উপর বিন্দুমাত্রও ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তিনি বিধবাটিকে নানারূপ অনুনয় বিনয় বাক্যে শান্ত করিয়া পূজা-ভঙ্গ হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছু অতিরিক্ত জপ করিয়া পুনরায় প্রথম হইতে পূজা আরম্ভ করিলেন। সেদিন তাঁহার আহারাদি করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। ইহাতে সকলেই বিধবাটির উপর নিতান্ত বিরক্ত হইল। কিন্তু তাঁহার শান্তসমাহিত বদন-মণ্ডলে বিরক্তি বা দুঃখের লেশমাত্র দেখা যায় নাই।

(৮) এই বিধবাদের দুইজন একদিন ঝগড়া করিতে করিতে ঝাঁটাহস্তে পরস্পরকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা উভয়েই মনে করিলেন শরৎসুন্দরীর সাহসেই অপরপক্ষ এরূপ করিতেছে এবং ক্রমে কাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়া তাঁহাকেই অকথ্য গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন দাসীরা তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিল। না ধরিলে তাহারা হয়ত সেদিন রাণীকে মারিয়াই বসিতেন। ইহাতেও কিন্তু মহীয়সী মহারাণী শরৎ-সুন্দরী বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইলেন না, বরং তিনি বলিলেন, "মা, আমার দোষ হইয়া থাকে, আমাকে মার, পরস্পর বিবাদ করিও না।"

(৯) নিজধর্ম্মে নিতান্ত নিষ্ঠাবতী হইলেও শরৎ-সুন্দরী অপরের ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ উদার ছিলেন। একবার তাঁহার কোনও মুসলমান প্রজা গোহত্যা করায় কর্ম্মচারীরা তাহার একশত টাকা জরিমানা করিয়া উহা আদায়ের জন্য তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন! শরৎসুন্দরী ইহা শুনিয়া স্নানাহার ত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন, "কাহারও ধর্ম্ম বা আচারের বিচারক আমি নহি। আমার ধর্ম্ম যেমন আমার নিকট সত্য, অপরের ধর্ম্মও তাহার নিকট সেইরূপ। যে যাহার কুলধর্ম্ম পালন করুক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। আর গোহত্যা পাপের জন্য জরিমানা করিয়া টাকা আমার তহবিলে আনিলে আমি ঐ পাপের অংশী হইলাম; ইহাতে টাকা লইয়া যেন পাপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আমার উদাসীন থাকাই কর্ত্তব্য। আর কখনও কোনও প্রজাকে কোন কারণে এরূপ ভাবে আটক করিয়া কষ্ট দেওয়া বা অবৈধ জরিমানা করা না হয়, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা।" কর্ম্মচারীরা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া ভবিষ্যতে আর এরূপ কার্য্য না করিবার প্রতিজ্ঞা করিলে তবে তিনি স্নানাহার করেন।

(১০) শরৎসুন্দরীর দেশপ্রেমও অসাধারণ ছিল। স্বদেশের কোনও উন্নতির সংবাদ পাইলে তিনি উল্লাসিত হইতেন। সে সময়ে বড় কোনও বাঙ্গালী রাজকার্য্যে বিশেষ কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেন না। এরূপ সময়ে হঠাৎ একদিন মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের বিভাগীয় কমিশনার হইবার সংবাদ পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী স্বজাতীয়ের এই উন্নতিতে রাজবাটীতে আনন্দোৎসব করেন। রমেশচন্দ্রের সহিত তিনি কোন সূত্রে পরিচিত ছিলেন না। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাই তাঁহাকে এই আনন্দোৎসবে নিযুক্ত করিয়াছিল।

শিশুজীবন

শ্রীসামুয়েল বিশ্বাস।

সন্তান ঈশ্বরের দান। তিনি পিতামাতার নিকট তাহার জীবন গচ্ছিত রাখিয়াছেন যেন তাঁহারা তাহাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন। সন্তান-পালন অর্থাৎ সন্তানকে ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা, ইহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ধর্ম্মপরায়ণতা, স্বাধীনচেতা, কার্য্যদক্ষতা, স্বদেশহিতৈষিতা, দানশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ থাকিলে, জগতে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারা যায়, আপন আপন সন্তানদিগকে সেইরূপ ভাবে গঠিত করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। যাহারা শিশুজীবন পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কঠিন হইবে না। যাহা হউক এখন শিশুদিগের প্রবৃত্তি ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

অনেকে মনে করেন যে, শৈশবে শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিবার বিষয় নাই। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। শিশু এই পৃথিবীতে আসিবা মাত্র প্রতি মুহূর্ত্তে জগতের নিকট শিক্ষা করে। ক্ষুধা এবং ভয় এই দুইটি বৃত্তির কার্য্য আমরা সর্ব্ব প্রথম দেখিতে পাই। ক্ষুধা লাগিলে শিশু কাঁদে, এবং দোলাইলে কিম্বা শূন্যে তুলিলে ভয় করে। এই দুইটী বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃত্তির প্রকাশ পায় সেটা সুখ বা আরাম। গরম এবং কোমল শয্যায় শিশু বেশ আরামে থাকে। কিন্তু কঠিন বা ঠাণ্ডা বিছানায় থাকিতে চায় না; আবার ছোট ছোট ভাই বোনদের অপেক্ষা বয়স্কদের নিকট থাকিতে ভালবাসে। ইহার কারণ আরাম বা সুখ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শিশুর চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। অতি ক্ষুদ্র শিশুও শয্যার উপর পনের কুড়ি মিনিট হস্ত পদ সঞ্চালন করিয়া থাকে। শিশুরা কখনই স্থির হইয়া থাকিবে না। তাহারা কিছু না কিছু করিবেই করিবে। এক সময় এক মা তাঁহার এক বৎসরের ছেলেকে পাশে বসাইয়া রান্না করিতেছিলেন। শিশু মাতার অজ্ঞাতসারে তৈলের পাত্রে হাত দিয়া সমস্ত তৈল ফেলিয়া দিল। মা রাগে শিশুর পৃষ্ঠে এমন এক চপেটাঘাত করিলেন যে, তাহার পৃষ্ঠে চারিটি অঙ্গুলি বসিয়া গেল। শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই প্রকার অনেক মা অকারণ তাঁহার সন্তানদিগকে প্রহার করিয়া থাকেন। শিশুর চঞ্চলতা নিবারণ করিতে হইলে, তাহাকে কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত রাখিতে হইবে কিম্বা নানা প্রকার খেলনার সামগ্রী দিতে হইবে। তাহা হইলে সে আর বিরক্ত করিবে না বা কোন কিছু ক্ষতি করিবে না।

শিশুমাত্রেই যাহা দেখে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপে তাহারা নানা বিষয় শিক্ষা করে। জীবজগতের দিকেও দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইব; প্রত্যেক প্রাণী শৈশব হইতে তাহাদের আবশ্যকীয় বিষয় দেখিয়া শিক্ষা করে। সুতরাং মানবশিশু যাহাতে প্রথম হইতে উত্তম উত্তম বিষয়ের অনুকরণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের সম্মুখে আদর্শ জীবন দেখান কর্তব্য। আজকাল গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। সে দোষ তাহাদের নয়, আমাদেরই। আমরা তাহাদিগকে সেরূপভাবে গঠিত করি না।

অনেক শিশু পিতামাতাকে গালাগালি দেয়, কেহ কেহ আবার প্রহার করিয়া থাকে। আবদার বলিয়া কখনও তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রথম হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আবার দেখিতে পাওয়া যায়; পিতামাতাকে তুই মুই করিয়া কথা বলে, বড় ভাই বোনদের নাম ধরিয়া ডাকে। অনেকে বলেন যে বড় হইলে ঐ সমস্ত ভাব আর থাকিবে না। কিন্তু এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যাহারা শিক্ষিত হইলেও পিতামাতাকে তুই মুই করিয়া কথা বলে, তাহাদিগের সহিত কর্কশ ব্যবহার করে, এমনকি মারিতে পর্য্যন্ত যায়। এই সমস্ত ব্যবহারের জন্য কি পিতামাতার মনে কষ্ট হয় না? কিন্তু এ দোষ তাঁহাদেরই।

এমন অনেক পরিবারের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে তাহাদের সন্তানেরা বেশ ভদ্র ব্যবহার করে। কাকা বাবু, দাদা বাবু, মাসীমা প্রভৃতি কেমন কেমন সুন্দর সম্বোধন করে এবং আপনি তুমি ছাড়া কখনও কথা বলে না আর তাহাদের ভক্তিও শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমান ভাবে থাকে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার হইবার কারণ কি আমরা নহি? আমাদের চালচলন, আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা সমস্তই শিশুরা লক্ষ্য করে এবং তাহারা সেইরূপ ব্যবহার করে। সুতরাং আমাদিগকে কতদূর সতর্ক হওয়া উচিত?

অতি চঞ্চল শিশুও স্থিরভাবে বসিয়া গল্প শুনে। ইহার কারণ পরে কি হইবে তাহা জানিবার জন্য। গল্পদ্বারা আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয় তাহাদিগকে শিখাইতে পারি। কেননা গল্পে তাহাদের মন খুব আকৃষ্ট হয়। শিশুরা নানা বিষয় দেখিতে শুনিতে চায়, তাহাদের সে কৌতূহল কখন দমন করা উচিত নহে। সময় সময় তাহাদের এই কৌতূহল দুষ্টামীর কারণ হইয়া থাকে। ঢোলে শব্দ হয় কেন? ইহা দেখিবার জন্য তাহারা চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলে! এই প্রকার কেহ কেহ বাঁশী, খেলনার জিনিস প্রভৃতি নষ্ট করিয়া থাকে। ইহার কারণ যাঁহারা না জানেন তাহারা ছেলেদিগকে প্রহার বা তিরস্কার করিয়া থাকেন।

আমরা জানি শিশু যেমন কথা কহিতে শিখে তেমনি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে থাকে। প্রশ্নের উত্তরে তিরস্কার বা মিথ্যা কোন কিছু বলা উচিত নহে। যথাসম্ভব তাহাদের জ্ঞান অনুসারে তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া ভাল। ইহাতে তাহাদের জানিবার দেখিবার আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধিপায় এবং ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা শিশুজীবনে খুবই বেশী। কেননা শৈশবের অভ্যাস সহজে দূরীভূত হয় না! অনেক ছেলে মেয়ে ৫।৬ বৎসর কিম্বা ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত বিছানায় প্রস্রাব করে। মা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করেন; তাহা হইলে সহজেই ঐ বদ অভ্যাস দূর হয়। ৪।৫ মাস হইতে বিছানায় প্রস্রাব করা ত্যাগ করিয়াছে এমন অনেক ছেলেও আছে। নিয়মিত স্নান, আহার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাতে মুখ ধৌত করা, যথা স্থানে মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি সদ্ অভ্যাস, শৈশব হইতে অভ্যাসে পরিণত করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

বিশ্বাস অতি গুরুতর বিষয় যে শিশুদের জীবনে আমরা যাহা বলি ছেলেরা তাহাই বিশ্বাস করে। সুতরাং আমরা যেন কখনও মিথ্যা না বলি এবং কোন প্রকারে তাহাদিগকে না ঠকাই। যদি কোন প্রকারে তাহাদের মনে অবিশ্বাস জন্মিয়া যায় তবে তাহা দূর করা খুবই কঠিন।

শিশুদিগের বিচারশক্তি ও স্মরণশক্তিও খুব আশ্চর্য্যজনক। আমরা যদি শিশুজীবন বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করি তাহা হইলে তাহাদিগের চরিত্রে নানা বিষয় দেখিতে পাইব। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(পালং বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলাসভায় পঠিত)

আজ আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, আজ আমরা গ্রামের কয়েকটী মেয়ে এক স্থানে একত্র হইবার সুযোগ পাইয়াছি। অন্যান্য গ্রামে গ্রামের প্রবীনারা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীই যাতায়াত করিতে পারেন, শুধু আমাদের গ্রামই এই প্রথার বাহিরে।

আমি আজ মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতেছি। আমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উন্নতির চেষ্টা স্ত্রীলোকেরই হাতে। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, পুরুষরা দাসীর ন্যায় খাটায়, আমাদের নিকট হইতে সেবা আদায় করে কিন্তু আমাদের উন্নতির চেষ্টা করে না। আমি দুই একটি মহিলার মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে, আবার যদি জগতে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করি তবে যেন পুরুষ হই। আমি কিন্তু ইহার বিপরীত বলিব। আমি বলিতেছি আমি যেন জন্মে জন্মে মেয়েমানুষই হই এবং জন্ম জন্ম এই প্রকার বা ইহা হইতে প্রকৃষ্ট ভাবে সেবা করিবার সুযোগ এবং অধিকার পাই।

আমরা রমণীরা যে সেবার অধিকারিনী সেজন্য প্রথমতঃ মঙ্গলময় ভগবানকে তৎপর আমাদের জীবনকে এবং আমাদের সমাজকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

মূল কথা এই আমরাই আমাদের উন্নতি এবং অবনতির জন্য দায়ী। মেয়েদের শিক্ষা উন্নতি সকলেরই মূলে আমি একটী কথা বলিব যে আমরা মেয়েরা কেহই এখন আর নিঃস্বার্থ প্রীতির অধিকারিনী নই, ইহাও আমাদের অবনতির মূল কারণ। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। জননী সন্তান, পতি পত্নী ভ্রাতা ভগ্নী কিম্বা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। শাশুড়ী বউ উভয়েই উভয়ের স্বার্থ লইয়া একেবারে অভিভূতা। ইহাদের পরস্পরের প্রীতি প্রত্যেকেরই স্বার্থের পরিমাণানুসারে। এই বিষয়ে আমার সহিত আমাদের অনেকেরই মতভেদ হওয়া সম্ভব। সে যাহা হউক নিস্বার্থ প্রীতির অভাবই যে নারী জাতির অবনতির প্রধান এবং প্রথম কারণ ইহা বোধ হয় মহিলাগণ কেহই অস্বীকার করিবেন না। এবং ইহাও সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের উন্নতির চেষ্টা আমাদেরই হাতে। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার সুবিধা আমাদেরই করিতে হইবে। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার যে প্রয়োজন তাহাতে এখন আর প্রায় মতভেদ নাই। আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন পুরুষগণ বাহিরের বিষয়ে যতই বিব্রত হয়, ততই স্ত্রীলোকের উপর বেশী নির্ভর করে। ইহাকে প্রকৃত পক্ষে স্ত্রৈণ বলা যায় না।

ভাবিয়া দেখুন প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ যাজন যজন

অধ্যাপনা অথবা যে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে এত বিব্রত যে তাঁহাদের সংসারটীর সম্পূর্ণ ভার স্ত্রীলোকের (অর্থাৎ মা, স্ত্রী; ভগিনী, কিম্বা কন্যার) উপর অর্পণ করিতে হয়। এইপ্রকার বৈদ্য কায়স্থ প্রত্যেকেরি যে পুরুষ যত বাহিরের বিষয়ে বেশী বিব্রত সেই পুরুষেরাই তত অধিক পরিমাণে সংসার বিষয়ক সমুদয় ব্যাপারের জন্য স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা স্বাভাবিক এবং ইহা না করিয়া উপায় নাই। বিশেষতঃ সাংসারিক বিষয়টী স্ত্রীজনোচিত। আমরা যদি এতটুকু কার্য্য করিয়াও (মা, স্ত্রী, যিনিই হউন) পুরুষের সাহায্য করিতে না পারি তবে আমরা কি করিব? আমাদের মহিলাদেরও ত একটী কার্য্য চাই বা কর্ত্তব্য আছে। ইহাও যদি আমরা না করি তবে ত আমরা জড় পদার্থ হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহি। এই সংসার ধর্ম্ম বা সংসার কর্ত্তব্য, ইহা কিন্তু নিতান্ত সোজা কথা নয়, বিশেষ ধনী, মধ্যবিত্ত এবং একান্নভুক্ত পরিবারে। সংসারের কর্ত্রী যিনি তিনি মা, স্ত্রী বা যিনিই হউন, তিনি যদি সঙ্কীর্ণ হৃদয়া হন তবেই সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। গৃহিণীকেই সর্ব্বপ্রথমে নিঃস্বার্থ সেবিকা এবং নিঃস্বার্থ প্রেমিকা হইতে হইবে। যে স্থলে পুরুষ কৃতী শিক্ষিত (শুধু ইংরেজী কলেজে শিক্ষিত নয়) সেখানেই গৃহিণীর উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার। পরিবারস্থ স্বজনগণের প্রতি ব্যবহার ও কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত মা অথবা স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। এই সকল স্থলেই অনেক সময় গৃহিণীদিগের ত্রুটী লক্ষিত হয়। এস্থলে মহিলারা সকল সময়ে স্বামী পুত্রের মান, সম্মান ও কর্ত্তব্যে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য চালাইতে পারেন না। পুরুষগণ তাঁহাদের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া প্রায়ই নিন্দা অপযশের পাত্র হইয়া থাকেন।

এই অবস্থার প্রতিকার পক্ষে মহিলাদিগের চরিত্র-উন্নতিই প্রধান আবশ্যক। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার অনিবার্য্য এবং গুরুতর প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ এই শিক্ষা স্কুলের শিক্ষায় কিছুতেই হইবে না এ শিক্ষার বিদ্যালয় জননীর ক্রোড়। মেয়েরা বাল্যকালে যে ছাঁচে তৈয়ার হয় তাহার প্রায়ই কোন পরিবর্ত্তন হয় না। বর্ত্তমানে মেয়েরা যে শিক্ষা পায় তাহাতে তাহারা গৃহিণী হইলেই প্রভুত্বের অধিকারিণী হয়। কিন্তু প্রকৃত সেবার অধিকারিণী প্রায়ই হইতে পারে না দেখা যায়। নম্রতা, কোমলতা, বাধ্যতার ধার ধারিতে তাহারা বড় পারে না। সুতরাং তাহাদের সন্তান সন্ততিগণও ঐ আদর্শেই গঠিত হইতেছে। আর আমরা বলি এখনকার মেয়েরাই ঐ রকম হয় কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন মেয়েরা ঐ ভাব কোথায় পাইয়াছে এবং পাইতেছে। প্রথম মায়ের কোলে তারপর শ্বশুর শাশুরী প্রভৃতির নিকট। অবশ্য তাহাদের নিজেদের জন্মগত সংস্কারও আছে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; আমি প্রথমতঃ বর্ত্তমান জননীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি কারণ প্রধানতঃ জননীগণকেই একাধারে একই সময়ে জননী ও গৃহিণী এবং শিক্ষয়িত্রীরূপে উন্নতি অবনতির মূলাধার বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ প্রেমের অভাবই উক্ত অবনতির মূল কারণ। প্রেমই অন্তরকে কোমল এবং মধুর করিয়া লোককে সেবাপরায়ণ করে। প্রেমিকার কর্ত্তৃত্বে প্রভুত্ব থাকে না, থাকে স্নেহ ও ভক্তির মধুর বন্ধন। তাহাতে রূঢ় বা কঠোরতা মোটেই থাকিতে পারে না। আমাদের হিন্দুর সংসার সংসারাশ্রম নামে অভিহিত। আমরা হিন্দুমেয়েরা গুরুজনের নিকট পত্র লিখিতে লিখিয়া থাকি "সেবিকা অমুক" ইহা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু ঐ সেবিকা শব্দটী শুধু পত্রে থাকিলেই চলিবে না। 'সংসার-আশ্রম' ও 'সেবিকা' ইহা কার্য্যে দেখাইতে হইবে। সংসার যে আশ্রম এবং আমরা যে সেবিকা ইহা কার্য্যতঃ দেখাইতে হইলেই উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। গৃহিণীই রোগী, শোকী,

সাধক, অনাথ, দরিদ্র প্রভৃতির যাহার যাহা প্রয়োজন, সুযোগ সুবিধা সান্ত্বনা এবং উপদেশ ইত্যাদি প্রদানদ্বারা যথোপযুক্তরূপে সকলের প্রীতি সম্পাদন করিবেন, কারণ আমাদের গৃহস্থাশ্রমই রোগীর শুশ্রূষার, শোকার্ত্তের সান্ত্বনার, সাধকের সাধনার এবং অনাথের আশ্রয় স্থান। সুতরাং গৃহিণীকে অতি ধৈর্য্য, ক্ষমা ও শ্রমশীলতা এবং বাক্য-মধুরতাদ্বারা সকলের সেবা করিতে হইবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পারিবারিক প্রবন্ধে পড়িয়াছি "যে দম্পতিতে পরস্পর প্রকৃত ভালবাসা থাকে সেই দম্পতির গৃহ, পরিবারস্থ সকলেরই জুড়াইবার স্থান হয়। সেই পরিবারে কখনই অন্যায়, অকর্ত্তব্য অপ্রীতি বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।" ইহা অভ্রান্ত সত্য। প্রেম জিনিসটা অতি মহান এবং পবিত্র। বিশেষ দাম্পত্যপ্রেমের চরম উৎকর্ষই ভগবৎ প্রেম। সংসারে স্ত্রী যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকা হন তবে তিনি স্বামীর মান যশঃ সবই আপনারই ভাবিবেন। স্বামী পুত্রের যাহাতে কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে তাহা তিনি কখনও করিতে পারেন না। বাহিরের ব্যাপারে পুরুষ এত ব্যস্ত থাকেন যে সাংসারিক ব্যাপারে তিনি স্ত্রীর কর্ণে শুনেন, স্ত্রীর চক্ষে দেখেন, স্ত্রীর মনে অনুভব করেন, ইহা স্বাভাবিক এবং পুরুষের পক্ষে ইহাই প্রকৃত প্রেমের আদর্শ। ইহাকে স্ত্রৈন বলা যাইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষের সর্ব্ব কার্য্যে সাহায্যকারিনী এবং অংশী হইতে হইবে।

সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও হিসাবাদির ভার মা অথবা স্ত্রীর হাতে লইয়া স্বামী পুত্রের চিন্তা ও পরিশ্রমের ভার লাঘব করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। নিঃস্বার্থ প্রেমিকা না হইলে একার্য্য কিছুতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাই নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য ও নারীর নারীত্ব। এই নারীজনোচিত শিক্ষার মাতৃ ক্রোড়ই প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্থান তাহার সাহায্যকারী মাত্র হইলেও স্কুলেই যাহাতে বালিকাগণ তদনুরূপ শিক্ষা পাইতে পারে আমাদের তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দুগৃহস্থের গৃহ দেবালয়ের মতই ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই ঠাকুর ঘর ও তাহাতে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল এবং তাহার ভোগ ইত্যাদি সহ সেবার বন্দবস্ত ছিল। ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ত কথাই নাই। ব্রাহ্মণগণ বিগ্রহের সেবা ভোগের রান্না প্রভৃতি সমস্ত আয়োজন নিজেরাই সম্পন্ন করিতেন। বৈদ্য কায়স্থ গৃহস্থের গৃহিণীগণও পূজা রান্না ব্যতীত সমস্ত নিজেরাই করিতেন। পূজান্তে বালক বালিকাগণ মহানন্দে প্রসাদ বণ্টন করিয়া খাইত। ইহাতে বাল্যকাল হইতেই বালকবালিকাদের প্রাণে ধর্ম্মভাব ভক্তি এবং একতার ভাব উন্মেষ হইয়া বদ্ধমূল হইত। গৃহিণীগণও নানা প্রকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সেবার অধিকারিণী হইয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করিতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনেক স্থলে এই সুন্দর ভাবটুকুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে। বর্ত্তমান মহিলা সমাজ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে বিগ্রহ সেবা যে স্থলে আছে তাহাও দায়ে ঠেকার মত গৃহস্থের ভারস্বরূপ। ইহার একটি প্রত্যুত্তর আছে যে দেশের দারুণ দুর্দ্দিন অন্নবস্ত্রের দারুণ মহার্ঘতা, ইহা সত্য বটে। কিন্তু দেশের দুর্দ্দিন বলিয়া আমাদের অশন বসন ভোগ বিলাসের কোন ত্রুটী আছে কি? বরং আহার ও পরিচ্ছদআড়ম্বর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের থাকিবার ঘরে কতই নূতন নূতন বন্দোবস্ত, ঠাকুরঘরের দুরবস্থায় কাহারও প্রাণ ব্যথিত হয় কি? অবশ্য যাহারা বিগ্রহাদিতে অবিশ্বাসী তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

হিন্দুমহিলা আমরা— আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মপালন। সংসারের সমুদায় কার্য্য যত্ন সহকারে সম্পন্ন করাই নারীধর্ম্ম রক্ষার উপায়। নিঃস্বার্থ প্রীতিতে সেবাকেই আমি নারীজাতির শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া আসিতেছি। এই নিঃস্বার্থ

প্রীতির জন্মস্থান ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুরাগিণী না হইলে কখনও নিঃস্বার্থ প্রীতি সম্ভবেনা। স্ত্রীলোক আমরা ধর্ম্মের গুরুত্ব কি জানি, কি বুঝি। শুধু প্রেম শুধু ভালবাসাই আমাদের ধর্ম্ম। নিঃস্বার্থ প্রীতির জন্যই ভারতমহিলা ধার্ম্মিকা নামে অভিহিতা।

এখন আমরা নারীজনোচিত স্বধর্ম্মচ্যুতা হইয়াছি। সেই জন্যই নারীজাতির এই অবনতি।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা আমাদের বংশানুগত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছি। "ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থে একটি বক্তৃতায় জগৎপূজ্য স্বামীজী বলিয়াছেন "বালক স্কুলে গেলে প্রথম শিখিল তাহার পিতা একটা মূর্খ, তার পর শিখিল তাহার পিতামহ একটা পাগল, তারপর প্রাচীন আর্য্যগণ সব ভণ্ড আর শাস্ত্র সব মিথ্যা"। বাস্তবিক বর্ত্তমান শিক্ষার ইহাই ফল দাঁড়াইয়াছে। বিপরীত শিক্ষার দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

সংসারাশ্রমই হিন্দু রমণীর প্রকৃত সাধনাশ্রম। প্রকৃত গৃহিণী হইতে হইলে তাহাকে সাধনোচিত সংযম ধৈর্য্য ও ত্যাগের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা আর্য্যমহিলা, হিন্দুমহিলা, আমাদের ত্যাগই প্রধান ব্রত, সেবাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, নিঃস্বার্থ প্রেমই ধর্ম্ম। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মেনিধন শ্রেয়; পরধর্ম্ম ভয়াবহ"। এই বাক্য সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য। আর্য্যমহিলা-গণ কখনও ধর্ম্মচ্যুতা হন না; আজ কেন হইলেন? আমাদের যে সব ত্রুটির উল্লেখ হইল এই সবই পরধর্ম্ম, বিদেশীর আমদানী। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলস্বরূপ পুরুষের মধ্য দিয়াই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এবং পুরুষানুক্রমিক ব্যাধির মত বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হইতেছে।

আমরা মহিলারা যদি চেষ্টা করি তবে আমাদের সমবেত চেষ্টায় নিশ্চয় ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রেমই যেমন আমাদের ধর্ম্ম, তদ্রূপ প্রেমই আমাদের সর্ব্ব বিঘ্ননাশক মহাস্ত্র। একমাত্র প্রেমেই আমরা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র ও নিষ্কাময় রাখিয়া স্বধর্ম্ম অনুপ্রাণিত করিতে পারি।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে নিরক্ষর হিন্দু মহিলাগণ যদি সকল গুণে গুণবতী ছিলেন তবে শিক্ষা শিক্ষা বলিয়া আর এত চীৎকার কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই, বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুমহিলাগণ নিরক্ষর ছিলেন না। পরেও তাঁহারা নিরক্ষর হইলে ব্যবহারিক নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষায় অতি উচ্চ আদর্শ ছিলেন। মহাভারত এবং রামায়ণই আমাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র; পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুমহিলাদের রামায়ণ মহাভারত প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। আমাদের বর্ত্তমান আর্য্যধর্ম্মানুযায়ী শিক্ষাই হিন্দু-মহিলাদের স্বধর্ম্ম, নারীর নারীত্ব পুনরুদ্ধার করিয়া উক্ত অবনতি হইতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে রক্ষা করিবে।

আমাদের স্ব স্ব পল্লীগ্রামে যে সকল বালিকা বিদ্যালয় আছে সেগুলি যাহাতে নারী জাতির স্বধর্ম্মানুযায়ী করিয়া গঠিত করিতে পারা যায় সর্ব্বাগ্রে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। আজ কাল দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাবজনিত কি ভীষণ হাহাকার তাহা সকলেই অবগত আছেন। বালিকাগণ যাহাতে স্কুলে অর্থকরী শিল্প শিক্ষা করিতে পারে প্রথমে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মহিলাগণ নিজ নিজ সংসারের স্ব স্ব অভাব চেষ্টায় ও পরিশ্রমে যতটা লাঘব করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সুতাকাটা এবং তাঁতের কাজ অতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সর্ব্ব প্রথম প্রত্যেক বাড়ীতে তুলাগাছ জন্মাইতে হইবে। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ এ বিষয়ে মনোযোগিনী হইবেন ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

ঘৃত-বিজ্ঞান।

শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা।

"ঘৃতের সাধারণগুণ"—শীতবীর্য্য, সৌম্য, মৃদু, মধুর, স্নিগ্ধকর, অগ্নিবৃদ্ধিকর, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, স্বর লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, তেজঃ, বলবর্দ্ধনকর, দৃষ্টিহিতকর, বিষ এবং ক্ষয়নাশক, উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, মৃগী, শূল, জ্বর ও বাতপিত্তের শান্তিকর; কিন্তু শ্লেষ্মাবর্দ্ধনকর।

১। "গব্যঘৃত-গুণ"—পরিপাকে মধুর, শীতল, বাত পিত্ত এবং বিষদোষ নাশক; দৃষ্টির হিতকারী, বলকর। ঘৃতের মধ্যে ইহাই উৎকৃষ্ট।

২। "ছাগীঘৃত-গুণ"—অগ্নিবৃদ্ধিকর, দৃষ্টির হিতকর, বলবর্দ্ধনকর, কাশ, শ্বাস এবং ক্ষয় রোগের উত্তম পথ্য, সহজে হজম হয়।

৩। "মহিষ-ঘৃতগুণ"—মধুর রস, গুরুপাক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত এবং বাতপিত্ত নাশক, শীতল।

৪। "মেষীঘৃত-গুণ"—সহজে হজম হয়, পিত্তের প্রকোপকর নহে, কফ এবং বায়ুরোগে, শোষরোগে এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর।

৫। "ক্ষীরঘৃত গুণ"—মলরোধক, রক্তপিত্ত, ভ্রম মূর্চ্ছার শান্তিকর এবং চক্ষু রোগের হিতকর।

৬। "ঘৃতের চাঁছী-গুণ"—মধুর, সারক কর্ণশূল, নেত্রশূল এবং শিরঃশূলের শান্তিকর। ইহা বস্তিক্রিয়া, নস্য এবং অক্ষিপূরণে উপদিষ্ট হয়।

৭। 'পুরাতন ঘৃত-গুণ"—সারক, পরিপাকে কটু" ত্রিদোষ নাশক, মূর্চ্ছা, মেদ, উন্মাদ, উদর রোগ, জ্বর, কাস, গরল, শোথ, মৃগী, শ্বাস, কুষ্ঠনাশক, যোনীশূল, কর্ণশূল এবং নেত্রশূলের শান্তিকর, অগ্নি দীপ্তিকর। ইহা বস্তি ক্রিয়া, নস্য এবং অক্ষি পূরণে ব্যবহৃত হয়। বহু দিনের পুরাতন ঘৃতকে মহাঘৃত কহে। ইহা কফঘ্ন এবং বায়ু প্রধান ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর, পবিত্র এবং মেধাজনক।

চাঁদবিবি।

শ্রীরাখালদাস গোস্বামী বি-এ

আমেদনগর দুর্গ ঘিরে
মুরাদসেনা কল্লোলে;
এক পলকে বিশটা গোলা,
প্রাকারে হায় ওই জ্বলে
পণ করেছে মোগল রাজা
ভগ্ন আমেদনগর শিরে,
উড়বে তাহার বিজয় নিশান
দীর্ঘ যুগ ও যুগান্তরে।
পশ্চিমে ঐ দুর্গ-প্রাকার
কতকটা তার পড়ল খ'সে
লুব্ধ হাজার মোগল সেনা
ছুটল মহা উল্লাসে।
দাঁড়াল কে একলা সেথা
ভগ্ন প্রাকার-দ্বারপথে;
বাম করে তার নগ্ন অসি
জ্বলছে সাঁঝের আলোকেতে।
নীল লাজে তার মুখটী ঢাকা
দুলছে পিঠে মুক্তকেশ,
ভয়ঙ্করী যুদ্ধদেবী
পরল একি নারীর বেশ!
এক নিমিষে শান্ত হল
মূর্ত্তি হেরে, যুদ্ধধ্বনি;
উদ্যত সব বর্শাফলক
আতঙ্কেতে চুমল ভূমি
কম্পিত ঐ সিপাই-হাতে
রইল ধরা অগ্নিশিখা;
সাহাজাদীর সিক্ত ভালে
উঠল বহুল জটিল রেখা।
দাঁড়াল কে ভয়ঙ্করী
এলোকেশী স্বর্ণহারা!
পাষাণ স্তরে অমন ক'রে
ছুটিয়ে দিলে ভয়ের ধারা!
যুদ্ধপাগল সৈন্য সাগর
দূরে দূরে পড়ল হটে;
এলোকেশী চাঁদবিবি ঐ
ভগ্নপ্রাকার-দ্বারের পথে।

খাসিয়া নারী।

শ্রীমতী আশালতা দেবী।

এদেশের নারীরা স্বাবলম্বনশীলা। জীবন যাত্রায় ইহারা কাহারো মুখাপেক্ষিনী নহে।

ইহাদের কুসুমকোমল দেহে পুরুষোচিত সামর্থ্য বর্ত্তমান। ১/ মন বোঝা বহিয়াও অনায়াসে সুউচ্চ খাড়াই বাহিয়া উঠিতে পারে। বড় ঘরের মেয়েরা অসঙ্কোচে কাপড়ের বস্তা পিঠে বহিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বিক্রি করে। সাংসারিক কাজে পুরুষের সাহায্য ইহারা সামান্যই পাইয়া থাকে। গৃহের কাজ, সন্তান পালন এবং অর্থ উপার্জ্জন সবই ইহারা করে। কোন কোন শ্রেণীর মেয়েরা কুলীর কাজ চাকরাণীর কাজ এবং ফল মাছ তরকারী এবং কাঠের ব্যবসা করে। সারা দিনের পরিশ্রমেও ইহারা স্ফূর্ত্তিহীন হয় না, সকাল ৮টার মধ্যেই রান্না খাওয়া সারিয়া বাহিরের কাজে বাহির হয়, বিকাল ৫ টায় বাড়ীতে ফেরে এবং সমস্ত গৃহস্থের কাজ করে। ঠিক সময়মত কাজ করে, ইহাদের সময়ের অপব্যবহার হয় না। সপ্তাহে দুইদিন কাপড় কাচে এবং রবিবার ছুটীতে কাটায়। কঠিন পরিশ্রমে এবং ভীষণ শীতেও ইহাদের শরীরের কোমলতা নষ্ট হয় না বা বর্ণ মলিন হয় না।

ইহারা বাড়ী ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজাইয়া রাখে। সাধ্যানুযায়ী সকলেই বাড়ীতে ফুল বাগান করে এবং বাগানের কাজও আনন্দের সহিত নিজেরাই করে। পোষাক ইহাদের সুন্দর। ইহারা বাহিরে কাজ করে বটে কিন্তু নির্লজ্জ নয়। মুখ ও হাতপাদুখানি ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশ ঢাকিয়া থাকে। সেমিজ বডিজ এবং উপরি উপরি ৪ খানা চাদরে সুন্দর ভাবে শরীর ঢাকে। ইহারা সুন্দরী, সুগঠনা এবং ইহাদের শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল গোলাপী। আজকাল এদের মধ্যে কয় একটা ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে এবং কলিকাতায় কতক গুলি শিক্ষিতা নার্স আছে। তাদের অনেকে ইংরাজি সুন্দর ভাবে বলিতে পারে। ইহারা জীবন আনন্দের সহিত কাটায়, আমাদের ন্যায় কল্পিত অভাব ইহাদের নাই। থিয়েটার বায়স্কোপ ঘোড় দৌড়ে আনন্দের সহিত যোগ দান করে। গহনার প্রতি ইহাদের বেশী আকর্ষণ নাই। তবে খুব ছোট দুল সকলেই পরিয়া থাকে, হার বালা কচিৎ কেউ পরে। কেউ কিছু বাহুল্য ভালবাসে না। মেয়েরাই এদেশে পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী। বিবাহের বয়স ইহাদের ঠিক নাই। সুবিধানুযায়ী বিবাহ করিয়া থাকে এবং বিবাহের পর ইহারা আদর্শ স্ত্রী হইতে চেষ্টা করে।

বিবাহোপলক্ষে অসমীয়া হিন্দু মহিলার সামাজিক প্রথা।

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

বঙ্গীয় হিন্দুদিগের প্রথা অনুসারে বিবাহের দিন স্থিরের পূর্ব্বে সপ্তাহকাল মধ্যে কোন একটী শুভক্ষণে বর ও কন্যার গাত্র হরিদ্রা হইয়া থাকে। বরের বাড়ী, কন্যার বাড়ী হইতে ৪।৫ ক্রোশের মধ্যে হইলেও এবং ঐ দিন ৩।৪ ঘণ্টা পরেও যদি পঞ্জিকাতে শুভক্ষণের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বর পক্ষ বরের গাত্র হরিদ্রার পর নাপিত দ্বারা কন্যার বাটীতে ঐ হরিদ্রার কিয়দংশ পাঠাইয়া থাকেন। সেখানে উহাই কন্যাকে মাখান হয়। বর কন্যার বাড়ী পরস্পর দূরবর্ত্তী স্থানে হইলে এবং কন্যার বাটীতে হরিদ্রা পাঠান অসুবিধাজনক বোধ হইলে এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কথা অনুসারে একই দিনে একই শুভক্ষণে বরের বাটীতে বরের এবং কন্যার বাটীতে কন্যার গাত্র হরিদ্রা হইয়া থাকে। কিন্তু অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। ৩ দিন, ৫ দিন অথবা ৭ দিনের দেশীয় অনুষ্ঠান অন্তে ঐ সকল অঞ্চলের অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকে। যে দিন বিবাহ হইবে তাহার এক দিন পূর্ব্বেই অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহের অধিবাস হয়। অধিবাসের দিন "কলর গুরিত গা ধুওয়ান"র কালে অর্থাৎ কলা গাছের নিকট বর কিম্বা কন্যাকে স্নান করাইবার সময় উভয়ের গাত্র হরিদ্রা হইয়া থাকে। আপার ও সেণ্ট্রাল আসামে (মঙ্গলদৈ মহকুমা ব্যতীত) "জোড়ন পিন্ধোয়া"র দিন "কলর গুরিত" বর এবং কন্যার গাত্র হরিদ্রা হয়। ঐ দিন হইতে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত যে কয়দিন পঞ্জিকা মতে অশুভ, সেই কয় দিন ব্যতীত প্রত্যহই গাত্র হরিদ্রা হইয়া থাকে। তবে বিবাহ দিবসের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহই বর ও কন্যাকে তাহাদিগের নিজ নিজ বাটীতে "কলর গুরিত" স্নান করাইবার রীতি অসমীয়া হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অসমীয়াদিগের "কলর গুরিত গা ধুয়া" প্রথাটী কিরূপ তাহা হয়তো জানিবার আগ্রহ অনেকের জন্মিতে পারে। এই বিষয়টি হইতেছে—প্রত্যূষে বরের বাটীতে বরের মাতা, কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা গ্রামস্থ সম্পর্কীয় ও অন্যান্য মহিলাগণ সহ মিলিত হইয়া ঢাক ঢোল খোল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সহ গীত গাহিতে গাহিতে নদী কিংবা পুষ্করিণীর ঘাটে যান। সেখানে যাইবার কালে বর কিম্বা কন্যার মাতা ও অন্যান্য মহিলারা হস্তে মৃৎঘট ও একটি ডালায় প্রদীপ, হরিতকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ঘাটে কবিয়া জল আনিয়া সেগুলিকে গৃহ মধ্যে সযত্নে রাখেন। অতঃপর বাড়ীর লোকে একটি কলা গাছ আনিয়া উঠানের কোন এক পার্শ্বে পুতিয়া দেন। এই কলা গাছের তলায় বর কিম্বা কন্যাকে উপবেশন করাইয়া স্নান করাইবার জন্য আসন স্বরূপ কয়েকটি খণ্ডিত কদলী কাণ্ড পাশাপাশি বিছাইয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর কিম্বা কন্যাকে ঐ আসনে বসান হয়। বর অথবা কন্যার মাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকেরা পেষিত মাসকলাই, হরিদ্রা, প্রভৃতি দ্রব্য বর কিম্বা কন্যার গাত্রে লেপন করতঃ উক্ত ঘটস্থ জল দ্বারা স্নান করাইয়া দেন। চূড়াকরণের সময় দুপুর বেলায় এইরূপ নিয়মে স্নান করান হয়। নিম্ন আসামে ইহাকে "কলর গুরিত গা ধুয়া", মধ্য ও পূর্ব্ব অঞ্চলে পাণি তোলা বলা হয়। নিম্ন আসামে বিবাহের দিনেই ঐ প্রকারে জল আনা (পাণি তোলা)

হয়। কিন্তু উপর আসামে বিবাহের ৩ দিন, ৫ দিন অথবা ৭ দিন পূর্বে নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে এই প্রকারে গৃহে জল আনাইয়া বর কিম্বা কন্যাকে স্নান করান হয়। এতদ্ব্যতীত চূড়াকরণ, উপনয়ন আদি সংস্কার কালে "কলর গুরিত" অসমিয়া হিন্দুদিগের স্নান করিবার (গাধুওয়ার) প্রথা প্রচলিত আছে।

বিবাহ পূজা ও অন্যান্য কর্ম্ম কাণ্ডের সময় সাধারণ অসমীয়া হিন্দুমহিলারা অবাধে গীত গাহিয়া থাকেন। অন্য কোন সময়ে তাঁহাদের গীত গাহিবার রীতি নাই। তবে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে গৃহকর্ম্ম করিবার কালে অনেক সময় স্বেচ্ছায় গান গাহিয়া থাকে। কাছাড় অঞ্চলে সকল জাতির মহিলাদিগের বিবাহকালে গীত গাহিবার রীতি আছে। "কলর গুরিত গাধুওয়া"র কালে উজনরই অঞ্চলের অসমীয়া হিন্দু মহিলারা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের নামগীত গাহিয়া থাকেন :—

কলর গুরিত গোয়ানাম।
সলাগ লৈ জেঠেরি মুচকাই হাঁহিলে
বৈনাই বর ভাল বুলিছে।
অলপৈ মতিয়া বৈনাই কুমলিয়া
ছত্র ধরিছে তুলিহে॥
শহুরর পদুলি দফা দমকা
কি ফুল ফুলিলে হালিহে।
পিদ্ধিবর মনগল, জেঠেরি বৈনাই
ইন্দ্র মালতীর চাকিহে॥
শহুরর মরমে, বারু দেখিলো
ছপাই কল গুরিত থলহে।
শাহু আইর মরমে নিছেই নিদারুণে
জিয়েকক পঁইতা যাচেহে॥
জিয়েকে বুলিছে মই কিম খামে
স্বামী কলগুরিত আছেহে,
কিনো কল পুলি কলাই ঐ জেঠেরি
হালি জালি পরে কে॥

অসমিয়া শব্দার্থ :—সলাগ—কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। বৈনায়—ছোট ভগ্নিপতি। কুমলিয়া—কোমল, দফা—দমকা—উঁচু—নিচু, হালি—হেলিয়া, চাকি—মণ্ডল, বারু—ভাল, ছপাই—ধরিয়া আনিয়া, কল—কলাগাছ, থলে—স্থাপন করিল, আই—মা নিছেই—একেবারেই, পঁইতা—পান্তা ভাত। খামে—খাইব, কিনো—কি প্রকার, কলপুলি—কলাগাছের চারা, জালিয়া—ঝুলিয়া।

নিম্নে কামরূপ অঞ্চলের মহিলাদিগের একটি কলর গুরিত গাদ বা গীত প্রদত্ত হইল :—

১। কলর গুরিত গোয়ানাম।
কাহিত করি আনা মায়ে পিতলরে কাকে
কলর গুরিক আগ মায়ে ধুরাবাক লাগে॥
সোণার খুটিগাছা, কলত ধরি আছা,
মায়েরে ধুরাব বুলি।
মাহতে মঠা দিলা, তৈলতে হালধি।
খুসিবা লাগিছে মায়ে সুগন্ধ মালতি॥
প্রথমেতে মাহদিবা, মলা শান্তি লোক।
হালধিরে লক্ষ্য আনি ঘুসিবা গায়ত॥

সোনার খুটিগাছা—সোণার পুতুল।

কাহিত করি...বুলি—বর বা কন্যার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইতেছে।

সোণার খুটিগাছা...বুলি—বর অথবা কন্যা কলাগাছ ধরিয়া থাকে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—স্বর্ণের পুতুলটি কলাগাছ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মা আসিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দিবে।

২। কলর গুরিত স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান কালের গীত—

সোণা পিন্ধা রূপা পিন্ধা পিন্ধা পাটর শাড়ী।
দেবাঙ্গভূষণ পিন্ধা ইন্দ্রে দিছে আনি॥
কারে কম্পে চিয়া, বস্ত্র আনি দিয়া
আমারে দয়ারে আই।
আথে বেথে করি দৈবকী সুন্দরী
আনি দিলা পাটর ভুনী।
পাটর ভুমুকা চিতর পাগুরী
আনিয়া দিলে রুক্মিণী
পাটর পচরা, সোণার গল ছোলা
সর্ব্ব গায়ে জিলিমিলি।
অতি বিতোপন আনিবা বসন
সভাত যেন শুবাই॥

পচরা—চাদর। শুবাই—ভাল দেখায়, শোভা করে।

ক্রমশঃ

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১৮)

সেবিকার স্বহস্ত লিখিত পত্রখানা যখন সরিত পাইল তখন সে বুকের মধ্যে একটা মৃদু কম্পন অনুভব করিল।

সেবিকাও কি অসীমের সেই ভয়ানক কথাটা শুনিতে পায় নাই? অসীম তাহাকে অমন করিয়া শুনাইল, স্ত্রীকেও কি বলিতে ছাড়িয়াছে? নিশ্চয়ই বলিয়াছে। সেবিকা তাহা সত্ত্বেও তাহাকে পত্র-পাঠ যাইতে লিখিয়াছে কেন?

রামলালকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল ললিতবাবুর বড় অসুখ। কাল সেই জ্বর আসিয়াছে, আজ এখনও তিন ডিগ্রির উপরে রহিয়াছে।

সরিতের মনের সকল দ্বিধা কাটিয়া গেল। সে তখনই গায়ে অলষ্টারটা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও আটটা বাজে নাই। কুয়াসাতে চারিদিক তখনও পূর্ণ হইয়া আছে। মাথার উপর আকাশটা সামান্য একটু পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে মাত্র।

অসীম উঠিয়াছে কি না সরিত রামলালকে জিজ্ঞাসা করিল। রামলাল বলিল "ছোটবাবু আটটার কমে বিছানা হতে ওঠেন না; এখনও উঠতে দেরী আছে।"

সরিত ভারি আরাম পাইল, অসীমের সম্মুখে যেন তাহাকে আর না পড়িতে হয় তাহাই সে কামনা করিতেছিল। ললিতবাবুর উপদেশে রামলাল তাহাকে খিড়কির দরজা দিয়া ভিতরে লইয়া গেল। হেমলতা তখন কলতলায় মুখ ধুইতেছিলেন, সরিতের আগমন জানিতে পারিলেন না।

গৃহের দরজার সম্মুখেই সেবিকা দাঁড়াইয়া ছিল। সরিতকে দেখিয়া সে বলিল "এই যে বাবা ঠাকুর-পো এসেছে।"

একটু সঙ্কোচের ভাবও তাহার মধ্যে জাগিয়া ছিল না। সরিত নিজে প্রথমটা ভারি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেবিকার ভাব দেখিয়া তাহার সঙ্কোচও সরিয়া গেল।

ললিতবাবু শুইয়া ছিলেন, সরিত আসিয়াছে শুনিয়া চাহিলেন; বলিলেন "এসেছ বাবা? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা বলবার মত আছে। চেয়ারখানা এদিকে টেনে নিয়ে এসে আমার কাছে বসে সব শোন।"

সরিত তাঁহার মাথার কাছে বিছানার ধারে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একটা কথাও সে কহিতে পারিল না, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার বুকটা কাঁপিতেছিল।

ললিতবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি কিছুতেই প্রথমে বুঝতে পারিনি কেন তুমি আস না। তারপরে সব কথা শুনলুম। এই অমত

অপবাদ দিয়েছে তোমারই প্রিয়বন্ধু, যাকে তুমি ছোটবেলা হতে তোমার বুকের আড়াল করে ঢেকে নিয়ে বেড়িয়েছ। সংসারটা এমনই জিনিষ বাবা, এখানে সবাই শত্রু হয়ে উঠে। আমার যে ছেলে সে, কিন্তু কেমন কর্ত্তব্য পালন করেছে! যাক সে কথা, আমি এ কথা বিশ্বাস করিনি। তোমার সন্ধানে পরদিনই রামলালকে পাঠালেম, কিন্তু সে এসে বললে তুমি তোমার বোনকে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে কলকাতায় চলে গেছ।"

সরিত মাথা নত করিয়া বসিয়া ছিল; ধীর ভাবে বলিল "না, আমার দরকার ছিল তাই গিয়েছিলুম, অসীমের কথা শুনে যাইনি।"

ললিতবাবু বলিলেন "আমার কাছে মিছে কথা কেন বাবা? আমি কি বুঝতে পারছিনে তুমি কি আঘাতটা তার কাছ হতে লাভ করলে! তুমি কি স্বপ্নেও কখনো ভেবেছিলে যে সে যখন তোমার সঙ্গে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কথা বলে, তার বুকটা তখন জলে যায়? তুমি কি কখনও জেনেছিলে সে বিষাক্ত ছুরি তুলে রেখেছে, অবসর পেলেই তা তোমার বুকে বসিয়ে দেবে? আর এই যে মেয়েটা—চাও দেখি এর পানে সরিত। দেখ দেখি কত দূর নিগৃহীত করা হয়েছে একে? আমার নিজেরই ছেলে সে—এই ভেবেই যে আমার আরও বেশী দুঃখ হচ্ছে, আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সরিত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল "আর সে সব কথা তুলে কি করবেন? যা হয়ে গেছে তার তো আর হাত নেই, মিছে মনে করে কষ্ট পাওয়া কেবল।"

ললিতবাবু কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন "মনে করতে হয় না সরিত, মনের দিকে তাকালেই দেখি সব কথা গুলো জল্ জল্ করে জলছে। আমার জন্যে ওরা কি আমার খাতির করে? এই আঘাতটা যে বড়ই দিলে আমার ওরা যেন আমার জন্যে ওরা আমায় চায় না, টাকার জন্যে চায়। কথাটা চিরকালই জানি, বলেও থাকি, কিন্তু সেটা তো মনের কথা নয়, হৃদয়ের জালা নয়। এই যে কাল সারাদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলুম, ছেলে একবারও তো উঁকি দিয়ে দেখে যায়নি। স্ত্রী একবার দুপুরে এসে কতকগুলো মন্তব্য ছেড়ে গেলেন, রাত্রে এসে দয়া করে একটু জেনে গেলেন কেমন আছি। ছেলে ঠিক জেনে আছে সম্পত্তি তারই, কাজেই খোসামোদ করার দরকার নেই তার। লোকনিন্দারও ভয় করে না সে, ধর্ম্মের ভয়ও করে না সে। যদি লোকনিন্দা কি ধর্ম্মের ভয় করত, তাহলে হাজার লোকের সামনে ধর্ম্ম সাক্ষ্য রেখে যাকে গ্রহণ করেছিল, তাকে আবার ত্যাগ করতে পারত না। স্ত্রী ধর্ম্মের ধার ধারেন না, লোকনিন্দার ধার একটু ধারেন আর সম্পত্তির আশাটা রাখেন তাই দুবার এসে দয়া করে দেখে গেলেন, এই তো সংসার!"

অনেকক্ষণ উত্তেজিত ভাবে কথা কহিয়া তাঁহার গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সেবিকার পানে চাহিয়া বলিলেন "একটু জল দাও মা।"

সেবিকা তাঁহার মুখে জল দিল।

ললিতবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি সকলের আশায় ছাই দেব। আমার সম্পত্তি আমি কাউকেই দেব না, বউ-মার নামে সব উইল করে দিয়ে যাব।"

সেবিকা চমকাইয়া উঠিল; আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমি কিছুই নেব না।"

ললিতবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "চুপ কর, এর মধ্যে তোমার কথা বলবার মত কিছু নেই। আমার যা আমি করব, আমার যাকে খুসি তাকে দিয়ে যাব, তাতে কথা ব'লবার অধিকার কারও নেই।"

সরিত বলিল, "আমি কি করব বলুন?"

ললিতবাবু বলিলেন "তোমার অনেক কাজ আছে, এ কাজটা আমি এত নিঃশব্দে করতে চাই যেন অসীম কি আমার স্ত্রী কেউ জানতে না পারে।

তোমাকে সাক্ষী উকিল যা দরকার সব এই ঘরে আনতে হবে, লেখাপড়া করতে হবে। তার পর, শুধু যে উইলটা করা হল আর তোমার সম্বন্ধ ফুরাল তা মনে ক'রনা। তোমাকে আমার সম্পত্তির একজিকিউটার করে রেখে যাব। তোমার দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। তুমি উপযুক্ত লোক বলেই আমি তোমার হাতে সব দিয়ে যাচ্ছি। বউ-মা ছেলে-মানুষ, সকলেই ওকে ঠকাবার চেষ্টা করবে। তুমি থাকলে, সব দেখাশুনা করবে। আর দেখ, যতদিন না অসীম বউ-মাকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ না করবে, ততদিন আমার সম্পত্তির এক পয়সা যেন তাকে না দেওয়া হয়। আর, কুড়ি হাজার টাকা আমার স্ত্রীর আছে, সেটা শোধ দিয়ে দিতে হবে।"

সরিত একটু থামিয়া বলিল "আপনি এখন অত ভাবছেন কেন? জ্বর হয়েছে, দু'দিন বাদেই সেরে যাবে—"

বাধা দিয়া হাসিয়া ললিতবাবু বলিলেন, "এ জ্বর কাল-জ্বর বাবা, এ জ্বর আমাকে না নিয়ে যাবে না আমি বুঝতে পেরেছি। সংসারের ভাব দেখে শুনে আমার আর তিলার্দ্ধ বাঁচতে ইচ্ছা করছেনা। বউ-মার জন্যে বিষম ভাবনা ছিল। আজ সে ভাবনাটা কতকটা মিটল। সম্পূর্ণ মিটবে সেই দিন, যেদিন উইলখানা শেষ হয়ে যাবে। তুমি আজই কি করতে পারবে না সরিত?"

বিস্মিত ভাবে সরিত বলিল "আজই?"

ললিতবাবু বলিলেন "হ্যাঁ আজই। তুমি জাননা আমার হার্টডিজিজ আছে। আজ কয়েক মাস ধরে আমি হার্টফেলের আশঙ্কা করছি। কোন সময় কি হয়ে বসে কিছুই ঠিক নেই তার। বলা যায় কি এক ঘণ্টার মধ্যে আমায় হয়তো তুমি শ্মশানে দেখতে পাবে। আজ দুপুরেই যদি কাজটা করতে পার তার চেষ্টা দেখ না কেন? অসীম এগারটার মধ্যে কোর্টে চলে যাবে; সে কিছুই জানতে পারবে না।"

সরিত বলিল "তাকে একেবারে বঞ্চিত করবেন?"

দৃঢ়স্বরে ললিতবাবু বলিলেন "হ্যাঁ, একেবারে।"

সরিত বলিল "মনে করে দেখুন সে আপনারই ছেলে। সেই তো মূল। সে বিয়ে করে এনে দেছে বলেই বউদিকে পেয়েছেন আপনি।"

ললিতবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন "আমায় আমার সঙ্কল্প হতে বিচলিত করবার চেষ্টা ক'রনা সরিত। সে আমার পর যদি হত আমি তাকে দয়া করে কিছু দিতে পারতুম। সে আমার ছেলে বলেই আমি তাকে এই দণ্ড দিতে অগ্রসর হয়েছি। পরের দোষ ক্ষমা করতে পারি কিন্তু নিজের ছেলের দোষ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনে। আমার দেওয়া দণ্ড মাথা পেতে নিতেই হবে তাকে।"

গৃহমধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুধু নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল, কেহ একটা কথা কহিতে পারিল না।

সরিত বলিল "তাহলে আপনি আজই কাজ শেষ করতে চান? আমি দুপুর বেলা অমিয় সেনকে নিয়ে আসব, আপনার যা খুশি করবেন। তবে দয়া করে আমাকে একজিকিউটার করবেন না, আমি এইটুকু আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

যাহার নামের সহিত তাহার নাম জড়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহারই সম্পত্তি তাহাকে দেখিতে হইবে, তাহার সহিত মিশিতে হইবে ইহা ভাবিতে সে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার হাতখানা টানিয়া লইয়া ললিতবাবু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "কিছু কুণ্ঠা রেখ না তুমি। আমি বুঝতে পারছি তুমি অসীমের সেই কথাটা মনে করে পিছিয়ে যাচ্ছ। আমি তোমায় সে কথা ভুলে যেতে অনুরোধ করছি সরিত, আশা করি আমার অনুরোধ তুমি রাখবে। বউ-মা যে অসীমের স্ত্রী এ কথা তুমি ভুলে যাও। মনে কর সে তোমারই সহোদরা বোন। অসীমের দিক হতে

তুমি তার দিকে চেয়ো না, তোমার দিক হতে চাও, কোনও কুণ্ঠা আসবে না, একটু সঙ্কোচও জাগবে না।"

সরিত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আমি এ ভার নেব। আমি তা হলে একটার মধ্যে আনব তাঁকে নিয়ে। আর আপনার যাকে যাকে সাক্ষী করবার দরকার হয়—"

বাধা দিয়া ললিতবাবু বলিলেন "সে তুমিই নিয়ে আসবে। এখানকার সকল লোককেই তো তুমি চেন। তোমাকে আর সে সব কথা কি বলে দেব সরিত। আমি তোমার উপরে সব ফেলে দিচ্ছি, তুমিই সব কর।"

সরিত বাহির হইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে অসীম পিতাকে দেখিবার জন্ম প্রাঙ্গণ পার হইয়া আসিতেছিল। সরিতকে দেখিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

সরিত তাহার পানে চাহিল না, তাহার সহিত কথাও কহিল না। সে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যেন অসীমকে দেখিতে পায় নাই এমনই ভাব করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

অসীম একটুখানি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কম্পিত পদে ফিরিল। পিতাই যে সরিতকে ডাকাইয়াছেন তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। তীব্র বিরক্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। যাহাকে সে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, পিতা আবার তাহাকেই আদর করিয়া গৃহে ডাকিয়া আনিলেন! পিতার উপর অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে আর পিতাকে দেখিতে গেল না।

পুত্রবধূ আর সরিত, ইহারাই তাঁহার আপন হইল আর সে পুত্র হইয়া হইল পর? উহারা এমন করিয়া তাঁহার স্নেহটা কাড়িয়া লইল যে অসীমের জন্ম কিছুই রহিল না?

সেই দিন দুপুর বেলাতেই উইল প্রস্তুত হইয়া গেল। রেজেষ্ট্রী করিবার জন্ম সরিত তখনই চলিয়া গেল।

শ্বশুরের পায়ের উপর মুখ রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সেবিকা বলিল "আমার এ কি করলেন বাবা? সর্বস্ব দান করে যে গৌরবটুকু আমি অর্জন করেছিলুম, তা এমন করে কেন বিসর্জন দিলেন; মুখ দেখাবার যে একটু পথ ছিল আমার তাও বন্ধ করলেন?"

ললিতবাবু বলিলেন "আমি তোমাকে যা দিয়ে গেলুম মা ভবিষ্যতে এ-ই তোমার আসনে তোমায় প্রতিষ্ঠিতা করবে। তুমি কিছু ভেবনা। দেখবে এতেই বিশ্ব তোমার পায়ের তলায় লুটোবে, তোমার জিনিস সবই তুমি ফিরে পাবে। ভেঙে পড়ছ কেন মা? পায়ে জোর কর, হৃদয়ে বল আন। সরিতের কাছে উইল থাকল কারণ তাকে আমি আমার মতই বিশ্বাস করি। তোমায় কিছু করতে হবে না, কোন দায়িত্ব নিতে হবে না, যা করবার সেই করবে, তুমি শুধু দেখবে মাত্র।"

(ক্রমশঃ)

বাংলার শিশুমৃত্যু

প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগই শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ। সন্তান যখন প্রসূতির গর্ভে থাকে তখন থেকে সন্তান ছয় মাসের হবার পর পর্য্যন্ত প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপর খুবই দৃষ্টি রাখা দরকার। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস এবং যাহাতে প্রসূতি সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে ও প্রফুল্ল চিত্তে থাকিতে পান তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

বাংলায় প্রতিদিন একশত আশিটি প্রসূতি সন্তান প্রসবকালে মারা যান। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাবধান হইলে ইহারা অনেকে রক্ষা পাইতে পারেন। অপরিণত বয়সে অর্থাৎ ১৭।১৮ বৎসরের কম বয়সে গর্ভ ধারণ প্রসূতির মৃত্যুর আধিক্যের অন্যতম কারণ।

সদ্যজাত সন্তান শীতে বা অন্য কোন কারণে অসহ্য কষ্ট পাইলে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হইয়া থাকে। বাংলা দেশে প্রত্যহ গড়ে ছিয়ানব্বইটি শিশু ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়। আমাদের দেশে এখনও এত অশিক্ষিত লোক আছেন যাঁহারা শিশুর ধনুষ্টঙ্কার রোগকে 'পেঁচোয় পাওয়া' অর্থাৎ কোন অজ্ঞাত পিশাচাত্মার আক্রমণ মনে করেন।

নোংরা আঁতুর ঘর, অশিক্ষিতা দাই এবং অনুপযুক্ত খাদ্যের জন্য প্রতিদিন আটশত ছাব্বিশটি শিশু বাংলায় মরিতেছে। যত সন্তান জন্মে প্রায় তাহার তিন ভাগের এক ভাগ সন্তানই শিশুকালে মরিয়া যায়। সূতিকা গৃহ ও প্রসূতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিলে, সন্তান জন্মগ্রহণ-জনিত অশৌচ জ্ঞানের সংস্কার করিলে ইহাদের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে।

শিশু ছয়মাস পর্য্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পান করিবে। তারপর মাতৃদুগ্ধ না দেওয়াই ভাল। তাহাতে প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই মঙ্গল। ছয় মাসের পর মাতৃদুগ্ধ পাতলা হইয়া যায়। উহা খাইলে সন্তানের বিশেষ উপকার হইবে না। ছয় মাসের পর হইতে শিশুকে গরুর দুধে সাগু বার্লি বা সটির পালো মিশাইয়া খাওয়াইবে। উহার সঙ্গে দরকার মত লেবুর রস বা সামান্য পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করা যাইতে পারে। শিশুর কাঁদা থামাইবার জন্য মাই দেওয়া কখনও উচিত নয়।

নিম্নে বিভিন্ন স্থানের হাজার করা শিশুমৃত্যুর হার লেখা গেল—

	ইংলণ্ড	ফ্রান্স	জার্ম্মাণ	জাপান	বঙ্গদেশ
১৯১০ সালে	১০০	১১৭	১০২	১৬৪	৩৪২
১৯১৫ "	৯১	১১০	৯৫	১৫৬	৫৪৮
১৯২০ "	৭৬	১০৫	৮৩	১৩৬	২৮৪
১৯২২	৭৫	৯৮	৬৮	১০৩	২৯৮

সুখের বিষয় স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জগতে শিশুমৃত্যুর হার ক্রমে কমিতেছে।

চরকায় আত্মনির্ভর

(সত্য ঘটনা)

শ্রীমুলচাঁদ মুন্দড়া।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও বিকানীর হইতে দেশলোক পর্য্যন্ত রেল হয় নাই। একদিন বিকানীর সহর হইতে দরবারের এক সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া দেশলোকে বেড়াইতে আসিলেন। গ্রামটির চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া একস্থানে আসিয়া তিনি সেখানকার আদিম অধিবাসী চারণদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানকার সব চেয়ে বড় ধনীর বাড়ী দেখাইয়া দাও।"

চাঁদমল ঢঢ্ঢাই এই স্থানের প্রধান ধনী ব্যক্তি। চারণদল পরামর্শ করিয়া সাহেবকে তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিল। চাঁদমল ঢঢ্ঢাইএর বাড়ীখানি খুব বড়। বাড়ীর চারিদিকে উন্মুক্ত জায়গা, তাহার পর উচ্চ প্রাচীর। সামনে প্রকাণ্ড ফটক, ফটকে দুইজন দ্বারবান পাহাড়ায় নিযুক্ত। ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তাহাদের অনুমতি না পাইলে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না।

সাহেব তাহাদের অনুমতি লইয়া চাঁদমল ঢঢ্ঢাইএর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এবং তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর সাহেব চারণদের নিকট গ্রামের সবচেয়ে গরীব লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

চারণগণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পল্লীপ্রান্তস্থ এক বৃদ্ধার বাড়ী দেখাইয়া দিল। এই স্থানটি খুবই নির্জ্জন। ফাঁকা একটি জায়গায় ছোট একখানি জীর্ণ কুটীরে বৃদ্ধা বাস করেন। বৃদ্ধার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। সংসারে পূর্ব্বে তাঁহার ছেলেপিলে টাকাকড়ি সবই ছিল—এখন কিছুই নাই। এক সময় এখানে ভয়ানক মহামারী হয়, তাহাতেই বৃদ্ধার সব গিয়াছে। এখন তিনি একা জীবনের শেষ দিন কয়টি এই জীর্ণ কুটীরে একটি চরকার সহিত আলাপ করিয়াই কাটাইয়া দিতেছেন। বৃদ্ধা প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতঃ স্নানাদি করিয়া ঘণ্টা দুই চরকায় সূতা কাটেন, তারপর স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন। আহারাদির পর অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার সূতা কাটিতে বসেন। দিনভোর সূতা কাটিয়া সন্ধ্যায় গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া পুনরায় পাক ও আহারাদি করেন। প্রতিদিন এই নিয়মেই বৃদ্ধা সময় অতিবাহিত করেন। এই সূতা কাটিয়াই বৃদ্ধা আপন জীবিকা উপার্জ্জন করেন। ইহাতে তাঁহার একরকম বেশ চলিয়া যায়। বৃদ্ধা শৈশব হইতেই চরকায় সূতা কাটিতে অভ্যস্ত ছিলেন, বর্ত্তমানে জীবনের শেষ অবস্থাতেও সেই চরকাকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া আছেন।

সাহেব যখন তাঁহার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন বৃদ্ধা সূতা কাটিতেছিলেন। সাহেব তাঁহার নিকট গিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন "আপনি বড় গরীব, আমি আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাই, এই টাকা কয়টি গ্রহণ করুন।"

বৃদ্ধা চরকাটি বন্ধ করিয়া সাহেবের দিকে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাকাইয়া কহিলেন "মহাশয়, মাফ করিবেন, আমার কোন প্রকার অর্থসাহায্যের

প্রয়োজন নাই। চরকার সাহায্যে আমি জীবনে কোন দিন ভিক্ষা গ্রহণ করি নাই এবং যে কদিন বাঁচিব এই চরকার প্রভাবেই কাহারো নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিব না।"

সাহেব বৃদ্ধার এই আত্মনির্ভরশীলতা এবং নিজ শিল্পের উপর অগাধ বিশ্বাস দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

বিলাত ভ্রমণ

(গ্লাসগো—বেলফাষ্ট)

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

৩রা ডিসেম্বর, (১৯২৪)-সকাল ১১টায় এডিনবরা থেকে ট্রেণে রওনা হয়ে ১২॥টায় গ্লাসগো এলাম। 29 Hope Streetএ Miss Macleod's Hotel নামক হোটেলে থাকবার স্থান ঠিক করলাম। দেখলাম হোটেলের কর্ত্রী Miss Macleod অতি ভাল মানুষ। সেদিন গ্লাসগোতে সারাদিন ঝিমি ঝিমি বৃষ্টি হচ্ছিল, নিকটবর্ত্তী কয়েকটা জায়গা দেখে ষ্টেশন থেকে গ্লাসগোর মানচিত্র সম্বলিত একখানি গাইড কিনে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। পরদিন (৪ঠা) ট্রামে গ্লাসগোর প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখলাম। কোন কোন ট্রামে মেয়ে কণ্ডাক্টর বেশ কাজ চালাচ্ছে দেখা গেল।

গ্লাসগো স্কটলণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে বড় সহর, শিল্প বাণিজ্যের প্রধান স্থান। সন্ধ্যা পাঁচটার পর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ Art Gallery দেখলাম। একই স্থানে পৃথিবীর নানা রকম দেখবার বিষয়ের একত্র সমাবেশ এত কোন স্থানে দেখি নাই। কৃষ্ণনগরের ভাস্করদের তৈরী নানা রকম মাছ বাংলার মাছের নমুনাস্বরূপ এখানে রাখা হয়েছে। পাশ্চাত্যের সুবিখ্যাত যাদুঘরে বাংলার শিল্পের আদর দেখে বাস্তবিকই প্রাণে বড় আনন্দ হল। এই Art Galleryর একটা বড় দেখবার বিষয়—গ্রীস এবং ইটালী প্রভৃতি দেশের প্রসিদ্ধ ভাস্করদের হাতে গড়া প্রস্তর নির্ম্মিত বিখ্যাত মূর্ত্তিগুলির আদর্শ এখানে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। শোনা যায় সেগুলি প্রায় মূলেরই অনুরূপ হয়েছে; কাজেই গ্লাসগোর এই Art Galleryতে পৃথিবীর নানা স্থানের সুবিখ্যাত মূর্ত্তি এবং ছবির আদর্শ দেখবার সুযোগ রয়েছে।

৫ই ডিসেম্বর—সকালে একটি ঢালাই পিত্তলের কারখানা দেখতে গেলাম। দেখলাম সেখানে Wireless (বেতার-বার্ত্তা যন্ত্র) সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হচ্ছে। সেখানকার ম্যানেজার সমস্ত কাজকর্ম্ম যত্নের সহিত আমাকে দেখালেন। তাঁর কাছে জানলাম যে বার্ম্মিংহামে গেলে এ সম্বন্ধে আরও বেশী রকম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত দেখতে পাব। গ্লাসগো সহরে লোহা এবং ষ্টিলের কাজই বেশী। আমি ষ্টিলের পাত তৈরী দেখবার জন্য কয়েকটি বড় বড় ফ্যাক্টরীর ঠিকানা এখানকার ম্যানেজারের নিকট হতে নিলাম। ফিরবার পথে একটা

Canal বা খাল দেখলাম। এটিকে একেবারে বরাবর সহরের উপর দিয়ে নেওয়া হয়েছে। সহরের বাড়ী, ঘর, রেল, ট্রাম প্রভৃতি সবই এই খালের নীচের পড়ে রয়েছে। গ্লাসগো খুব পাহাড়ীয়া উঁচুনীচু স্থানময় সহর। এজন্য খালটিকে সমতল জমীর অভাবে একেবারে সহরের উপর দিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তারপর যেখানে পাহাড়ের খানিকটা জায়গাকে সমতল করে সহরের আয়তন বৃদ্ধি করা হচ্ছে সেইখানটি দেখতে গেলাম। দেখলাম বহুস্থান ব্যাপী উঁচুনীচু পাহাড় সমতল করে তার উপর খুব দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা করা হয়েছে। দু-একটি রাস্তাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীর পত্তন আরম্ভ হয়েছে। এই স্থানটি সহর অপেক্ষা অত্যন্ত উঁচু। তখন খুবই প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বাতাসে মাথার টুপি রক্ষা করা দায়। সাবধানতা সত্ত্বেও আমাকে দুইবার টুপীর পশ্চাতে বহুদূর পর্য্যন্ত দৌড়িতে হয়েছিল।

মধ্যাহ্নে একটা হোটেলে বিশ্রামের পর বিকালে লোহা ও ইস্পাতের সিট বা চাদর প্রস্তুতের কারখানা দেখতে গেলাম। এটি সহরের বাইরে ফাঁকা জায়গায় প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী বিরাট কারখানা। কারখানার দ্বারে ঢুকে একজন প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট বললুম—কারখানার কাজকর্ম্ম দেখতে চাই। তিনি বড় ডিরেক্টর সাহেবের নিকট আমাকে নিয়ে গেলেন। ডিরেক্টর সাহেব আমার কারখানা দেখবার উদ্দেশ্য কি জানতে চাইলেন। আমি সোজাসুজি বললাম যে লোহার পাত প্রস্তুতের একটা আভাষ আমি পেতে চাই। তিনি বললেন—আপনাদের দেশে এইসব কাজ প্রচলনের চেষ্টা আপনি দেখবেন, এতে আপনাদের দেশের লাভ, আমাদের ক্ষতি। আপনি সহজেই বুঝতে পারেন এ অবস্থায় কেমন করে দেখান যেতে পারে।

আমি বললাম—কাজকর্ম্ম দেখতে পেলে আমাদের দেশের সংবাদপত্রে আমি আপনাদের কারখানার সম্বন্ধে কিছু লিখব। তাতে আপনাদের কিছু ভাল হবারই কথা। ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে ব্যবহৃত আমার ফটো সম্বলিত একখানি উচ্চ শ্রেণীর Staff পাস আমার কাছে ছিল। সেইখানি দেখালে তিনি খুব আগ্রহের সহিত আমাকে কারখানা দেখতে আদেশ দিলেন। কারখানার কাজকর্ম্ম ভালরূপ বুঝিয়ে দেবার জন্ত একজন শিক্ষিত কর্ম্মচারীকে আমার সঙ্গে দিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ঘুরে আমি টিনের সিট ও করগেট আয়রণ-সিট প্রস্তুতের সমস্ত কাজ দেখলাম।

৬ই ডিসেম্বর সারাদিন সহর দেখলাম। গ্লাসগো সহরের মাঝখান দিয়ে ক্লাইড (Clyde) নদী গিয়েছে। দুধারে সহরের অপূর্ব্ব শোভা। যতদূর যাই ক্রমেই দেখবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। নদীর উপর দিয়ে অনেকগুলি পোল গিয়েছে। কিন্তু সমুদ্র থেকে সহরের যে পর্য্যন্ত জাহাজ এসে থাকে সে পর্য্যন্ত নদীর উপর পোল করা হয় নাই। নদীর এপার ওপার দিয়ে কয়েকটা সুড়ঙ্গ করা হয়েছে। লোকজন ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী সমস্তই Liftএ করে কলে নীচের সুড়ঙ্গপথে নামান হয়। সেখান থেকে নদীর নীচে দিয়ে পার হয়ে অপর পারে গিয়ে Liftএর সাহায্যে উপরে উঠে খানিকদূর গিয়ে একটা খেয়াঘাট দেখলাম, সেখানে জাহাজের উপর করে লোকজন গাড়ীঘোড়া পারাপার হচ্ছে। এর সমস্ত কাজই ইঞ্জিনের সাহায্যে হয়। লণ্ডনের মত গ্লাসগো সহরেও Underground Railway অর্থাৎ মাটীর নীচে চোঙের ভিতরের রাস্তা দিয়ে রেলট্রেণে লোকে সহরের নানাস্থানে যাতায়াত করে।

৭ই ডিসেম্বর—আজ রবিবার। স্কটলণ্ডের লোকজন রবিবারে সংসারের কাজ মোটেই করে না। দুবেলায় গির্জ্জায় যায়, কেউ বা সহরের বাইরে ভ্রমণে বেরোয়। আমি সারাদিন একটা

লাইব্রেরীতে বসে গ্লাসগো সম্বন্ধে আমার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প'ড়লাম। সন্ধ্যার পর হোটেলের কর্ত্রী Miss Macleodএর অনুরোধে তার সঙ্গে একটা গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনাদি দেখলাম।

৮ই, ৯ই, ১০ই তিনদিন পর্য্যন্ত গ্লাসগো সহরের নানা দ্রষ্টব্য বিষয় দেখলাম।

১০ই ডিসেম্বর রাত্রি আটটায় আমি গ্লাসগো থেকে জাহাজে বেলফাষ্টে রওনা হ'লাম। Miss Macleod অতি আপন জনের মত আমাকে বিদায় দিলেন। আমার প্রতি তাঁর মধুর স্নেহের স্মৃতি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত রইল তিনি বেলফাষ্টে আমার থাকবার সুবিধার জন্য তাঁর এক বন্ধুর নিকট পত্র লিখে আমাকে দিলেন। ডাকেও তাঁর বন্ধুকে একখানা চিঠি দিলেন।

রাত্রি ৯টায় বেলফাষ্টের জন্য জাহাজ ছাড়ল। অপ্রশস্ত Clyde নদীর মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে জাহাজ চ'লল। তীরে দুধারে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রখর জ্যোতিতে সহরের দৃশ্য অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। Clyde নদীর মোহানা পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল পথ নদীর দুধারে কেবল জাহাজ প্রস্তুতের কারখানায় পূর্ণ। বাইরে খুবই ঠাণ্ডা, তথাপিও নদীর মোহনা পর্য্যন্ত আমি বাইরে থেকে জাহাজ প্রস্তুতের কারখানাগুলি দেখলাম। পরে ভিতরে গিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপাদি আরম্ভ করলাম; আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হলেও জাহাজে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। একটি বর্ষিয়সী মেয়ে নানারকম আমোদজনক গল্প করে আমাদের যাত্রীমহল বেশ আনন্দময় রাখলো। রাত্রি ১টার পর গল্প শুনতে শুনতে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

১১ই ডিসেম্বর ভোর সাতটায় বেলফাষ্ট সহরে এসে জাহাজ ভিড়ল। আটটায় ফর্শা হ'ল। আমি জাহাজ থেকে নেমে ট্রামে করে Miss Macleod-এর বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হ'লাম।

বেলফাষ্ট অঞ্চলটা আয়র্লণ্ডের গৃহশিল্পের দেশ। বিশেষতঃ সূতা প্রস্তুত ও তাঁতের কাপড় বোনার জন্য এ দেশের বিশেষ খ্যাতি আছে। সকালে পৌঁছেই এ সম্বন্ধে কিছু খবর নিলাম। জানলাম সহরে কলের কাজই বেশী, পল্লীতে মেয়েরা অনেক রকম হাতের কাজ করে।

এদিন প্রথমে আমি এখানকার সব চেয়ে বড় Flex অর্থাৎ শণের তৈরী তোয়ালে প্রভৃতি বোনার মিল দেখতে গেলাম। এই সম্বন্ধীয় কাজে এইটাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়। সহজেই কারখানার মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পেলাম। এখানকার আফিসের ভিজিট-বুকে জাপান, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি জগতের সর্ব্ব স্থানের ভিজিটরদের স্বাক্ষর রয়েছে। একটি ভারতীয় নামও দেখা গেল, তবে বাঙ্গালী নয়। ম্যানেজার একটি লোককে আমার সঙ্গে দিলেন। এখানে বাঙ্গালী ভিজিটর বোধ হয় আমিই প্রথম। ভিতরে গিয়ে দেখলাম, বহু স্ত্রী-পুরুষ কলে কাজ ক'রছে। এই শ্রেণীর কোন কোন কাজ কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কাপড়ের কল ও চটকলে দেখেছি। Flex জিনিষটা তুলা ও পাটের মাঝামাঝি রকমের। খুব শক্ত জিনিস Flex বা শণ আমাদের দেশে জেলেদের জাল প্রস্তুতে খুব ব্যবহৃত হয়।

এখানে কার্য্যকারীদের মধ্যে মেয়েরা সপ্তাহে ১৫৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা এবং পুরুষেরা সপ্তাহে ২০৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পায়। প্রত্যেক লোকেরই পোষাক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশে কলের কাজের লোকের দুর্দ্দশা অতি ভয়ানক। এখানে এদের অবস্থা দেখে সাধারণ লোকের চেয়ে এদের নিম্নশ্রেণীর মনে করতে পারলাম না। বস্তুতঃ এদেশে কাজের ছোট-বড়র মান-অপমান বিশেষ নাই। সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে খুবই দ্রুত গতিতে কাজ করছে। পরিশ্রমের কাজ আর অপরিষ্কার জিনিস পরিষ্কার করা পুরুষেরা করে। মেয়েরা সহজ পরিশ্রমে নৈপুণ্যের কাজগুলি করে। পনের বৎসরের কম বয়সের লোক

এদেশে কাজ করেনা। মেয়ে হোক পুরুষ হোক পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর বয়স অর্থাৎ, পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ পর্য্যন্ত দেশের নিয়মানুসারে সকলকেই স্কুলে পড়তে হয়। এর পর যোপন আপন কাজে যোগ দেয়। এই সমস্ত কারখানার কাজকর্ম অতি সহজ। এজন্য ছাত্রছাত্রী বহুসংখ্যক স্কুল ছাড়বার পরই এই সব কারখানায় যোগ দেয়। সুদক্ষ মেয়েরা এখানে Embroidery অর্থাৎ কাপড়ের উপর সুতা দিয়া লতা ফুল কাটা প্রভৃতি কাজ করেন। এঁদের বেতন সপ্তাহে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা।

১১ই ডিসেম্বর সকালে আমি এখানকার Salvation Armyর মহিলা বিভাগের শিল্পাশ্রম দেখতে মনস্থ করে সহরস্থ এদের আফিসে আবেদন জানালাম। এই আফিসটী হতে মহিলাদের আশ্রম দুই মাইল দূরে। আফিসের ম্যানেজার আমাকে একখানি Introduction Letter দিলেন এবং মহিলা শিল্পাশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকাকে টেলিফোন করে জানালেন যে ভারতীয় মেয়ে-পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট একজন ভদ্রলোক মহিলা-কার্য্যালয় পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন। ট্রাম গাড়ীতে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌছলাম, সেখানকার মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে যে ভাবে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করলেন আমি অতটা আশা করেছিলাম না। একটু বিশ্রাম ও আলাপাদির পর তিনি নিজে একে একে প্রত্যেক ঘরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কোন ঘরে কি কি কাজ হয় সব দেখালেন। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি, শীতের দেশ তাই প্রত্যেক ঘরেই গরম ষ্টীমের চোঙ ফিট করা।

প্রথমেই আমরা সন্তান-পালন শিক্ষার ঘর দেখতে গেলাম। বিলাতে সন্তান প্রসব বেশীর ভাগই হাসপাতালে বা এই শ্রেণীর আশ্রমে হয়ে থাকে। দেখলাম সদ্যপ্রসূত থেকে এক বৎসরের পর্য্যন্ত অনুমান ত্রিশটি সন্তান পৃথক পৃথক পালঙ্কে রয়েছে—এদের প্রসূতি কেহই এ ঘরে নাই। দুটিমাত্র স্ত্রীলোকে এই সন্তানগুলির তত্ত্বাবধান করছে। সবগুলি শিশুই সুস্থ কায়—বেশ আনন্দে হাত পা ছোড়ে খেলা করছে। এদের মায়েরা পৃথক স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

তারপর মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে আশ্রমের রন্ধনশালায় নিয়ে সেখানকার রন্ধন-প্রণালীর বিশেষত্ব আমাকে দেখালেন। এই রন্ধনশালাটী কেবলমাত্র আশ্রমের আহারের ব্যবস্থার জন্য নহে—এখানে মেয়েরা রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা করে। বিলাতের রন্ধন কার্য্য গ্যাস-ষ্টোভে সম্পন্ন হয়, এজন্য রান্নায় পরিমাণ মত উত্তাপ ব্যবহারের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। রন্ধনশালার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে আমি তাঁদের প্রশংসা করতে লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত সম্পন্ন করাই রন্ধন কার্য্যের প্রধান গুণ। এ সব এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতের রন্ধনকার্য্যে বাটনা বাটার বালাই নাই, ঝাল হলুদ মসলা এসব কিছুই ওদেশে রন্ধনে ব্যবহার হয় না। হাত দিয়ে কোন জিনিষ ধরবার আবশ্যক হয় না—বিভিন্ন রকমের হাতা চামচ প্রভৃতির সাহায্যে সব কাজ হয়; এজন্য রন্ধন কালে হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

কাপড় ধোয়ার ঘরে গিয়ে দেখলাম দুটী মেয়ে কাপড় ধোলাই করছে। এই আশ্রমের ছোট বড় সব কাজই আশ্রমের মেয়েরা করে। কাপড় ধোলাই শিক্ষা করা বিলাতের মেয়েদের খুব বড় একটা শিক্ষার বিষয়। এই বিদ্যা মেয়েদের শেখবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে। সাধারণ বা গরীব গৃহস্থরা যে প্রণালীতে আপন আপন ঘরে কাপড় ধোয় সেই মত ব্যবস্থাই এখানে রয়েছে। একটী পাত্রে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সাবানযুক্ত গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে রেখে পরে একটী হাণ্ডল ঘুরাইলে সেই জল ও কাপড় পূর্ণ পাত্রটী এমন ভাবে ঘুরতে থাকে যাতে পাত্রের ভিতরের কাপড় গুলি জলের সঙ্গে ওলট পালট হতে থাকে। পাঁচ সাত মিনিট এইমত ঘুরালেই কাপড়ের ময়লা

ছেড়ে যায়, পরে অন্য পরিষ্কার জলপূর্ণ পাত্রে তুলে ধুয়ে লয়। কাপড়ের জল নিংড়াবার জন্য কাঠের রোলার আছে, তার মধ্যে কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়ে হাতল ঘুরালে আপনা আপনিই সমস্ত কাপড় ঐ রোলারের মধ্যে দিয়ে পিষে গিয়ে সমস্ত জল নিংড়িয়ে ফেলে। বিলাতে প্রায় সর্ব্বদাই ঝিমি ঝিমি বর্ষা হয়, রোদ কচিৎ দেখা যায়, কাপড় শুকাবার বড় অসুবিধা হলেও অসুবিধা বলতে কোন কিছু এরা রাখে নাই—কাপড় শুকনা করবার জন্য একটী খুব ছোট গরম ঘর আছে। লোহার নলের ভিতর দিয়া গরম ষ্টিম প্রবাহিত হয়ে ঐ ছোট ঘর খানি খুব গরম রাখে, ঐ ঘরের মধ্যে কাপড় রেখে আধ ঘণ্টা কাল দরজা বন্ধ রাখলেই কাপড় শুকিয়ে যায়। তার পর খুব ছোট সুন্দর ইস্তিরী দ্বারা ~~সমস্ত~~ কাপড় ইস্তিরী করা হয়। রঙ্গিন কাপড় অপেক্ষা সাদা কাপড় ধোলাই শক্ত কাজ। নানা রকম লেস যুক্ত কাপড় ইস্তিরী করা খুবই কঠিন। এসব এই আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়। মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েক খানা লেস ও লতা ফুল ওয়ালা কাপড় ইস্তিরী করে দেখাতে আদেশ করায় মেয়েরা সে সব সুন্দর ভাবে করে দেখাল।

তারপর আমরা একটী প্রকাণ্ড হলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এইটি আশ্রমের শিল্পশিক্ষার ঘর। ৬০।৭০টী মেয়ে নিপুণ হয়ে নানা রকম সেলাইয়ের কাজ করছে। আমরা ঘরে প্রবেশ করবামাত্র মেয়েরা স-সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।

সম্ভবতঃ এরা আমাকে কাজ দেখাবার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। দেখলাম নানা রকম উলের জামা ষ্টকিং বোনা হচ্ছে, অতি সুন্দর Embroidery কাজ হচ্ছে। এই ধরণের উলের কাজ ও Embroidery আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের কিছু কিছু করতে দেখেছি। কিন্তু আমাদের দেশে এগুলি বিশেষ কোন কাজে লাগে না। এদের কাজ দেখে বুঝলাম বিলাতের আবশ্যক যে সব জিনিস এরা করছে—তারই একটা অন্ধ অনুকরণ আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা মেম শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকে পেয়েছে। ইউনিভার্সিটীর বিদ্যাই হ'ক আর যে কোন বিদ্যাই হ'ক, আমরা যা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখি সে সব আমাদের দেশের কাজে খুব কমই লাগে। আমরা তাদের অনুকরণ করি মাত্র। সেই শিক্ষার একটু অদল বদল করে আমাদের দেশের কাজের উপযোগী করে নেবার শক্তিটুকু আমাদের থাকা চাই—এটা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই ভাববার কথা।

এখানে মেয়েদের নানা রকম সুতার কাজ করতে দেখলাম, তার কোনটা কি কাজে লাগে সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম, মহিলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ছোট ছোট কয়েকটী চিত্রের নমুনা উপহার দিলেন। এখানকার মেয়েদের কার্য্যপ্রণালী দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। এই মহিলা-আশ্রমের ছোটবড় সব কাজ আশ্রমের মেয়েরাই করে। আমাদের দেশে কাজের ছোটবড়, সম্মানজনক, অসম্মানজনক ইত্যাদি অনেক পার্থক্য আছে। এসব দেশে ও বালাই নাই। সব কাজই সকলে করে।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে সমস্ত কাজের ঘরগুলিতে নিয়ে প্রত্যেক ঘরের কার্য্যপ্রণালী বিশেষভাবে দেখালেন। এই দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই আমি তাঁর কার্য্যকুশলতা দেখে মনে মনে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম। পরে যথাযোগ্য ভাবে তাঁর নিকট বিদায় নিলাম।

রাত্রিতে এখানকার একটি থিয়েটার দেখলাম। লণ্ডন ও গ্লাসগোতে যেমন থিয়েটার দেখেছি তা অপেক্ষা এখানে একটু কম জমকাল হলেও বড় মধুর লেগেছিল। অভিনয়ে এক ধোবার মূর্খমী দেখে হেসে আর বাঁচিনে—বুদ্ধিমতী কর্ম্মকুশলা স্ত্রীর গুণে তার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ব্যাধ-বালিকার সঙ্গীতের তালে তালে দর্শকগণের প্রতি ফুলের তীর নিক্ষেপ অতি আশ্চর্য্য শিক্ষার পরিচায়ক।

তোতলার গান, মাতালের সার্কাস' প্রভৃতি অভিনয় আমার বড়ই চমৎকার লেগেছিল।

১৩ই ডিসেম্বর সকালে কয়েকটী দোকানে গিয়ে পল্লীর মেয়েদের হাতের তৈরী অনেক রকম বস্ত্র-শিল্প দেখলাম। বিকাল তিনটায় নদীর তীর'ধরে ট্রামে সমুদ্রের দিকে চললাম, সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ট্রামের শেষ সীমানায় নেমে পল্লীগ্রাম দেখতে গেলাম। নদীর মোহনায় সমুদ্রতীরে বড়ই মনোরম পল্লী দেখতে পেলাম। একস্থানে ৪০।৫০টী বালক বালিকা দেখতে পেলাম, তারা স্কুলের ছুটীর পর খেলা করছিল, আমার বড়ই ইচ্ছা হল তাদের খেলা দেখতে—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে। এই পাড়াগাঁ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় লোক দেখে নাই।

বিদেশী নূতন রকম মানুষ দেখে তারা খুবই বিস্ময়ের সহিত আমার পানে চাইল—বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে দু'একটী একটু এগিয়ে আমার দিকে এল। আমি প্রথমেই তাদের বললাম, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই, আমার ইংরেজী কথা তোমরা বুঝতে পার কি? তারা বলল হাঁ পারি। তখন তাদের সঙ্গে একটু কথা বার্ত্তা বলতেই সব ছেলে মেয়ে আমার কাছে এল। পরে তাদের বাড়ী থেকে বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরাও এল। আমি ছেলেদের উপযোগী অনেক রকম ভারতীয় সংবাদ তাদিগকে শুনালাম, তাদের কাছেও অনেক শুনলাম। বাস্তবিকই আমি সব যায়গায় ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পাই। সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ছেলে মেয়েরা আমাকে ছাড়ে না—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ভারতীয় কথা শুনতে থাকল। প্রশ্ন করবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মিটল না, তাই আর একদিন আমাকে আসতে সবে মিলে অনুরোধ করল। আমি আগামী পরশু বিকালবেলা আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কাছে বিদায় নিলাম। সকলে মিলে ট্রাম পর্য্যন্ত এসে আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে বিদায় বিদায় বলে হাত নাড়া দিতে লাগল। ট্রাম ছাড়বার পর অনেকক্ষণ তাদের হাত নাড়া দেখলাম।

বাস্তবিক নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি তাদের কাছে গিয়েছিলাম, এদিন তারা আরও ছেলেমেয়ে ডেকে এনে সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে ৭০।৭৫টী হয়েছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাদের গান শুনতে চাইলাম, তারা ছেলে মেয়ে এক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চমৎকার গান করল, গানটী ছিল আমাদের দেশের "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান"এর মত। ছেলে মেয়ে মিলে এমন জোরে এমন স্ফুর্ত্তিতে এক তালে গান করতে বাস্তবিকই আর কখন শুনি নাই।

তার পর তাদের পাল্লায় পড়ে আমাকেও একটা বাংলা গান গাইতে হয়েছিল—আমার গানের অদ্ভুত ভাষা আর সুর শুনে তারা খুবই হো হো করে হেসেছিল। সে হো হো হাসি উপহাসের নহে —নূতনত্বের আনন্দের।

আইরিশ বালকবালিকাদের সঙ্গে এ দিন যে মধুর ভাব হয়েছিল তা জীবনে ভুলবার নয়।

সন্ধ্যার পর সহরে এখানকার এম্পায়ার থিয়েটার নামক একটী প্রসিদ্ধ থিয়েটার দেখলাম। আমি থিয়েটারের বিশেষ পক্ষপাতী নহি—কিন্তু বিদেশে নানা ভাবের ভিতর দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা লাভের জন্যই বিদেশী থিয়েটার গুলিও আগ্রহের সহিত দেখতাম। বিলাতের থিয়েটার গুলি দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই অভিনয় শেষ করে। প্রত্যেক থিয়েটারই সন্ধ্যার পর আরম্ভ করে দু'বার অভিনয় করে। এদিন সন্ধ্যা ৫টায় আরম্ভ হয়ে ৭।০টায় শেষ হল।

থিয়েটারের পর রাস্তায় বের হয়ে একস্থানে দেখলাম প্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচার করছে, খানিকটা দাঁড়ায়ে শুনলাম, আমার বড়ই ভাল লাগল—কারণ এখানে এদিন প্রচারকেরা প্রত্যেকে আপন জীবনে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ যা প্রত্যক্ষ করেছে সেইগুলিই প্রাণের আবেগে বলছিল। স্ত্রী-পুরুষে ৪।৫ জনের প্রচার শুনলাম—সবই চমৎকার। একটী মেয়ে উপাসনা করল, অতি দীর্ঘ সময় ব্যাপী

উপাসনা। বাস্তবিক জীবন্ত ভগবানের সঙ্গে পরিচয় না হলে কি এমন ভাবের উপাসনা করা যায়?

প্রচার সভা ভঙ্গের পর এদের কর্ত্তৃপক্ষ একটী যুবক আমার সঙ্গে পরিচয় করলেন, বাস্তবিক আমিও তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে মনে মনে আশা করছিলাম। যুবকটী পরদিন রবিবারের উপাসনা-সভায় যোগ দিতে আমাকে অনুরোধ করলে আমি সানন্দে স্বীকৃত হলাম।

১৪ই ডিসেম্বর রবিবার সকালে আহারাদি শেষ করে ১১টায় তাদের উপাসনা মন্দিরে গেলাম। প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ ও প্রার্থনাদি শুনলাম, তারপর উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর ভিতরের কয়েক জনে উপাসনা করলেন। প্রত্যেক উপাসনার মধ্যেই এঁদের গভীর ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পেলাম। ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ডবাসীদের চেয়ে আয়র্লণ্ডবাসীরাই বেশী ভগবৎ-পরায়ণ বলে মনে হয়।

পরে এঁদের সোমবারের রাত্রির একটী বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়েও বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। এদিন একটী যুবক সকলকে কয়েকটী নূতন গান শিখালেন আর একটী মহিলা উপদেশ দিলেন। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মোপাসনার সঙ্গে আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের আমি খুবই সাদৃশ্য দেখতে পাই।

১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। এদিন সকালের আহারাদি শেষ করেই আমি পল্লীগ্রামের তাঁতে কাপড় বোনা দেখবার জন্য ট্রেণে বেলফাষ্ট থেকে ৩০ মাইল দূরে Lurgan নামক স্থানে গেলাম। ট্রেণে চলতে পথে স্কচ-পল্লীর সৌন্দর্য্য দেখে বড় আনন্দ পেলাম। এদের সমস্ত দেশগুলিই উচু নিচু পাহাড়ে পূর্ণ। পথে অনেক বড় বড় Linen বোনার factory দেখলাম। ১ ঘণ্টার মধ্যেই Lurgan পৌছলাম। এটী নিতান্ত ছোট পাড়াগাঁ নহে। বেলফাষ্টের একটী ভদ্রলোক আমাকে Lurgan-এর Mrs Weir নাম্নী একটী মহিলার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিলেন (17, James Street) আমি তাঁর বাড়ীতে উঠলাম। Mrs Weir বৃদ্ধা।

অপরিচিত লোকের চিঠি আমার হাতে পেয়ে তিনি আমাকে খুবই যত্নের সহিত গ্রহণ করলেন। তিনি রান্না করছিলেন। এসব দেশে এই শীত কালে প্রতি ঘরেই সর্ব্বদা আগুন জ্বালান থাকে, দেখলাম মহিলার পৃথক রান্নাঘর নাই, এই সদর ঘরের আগুনেই রান্না করছেন। আমি খানিকটা পথ হেটে এসেছি, পায়ে বড় শীত বোধ করছিলাম, তাই ঐ আগুনের কাছে পা রাখলাম। বৃদ্ধা তখন পৃথক গ্যাসের উনান জ্বেলে রান্না আরম্ভ করলেন, আর এই কয়লার আগুনে আমার গা, পা গরম করতে বললেন। এই পল্লীকুটীর খানির প্রত্যেক জিনিষটী আমার কাছে নূতন লাগছিল। আমার ভাব গতিকে দেখে বৃদ্ধা আমাকে বলেই ফেললেন যে আপনি সবই নূতন রকম দেখেছেন, নয় কি? এই বলে বৃদ্ধা তার গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম খুটী নাটী সব আমাকে আনন্দের সঙ্গে দেখালেন।

একটু দূরে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনছিলাম, কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা বললেন, আপনি যা দেখতে এসেছেন সেই তাঁত বোনা হচ্ছে। তখন বৃদ্ধা আমাকে তার বয়ন কার্য্যালয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়ে দিলেন। আমি খুবই আগ্রহের সহিত তাঁত বোনা দেখলাম। লিনেন সূতায় খুব বড় টেবিল ক্লথ বোনা হচ্ছিল। প্রকাণ্ড বড় তাঁত—কোন মেশিন Power এর ব্যবহার নাই, সমস্তই হাতে পায়ে কাজ হচ্ছে। সেই আমাদের দেশের তাঁতীদের মতই ঠক্ ঠকি তাঁত, কিন্তু অনেক উন্নত ভাবের পরিবর্ত্তন দেখলাম। কাপড়ের উপর সাদা সূতায় চমৎকার লতা ফুল ঐ সঙ্গেই বোনা হয়ে যাচ্ছে। তার বিশেষ বর্ণন এখানে করবার স্থান হবে না।

বিকালে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথ চলতে পথে, অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল, তারা কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে। বাড়ীতে

তারা নানা রকম সুঁচের কাজ আর লেশ বোনার কাজ করেছে, সেগুলি কারখানায় নিয়ে চলেছে। আমি ঐ সব দেখতে চাওয়ায় তারা অনেক রকমের কাজ আমাকে দেখাল। তাদের কাছে জানলাম—এ অঞ্চলে প্রত্যেক মেয়েই এই সব শিল্পকর্ম্ম করে।

সন্ধ্যায় ট্রেণে বেলফাষ্ট ফিরলাম। ঐ রাত্রিতেই জাহাজে লিভরপুল রওনা হলাম।

বিধবার দেবতা

(গল্প)

শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়।

(১)

সুরমা যখন একবছরের মধ্যেই সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লোহা খুলিয়া, শুভ্রবাসে গৌরতনু ঢাকিয়া বিষাদের প্রতিমাটী সাজিয়া পিতার চরণে আসিয়া প্রণত হইল, তখন বৃদ্ধ শশাঙ্কশেখরের বুকের সবখানাই ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল। কন্যার সে অপরূপ আভরণ দেখিয়া তিনি শুষ্ককণ্ঠে একবার মাত্র বলিয়া উঠিলেন "ভগবান্"!

সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, আপনার সম্বল এক কপর্দ্দক না রাখিয়া, মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গগত প্রিয়ার বড় আদরের দুলালী এই সুরমাকে তিনি মনোমত পাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিবাহের রাত্রে কন্যাকে জামাতার হস্তে সম্প্রদান করিবার সময় চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "বাবা, একসঙ্গে বাপ ও মা সেজে ওকে এত বড়টী ক'রে তুলেছি। আজ তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে আমি ছুটি নিলাম। তুমি বাবা ওকে একটু দেখোশুনো, যত্ন ক'রো। বড় অভিমানিনী মা আমার, তুমি ওর ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটী মার্জ্জনা করে ধীরে ধীরে তোমার মত করে গড়ে নিও।"

সুরমা শাশুড়ীর চক্ষের মণি ও স্বামীর হৃদয়ের আলো হইয়াছিল। শাশুড়ী সুরমাকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সুরমা যেটী না করিবে সেটী তাঁহার আর কিছুতেই মনোমত হইত না। সুরমা রাঁধিয়া দিবে, তাঁহার পাণ ছেঁচিয়া দিবে, তাঁহাকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবে, তাঁহার পূজার আসন গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গুছাইয়া দিবে। সুরমা এগুলি যেমন ভক্তির সহিত, যেমন পরিপাটীরূপে করে, আর কেহ তেমন পারেনা এই শাশুড়ীর বিশ্বাস।

কন্যার বিবাহ দিয়া শশাঙ্কশেখর ভাবিলেন এইবার বুঝি তিনি ছুটি পাইলেন, এইবার কোন তীর্থে গমন করিয়া শেষের কয়টা দিন কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু আজ যাই কাল যাই করিয়া তাঁহার আর যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। মনে করিলেন সুরমার সন্তান হউক, তাহাকে একবার বুকে ধরিয়া, চাঁদ মুখে একটা চুমা খাইয়া তবে যাইবেন। কিন্তু বিধি বাদ সাধিল, তাঁহার সকল আশায় ছাই পড়িল; তিন দিনের জ্বরে সকলকে কাঁদাইয়া, সকলের চোখের আলো নিভাইয়া, বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া সুরমার স্বামী জনমের মত চলিয়া গেল। সুরমা সর্ব্বস্ব হারাইয়া পিতার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

(২)

বৃদ্ধের বুকে এ আঘাত বড় বিষম বাজিল। তিনি এ শোক সামলাইতে পারিলেন না। কন্যাকে সান্ত্বনা দিবেন কি, তিনি নিজেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুইটী হারাইতে বসিলেন।

আর সুরমা? গন্ধে দিক আমোদ করিবার জন্য বৃন্তে কুঁড়িটীর মত ফুটিয়াছিল। ফুল ফুটে ফুটে, এমন সময় বিধাতার বিচিত্র বিধানে বৃন্তচ্যুত হইয়া অকালে কঠিন ধরার বুকে ঝরিয়া পড়িল—শোকের উষ্ণনিশ্বাসে ম্লান হইয়া। তাহার যে কি হইল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মৃত্যু যে কি, সে ধারণা তাহার নাই। একখানা পুস্তকের মাঝখানের কতকগুলো পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া গেলে যেমন সে বইখানার আর কোন মূল্য থাকেনা, তাহা যেমন আর বোঝা যায় না, সুরমার জীবনও তেমনি দুর্বোধ অসার হইয়া পড়িল। তাহার একি হইল! স্বামী—দেবতার মত স্বামী তাহার কোথায় গেল? আবার কি আসিবে?

কালের করাল কবল ক্রমেই শশাঙ্কশেখরের চোখের আলো, জীবনের পরমায়ু কমাইয়া দিতে লাগিল। মৃত্যু ত সুখের, এতদিন ধরিয়া যাঁর আশাপথ চাহিয়া, পুনর্মিলনের সুখময়ী কল্পনায় বিভোর হইয়া তিনি দিন গণনা করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী প্রণয়িনীর নিকট যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে সে ত সুখের,—কিন্তু সুরমা? তার গতি কি হইবে? তার যে আপনার বলিতে এ বিপুল বিশ্বে কেহই রহিল না। তাকে কার আশ্রয়ে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া চক্ষু মুদিত করেন? ভারী পাথরের মত এই চিন্তা তাঁহার জীর্ণ বক্ষের উপর চাপিয়া বসিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন তাঁহার গুরুদেব তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। হরিদ্বারে এক নিভৃত প্রদেশে তাঁহার আশ্রম। আশ্রম বটে, কিন্তু দেখিলে গৃহস্থের বাটী বলিয়া অনুমান হয়। তিনি তথায় সাধারণ লোকের মতই থাকেন। ভিখারী দুঃস্থ কত তাঁহার নিকট আসে, তিনি তাঁহাদের অকাতরে সাহায্য করেন। তথায় তিনি একাকী যোগসাধনা করেন। বহুদিন পরে আজ তিনি তাঁহার শিষ্য শশাঙ্কশেখরকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন।

গুরুগিরি তাঁহার ছিলনা। সে উদ্দেশ্যে তিনি এ পথের পথিক হন নাই। প্রাণের আবেগে তিনি সংসার ও বিলাস ত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় কাল যাপন করিবার মানসে হরিদ্বারে এই নিভৃত নিবাসে আসিয়া কুটীর বাঁধিয়াছেন।

শশাঙ্কশেখর তখন রোগশয্যায়। গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি মুক্তির একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, আরামে বলিয়া উঠিলেন "আঃ, এই যে এসেছেন গুরুদেব; তবে আর আমার চিন্তা কি? আর আমার সময় বেশী নেই। এই শেষ সময় আপনার দেখা পাব না?—প্রাণে বড় ব্যাকুলতা জন্মেছিল। অন্তর্য্যামী আপনি আমার ডাক শুনে অমনি এসেছেন। সুরমাকে দেখুন একবার। বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করে বড়টী করলাম, সর্ব্বস্ব হারা হ'য়ে বিয়ে দিলাম, আমার পোড়া কপাল, বছর ঘুরল না, মা আমার নিরাভরণা হয়ে আমার ঘরে ফিরে এল। আজ এই শেষ শয্যায় শুয়ে ভাবছিলাম আমি ত চল্লাম, মার আমার কি হবে! আর আমার ভাবনা নেই। আজ আমি আপনার হাতে ওকে তুলে দিলাম, আপনিই ওকে দেখ্‌বেন। আপনি ওর ভার গ্রহণ করুন, আমাকে শান্তিতে মরতে দিন দেব।"

গুরুদেব সুরমার ভার লইলেন। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের মুখে তৃপ্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরের দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সজ্ঞানে গুরুদেবের পায়ে মাথা রাখিয়া শশাঙ্কশেখর এ জনমের মত চক্ষু মুদিত করিলেন।

(৩)

পিতার মৃত্যুর পর গুরুদেবের সঙ্গে সুরমা তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছে। পিতৃগুরুর নিকট আসিয়া সুরমা একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও

পিতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই, এমনি স্নেহদৃষ্টির মাঝে তিনি তাহাকে রাখিয়াছেন।

গুরুদেব সুরমার জন্য অনেক ভাবিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন সুরমাকে নারীর চির আকাঙ্খিত সেবা 'নরনারায়ণের সেবা—জীবের সেবা—জগতের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু সুরমা যে বালিকা, তাহার মতি যে চঞ্চল। গুরুদেব তাহাকে স্থিরমতি করিবার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি একদিন সুরমাকে বলিলেন "সুরমা, তোকে একটা জিনিস দেব মা।"

বালসুলভ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া সোৎসুকে সুরমা বলিল "কি জিনিস দেবেন বাবা।"

গুরুদেব বলিলেন "দেব একটা দামী জিনিস, স্নান করে আমার পূজার ঘরে আয়।"

সুরমা হর্ষোৎফুল্ল প্রাণে নদী হইতে স্নান করিয়া পূজার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

গুরুদেবের আদেশে সে কম্পিত বক্ষে, শঙ্কিত-চিত্তে পূজার ঘরে প্রবেশ করিল এবং গুরুদেবের পদতলে গিয়া বসিল। গুরুদেব বলিলেন "মা, আজ তোকে মন্ত্র দেব। আগে মন্ত্র নে তার পর সে জিনিস দেব।"

গুরুদেব তার কানে মন্ত্র দিলেন। সুরমার চক্ষু যেন এতদিন মুদিত ছিল, মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সে চক্ষু খুলিয়া গেল। সে চারিদিকে যেন কি এক দিব্য জ্যোতি দেখিতে পাইল। তাহার কর্ণকুহরে যেন দূরাগত বীণাধ্বনির মত মোহন সুরের একটা রেশ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিভুত করিয়া তুলিল। পুলকে তাহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

তখন গুরুদেব বেদীর অন্তরাল সরাইয়া দিয়া, বেদীমধ্যের মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন "মা ওই তোমার সামনে যে মূর্ত্তি দেখ্‌ছ, আজ হ'তে ও তোমার। গোপীজনবল্লভ গোপীনাথ ঐ মা তোমার জীবনের অবলম্ব। কায়মনপ্রাণ সব ওঁকে সঁপে দিয়ে, পিতার মত, সখার মত, স্বামীর মত, পুত্রের মত ওঁকে ভালবাস্‌বে, পূজা করবে। দেখবে, জীবনে শান্তি পাবে, তোমার সকল জ্বালা, সব অবসাদ দূরে যাবে"

কণ্টকিত কলেবরা, বেপথুমানা সুরমা দিব্যচক্ষে দেখিল মর্ম্মর-বেদিকোপরি শিখিপুচ্ছধারী, 'চন্দন-চর্চ্চিত নীল কলেবর পীতবসন' নীলমণি পায়ের উপর পা রাখিয়া দণ্ডায়মান। বামে জগজ্জননী রাধারাণী দণ্ডায়মান। বেদী মধ্য দিব্য আলোকে জ্যোতির্ম্ময়, ধূপ ধূনা ও চন্দনলিপ্ত কুসুমবাসে আমোদিত। সুরমার প্রাণ ভক্তিতে নত হইয়া পড়িল। তাহার সকল অঙ্গ দেবতার নিবিড়ালিঙ্গন পাইবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে ভক্তিপ্লুত প্রাণে দেব-পদমূলে প্রণত হইল।

(৪)

পূজার্চ্চনায় ব্যস্ত থাকিয়া সুরমার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। গুরুদেব দেখিলেন তাহার মতি বেশ স্থির হইয়াছে। তাঁহার আদেশমত চলিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী পালন করিয়া সে একজন আদর্শ নারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তাহার দ্বারা সকল কাজই সম্ভবে। তিনি ডাকিলেন "সুরমা।"

সুরমা নিকটে আসিয়া বলিল "কি বলছেন বাবা?"

গুরুদেব বলিলেন "আজ মা তোকে অনেক কাজের কথা বলব—দেখিস মা আমার এতদিনের শিক্ষা, তোর এত দিনের সাধনা যেন ব্যর্থ না হয়। আজ হতে তোকে দেশের সেবায়, বিশ্বের সেবায়, নরনারায়ণের সেবায় আত্মদান করতে হবে। যে দেবতার চরণতলে তুই আপনাকে বিকিয়ে দিয়েছিস—এ কাজ তাঁরই কাজ, তাঁরই প্রীতির জন্য তোকে এ কাজ করতে হবে। তুই বোধ হয় জানিস্ নদীর ওই বাঁকের মুখে আমাদের একটা সেবাশ্রম আছে। সেখানে তোর মত অনেক মা, দেবতুল্য অনেক সন্তান সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে পরমপিতার কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধিতকে অন্নদান, রোগীর সেবা, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, অন্ধ খঞ্জ

শিশুদের পালন—এই হচ্ছে সেখানকার কাজ। এই কাজে তোকেও যোগদান করতে হবে। শুধু এই নয়—জগতে কেউ কারো ভার নেয় না মা; তোর জীবন ধারণের উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের ভারও তোকে নিতে হবে। তার ব্যবস্থাও সেখানে আছে; সামান্য কৃষিক্ষেত্রের কাজ, গো-সেবা, ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন সকল কাজই তোকে কিছু কিছু করতে হবে। গোপীনাথের নিত্য পূজা? সে-ত আছেই—সে-তো তোর জীবনের প্রাত্যহিক প্রথম কর্ত্তব্য। দেখিস, মা, আমার কথামত কাজ করতে পারবি তো?"

সুরমা তন্ময় হইয়া গুরুদেবের কথা শুনিতেছিল। এক্ষণে সে পুলকিত প্রাণে বলিয়া উঠিল "পারব বাবা পারব। গোপীনাথের অনুগ্রহে আমি সব পারব। তিনি আমাকে সব করবার শক্তিই দেবেন বাবা।"

* * *

সুরমা পূজায় বসিয়াছে। পূজায় আজ সে উন্মাদ, আজ সে দেবতার কাছে শক্তি চায়। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, ভাবাবেশে সে মূর্চ্ছাপ্রায় হইয়া গেল। তাহার শরীর দেব-পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছার ঘোরে দেখিল, যেন তাহার ধ্যানের মূর্ত্তি—আরাধনার দেবতা পীতবসন বনমালী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বীণাতানে তিনি যেন বলিতেছেন "ভক্ত আমার, তোমার সকল সাধ পূর্ণ হোক। তোমার এ পূজায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এইবার আমার বাইরের মূর্ত্তির পূজা কর। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষাপাত্র লয়ে আমি তোমার হাতের অমৃতের লোভে নিত্য ঘুরে বেড়াই,—রোগীর বেশে তোমার কাছে সেবা নিতে আমি তোমার দ্বারে প্রত্যহ আসি,—শিশুর বেশে অসহায় হয়ে তোমার বক্ষে একটু স্থান পেতে, তোমার মুখের দুটো মিষ্টি চুমুর লোভে প্রতিদিন তোমার দ্বারে ঘুরি;—এইবার সেই 'আমাকে' পূজা কর তুমি। চেয়ে দেখ, কত দীন দরিদ্র নিরন্ন দুঃস্থ তোমার চারিদিকে তোমার মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কোলে টেনে তুলে নাও, তাদের মুখের পানে চাও, তাদের চোখের জলের সঙ্গে তোমার দুফোঁটা চোখের জল মেশাও। যাদের অর্থ নাই, বিভব নাই, বস্ত্র নাই, অন্ন নাই, গৃহ নাই তাদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা কর। তাদের আশ্রয় দান কর, তাদের অভাব মোচন কর, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল, জীবনে তাহলেই শান্তি পাবে, আমার পূজা করাও সার্থক হবে। পরদুঃখবিগলিত তোমার একদিনের চোখের জলের গঙ্গাজলে, তোমার হাতের মুষ্টি ভিক্ষার নৈবেদ্যে, তোমার প্রাণঢালা সেবার অর্ঘ্যে পৃথিবীর পূজার দালানে বসে অনন্যমনে নিষ্ঠার সহিত নর-নারায়ণের পূজা কর। সে পূজায় আমার যত সন্তোষ, ঢাকঢোল শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে শত জীবনের পূজাতেও তার শতাংশের একাংশ হয় না।"

বীণা থামিয়া গেল, মূর্ত্তি মিলিয়া গেল। সুরমারও মূর্চ্ছার ঘোর কাটিল। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সে আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "দেবতা আমার, তোমার আদেশ মাথায় করে নিলাম, তোমারই পরম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলাম।"

আশ্রমের বাহিরে বসিয়া গুরুদেব তখন গাহিতেছিলেন—

"যায় যাবে প্রাণ কি ভয় তার জগতের সেবা কর রে,
প্রাণ দিলে প্রাণ পাবি রে, জগতের সেবা কর রে।
কত নর নারী আছে অসহায়
রোগে শোকে তাপে কত ক্লেশ পায়
নয়নের জল মুছাতে তাদের মুখ পানে কেবা চায়রে।
ত্যাগেরি মহিমা করিতে প্রচার
নারায়ণ আসি হলেন অবতার
যদি হবি পার এ ভব পাথার ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা লওরে।
কে কোথায় আছ কর আগমন
সেবিতে দরিদ্র দীন নারায়ণ
কররে সকল মানব জীবন পরহিতে প্রাণ ঢাল রে।"

বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

মহাত্মা গান্ধী বঙ্গদেশে আসিয়া নানা স্থানে তাঁহার খদ্দর, অস্পৃশ্যতা দূর ও হিন্দু মুসলমানদের একতা সম্বন্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি যেখানেই যাইতেছেন সেইখানেই কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক নহে। তিনি যে অসামান্য ত্যাগের—দেবোপম হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা একমাত্র তাঁহাতেই সাজে। তাঁহাকে বুদ্ধ, চৈতন্যের অবতার বলিয়া লোকে পূজা করে—টলষ্টয়ের মন্ত্রশিষ্য বলিয়া শ্রদ্ধা করে, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও কেহ কেহ তাঁহাকে সম্মান করেন, মহাপুরুষের প্রতি এরূপ অযাচিত ভক্তি ভারত যুগে যুগে দেখাইয়াছে, আজও দেখাইতেছে; ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির সংস্পর্শ অনেকটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। ফরিদপুরে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, রাজনীতির অংশটা তিনি স্বরাজ্য দলকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের জন্য শুধু চরকা, অস্পৃশ্যতা দূর ও হিন্দু মুসলমানে মিলন—এই তিনটি বিষয়ের প্রচার কার্য্য রাখিলেন। মহাত্মা মহাপুরুষ। কোন কালে তিনি নেতা হইতে চান না। দলের মাথার উপর বসিয়া হুকুম চালাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করেন না, কিংবা দল গঠন করিয়া তিনি তাহার কর্ত্তা সাজিতেও চান না, তাই তিনি নিজে হীনতা দীনতা, বশ্যতা স্বীকার করিয়াও অপর দলকে কর্ম্মক্ষেত্রের পুরোভাগে বসাইয়াছেন। এই জন্যই মহাত্মা আজ স্বরাজ্যদলপতি দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের দ্বৈতশাসন ভঙ্গ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মানজনক সহযোগীতা প্রভৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। এরূপ মহত্ত্ব আছে বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী দেবতা এবং মহাপুরুষ।

মহাত্মা গান্ধীর বৈশিষ্ট্য এই তিনি একটা বিলাসী জাতিকে পুরাতন ত্যাগের দিকে ফিরাইয়াছেন যে জাতি ম্যাঞ্চেষ্টারী ফিন্ ফিনে মিহি কাপড় ছাড়া পরিত না, সে জাতি আজ খদ্দরের মোটা কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে।—লক্ষপতি আজ চরকায় সুতা কাটিতেছে, ইহার চেয়ে পরিবর্ত্তন আর কোন নেতাই এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই মহাত্মার পূর্ব্বে যাঁহারা দেশের নেতৃত্ব করিয়াছেন তাঁহারা পরকে বলিয়াছেন—বিদেশী বর্জ্জন করিতে আর নিজেরা দিব্য হ্যাট্‌কোট পরিয়া বেড়াইয়াছেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইল "আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখায়।" তিনি অন্যকে কিছু করিতে বলিবার পূর্ব্বে নিজে তাহা আচরণ করেন, আর তাহা করেন বলিয়াই আজ তাঁহার কথার মূল্য এত বেশী।

মহাত্মা গান্ধী—আদৌ ভাত খান না, সবরমতি আশ্রমেও তিনি দিনে তিনবার ছাগলের দুধ, কলা আঙ্গুর খান, বাঙ্গালায় আসিয়াও তিনি এই নিয়মেই খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেছেন। সূর্য্যাস্তের পরে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র আহার্য্য গ্রহণ করেন না। কটিদেশ পর্য্যন্ত একখানি খদ্দরের কাপড় এক জোড়া কাঠের খড়ম ও একটা ভিক্ষার ঝুলি মহাত্মা গান্ধীর বেশ ভূষা। বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় তিনি একটা খদ্দরের ছাতা ব্যবহার করেন। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে মহাত্মা আদৌ ভালবাসেন না, সর্ব্বত্রই হিন্দী ভাষায় তিনি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা সরল, আড়ম্বর বিহীন, তাঁহার সরস প্রাণের সরল কথা মাত্র। তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন, তাহাই অকপটে

বলেন, কাহারও নিন্দা প্রশংসার ধার তিনি ধারেন না। সারা সোমবার মৌনব্রত অবলম্বন করেন, এদিন কাহারও সহিত তিনি কথাটিমাত্র বলেন না—কেবল তাঁহার "ইয়ংইণ্ডিয়া" কাগজের জন্য প্রবন্ধ লেখেন। মহাত্মা গান্ধী দিনের মধ্যে কত সভা সমিতিতে যোগদান করেন, কত বক্তৃতা করেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহার "ইয়ংইণ্ডিয়া" পত্রের জন্য তিনি একাকীই প্রবন্ধ লেখেন, এজন্য তিনি কাহারও নিকট প্রবন্ধের জন্য হাত পাতেন না। ইহা কম অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচায়ক নহে। তাঁহার "ইয়ংইণ্ডিয়া" পত্রে কোন সংবাদ থাকে না, শুধু প্রবন্ধ, এই প্রবন্ধ পড়িবার জন্য সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানের হাজার হাজার লোক তাহার পত্রের গ্রাহক।

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী সর্ব্বদা সবরমতী আশ্রমে থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া তিনি স্বামীর সেবা করেন। সেদিন তিনি নিজের হাতে ঘৃতে ভাজা মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া মহাত্মার জন্য বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, কেননা তাঁহার কোন দ্রব্যের অভাব নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি করিয়াছিলেন তাহা তিনি তত্রত্য ভারতবাসীদের কল্যাণের জন্য দান করিয়া আসিয়াছেন, আবার ইয়ং ইণ্ডিয়ার আয় হইতেও তিনি এক কপর্দ্দক গ্রহণ করেন না। তিনি নিজে সূতা কাটেন, তাহা দ্বারা তাঁহার নিজের বস্ত্রের সমাধান হয়। আর নানা স্থান হইতে তিনি যে সমস্ত সূতা ও কাপড় উপহার পান তাহা দ্বারা আশ্রমবাসীদের বস্ত্রের সংকুলান হয়। ভক্তগণ তাঁহাকে যখন যেখানে আমন্ত্রণ করেন তখন তাঁহারাই তাঁহার রেল খরচ প্রভৃতির ব্যয় ভার বহন করেন, তাঁহাকে ভক্তগণ যে খাদ্য সামগ্রী দেয় তাহা দ্বারা তাঁহার আহার হইয়া আরও এত উদ্বৃত্ত থাকে যে অন্য লোকে তাহা খায়। কাজেই মহাত্মার কোন দ্রব্যের অভাব নাই।

মহাত্মা-গান্ধী চরকা কাটিতে এত ভালবাসেন যে একটি চরকা পাইলে আর অন্য কথা নাই। তিনি বলেন, ধনীর সহিত দরিদ্রের মন-প্রাণের সংযোগ করিতে চরকার মত এমন সুন্দর জিনিষ আর নাই। হতভাগ্য ভারতবাসী বুঝে না যে চরকার শক্তি কত! এই চরকা কাটিতে পারিলে শুধু যে দেশের ৬০ কোটি টাকা বছরে দেশে থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, চরকা—ভারতবাসীর বিলাসিতা একেবারে নাশ করিবে; একখানি চরকায় কাটা কাপড় পাড়লে আর কাহারও চেন ঘড়ী ঝুলাইয়া পমেটম মাখিয়া ডসনের বাড়ীর জুতা পায়ে দিয়া বাবুয়ানা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। একখানা খদ্দরের ধুতি একবার একটি বালকের অঙ্গে পরাইতে পারিলে সে আর বুটজুতা, চেন, ঘড়ি, আদ্দির জামার জন্য আবদার করিবে না। কাজেই অর্থ-নীতি হিসাবে খদ্দরের শক্তি বড় কম নহে। তাহা ছাড়া মিলের কাপড় পরিধান করিলে মিলের যাঁহারা ধনী অংশীদার তাঁহারাই লাভবান হন, দরিদ্রের তাহাতে একটুও উপকার হয় না। খদ্দর পরিলে দরিদ্রের অন্ন সংস্থান হয়—এই সহজ সত্যটুকু বুঝিয়াই আজ মহাত্মা গান্ধী "খদ্দর" "খদ্দর" বলিয়া দেশবাসীকে এত অনুনয়-বিনয় করিতেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিহিংসা বৃত্তি বড় আশ্চর্য্য রকমের। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশা ও তাহাদের প্রতি বুয়ারদের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করায় নাটাল, জোহানস্‌বর্গ, ট্রান্সভাল প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অসংখ্য শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল, মহাত্মা একবার ভারতবর্ষ হইতে নাটালে গিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিবামাত্র একজন গুণ্ডা তাহার মাথায় প্রহার করে। সকলে গুণ্ডাটিকে ধরিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য মহাত্মাজীকে বলে। মহাত্মাজী কিন্তু তাহা না করিয়া সেই গুণ্ডাকেই তাঁহার শরীর

রক্ষী নিযুক্ত করেন; ইহাতে সেই গুণ্ডা গান্ধী-মহাত্মাজের পরম ভক্ত হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় থাকিয়া মহাত্মার দেহ রক্ষা করিত।

মহাত্মা গান্ধী যখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিলেন, তখন যাইবার পূর্ব্বে তিনি মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি কখনও স্ত্রীলোকের মুখ চোখ দেখিবেন না, কখনও মদ্য স্পর্শ করিবেন না, কখনও কোন গান বাজনায় যোগদান করিবেন না, বলা বাহুল্য তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যারিষ্টারী করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার লাঞ্ছিত ভারতবাসীদের পক্ষে একটি মোকদ্দমা চালাইবার জন্য ট্রান্সভালে যান, তদবধি তিনি সেইখানেই অবস্থিতি করেন। তারপর সেখানে থাকিয়া তথাকার ভারতবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি সস্ত্রীক কয়েকবার জেলে যান—একবার সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া দশসহস্র ভারতবাসী লইয়া একটি বিরাট শোভা যাত্রা করিয়া ট্রান্সভালের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যান। এইখান হইতেই তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু হয়। ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ চালাইবার পূর্ব্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ চালাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী নিজেকে কখনও বড় বলিয়া মনে করেন না। আমেদাবাদ সেসনের জজ যখন তাঁহার প্রতি ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "লোকমান্য তিলক যে ধারায় যে দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সেই ধারায় সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।" এবার কলিকাতায় আসার কয়েকদিন পরেই মহাত্মা নিজে ব্যারাকপুরে যাইয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন এবং "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে "ব্যারাকপুরের জ্ঞানবৃদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে স্যার সুরেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা জানিতাম ত্যাগে, সংযম, নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম, দেবত্ব, মহত্ব প্রভৃতিতে স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে মহাত্মার স্থান অনেক উচ্চে, তাই আশা করা গিয়াছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথ নিজে আসিয়া মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিন্তু মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথকে সে অবকাশ না দিয়া নিজে গিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। এইটুকু মহত্ব আছে বলিয়াই মহাত্মা আজ এত মহীয়ান্।

বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলা ও আসামের নানা স্থানে চরকা, অস্পৃশ্যতা ও হিন্দুমুসলমান মিলনের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচারিত চরকার বাণী বাঙ্গলার দরিদ্র ও প্রকৃত দেশভক্তদের মধ্যে সফলতা মণ্ডিত হইবে। ধনী বিলাসীদের হাতে চরকা দিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। বাঙ্গলার শতকরা একটি স্ত্রীলোক এখন চরকায় সূতা কাটে, শতকরা ২টি স্ত্রীলোক চরকার সূতার তৈয়ারী কাপড় পরে। এই অধঃপতিত বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে মহাত্মা যে অমোঘ বাণী ঘোষণ করিতেছেন কে জানে তাহার ফল কি হইবে? তবে আমাদের বিশ্বাস, মহাত্মার বাঙ্গলা ভ্রমণের ফলে বাঙ্গলায় চরকা কাটা বৃদ্ধি পাইবে। খদ্দরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িবে।

"চরকা আমার সোয়ামী পুত
চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি।"

কথাটা এক বিন্দুও মিথ্যা নহে। এই চরকায় সূতা কাটিতে পারিলে গরীব দুঃখীর অন্ন কষ্ট যাইত—তাহাদের পেটে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হইত। আজ রোমা রোলা প্রমুখ পাশ্চত্য মনীষিগণ মহাত্মার এই চরকা-নীতির প্রতি তাঁহাদের অকাট্য বিশ্বাস জানাইতেছেন. আর কিনা আমরা

বাবু বিলাস'র দল—অবসর সময়ে একটু চরকায় সূতা কাটিতে পারি না!

মহাত্মা গান্ধী যে তিনটী মন্ত্র বাঙ্গলায় প্রচার করিতেছেন তন্মধ্যে খদ্দরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী। অন্য দুটী স্বভাবের দ্বারা গড়িয়া উঠিবে। এখন মহাত্মা বাঙ্গলার অতিথি, বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য অতিথি যে বস্তু পাইয়া খুসী হন, অতিথিকে সেই বস্তু অর্ঘ্য প্রদান করা। মহাত্মা খদ্দর ও চরকা ভালবাসেন। সকলে তাহাই দিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া তুলুন। বাঙ্গলার মা সকলেরা উলুধ্বনি করিয়া মহাত্মাকে যেমন বরণ করিতেছেন তেমনি তাঁর চরকার বাণীকে কার্য্যে পরিণত করিয়া সফল করিয়া তুলুন। চরকা কাটা মেয়েদেরই কাজ। পূর্ব্বে এদেশের ঠাকুর মা, দিদিমারা টেকোয় সূতা কাটিয়া জোলার দ্বারা কাপড় গামছা বুনাইয়া পরিতেন—টেকোয় তাঁহারা খাটি পৈতার সূতা কাটিতেন। এখন সেদিন গেল কেন? মা লক্ষ্মীরা নাটক নভেল ছাড়িয়া অবসর সময়ে চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করুন, মহাত্মার বাঙ্গলায় আগমন তবে সার্থক হইবে।

মহাত্মা বগুড়া, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই মেয়েরা তাঁহাকে চরকায় সূতা কাটিয়া দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালার মেয়েদের মধ্যে এই চরকার আদর দেখিয়া তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। কেন না—বাঙ্গালার মেয়েদের যে পরিমাণে খদ্দর পরা ও সূতা কাটা উচিত ছিল তাঁহারা সে পরিমাণে খদ্দর উৎপাদন করেন নাই। কাজেই তাঁদের কাছে আমার সানুনয় প্রার্থনা, বাঙ্গালার মা ভগ্নীগণ মহাত্মার ভ্রমণকে যদি সার্থক করিতে চান তবে মহাত্মার চরকা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা করুন—বাড়ীতে বাড়ীতে কাপাসের গাছ রোপণ করুন আর নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র নিজেরা উৎপাদন করিতে আরম্ভ করুন। পরমুখাপেক্ষীতা ও পরাধীনতা যে শাস্ত্রমতে মহাপাপ!

কিশোরী

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই যে কিশোরী যায় ফুটফুটে ফুলটী
ভোরের হাওয়ায় দোলা শিশিরের দুলটী।
দুষ্টুমি মুখখানি ভরা, ভারি চঞ্চল
জবা বকুলেতে ভরে' নিয়ে এল অঞ্চল।
বলো'নাকো কিছু ওরে, মনে হবে ক্ষুন্ন,
পুণ্যিপুকুর করে, হবে ওর পুণ্য।
ওর হাসি আকাশেতে উঠ্‌ছে রে ঝলসি
তুলসী তলায় জল ঢালে ওর কলসী!

শঙ্খ বাজাগে যারে হ'য়ে এল সন্ধ্যা,
আনো ফুল বেল, যুঁই, হেনা, রাত গন্ধ্যা।
মিছামিছি ব'সে ব'সে মালাটা কি গাঁথবি,
দিদিমার কাছে 'ইতু কথা' শুনে মাত্‌বি।
মালা গেঁথে এনে দিলি ঠাকুরের অর্ঘ্যে
নিশ্চয় যাবি তুই বলে দিনু স্বর্গে।
আজ তুই মধু ভরা মাধবীর সজ্জায়,
বধূ হ'তে হবে তোরে, মরিস্ নে লজ্জায়।

প্রেমে স্নেহে সুধারসে ভ'রে হিয়া বোন্ রে
রাখিস্ লো, করিস্-নি রাগ, হেথা শোন্‌রে।

নানা কথা

বোলপুর আশ্রমবাসিগণের সহিত মহাত্মা আলাপ :—

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বৈকালে মহাত্মাজী বোলপুর গিয়া আশ্রমবাসিগণের সহিত আলাপ করেন। খদ্দর শাড়ী পরিধান করিয়া বহু মহিলা আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী, ও ৺ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী মহাত্মাজীর সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। আলাপ করিবার সময় তিনি অবিশ্রান্ত চরকা চালাইতে ছিলেন।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মহাত্মাকে বলেন, আপনি আমাদিগকে যাহা ভাল তাহা বুঝাইয়া দিন। মহাত্মা চরকার দিকে তাকাইয়া বলেন, আমি ত দুই হাতেই ভাল জিনিষ দিতেছি। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমি কিছুই দিতে পারি না, তাহা আমার শক্তির অতিরিক্ত। আমার যন্ত্র আমার হইয়া কথা বলিবে। ইহাতে দেশের যে উপকার সাধিত হইবে, তাহা স্মরণ করিলে চরকার সঙ্গীত বড়ই মধুর বলিয়া মনে হয়।

আশ্রমবাসিগণ মহাত্মাকে প্রশ্ন করেন, কি উপায়ে আমরা প্রত্যেকেই দেশের জন্য কিছু কাজ করিতে পারিব? উত্তরে মহাত্মাজী বলেন, ইহার উত্তর অতি সহজ। আপনারা চরকা কাটুন। তিনি বলেন, আমি যদি দেশের প্রত্যেক লোককে ৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে বলিতাম, অথবা সকলকে আমার জন্য টেবিল তৈয়ারী করিতে বলিতাম, তাহা হইলে সকলের পক্ষে আমার অনুরোধ পালন করা সম্ভব হইত না,—ইহা আমি জানি; এইজন্যই আমি এমন একটা কাজের কথা বলিয়াছি, যাহা কি ধনী, কি নির্ধন, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি কবি, কি নিরক্ষর সকলেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। এই কাজ—চরকায় সুতাকাটা। ইহা করিলে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এক বিশাল জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমানে অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষকে ঠিক একটা দেশ বলা যাইতে পারে না,—মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এদেশে একটী জাতি নাই, ইহা বিভিন্ন জাতির সমষ্টি মাত্র। গুজরাটীর সহিত বাঙ্গালী অথবা মাদ্রাজীর ঠিক খাপ খায় না; অতএব সকলে যদি এমন একটা কিছু কাজ করেন, যাহা প্রত্যেকেই করিতে পারে, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ দেশে পরিণত হইতে পারিবে। আমার মনে হয়, দেশের সকলে যদি সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একভাবে জাতীয় শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে।

আমাদের দেশে মধ্যশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মেলামেশার কোনই সুযোগ নাই। আমার মনে হয়, এই দুই শ্রেণীকে পরস্পরের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়—খদ্দর। এই জন্যই আমি চরকাকে 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত করিয়াছি। যদি আপনারা কেহ গ্রামের অবস্থা দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি জানেন, গ্রামের অবস্থা কি শোচনীয়। দেশময় যে কি আলস্যের ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিলে সত্যই মর্ম্মাহত হইতে হয়। এই আলস্য মোচনের একমাত্র উপায়—খদ্দর।

আমার মনে হয়, এই একমাত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে; ইহা দ্বারাই হিন্দু মুসলমান কলহের শান্তি হইতে পারে; এমন কি, আমার মনে হয়, সকলে চরকা কাটিতে আরম্ভ করিলে, লোকের মানসিক অবস্থা এইরূপ উদার হইবে যে, তখন অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন করা অতি সহজসাধ্য হইবে।

হিন্দুসভায় আচার্য্য রায় :—

ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দুসভায় সভাপতির অভিভাষণে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন,—"প্রায় সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা পাত্রস্থ করা দায়, আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুষ্কর—বারেন্দ্র রাঢ়ীর সহিত, আবার উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। হিন্দুসমাজে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে অনেকে ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটী অপরিণত বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, বালিকাবধূ ১৫-২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলাদেশে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং পশ্চিম দেশীয় খোট্টারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনেক শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত

থাকিতে বাধ্য হয়, পরন্তু সহস্র সহস্র বালবিধবা সামাজিক রীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্নী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে—পাপস্রোত ও ভ্রূণহত্যা পাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭০ বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহ" বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু-বিধবা এই প্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।

কলিকাতার স্বাস্থ্য :—

কলিকাতার হেল্থ অফিসারের ১৯২৩ সনের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঐ বৎসরে কলিকাতায় ১৪৫৮৪ জন পুরুষ ও ১১২৫০ জন স্ত্রীলোক—মোট ২৫৮৩৭ জন লোক মারা গিয়াছে। কলিকাতা সহরে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী—কাজেই সংখ্যার অনুপাতে স্ত্রী-মৃত্যুর সংখ্যা বেশী। পুরুষগণের মধ্যে আলোচ্য বৎসরে হাজারকরা ২৩·৬ জন এবং স্ত্রীলোকগণের মধ্যে হাজারকরা ৩৮·৮ জন মারা গিয়াছে। কলিকাতার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বেশী। শিশু মৃত্যু হাজারকরা ২৯৪ জন—পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২৮৭ জন। আলোচ্য বৎসরে মোট জন্মসংখ্যা ১৮২১২ অর্থাৎ হাজার করা ২০·১ জন।

হেল্থ অফিসার তাঁহার রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা সহরে পুরুষ অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক স্ত্রীলোক যক্ষ্মাতে মারা যায়। তাঁহার মতে পর্দ্দাপ্রথার জন্য মেয়েরা উপযুক্ত পরিমাণ আলো-বাতাস না পাওয়াতে এবং রুদ্ধ ঘরে বাস করাতেই তাহাদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ বেশী।

কলিকাতা সহরে আনুমানিক ১০ হাজার যক্ষ্মারোগী সর্ব্বদা বাস করিতেছে এবং উহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রকার সতর্কতা না নেওয়াতে উহাদের থুথু ইত্যাদি দ্বারা সহরে রোগ সংক্রামিত হইতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশন অর্থাভাবে উহার কোন প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না।

রিপোর্টে প্রকাশ যে, কলিকাতায় কলেরা রোগে অন্য জাতি অপেক্ষা হিন্দু অনেক বেশী মরে। উহার কারণ গঙ্গাতে ও নালাসমূহে স্নান। ময়লা জলের কলিকাতায় যে সমস্ত কল আছে, তাহার ব্যবহারের ফলে কলিকাতায় অনেক সময় কলেরা বিস্তৃত হয়।

বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা :—

লাহোর বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার সম্পাদক জানাইতেছেন, উক্ত সমিতির ভারতের বিভিন্ন শাখা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সমগ্র দেশে গত এপ্রিল মাসে মোট ২০৬ জন বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে মার্চ্চের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৭৫৩টী বিধবার পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে জাতি নির্ব্বিশেষে ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে তালিকা দেওয়া হইল—

জাতি নির্ব্বিশেষে :—ব্রাহ্মণ—১৩৯, ক্ষত্রিয়—১৮১, অরোরা—১৫১, আগরওয়াল—২৫, কায়স্থ—২১, রাজপুত—৫৯, শিখ—৫৪, বিভিন্ন জাতীয়—১২৩; মোট—৭৫৩।

দেশ নির্ব্বিশেষে :—পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—৬১০, দিল্লী—১৭, সিন্ধু—৭, যুক্ত প্রদেশ—১০১, বাঙ্গালা—১৪, মাদ্রাজ—২, বোম্বাই—১, হায়দ্রাবাদ—১; মোট—৭৫৩।

রাজনীতিক্ষেত্রে নারীর প্রভাব :—

ব্রহ্মদেশে নারীগণ রাজনীতিক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মদেশের একটি মামলা হইতে জানা যায়। ব্রহ্মদেশে আ-থিন নামক স্থানে একটি গুপ্ত-সমিতি আছে। গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করায় কয়েকজন সদস্য উক্ত সমিতি হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মা-থিন নাম্নী এক মহিলা তাঁহাদের কার্য্যের ঘোর নিন্দা করিয়া 'নিউ লাইট অফ বার্ম্মা' নামক সংবাদপত্রে লিখেন। তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও তিনি এই কথায় কোন আমল দেন না। অধিকন্তু তিনি মা-থিনের অধিবেশন করিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রভাবে সমিতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই অপরাধে তাঁহার নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তিনি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। মা-পোয়া নাম্নী আর একটি মহিলাও এই অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন।

বেনারসে মহিলা সভা :—

গত ২৯শে এপ্রিল বেনারসে আর্য্য-মহিলা-হিতকারিণী মহাপরিষদ বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মী হিন্দু মহিলাদের এক সভা হয়। মাজুলীর রাজমাতা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সকল শ্রেণীর মহিলাই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাতে ধর্ম্ম শিক্ষা, বিধবাদের রক্ষা, উপদেশক গঠন করা প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমগ্র ভারতের

মহিলাদের লইয়া একটী অধিবেশন করারও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

যশোহরে মহিলা সভা :—

যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মিঃ সুশীলকুমার সিংহের উদ্যোগে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম প্রাথমিক সভা হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এল্-সি মহাশয়ও উদ্যোগী। আমরা এরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজকুমারীর মৃত্যু :—

গত ৮ই মে শোভাবাজার মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে তাঁহার পৌত্রী রাজকুমারী কৃষ্ণময়ীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন এবং অনেক গরীব দুঃখী দুস্থ লোককে অকাতরে দান করিতেন। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, মূক বধির বিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডার প্রভৃতিতে তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

সুতা কাটার দীঘি :—

সুতাকাটা যেমন লাভজনক না হইলেও ইহা দ্বারা যে সমাজের ধনবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা হইতে পারে, তাহা শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগণায় মহাদেবী বড়কাপন গ্রামের শিকদার বংশের এক বিধবা দেখাইয়াছেন। তিনি তাঁহার আজীবনকাটা সূতা বিক্রয়লব্ধ অর্থে একটী দীঘি কাটাইয়া গিয়াছেন। উহার নাম সুতা-কাটা দীঘি।

কুমারীগণের ধর্ম্মঘট :—

সহযোগী "কাশীপুর নিবাসী" সংবাদ দিয়াছেন যে বরিশালের নিকট, করেবী গ্রামের মেয়েরা টাকা বা সেলামী দিয়া বিবাহ করিবেনা বলিয়া এক ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতেছে।

শ্রীমতী শান্তাদেবীর বিবাহ :—

প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিদুষী শ্রীমতী শান্তা দেবীর সহিত বোলপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত কালিদাস নাগ মহাশয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সার নীলরতন সরকার এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বাংলার সহর ও পল্লীতে অনেক মহিলা চরকায় সূতা কাটিয়া থাকেন। কত মহিলা কত রকম জিনিসপত্র তৈরী করিয়া বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কাজ বর্ত্তমানে মহিলাদের পক্ষে বিশেষ গৌরব জনক। এই রকম কাজের বিবরণসহ নাম ঠিকানা পাঠাইলে আমরা আনন্দের সহিত মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশ করিব।

দণ্ডায়: ন চিত্তরঞ্জন ড় ভ তা সুধীর রায়
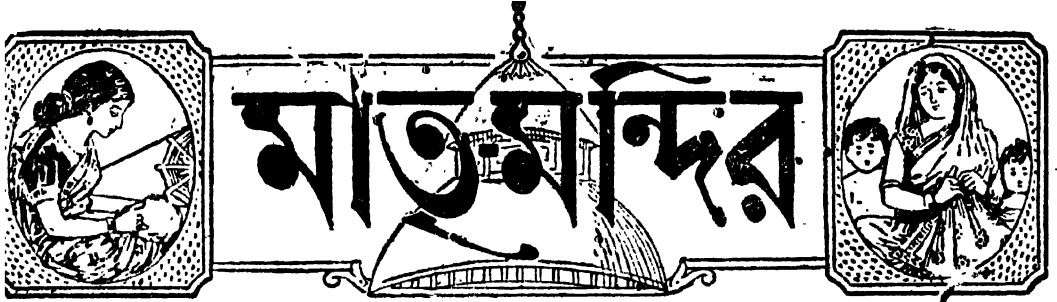
৩য় বর্ষ { শ্রাবণ—১৩৩২ } ৪র্থ সংখ্যা।

দেশবন্ধু-তর্পণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,

তুমি আমাদের কাছ থেকে নিত্যজগতে গিয়েছ। তোমাকে হারিয়ে আমরা বড় ব্যথিত হয়েছি, বড় বল-বুদ্ধি-হীন হয়ে পড়েছি। তুমি আমাদের জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে আমাদের দেশের কল্যাণ চিন্তা কর্‌তে। আমরা দিন দিন ক্রমেই তোমার দেশসেবার পরিচয় পেয়ে তোমার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলাম। দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বে তোমার দেশসেবায় আত্ম নিয়োগের পরিচয় পেয়ে আমরা অনেক আশান্বিত হয়েছিলাম, বুঝছিলাম এতদিন পরে আমরা দেশের উপযুক্ত নেতা, উপযুক্ত বন্ধু পেয়েছি; বুঝেছিলাম, অচিরাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের নানামুখী ক্লৈব্য ঘুচে গিয়ে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দিন এসেছে।

তারপর তোমার দেহ-সমাধির দিনে কলিকাতা মহানগরীর জনপথে যে লোকারণ্য দেখলাম, দেশের প্রতি তোমার প্রভাবের যে পরিচয় পেলাম, তাতে বুঝলাম,—তুমি মাত্র আমাদের বন্ধু ছিলে না, মাত্র ভারতের বন্ধু ছিলে না, তুমি দেশী-বিদেশী সকলের বন্ধু ছিলে। শ্বেতকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে দেশী বিদেশী সকলেই তোমার দেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। সেদিন ভারতের এক বিশেষ স্মরণীয় দিন।

ভগবান কি উদ্দেশ্যে তোমাকে তোমার অপূর্ণ কর্ম্মযোগের নির্ব্বাণ করলেন, সহজ জ্ঞানে তা আমরা বুঝতে পারি না। জানি তিনি মঙ্গলময়, তথাপি আমরা তোমার বিয়োগকে তাঁর মঙ্গলময় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে পথ পাচ্ছি না, তোমার অভাবে আমরা দুর্ব্বলচিত্ত হয়ে পড়েছি। ভগবানের সর্ব্বতোমুখী মঙ্গলের প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, স্বর্গ হতে তুমি আমাদের প্রতি সেই বিশ্বাস পাঠাও। তোমার জীবনে যে কর্ত্তব্যজ্ঞান, সৎসাহস, নিজ চরিত্রে অটল বিশ্বাস, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের আদর্শ দেখেছি, আমাদিগকে সেই সকল গুণ পেতে দাও।

মহাকালের যতই ধ্বংসকারী প্রভাব থাকুক না কেন, তোমাকে আমরা আমাদের মধ্য হতে বিদায় দিতে পারি না। আমরা জানি আত্মার ধ্বংস নাই, তোমার পরলোকগত আত্মা আমাদের দেশ মধ্যে বন্ধুরূপে কার্য্য করবেই। তুমি জীবিত থাকতে দেশের কার্য্যে কত বিঘ্নই পেয়েছ, কত বিরোধী শক্তির সঙ্গে তোমাকে কত যুদ্ধই করতে হয়েছে,—দৈন্য ভোগ, কারা ভোগ প্রভৃতি কতই তুমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছ—আজ তুমি

সর্ব্বমুক্ত। তোমার আত্মা আজ পরজগৎ থেকে আমাদিগের মধ্যে এসে শক্তি দান করবে। এক দেশবন্ধুর আত্মা দেশবাসী শত সহস্র দেশভক্তের প্রাণে শক্তি যোগায়ে তোমার মত শত সহস্র দেশবন্ধু গড়ে তুলবে।

যুগে যুগে এমনই হয়ে আসছে। মহাপুরুষগণ জীবিতকালে যে সব কার্য্য করেন, তা সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন। জড়দেহ ত্যাগের পরেই তাঁদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হয়, সসীম অসীমে যুক্ত হয়।

এস চিত্তরঞ্জন অসীমে যুক্ত হয়ে আবার আমাদের চিত্ত মধ্যে; এস দেশবন্ধু অসীমে যুক্ত হয়ে আবার তোমার প্রিয় দেশে। তোমার হাতে গড়া স্বরাজ দল জয়যুক্ত হক। তোমার অর্দ্ধাঙ্গিণী আমাদের ভগিনী বাসন্তীর প্রাণের বল শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে নারীকল্যাণে নিয়োজিত হ'ক। সর্ব্বদিকে জয়যুক্ত হয়ে ভারত সম্যকরূপে স্বরাজ লাভ করুক।

অন্তঃপুরে আচার-নিষ্ঠা ও সংস্কার

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্-সি।

আমি এই প্রবন্ধে হিন্দু-ঘরের অন্তঃপুরের আচার-নিষ্ঠা ও সংস্কার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে যে-কিছুরই সম্বন্ধ আছে, তাহার বিষয়ে কোন কথা লিখিতে হইলে খুব সাবধান হওয়া দরকার, বিশেষতঃ যে স্থলে আমাদের অন্তঃপুরের গৃহিণীগণকে কিছু বলিতে হইবে সেখানে অনেক সময় বোঝা পড়াতে বড় গোলযোগ হয়। সেইজন্য প্রথমই হইতেই খোলাখুলি ভাবে আমি সকল বিষয় বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম বলিতে আমি বুঝি এই—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি। যিনি যে ভাবেই তাহা প্রকাশ করুন না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। নানাপ্রকারের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে,—ঈশ্বরকে ধারণা করিবার অনেক উপায় আছে,—ঈশ্বরের স্বরূপ বিবিধ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমী তাঁহার সুবিধামত যে কোন পথ অবলম্বন করিতে পারেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পন্থা আমাকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া নিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাহা পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে আমি সত্যই ঈশ্বরের অভিমুখে যাইতেছি—না, ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি। যদি আমার মন দিনের পর দিন অধিকতর পবিত্র না হয়, যদি আমার হৃদয়ে ক্রমশঃ শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে না পারি, যদি এই সুখদুঃখময় সংসারচক্রে চিত্তকে স্থির ও প্রশান্ত রাখিতে সমর্থ না হই, তবে বুঝিব আমার ধর্ম্ম-সাধন-পন্থা ঠিক ধরা হয় নাই; ঈশ্বর ও আমার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইতেছে।

ধর্ম্মের আর একটা দিক আছে। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবা মাত্রই আমরা একটা বন্ধনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। মনুষ্যসমাজের সহিত আমাদের সম্বন্ধ—পরিবারে, স্বদেশে, বিদেশে। পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, শত্রুমিত্র, প্রতিবেশী, প্রভু ভৃত্য, রাজা প্রজা এই সকল বহু প্রকারের সম্বন্ধের অধীন আমরা থাকি। শুধু তাহাই নহে, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা প্রস্তর ইহাদের সহিতও আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—তাহাও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। এই সম্বন্ধ হইতেই আমাদের কর্ম্মের উৎপত্তি;—এই কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মের আর এক

দিক। নিজের প্রতি, পরিবার, পরিজনের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে,—যাহার সম্পাদনে আমাদের এই পার্থিব সম্বন্ধগুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও সার্থক হইয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই দিকটা কিছু জটিল, কারণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। অনেক স্থলে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যাহা পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য তাহা হয়ত দেশের পক্ষে অকর্ত্তব্য, তাহা হয়ত নিজের প্রতি অকর্ত্তব্য—এইরূপ কঠিন সমস্যার উদ্ভব প্রায়ই হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ আমাদের পারিবারিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মের এই দুইটী দিকই একসঙ্গে জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের কাজকর্ম্মের মধ্যে দেখা যাইবে ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্ত্তব্যপালন এই দুইটী ভাবই আছে, একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধরুন এই সাবিত্রীব্রতের বিষয়টা। এখানে কি দেখিতে পাই? প্রথমতঃ পতির সহিত সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিয়া পত্নী ঈশ্বরকে স্মরণ করে। এই গেল ঈশ্বরের দিকটা। দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তব্যের দিক। সাবিত্রীকে যাঁহারা ঐতিহাসিক হিসাবে স্বীকার করিয়া লইবেন তাঁহারা সাবিত্রীর স্মৃতি পূজা করিয়া সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন এবং সেই সতীর স্মৃতি পূজার যে সুফলটুকু নিজেদের জীবনের হিতের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন তাহাই তাঁহাদের পরম লাভ। তারপর মোটামুটী কথা, পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য পালন। অন্তঃপুরের মধ্যে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। এই কর্ত্তব্য পালনেই পতিপত্নীর সম্বন্ধ সার্থক হয়। এক্ষণে আমি বলিতে পারি, সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা গৃহিণী ঈশ্বরের সত্তার ধারণা ও আপনার কর্ত্তব্য পালন এই দুইটী কার্য্য করিয়া থাকেন। অবশ্য অন্তঃপুরে এরূপ অনেক অনুষ্ঠান আছে যাহাতে ধর্ম্মের শুধু একটা দিকই প্রধানতঃ লক্ষ্যের বিষয় থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি. শিবপূজায় শুধ ঈশ্বরের দিক,—শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শুধু কর্ত্তব্যের দিক।

দ্বিতীয়তঃ আচার বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রণালী, যাহা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেক দিন হইতে চলিয়া আসার জন্যই সেই সকল নিয়ম প্রণালীর এমন একটা মর্য্যাদা, এমন একটা গুরুত্ব, এমন একটা শক্তি জন্মে যাহা লঙ্ঘন করা বড় কঠিন। ইংরাজীতে ইহাকে Customs অথবা Etiquette বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইংরাজী শব্দ দিয়াই যে আচারের অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের দেশের রাজবিধিতে এই ইং Custom কথাটির খুব প্রয়োগ ও জোর দেখা যায় আর তাহাই দেশাচার বলিয়া আইনে বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকে, সেইজন্য ইহার উল্লেখ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি অন্তঃ-পুরের বাহিরে যাইব না, সুতরাং দেশাচার ছাড়িয়া আমি পারিবারিক আচারের কথাই বলিব। বিশেষ বিশেষ কারণে কোন বিশেষ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আচারের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আচার। আবার একই দেশে সামাজিক আচার অনেক রকমের আছে। একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল পরিবারের আচার এক প্রকার নহে। আবার পরিবারের মধ্যেও স্ত্রী-আচার বলিয়া আলাদা একটা জিনিস আছে। অন্তঃপুরের কথা আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিব যে, যে অবস্থায় অথবা যে সুবিধার জন্য কোন বিশেষ আচারের প্রচলন হইয়াছিল, এখন সেই অবস্থা আছে কিনা, সেই সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা, যদি না থাকে তবে তাহা শুধু পুরাতন বলিয়াই যে মানিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না। আপনারা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন এইরূপ ভাবে অনেক পুরাতন আচার উঠিয়া গিয়াছে ও তাহার স্থলে নূতন রকমের ব্যবস্থা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ নিষ্ঠা। শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য যে সকল সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে, সেগুলিকে অত্যন্ত খুঁটিয়ে নাটিয়ে প্রয়োগ করার অভ্যাসকে নিষ্ঠা বলে। ন্যায়ের নিয়মের খুঁটিনাটি, 'একেবারে চুলচেরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তাহাই হইল নিষ্ঠা। নিষ্ঠা জিনিসটী মন্দ নয়। এই নিষ্ঠা শুধু অন্তঃপুরে কেন—বাহিরে বিজ্ঞের মহলেও খুব প্রচলিত আছে। সেগুলি হইল বিজ্ঞানের খুঁটিনাটী। ডাক্তার একটা অপারেশন করিবার সময় ছুরী কাঁচি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেকে শুদ্ধ ষ্টেরিলাইজ করিয়া লয়,—একখানা ব্যাণ্ডেজ, যদি কাঁচের মত চকচকে পরিষ্কার মারবেল পাথরের মেজের উপর পড়িয়া যায় তবে সেপ্‌টিক্ হইবার ভয়ে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। এই সকল দেখিয়া ত আমরা নাক সিঁটকাইয়া বলিনা "আহা, কি নিষ্ঠা গো।" কিন্তু একটী হিন্দু-বিধবা পুকুরে ডুব দিয়া পাড়ে উঠিয়া দেখিল তাহার পরণের ভিজা কাপড়ে একটা কুচো চিংড়ী লাগিয়া রহিয়াছে; তখন সে আবার ডুব দিতে জলে নামিল। এই স্থলে আমরা তাহার নিষ্ঠাকে ঠাট্টা করি। কেন? ইহার কারণ আছে। যাহারা নিষ্ঠাবান্ তাহারা যদি মূল নীতিটা ধরিতে পারে তবে তাহাদের সকল আচরণে একটা সামঞ্জস্য থাকে, সেই স্থলে নিষ্ঠা হাস্যজনক ব্যাপারে পরিণত হয় না। কিন্তু যেখানে শিক্ষার অভাবে মূল নীতি অপরিজ্ঞাত থাকে, সেখানে নিষ্ঠা নিত্যই বিরোধী আচরণের উদ্ভব করে এবং সেখানে নিষ্ঠা নিষ্ফল, নীরস ও নিরর্থক।

চতুর্থতঃ সংস্কার। দীর্ঘকাল কোন অভ্যাসের দরুণ মনে যে একটা স্থায়ী ভাবের সৃষ্টি হয় তাহার নাম সংস্কার। কিরূপে সংস্কারের উৎপত্তি হয় তাহা গত আষাঢ় মাসের "মাতৃ-মন্দিরে" "অন্তঃপুরের আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিয়াছি। এবারে তাহা আরও বিশদ করিতেছি। মনে করুন আমি বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম আমাদের বাড়ীর পার্শ্বের তেঁতুল গাছে ভূত আছে। বড় হইলাম, জ্ঞান হইল, বুদ্ধি হইল, বুঝিলাম ভূত বলিয়া কিছু নাই। দেশ বিদেশে, বনে জঙ্গলে, আঁধারে আলোকে কতই ঘুরিলাম কোথাও ভূতের ভয়ে আমাকে ধরিল না। কিন্তু বাড়ীর পাশের সেই তেঁতুল গাছের তলায় আসিতেই গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল,—এই হইল সংস্কার। কারো মাথায় জটা, পরণে গেরুয়া কাপড়, হাতে চিম্‌টা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা দেখিলেই আমার যে মাথা আপনা আপনি নুইয়া আসে এইটা হইল আমার সংস্কার। যে দেশে, যে সমাজে যে পরিবারে আমার জন্ম হয় তাহার প্রাচীন ইতিহাসের প্রভাবেই আমার সংস্কার গঠিত হয়। শৈশবের শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতা আমাদের সংস্কার গুলিকে তৈয়ারী করিয়া দেয়। সংস্কারের আক্রমণ হইতে কেহ রক্ষা পাইতে পারে না। সংস্কার সু ও কু এই দুই রকম হইতে পারে। যাহাতে আমাদের ভাল হয় সেগুলি সুসংস্কার। দৃষ্টান্ত, ধরুন বৎসরের প্রথম দিনকে একটা বিশেষ শুভদিন মনে করিয়া সেদিন বন্ধুবান্ধব সকলে মিলিয়া আমোদ উৎসব ও আহারাদি করা অথবা ঈশ্বরকে স্মরণ করা। ইহাতে আমাদের চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় ও সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করা হয় সুতরাং ইহা একটী ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী সংস্কার হইতে উদ্ভূত। বৎসরের প্রথম দিনে এমন কিছু বিশেষত্ব নাই—সেদিন বরাবরকারই মত সূর্য্য উঠে, বাতাস বয়, পাখী গায়, ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে। নববর্ষের উৎসব একটী সুসংস্কার। আর মাসের প্রথম দিন অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া কাজে বাহির হইলাম না, ফলে একটা জরুরী কাজ পণ্ড হইল, এইটী হইল কুসংস্কার, কারণ ইহাতে আমার ক্ষতি। অবশ্য যদি ইহা সুপ্রমাণিত হয় যে মাসের প্রথম দিন বাহির হইলে মৃত্যুও ঘটিতে পারিত—অথবা মাসের প্রথম দিন বাহির হওয়াতে অহরহ মৃত্যু ঘটিতেছে

এবং উদাহরণ মাসের প্রথম দিন রেলজাহাজ সব বন্ধ থাকে, তবে তাহা আর কুসংস্কার হইত না।

এখন আমি সংক্ষেপে আমার কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সুখ-শান্তির স্থান অন্তঃপুরে। ধর্ম্ম ও নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা আচার-নিষ্ঠা ও সংস্কারগুলিকে এইরূপ ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব যেন তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ ও শান্তির ব্যাঘাত না হইয়া সাহায্য হয়।

বিশ্বের দরবারে মুস্‌লিম মহিলা

"নারীরে যে জাতি করে অবহেলা

পঙ্গু করিয়া রাখে

বিশ্বজগতে সে জাতির হায়

কে আর লজ্জা ঢাকে!

মাকে অপমান! সহিলেও মাতা,

সহেনা'ক ভগবান

নারী মহিমার নিকটে তুচ্ছ

আর যত সম্মান!"

"নারী এবং পুরুষ নির্ব্বিশেষে মোসলমানেরই বিদ্যার্জ্জন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য" এই অমর বাণী প্রচার করিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মানবের চিন্তা রাজ্যে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন ধারা প্রবাহিত করিয়া সভ্যতাভিমানী জাতিকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই অগ্নি-গর্ভ মন্ত্রের ফলস্বরূপ উত্তরকালে বহুসংখ্যক মোস্‌লেম-নারী বিভিন্ন বিভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোরাণ এবং হাদিসে ব্যুৎপন্ন এমন আরব মহিলার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় যিনি দীর্ঘ বার বৎসর কাল কেবল কোরাণ শরিফের প্রবচন সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সাহিত্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই হজরত হোসেন-তনয়া সৈয়দা সখিনা, তদীয় ভবনে কবি কেকাহ্ শাস্ত্রবিদ্ এবং বিদ্বৎমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া নানা শাস্ত্রালোচনায় ব্যস্ত। প্রথম খলিফদের মহিষী উম্মলবানিন তৎকালীন প্রজাবৃন্দের Magna carta স্বরূপ ছিলেন। প্রজাদের উপর কোন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে স্বয়ং খলিফাকে তাঁহার নিকট কৈফিয়ত দিতে হইত। এই সদাশয়া মহিলাই পারস্যের শাসনকর্ত্তা অত্যাচারী হোজ্জাজকে শাস্তি প্রদান করেন এবং প্রজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

তপস্বিনী রাবেয়া কাহারও নিকট অপরিচিতা নহেন। আব্বাস বংশ-গৌরব আরব্যোপন্যাস কীর্ত্তিত বাগদাদের জনপ্রিয় খলিফা হারুণর রশিদের রাজত্বকালে তদীয় মহিষী জোবেদা খাতুনের কবিত্ব এবং আরবীয় Joan of Arc লায়লার রণনৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের ইতিহাসেও রেজিয়া, চাঁদসুলতানা, জাহান্-আরা, নুরজাহান, জেবুন্নেসা যে কোন উন্নত জাতির, যে কোন গরীয়সী মহিলার মসনদে আপন আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিবেন।

জাতি যখন উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তখন সে জগতের জাতি সমূহের সদগুণাবলী আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করে, পক্ষান্তরে অবনতিশীল জাতি নিজেদের সমস্ত গুণাবলী বিসর্জ্জন দিয়া অপরের অসৎ অভ্যাসাদির অন্ধ অনুকরণ করে।

মহাপয়গম্বরের (১) মহান শিক্ষা ভুলিয়া মোসলমানগণ যখন স্ত্রীজাতির স্বাধীন চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তিকে অস্বীকার এবং তাহাদিগকে শিক্ষা এবং সাময়িকতা হইতে বঞ্চিত করিয়া জাতিকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছিল তখন ইউরোপের গুণগ্রাহী জনমণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ মহাপরাক্রান্ত সম্রাট চিন্তাশীল মনস্বী নেপোলিয়ন ইস্‌লামের শিক্ষার প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করিলেন "জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষিতা মাতার যত প্রয়োজন এত আর কিছুই নহে।"

একার দুর্গমূলে তুর্কীর তরবারির আঘাতে নেপোলিয়নের সমস্ত বিক্রম প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, সেই অপরাজেয় বীর সর্ব্ব প্রথম তুর্কীর নিকটই পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নারীশিক্ষার যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা তিনি ফরাসী জাতিকে পান করাইয়াছিলেন তাহার ফলে অল্পকাল মধ্যে পরাজিত ফরাসী জাতি শতগুণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া তুর্কীর, তথাকথিত মোস্‌লেম জগতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া আছে।

ইউরোপ আমেরিকার ঘরে ঘরে আজ শিক্ষিতা মাতা বর্ত্তমান। ধীরে ধীরে কর্ম্মজগতের প্রত্যেক বিভাগে নারী-প্রতিভার বিকাশ হইতেছে। রাজনীতি, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকার্য্য, চিকিৎসা, সংবাদপত্র পরিচালন, শিক্ষাদান, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্যে পাশ্চত্য নারীগণের সংখ্যা আশাতীতরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রাচ্য দেশেও যে কয়টি জাতি আজ পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিতেছে তাহারাও নারী-শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিমান। সমস্ত ইউরোপীয় খৃষ্টান-শক্তির প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে যে তুর্কীগণ স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার একটী প্রধান কারণ তাহাদের নারীশক্তি। তুর্কী মাতাগণ মেথহাত, আনোয়ার, জমাল, তালাত, ইস্‌মত ও কামালকেই কেবল গর্ভধারণ করেন নাই, লতিফা, হামিদা প্রভৃতির ন্যায় কার্য্য-কুশল ভগিনীগণকেও তাঁহারাই গর্ভে ধারণ করিয়া জাতির এবং সমস্ত জগতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। জাপানী মহিলাগণের কর্ম্মজীবনের নানা কথা এখন প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। মেসেরের (Egypt) স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীশক্তি কি পরিমানে সাহায্য দান করিয়াছে তাহা সংবাদপত্র পাঠক পাঠিকা মাত্রেই অবগত আছেন। অনুন্নত রাষ্ট্রশ্রেণীর মধ্যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত আফগানি-স্তানও নারীশিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেছে।

পরাধীন হিন্দুস্থানের হিন্দু এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ভগিনীগণও জড়তা পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা, শিল্পকার্য্য, আইন ব্যবসা, রাজনৈতিক ও সাহিত্য সাধনায় ইতিমধ্যেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ট্রিভেণ্ড্রমের মহিলা এবং শিশু হাঁসপাতালের ডাক্তার মিসেস পুনেন লুখোজ গত ২০শে সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিবাঙ্কুর রাজদরবারের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় মোসলমান মহিলাগণের মধ্যে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী পরলোকগত বি-আম্মা ব্যতীত আর কোন মহিলা উল্লেখযোগ্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। গত ১৯২১ সনের আদমসুমারী হইতে জানা যায় ভারতের মোসলমান জনসংখ্যার মধ্যে হাজারকরা মাত্র ৯ জন শিক্ষিতা। বাংলা দেশের মুস্‌লিম মহিলাগণ ইহার উপরেও টেক্কা মারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাজার করা ৬ জন শিক্ষিতা।

ভারতের—বিশেষতঃ বাংলা দেশের মোসলমান ভগ্নীগণের মনোযোগ নিম্নলিখিত বিষয়টীর প্রতি আকর্ষণ করিতেছি—বাংলার পিঞ্জরাবদ্ধ ভগিনীগণ হয়ত শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন যে কুমারী এগ্‌নেস

(১) পয়গম্বর—প্রেরিত পুরুষ।

স্মেডলী নাম্নী জনৈক মহিলা সুদূর আমেরিকায় শৈশবের খেলাধুলা এবং কৈশরের পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়া বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর বার্লিন্ শহরে অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি জার্ম্মেনীর সংবাদপত্রে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন এবং কলেজেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই শিক্ষাদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনের সহিত তাঁহার বেশ পরিচয় আছে।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্মেডলী সম্প্রতি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"যদি আপনি (সম্পাদক) ভারতের কন্ফারেন্স সমূহের কার্য্যাববিরণী আমাকে পাঠাইয়া দেন তবে আমার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। মোসলমান মহিলাগণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক উন্নতির বিষয়ই আমি বিশেষ ভাবে জানিতে বাসনা করি। মোসলমান মহিলাগণের মধ্যে এরূপ কি কোন সঙ্ঘ আছে যাহারা উক্ত বিষয় সমূহের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন? যদি থাকে তবে তাহাদের কাগজ পত্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন কি?"

আমাদের পাঠিকা এবং লেখিকাগণ এ প্রশ্নের কি কোন উত্তর দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? বোধ হয় তাঁহাদের উত্তর এই—"হে ভগিনী! ক্ষমা কর, এ প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ, শিক্ষায় দীক্ষায় বহু পশ্চাৎপদ, স্বাধীন চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তি আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমাদের কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নাই। আমরা হেয়; লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ভাবে শিয়াল কুকুরের জীবন যাপন করিতেছি।"

বিষাদ-কালিমালিপ্ত লজ্জাবনত বদনে এই উত্তর দান ব্যতীত ভগিনীগণের আর কি কিছু বলিবার আছে? আমরা বলি, নাই।

কতদিনে যে আমরা আমাদের নারীশক্তির সাহায্য লাভ করিব জানি না।

—তরুণ পত্র।

বাসন্তীদেবীর প্রতি

(চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে)

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী।

কেঁদ'না ভগিনী, ফে'লনা অশ্রু
শ্রেষ্ঠ মানব-ঘরণী,
মহিমা তোমার মহান স্বামীর
ঘোষিছে আজিকে ধরণী।
মরণে অমর ধন্য যে তিনি,
সার্থক তব শোক,
আজি বাংলার মুখপানে চাহি
মুছ' ওগো দুটি চোখ।

কর্ম্মের বীর সব ত্যজি ওই—
দেবধামে যান চলি,
সজল চক্ষে অযুত মানব
দিতেছে পুষ্পাঞ্জলি।
ত্যজ শোক দেবী, এ নহে মরণ
এযে গো মৃত্যু জয়,
বঙ্গমুকুট সে দেশবন্ধু
চির অমরতাময়।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৯

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া হেমলতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দুপুর বেলা গাড়ী করিয়া অত ভদ্রলোক সঙ্গে লইয়া সরিত আসিল কেন—আধ ঘণ্টা পরে আবার সকলে চলিয়া গেল কেন, এই অর্দ্ধ ঘণ্টা তাহারা কি করিল তাহার কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। তাঁহার গুপ্তচর দাসীটাও সেদিন বাড়ী ছিল না, কোথায় গিয়াছিল। সহস্রবার তাহার মুণ্ডপাত করিয়া অগত্যা হেমলতা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ব্যতীত অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না।

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে তিনি ললিতবাবুর গৃহ দ্বারে গিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিলেন ললিতবাবু নিদ্রামগ্ন, সেবিকা একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছে। তিনি যেমন গোপন ভাবে আসিয়াছিলেন তেমনি গোপন ভাবে ফিরিয়া গেলেন।

অসীম কোর্ট হইতে ফিরিয়া জলখাবার খাইতেছিল, হেমলতা এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন "ওঁকে দেখতে গেছলে ?"

অসীম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "না।"

হেমলতা বলিলেন "কেন ?"

একটু রুক্ষভাবে অসীম বলিল "আমার যাবার কিছু দরকার দেখছিনে। তাঁকে দেখবার লোক যথেষ্ট আছে দেখলুম।"

হেমলতা বলিলেন "সরিতের কথা বলছ তো ?"

অসীম গম্ভীর ভাবে কচুরীখানা চিবাইতে লাগিল, উত্তর দিল না।

হেমলতা বলিলেন "সরিত আজ দুবার এবাড়ীতে এসেছে। দুপুর বেলা উকিল অমিয় বোস, ডাক্তার বাবু, আরও অনেক লোক নিয়ে সে আবার এসেছিল দেখলুম।"

অসীম বিস্মিত চোখ দুইটা একবার তাঁহার মুখের উপর তুলিয়া তখনই নামাইল এবং গভীর মনোযোগের সহিত ছানাবড়া ভাঙ্গিয়া মুখে দিতে লাগিল।

বিরক্ত ভাবে হেমলতা চলিয়া গেলেন।

জলখাবার খাইয়া সে নিজের গৃহের বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে বসিয়া আপন মনে সিগারেট টানিতে লাগিল। চোখের সামনে আকাশের গা বহিয়া অন্ধকারের ধারা পৃথিবীর গায়ে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

শীতে তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল তথাপি সে নড়িতে পারিল না। এখন সে এমন একস্থানে উপনীত হইয়াছে যেখানে কেবল ধাকাই সহিতে হয়।

হাঁফাইতে হাঁফাইতে রামলাল আসিয়া বলিল "শীগ্‌গির চলুন ছোটবাবু—বাবু কি রকম করছেন !"

"অ্যা, তুই বলছিস কি রে?"—অসীম একেবারে লাফাইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইবার আগেই যে তাহার পিতার কিছু হইতে পারে ইহা তাহার ধারণারই অতীত যে। আর কাল যে মানুষের জ্বর হইয়াছে সে আজ চলিয়া যাইতেছে ইহা বিশ্বাস করাও যে যায় না।

রামলাল কাঁদিয়া বলিল "আপনি শীগ্‌গির চলুন। দেরী করলে আর দেখতে পাবেন না তাঁকে।"

এমন অবস্থা? অসীমের ইচ্ছা হইতেছিল সে একবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠে, নিজের বক্ষে একবার আঘাত করিয়া নিজেকে শাস্তি দেয়। পাষণ্ড সে, পিশাচ সে, কেন পিতাকে কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুইটা দিনের মধ্যে একবারও দেখিতে গেল না? পরের উপর রাগ করিয়া কি হইল? এ যে সব পর, যে যাইতেছে সেই যে তাহার আপন।

সে রুদ্ধ শ্বাসে নীচে নামিয়া পড়িল। পিতার গৃহের সম্মুখে পড়িয়া হেমলতা। তিনি মূর্চ্ছিতা কিনা তাহা দেখিবার অবকাশ অসীমের ছিল না, সে এক লম্ফে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

গৃহ তখন লোকে ভরিয়া গিয়াছে। সেবিকা ললিতবাবুর মাথার কাছে নীরবে বসিয়া। সরিত ললিতবাবুর পার্শ্বে বসিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ডাক্তার তখন ইন্‌জেকসান দিবার জন্য ব্যস্ত।

ললিতবাবু একবার চাহিলেন, ক্ষীণ কণ্ঠে একবার মাত্র উচ্চারিত হইল—"মা।"

সেই মুহূর্ত্তে ডাক্তারও ইন্‌জেকসান দিল। শেষ মা কথাটা মুখে থাকিতে থাকিতেই ললিতবাবু চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেবিকা রুদ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস চাপিতে না পারিয়া—"বাবা গো" বলিয়া দুই হাত মুখে চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরিত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল "বউ-দি, শোক করবার সময় এটা যদিও, তবু আমি তোমায় কাঁদতে বারণ করছি। তুমি উঠে বাইরে যাও। এখানে এই প্রাণশূন্য দেহটাকে আগলে নিয়ে বসে থেকে কোনও লাভ নেই তো!"

সেই মুহূর্ত্তে অসীমের দিকে তাহার চোক পড়িল। হতভাগ্য পুত্র তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দরজার পাশেই বসিয়া পড়িয়াছিল। শেষ সময়ে পিতা তাহার একটু সেবা পাইলেন না, তাহাকে দূরে জানিয়াই চলিয়া গেলেন ভাবিয়া সে আর আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

সরিত জোর করিয়া তাহার মুখ হইতে হাত সরাইয়া দিয়া বলিল "এখন অস্থির হবার সময় নয় ভাই। যদি আমার উপর তোমার রাগ থাকে, এ সময় তা মুছে ফেলবার অনুরোধ করছি আমি। এসো, আজ আমাদের সেই ছোট বেলার মত একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যে পর্য্যন্ত না সব কাজ, শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত শেষ না হয়ে যায়, সে পর্য্যন্ত আমরা দুই জনে এক হয়ে কাজ করব। মনে রাখব আমাদের মাঝখানে কেউ নেই। তুমি বস তোমার বাপের কাছে, আমি বউদিকে বার করে দিয়ে লোকজন ডেকে আনি।"

সেবিকা কিছুতেই উঠিল না, তেমনই আড়ষ্ট ভাবে মৃতের মাথার কাছে বসিয়া রহিল। জগতে তাহার একটীমাত্র যে স্নেহপ্রিয় ছিল তাহা আজ সে হারাইল। আজ যেন সে যথার্থ অভাগিনী হইল। আজ সে জগৎ পানে চাহিয়া, নিজের কথা ভাবিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

সরিত জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

সৎকার শেষ লইয়া গেল, ললিতবাবুর চিহ্ন জগৎ হইতে মুছিয়া গেল। হেমলতা সব ত্যাগ করিয়া থান পরিলেন, সিঁথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিলেন।

কয়েকদিন পরে অসীম একটু ঠাণ্ডা হইয়া

সরিতকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বাবার কাছে ছিলে ; জানো বোধ হয় বাবা তাঁর সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করে গেছেন ?"

সরিত গম্ভীর ভাবে বলিল "সব জানি, কিন্তু এখন আমি কিছুই বলতে পারছি নে। আগে শ্রাদ্ধটা শেষ হয়ে যাক, তার পর বলব। আর এই কয়েকটা দিন চুপ চাপ করে থাক।"

অসীম বেশ বুঝিতে পারিল ইহার মধ্যে একটা কোনও গোল আছে। তাহার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ ব্যাপার শেষ হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধের পরদিন সকাল বেলা শ্রান্ত দেহে নিজের বাড়ী ফিরিবার সময় সরিত অসীমকে বলিল "তুমি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলে ভাই তা শুনতে পাবে বউদির কাছে। আমাকে মাপ কর ভাই, আমি বলতে পারলুম না।"

অসীম গম্ভীর ভাবে বলিল "সেটা সেদিন বলে ফেললেও পারতে, এতটা লুকোচুরি করবার দরকার ছিল না। তোমার যা ইচ্ছা তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।"

অকস্মাৎ সাদা হইয়া গিয়া সরিত দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া বলিল "আমার ইচ্ছা ?"

তীব্র কণ্ঠে অসীম বলিল "হ্যাঁ তোমার ইচ্ছা! তুমি জান যে তাকে আমি দেখতে পারি নে। তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, তাকে দেখলেই আমার পালিয়ে যেতে হয়। তোমারই জন্য যে এটা হয়েছে তা আমি এখনও বলছি। তুমি সব জেনে শুনেও তার সঙ্গে সেধে কথা বলাতে ইচ্ছা কর আমাকে দিয়ে ? খুব ভুল ধারণাই হয়েছে এটা তোমার, এটা ঠিক জেনে রেখ, মরে গেলেও আমি তার মুখ দর্শন করব না। ভ্রষ্টা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না।"

সরিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া বলিল "সে তোমার ইচ্ছে। তুমি জান বা না জান আমার কোনও ক্ষতি নেই। বউদি আমায় বলতে বারণ করেছেন বলেই আমি বলতে পারলুম না, এর জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা না কর তাতে আমার আর হাত নেই।"

গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া অসীম বলিল "নিশ্চয়ই এতে কোনও ষড়যন্ত্র আছে নইলে—"

সরিত বলিল "থাকতে পারে।"

উত্তেজিত ভাবে হাত তুলিয়া অসীম বলিয়া উঠিল "সরিত, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি আমার সামনে তুমি আর এস না। আসলে নিশ্চয়ই খুনোখুনি ব্যাপার একটা ঘটে যাবে। আমি নিজকে সামলাতে পারি নে তা বোধ হয়—"

উত্তেজনার আবেগে সে থামিয়া গেল। সরিত গম্ভীর ভাবে বলিল "সে তুমি বউদিকে জিজ্ঞাসা করতে পার। আমি তোমার আদেশ পালন করতে বাধ্য নই, তিনি যা বলবেন আমি তাই শুনতে বাধ্য।"

ধীর ভাবে সে চলিয়া গেল। অসীম জ্ঞানহারার মত দাঁড়াইয়া রহিল। সরিত যে তাহার মুখের উপর এমন ভাবে স্পষ্ট কথা বলিতে সাহস করিবে তাহা সে ভাবে নাই।

যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে দ্রুতপদে সেবিকার গৃহের দিকে ছুটিল।

স্নানান্তে সেবিকা তখন পূজার গৃহে যাইতেছিল। সম্মুখে অসীমকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

অসীম গর্জ্জন করিয়া বলিল "এর মানে কি বুঝিয়ে দাও আমাকে ? সরিতকে তুমি আসতে বলেছ আমার বাড়ীতে ?"

সেবিকা বুঝিল সে কেন আসিয়াছে। অবগুণ্ঠন একটু কমাইয়া দিয়া স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অকম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর দিল "হ্যাঁ আসতে বলেছি।"

তাহার স্থির ভাব অসীমের গাত্রে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। সে একপদ অগ্রসর হইয়া মুষ্টি তুলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কুলটা, ব্যভিচারিণীর মেয়ে—

তীব্র কণ্ঠে সেবিকা বলিল "আমাকে যা বলতে হয় বল, সব সহ্য করব, কিন্তু তুমি যে আমার স্বর্গগতা জননীর নামে কলঙ্ক দেবে, তাঁকে যা-তা বলবে, সে আমার সহ্য হবেনা বলে দিচ্ছি। আমায় তুমি লাথি মেরে যাও সেও আমার সইবে, কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধে কথা সইবে না আমার।"

সেবিকার মুখে তীব্র উক্তি অসীমের কল্পনারও অতীত। সে তাহার দীন ভাবই হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছিল। সেই দীন ভাবের মধ্যে যে তেজঃদর্প থাকিতে পারে তাহা সে জানিত না। অসীম একটু থতমত খাইয়া হাত নামাইয়া পিছনে সরিয়া গেল।

সেবিকা তখনি নরম হইয়া বলিল "ঠাকুরপোকে এনেছিলেন বাবা। তিনি তাঁকে বিষয়ের এক্জিকিউটার করে রেখে গেছেন, সেইজন্যই ঠাকুরপো এখন এ বাড়ীতে যাতায়াত করছেন, করবেনও। তুমি তোমার জিনিস নাও, আমায় মুক্ত করে দাও, আমিও ঠাকুরপোকে মুক্তি দিচ্ছি। যতদিন এ বোঝা আমার মাথায় চাপানো থাকবে, ততদিন ঠাকুরপোরও মুক্তি নেই।

অসীম কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। পিতা সকল সম্পত্তি পুত্রবধূকেই উইল করিয়া দিয়াছেন এ আশঙ্কাটা আজ তাহার সত্যে পরিণত হইল। প্রথমটা বিস্ময় তাহার পর ক্রোধ আসিয়া তাহার হৃদয়খানা ছাইয়া ফেলিল। সে ক্রোধটা চাপিবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, বলিল "বাবা বুঝি তোমাকেই সব উইল করে দিয়ে গেছেন, আর সরিত বুঝি এক্জিকিউটার নিযুক্ত হয়েছে?"

সেবিকা নতমুখে ধীরে ধীরে উত্তর দিল "হ্যাঁ। একটু দয়া করে দাঁড়াও, আমি একটা জিনিস এনে দেখাই।"

সে দ্রুতপদে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। দারুণ ঘৃণা অসীমকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কৌতূহল তাহাকে সরিতে দিল না। সে কি আনিতে গেল দেখিবার জন্য অসীম সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেবিকা ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতে দুইখানি কাগজ দিয়া বলিল "নিয়ে যাও। আমি আজ হতে ঠাকুরপোকে এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করছি।"

অসীম একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিয়া লইল একখানা তাহার পিতার উইল। তিনি তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন সেবিকাকে, অসীমকে একটা আধলাও দান করিয়া যান নাই। তাহাকে কিছু দেওয়া না দেওয়া সেবিকার ইচ্ছা। এই যে বাড়ীখানা অসীম এতক্ষণ আপনার বলিয়াই জানিতেছিল, ইহাও তাহার নয়, সেবিকার।

অসীমের বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। সে একবার অলক্ষ্যে সেবিকার পানে তাকাইয়া দেখিল সে মাথা নত করিয়া পূজার থালার ফুল তুলসী এক এক পাশে সরাইয়া রাখিতেছে। ওই না তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখা যায়? ওই না তাহার ললাটে বিজয়ীর রেখা?

আর একখানি কাগজের পানে চাহিয়া সে দেখিল সেখানিও উইল। সেবিকা শ্বশুরের দত্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া স্বামীকে দান করিয়াছে। সে দুইবেলা দুই মুষ্টি অন্নের প্রার্থনা করে এবং নিজের গৃহটীতে থাকিবার প্রার্থনা করে। আর কিছুই সে চায় না।

স্ত্রীর দানে অসীম ধনী হইবে এতদূর নীচ সে? যাহাকে সে পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে, বারবারই সে তাহার সর্ব্বস্ব সেই আঘাতকারীকে দান করিয়া জয়ীর গৌরব লাভ করিতে চায়?

অসীম উইল দুইখানা তাহার পাশে ফেলিয়া দিল, দর্পিত কণ্ঠে বলিল "তোমার সম্পত্তি তুমি যাকে খুসি দিতে পার, আমি চাইনে। আমার ও উইল যাতে তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়েছ সেটা তুমি ছিঁড়ে ফেলতে পার।"

চমকাইয়া পূজার থালা ফেলিয়া সেবিকা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "চাও না? তোমার সম্পত্তি তুমি নিতে চাও না?"

কর্কশ কণ্ঠে অসীম বলিল "আমার সম্পত্তি কিসে? বাবা তোমাকেই দান করে গেছেন, আমায় দেননি। আমায় দেবার ইচ্ছা থাকলে আগেই দিতে পারতেন তিনি। তোমার ন্যায় ঘৃণিতার দানে আমি বড়লোক হতে চাইনে।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে সেবিকা বলিয়া উঠিল, "নেবে না—তুমি নেবে না? এ সম্পত্তি আমি কি করব তবে?"

"খুসি তোমার, পথে ছড়িয়ে ফেল গে, কুড়িয়ে নেবার ঢের লোক আছে। আমি ছোট লোক নই যে তোমার দান কুড়োতে যা'ব!" বলিয়া দর্পিত পদে অসীম চলিয়া গেল।

সেবিকা সেইখানে তেমনি শূন্য হৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল তাহার সে জ্ঞান নাই। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে উইল দুখানা কুড়াইয়া লইল। একবার শূন্য-দৃষ্টিতে দুখানার পানে চাহিয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল। সেদিন তাহার পূজা হইল না।

দুপুর বেলা সে শুনিতে পাইল অসীম আলাদা বাসা ঠিক করিয়া আসিয়াছে, বৈকাল বেলাই সেই বাসায় সকলে চলিয়া যাইবে।

সেবিকার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। মান অপমান ভুলিয়া সে গিয়া হেমলতার পা জড়াইয়া পড়িল "আপনার পায়ে পড়ি মা, সকলে মিলে আমায় এমন করে মারবেন না। আমি এখনি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আপনারা কোথায় যাবেন আপনাদের বাড়ী ছেড়ে?"

গম্ভীর ভাবে হেমলতা পা দুখানা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন "আমাদের বাড়ী এ কথাটা আর বলোনা বাছা। এ দুঃখের সময় ও রকম ঠাট্টা ভাল লাগেনা আমার। আমাদের বাড়ী কিসে? তুমি এখন বাড়ীর মালিক, জমিদারীর মালিক, আমরা কোথাকার কে? সরে যাও বাছা, মায়া কান্না আর কাঁদতে এসনা, তোমায় বাছা খুব চিনেছি। তুমি হচ্ছ ভিজেভিজে বেরাল। মুখে সাত চড়ে কথা বেরোয় না অথচ ডুবে ডুবে জল খেতে বিলক্ষণ জান। লোক-দেখান মায়া দেখিয়ে আর ফলটা কি?"

আহত হইয়া সেবিকা উঠিয়া নিজের গৃহে গেল। উইল দুখানা বাহির করিয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে প্রকৃত অভাগিনীর মতই আজ আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিল!

তুমি তো চলিয়া গেলে বাবা, এ বোঝা কেন তাহার মাথায় চাপাইয়া গেলে? তাহার মুখ দেখাইবার পথ একটু রাখিলে না, এমন করিয়া তাহার সম্মুখে বিশ্বজগতের উপর কৃষ্ণ যবনিকা বিস্তার করিয়া দিলে! আজ সেবিকা লুকাইবে কোথায়, সে যে স্থান খুঁজিয়া পাইতেছে না।

(ক্রমশঃ)

বিলাপ

(দেশবন্ধু দাশের বিয়োগে)

শ্রীমতী মানকুমারী বসু

মনে পড়ে একদিন—কত যুগ আগে,
রক্ত পদ্ম পাদযুগ নিম্ববৃক্ষে হেরি
কালরূপী মূঢ় ব্যাধ মৃত্যুবাণ দিয়া
বিঁধিল, সে বিশ্বধ্যেয় নর নারায়ণে!
আবার কি শুনি হায়—সুদূর প্রবাসে
গ্রাসিল যে ব্যাধ রূপে কাল ব্যাধি আসি
দেশপূজ্য মহাপ্রাণে! শরাহত সম

সায়াহ্নে সহসা শূর পড়িল ঢলিয়া!
চমকি উঠিল বিশ্ব! অদৃশ্য নিয়তি—
কি করিল সর্ব্বনাশ—কি শাপে না জানি
শ্রীকৃষ্ণে হারালে ধরা!—কি পাপে না জানি
হারা'লে অভাগী বঙ্গ "দেশবন্ধু" সুতে!
আকাশ অবনী ভরি উঠিছে ক্রন্দন
কোথা তুমি! কোথা তুমি! হে চিত্তরঞ্জন!

বিবাহোপলক্ষে অসমীয়া হিন্দু মহিলার সামাজিক প্রথা

আসাম পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিবাহকালে কন্যাকে "কলর গুরিত" স্নান করাইবার কালে অসমীয়া হিন্দুমহিলারা যে ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন, মাতৃমন্দিরের পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা তাহার দুইটি নমুনা ইতিপূর্ব্বে উপহার দিয়াছি। বরকে 'কলর গুরিত স্নান' করাইবার কালে সকল শ্রেণীর কামরূপীয়া হিন্দু মহিলারা যে ধরণের গীত গাহিয়া থাকেন, পাঠক পাঠিকাগণের উপলব্ধির জন্য কামরূপের নলবাড়ীতে শ্রীযুত পদ্মপাণি দত্তরায় বরুয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত দুইটী গীত নমুনাস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। কলর গুরিত গোয়া নাম।

হাতী দাতর ফণি খিনি রত্নরে রত্নরে চিতিকা।
মেলিছি বিচিত্র কেশ ধুয়ায়ে চণ্ডিকা॥
কলর গুরিত থিয় হৈ বাপু এ কেইমন লিখিলা গাঁও।
সকল আয়াতি বেঢ়ি ধুয়ায়ে আকলা মায়ের নাউ॥
গা ধুই উঠি চানা বাপু এ পতুয়াত দিলা ভরি।
তোমার চেনেহর দাদাই নিব কোলা করি॥ (১)

২। কলর গুরিত গোয়া নাম।

হাতী দাতর ফণি গলে হীরা মণি
ধুয়ায়ে যশোদা রাণি হে রাম।
বাপুর চুলি কোছা দেখিবাকে খাছা
লাগে দের পোয়া তেল হে রাম॥
চুচিবা না পালু জাজিবা না পালু
আয়তির হুহিতে গেল হে রাম।
কলর গুরিতে নাচে অপ্সরা
ধুয়ায়ে সরগর তরা হে রাম॥ (২)

বিবাহের দিন কন্যার বাটীতে "কলর গুরিত গা-ধুয়ানর পর কন্যা নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে বসে। তৎকালে তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যে সিঁন্দূরের টিপ অথবা তাহার সিঁতায় সিঁন্দূরের রেখা দেওয়া হয়। বরের বাটীতে কলর গুরিত গা-ধুয়ানর পর বরকে বাটীস্থ প্রাঙ্গনে আসনে বসাইয়া রাখা হয়। তৎপরে "সুয়াগতুলা" কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

সুয়াগ তুলা

কামরূপ দরঙ্গ ও নগাঁও অঞ্চলে আমরা দেখিতে পাই, বরের মাতা সন্ধ্যাকালে গ্রামের স্ত্রীলোকবৃন্দ ও আত্মীয়গণ সহ একটী ডালায় করিয়া চাউলের দোনা, প্রদীপ, হরিতকী আতপ চাউল, মৃৎঘট প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য লইয়া কোন একটী পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে গমন করেন। তৎকালে ঐ স্ত্রীলোকেরা গীত গাহিতে গাহিতে, ঢুলীরা ঢোল এবং খুলীরা খোল বাজাইতে বাজাইতে তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করে। বরের মা ঐ নদী অথবা পুষ্করিণী তীরে অর্দ্ধহস্ত অথবা

দোল

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন দুইটী উচ্চ "দোল" নির্ম্মাণ করত উহার চতুর্দ্দিকে উলুখড় পুতিয়া দেন। এই উলুখড়ের চতুর্দ্দিকে সুতার বেড় দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি জলে নামিয়া ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া স্থলে উঠিলে জনৈক আত্মীয়া তিনটী আম্রপল্লব দ্বারা তাঁহাকে কোমলভাবে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করেন, "কি দেখিলে?" তদুত্তরে বরের মা বলেন, "ঢোলর

---

(১) অসমীয়া শব্দার্থ :—ফণি—চিরুণি : থিয়—স্থির : অকলা—একমাত্র ; নাউ—নাম ; পতুয়াত—কলার গুঁড়িতে ; ভরি—পা ; চেনেহর—স্নেহের।

(২) অসমীয়া শব্দার্থ :—বাপুর—কনিষ্ঠ ভ্রাতার। কোছা—গুচ্ছ। খাছা—খাসা, খুব ভাল। দেখিবাকে—দেখিতে। চুচিবা—পরিমার্জ্জিত করা। হুহিতে—কোলাহল ধ্বনিতে।

ডুব" অর্থাৎ ঢোলের বাজনা। অতঃপর ঐ উত্তোলিত মৃত্তিকার কিয়দংশ উপরিউক্ত ডালায়, দোনায় ও দোঁগে দেওয়া হইলে পুনরায় তিনি জলে গিয়া ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া আনিয়া ঐরূপ করেন। দেশীয় প্রথা অনুসারে ৩।৫ অথবা ৭ বার এইরূপ করিবার পর আর একবার তিনি স্নান করেন—সেবার মাটী আনেন না, স্থলভাগে গা মুছিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করেন। অতঃপর ৩ ধার অথবা ৭ বার জলে আতপ ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই চাউল ফেলিবার কালে দুইজন অথবা তিন জন আত্মীয় উহা হইতে কিছু পরিমাণ লইয়া রাখেন। তৎপরে বরের মা ৩ জন অথবা ৫ জন আত্মীয়া সধবা স্ত্রীলোকের "কোঁচড়"এ আতপ চাউল ফেলিয়া দেন। ইহার পর বরের মা পুনরায় স্নান করিয়া মুখে জল ভরিয়া লন ও শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। ফিরিবার কালে একব্যক্তি কোদাল দ্বারা রাস্তায় ছোট ছোট গর্ত্ত কাটিতে কাটিতে যায়। একজন স্ত্রীলোক ঐ গর্ত্তে উত্তমরূপে মিশ্রিত দুগ্ধ-কদলি দিয়া যায়। বরের মাতা কয়েকটী উলুখড় সংযোগে এই মিশ্রিত দুগ্ধ-কদলির কিয়ৎ পরিমাণ তুলিয়া একটী কংসপাত্রে রাখেন। এই পাত্রে পূর্ব্ব হইতে একটী টাকা, চাউল ও মাসকলাই রাখা হয়। বরের মাতা বাটীর প্রাঙ্গনে পৌঁছিলে দুইজন স্ত্রীলোক বরের মস্তকোপরি একখানি বস্ত্র প্রসারিত করত ধারণ করেন। বরের মাতা তখন তাহার সম্মুখে ৫ বার অথবা ৭ বার প্রদক্ষিণ করিলে ঐ কংসপাত্রস্থ টাকা বরের মস্তকোপরি ধৃত কাপড়ের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। কাপড়খানির এক দিক নীচু করিয়া দিলে জনৈক ব্যক্তি টাকাটী ধরিয়া লন। তৎপরে পাত্রস্থ চাউল ও মাস কলাইয়ের কিয়দংশ ঐ কাপড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বর উপরিউক্ত টাকাটী তাম্বুল ও পান সহ একটী বাটায় করিয়া তাহার মাতাকে দিয়া প্রণাম করেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন। অনন্তর সুয়াগতুলার সময় মুখে করিয়া আনিত জল তিনি ফেলিয়া দেন এবং কংসপাত্র হইতে একটী মাত্র চাউল আনিয়া তিনি তা হার পুত্রের মুখে দিয়া থাকেন।

কন্যার বাটীতেও কন্যার মাতা এইরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু "দেউলের" পরিবর্ত্তে তিনি অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ দুইটী ছোট ছোট পুষ্করিণী খনন করেন। সঙ্গিনী আত্মীয়েরা আম্রপল্লব দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া "কি দেখিলে?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি বলিয়া থাকেন, "গঙ্গায়, দুর্গায় বিয়া।" সুয়াগতুলার পর বর, কন্যার বাটীতে যাত্রা করেন। সেখানে বিবাহ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। কন্যার বাটীতে কন্যার মাতা সুয়াগ তুলিবার পর কন্যাকে ঘরের মধ্যেই রাখিয়া দেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বড়পেটা মহকুমায় বরের সহিত একদল স্ত্রীলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যার বাটীতে গীত গাহিতে গাহিতে গমন করে। তাহাদের সহিত ঢুলিয়ারা থাকে। এই মহিলাদিগকে নিমন্ত্রিত করিতে হয় না বলিয়া তাহারা কোনরূপ পারিশ্রমিক পায় না। বরকর্ত্তা তাহাদের প্রত্যেককে কেবল মাত্র সিধা দিয়া থাকেন। বরের প্রতিবাসিনী কলিতা, কেওট বা কৈবর্ত্ত, কোচ প্রভৃতি জাতির কতিপয় স্ত্রীলোকেরা তাহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে। সিধার পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় বরকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদিগকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

বরের বাড়ী কন্যার বাড়ী হইতে ১০।১২ মাইলের অধিক দূরে এবং বিবাহ দারুণ গ্রীষ্মকালে অথবা বর্ষা কালে হইলেও সঙ্গিনী মহিলাগণ স্বেচ্ছায় ও উল্লাসে এই দীর্ঘ পথ গীত গাহিতে গাহিতে কন্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন। অন্যূন ১১।১২ বৎসর হইতে ৪০।৪৫ বৎসরের মধ্যে উপরিউক্ত যে কোন জাতির যে কোন বয়স্কা মহিলা বরের সঙ্গিনী হইতে পারে। কন্যাগৃহ অধিক দূরবর্ত্তী না হইলে কুমারীগণও তাহাদিগের দল বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অসমীয়া ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কলিতা বা কৈবর্ত্তের কন্যারা বিবাহ অন্তে প্রথমবার দোলায় উঠিয়া বরের বাটীতে যাতায়াত করে। পিত্রালয় অধিক দূর না হইলে তৎপরে তাহারা পদব্রজে সেখানে গমনা-গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলের এবং মঙ্গলদৈ মহকুমায় খাতি কায়স্থের এবং উজনীয়া কায়স্থ সত্রাধিকারীদিগের কন্যারা বিবাহ অন্তে বরাবর কাষ্ঠ নির্ম্মিত দোলায় উঠিয়া পিত্রালয়ে যাতায়াত করেন। মঙ্গলদৈয়ে মাত্র ৫ ঘর খাতি কায়স্থ আছেন। আসাম অঞ্চলের বড় বড় পল্লীতে বর্ত্তমানেও এই দোলার প্রচলন আছে। দোলাগুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘে তিন হাত। কোচ জাতীয় লোকেরা বরাবর দোলা বহন করিয়া আসিতেছিল। ইদানিং তাহাদের অনেকেই ঐ কাজ ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিয়াছে

দোলায় উঠিয়া কন্যার গমনাগমন

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

সর্দ্দিতে :—

(১) শিশুর সর্দ্দি হইলে তাহার দুই পায়ের তলায় রাত্রিতে উত্তম করিয়া খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া মালিশ করিয়া দিলে উপকার হয়।

(২) দুই রতি পিঁপুলের গুঁড়া মধু সহ মাড়িয়া সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দিতে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৩) ছোট চামচের এক চামচ আদার রস মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি ভাল হয়।

(৪) ছোট চামচের এক চামচ তুলসী পাতার রস মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি ভাল হয়।

ব্রণকাইটিসে বা ঘুঙ্‌রিতে :—

শিশুর বুকে সর্দ্দি বসিলে তৎপ্রতিকারার্থ আদার রস ও মধু সমান ভাগে লইয়া অগ্নিসন্তাপে আদার রস শুষ্ক হইলে, কেবলমাত্র মধু অবশিষ্ট থাকিলে সেই মধু সমস্ত দিনে দুই তিন বার অল্প অল্প করিয়া সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি যায়। ইহাতে শিশুর ব্রণকাইটিসে বা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় বিশেষ উপকার হয়।

বুকে সর্দ্দি বসিলে :—

(১) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম মধুর সহিত সেবনে শিশুর বিশেষ উপকার হয়।

ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিবার প্রণালী :—একখানি হাতায় কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ রাখিয়া একটী ছোট বাটি দ্বারা উহা চাপা দিয়া কিয়ৎক্ষণ অগ্নিসন্তাপে রাখিলে উহা ভস্ম হইয়া যায়। ২ বৎসরের শিশুর জন্য এই ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ১ রতি দিবে। আবশ্যক হইলে ইহা সকালে ও বিকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান যাইতে পারে।

(২) আদার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বুকে ও গলায় মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৩) পিঁপুল চূর্ণ ২ আনা, তুলসীমঞ্জরী ২ আনা, যষ্টিমধু, মিছরি, বড় এলাচ ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটী চারি আনা, সমস্ত দ্রব্য অগ্নি সন্তাপে দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ঝিনুক থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি কাশিতে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বাসে :—

শিশু শ্বাসে কষ্ট পাইতে থাকিলে তৎপ্রতিকারার্থ—আমড়া পোড়াইয়া তাহার খোসার পরেই যে সার পদার্থ থাকে, তাহা ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া শিশুর বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। সমস্ত দিনে দুই তিনবার মালিশ করিতে হইবে।

যষ্টিমধুর গুঁড়া শিশুর যত বয়স তত রতি, অর্থাৎ এক বৎসরের শিশুর পক্ষে এক রতি এই রকম হিসাবে গরম দুগ্ধের সহিত খাওয়াইলে পরিষ্কার দাস্ত হইয়া থাকে।

জ্বরে :—

(১) তুলসী পাতার রস মধু সহ সেবনে শিশুর জ্বর নষ্ট হয়।

(২) আতইচের চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে শিশুর জ্বর নিবারিত হয়। ইহা সাধারণ জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। আতইচ চূর্ণের মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ রতি।

(৩) পলতা, নিমছাল, হরীতকী (আঁটীবাদ), ও বহেড়া (আঁটীবাদ)—ইহাদের সর্ব্বসমান দ্রব্য মোট দুই তোলা হইবে। অর্দ্ধ সের জলে উক্ত দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের এক ঝিনুক শিশুকে কয়েকদিন সেবন করাইলে সাধারণ জ্বর নষ্ট হয়। এই ঔষধ তিন বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে সেবন করাইবে না।

অতিসারে :—

(১) আমড়া ছাল, আম ছাল ও জাম ছালের গুঁড়া সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবনে শিশুর অতিসার ভাল হয়।

(২) বেল শুঁঠের গুঁড়া ও ধাই ফুলের গুঁড়া চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে শিশুর অতিসার ভাল হয়। ১ বৎসরের শিশুর জন্য ঐ দুইটী দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ রতি মাত্র দেওয়া দরকার।

(৩) বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস, মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৶১০ আনা ওজন, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া ও জল এক সের—একত্র সিদ্ধ করিয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শিশুকে ২।৩ বার পান করাইলে শিশুর অতিসার ভাল হয়।

আমাশয়ে :—

(১) সাদা জীরার গুঁড়া ও সাদা ধুনার গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাশয় ভাল হয়। ১ বৎসরের শিশুর জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধ রতি মাত্র।

(২) খইয়ের গুঁড়া, যষ্টিমধুর গুঁড়া, চিনি ও মধু সমান ভাগে লইয়া সেবন করাইলে শিশুর আমাশয় ভাল হয়। ১ বৎসরের শিশুর জন্য প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ রতি।

এঁড়ে লাগায় :—

(১) দুগ্ধের সহিত চূণের জল সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিকজনিত অগ্নিমান্দ্য রোগ ভাল হয়।

(২) ছাতিমছাল, মরিচ, গোরোচনা প্রত্যেক দ্রব্য ১ রতি মাত্রায় লইয়া জল সহ শিলায় পেষণ করিয়া ৪।৫ দিন সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক রোগ ভাল হয়।

আমাতিসারে :—

(১) বিরঙ্গ, যোয়ান ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ রতি লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাতিসার ভাল হয়।

(২) বটের মূল পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল অতিসার ও আমাতিসার ভাল হয়। *

* শিশু চিকিৎসা সম্বন্ধে নূতন কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে লেখক মহাশয়ের নিকট (১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার) পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। মাঃ সঃ

নিরুপায়

(গল্প)

৺ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী। *

হরিহর ঘোষালের অবস্থা মন্দ ছিল না। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরের মাছ, গাছের নারিকেল, অটুট স্বাস্থ্য, সুশীলা ভার্য্যা আমাদের আগেকার প্রার্থনীয় যা কিছু সবই তাহার ছিল। সংসারে তাহার স্ত্রী লক্ষ্মী ও বৃদ্ধা মাতা। গ্রামের অধিকাংশ তাহার আত্মীয়, তাহার যজমান। ছিলনা কেবল সন্তান, সেইটী স্বামী স্ত্রীর সুখের মাঝে চাঁদের কলঙ্কের মত বিরাজ করিত। হরিহরের মনটা উদার, মেজাজটী উঁচু, হৃদয়টা কোমল আর হাতটা দরাজ। গ্রামে এমন কোন লোক নাই যে কোন না কোন প্রকারে তাহার নিকট উপকার না পাইয়াছে। শত মুখে সবাই তাহার সুখ্যাতি করিত।

তারপর হইবেনা হইবেনা করিয়া অনেক বয়সে লক্ষ্মীমণি যখন একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিল তখন হরিহরের গৃহখানি আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল। সবারই মুখে হাসি, মনে আনন্দ। কেবল প্রসন্ন হইল না হরিহরের মনটা। পুত্রের বিষণ্ণ বদন দেখিয়া মা বলিলেন, 'হর, মেয়ে হয়েছে তাই কি, দেখিস ওর পিঠে আবার কত ছেলে হবে, আর না হয় ওই তোর সাত ব্যাটা'।

বাঙ্গালীর সংসারে মেয়ে জন্মান সত্যই যেন একটা অভিসম্পাতের মত হইয়া পড়িয়াছে। হরিহরের মনে কি উদয় হইল জানি না কিন্তু সে চেষ্টা করিয়াও যেন মনের বিষণ্ণতা তাড়াইতে পারিতেছিল না।

মেয়েটীও হইল যেন ফুলের চুপড়ি, রূপের ডালি। সব চেয়ে সুন্দর তার হাসিটী। সে যেন স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া সুধার ধারা। সে হাসিতে চপলতা নাই, অনাবশ্যক শব্দ নাই, সে যেন ফুলের মত ফুটে উঠা জ্যোৎস্নার মত ছড়িয়ে পড়া। কারণে অকারণে মেয়েটী সদাই হাসিত। তাই দেখিয়া লক্ষ্মী তাহার নাম রাখিল সুহাস।

এক দিন লক্ষ্মী সুহাসকে হরিহরের কোলে দিয়া বলিল 'দেখ দেখি কেমন সুন্দর মেয়ে হয়েছে।' মেয়েটিও তার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

হরিহর বলিল, 'লক্ষ্মী, তোমার মেয়েটি ভারি হাসকুটে হয়েছে।'

লক্ষ্মী বলিল, আমার মেয়ে আর তোমার কে? তোমার বুঝি মাসী;' এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

হরিহর সে কথায় কান না দিয়া বলিল, 'অতো হাসি কি ভাল!'

লক্ষ্মী ব্যথিত হইয়া বলিল, 'কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। ছেলেপিলে হাসবে নাত কি?'

কিন্তু সুহাস আর হাসিল না, কি বুঝিল সেই জানে।

(২)

লক্ষ্মী বসিয়া কাঁথা শেলাই করিতেছিল এমন সময় হরিহর শুষ্ক মুখে আসিয়া বলিল 'না লক্ষ্মী, দু হাজারের কমে তাঁরা রাজি নন।'

স্বামীর মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল 'কেন তাঁরা যে বলে গেলেন মেয়ে দেখে বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'পছন্দ হয়েছে বলেই তো—'

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল 'ও সব কথা এখন থাক। রোদে মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে কিছু জল

---

* এই উদীয়মান লেখক গত বৈশাখ মাসে অকালে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যান কামনা করি।

খেয়ে নাও। মেয়ে জন্মাবার আগে বর জন্মেছে। তার আর অত ভাবনা কেন?'

'বর জন্মেছে চিরকালই শুনে আসছি কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে যে প্রাণ যায়',—এই বলিতে বলিতে হরিহর কূপের কাছে গেল।

সুহাসের জন্মগ্রহণের পরে অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সংসারের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে আর পরিবর্ত্তন হইয়াছে সুহাসের। সেই অর্দ্ধস্ফুট কমল কোরক আজ প্রস্ফুটিত শতদল। তার রূপে গুণে কথায় সকলেই মুগ্ধ। মেয়ের নামে যারা ভয় পায় তারাও তাকে দেখে মনে করে 'হাঁ মেয়ে যদি জন্মায় তবে যেন এম্নি মেয়েই হয়।'

হরিহরের ইচ্ছা কোন এক গৃহস্থ ঘরের সুস্থ সবল ছেলে দেখিয়া সুহাসের বিবাহ দেওয়া। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই হইল। লক্ষ্মী বলে 'তা কি হয়? অমন পরীর মত মেয়ে আমার কি যার তার ঘরে দেওয়া যায়! ভাল ঘর ও পাশ করা ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। হাকিম জামাই হবে আর মেয়েও খেয়ে পরে সুখী হবে।'

কিন্তু পাশকরা ছেলেত আর মুখের কথায় বা চেহারায় হয় না! ছেলের পাশের একটি পদ বাহির হইল যদি তবে মেয়ের বাপের মর্ত্ত্য গেল, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ গেল, তৃতীয় পদে মাথাটি পর্য্যন্ত গেল। একবারে বলি রাজার দশাই। এই পাশ ও অর্থের সামঞ্জস্য ঘটাইতে গিয়া সুহাসের বিবাহে দেরী পড়িতে লাগিল।

কি পাশই যে বাঙ্গলা দেশে এসেছিল! অর্থ গেল, স্বাস্থ্য গেল আর যা গেলে আর ফেরে না তাহাও ক্রমে ক্রমে যাইতেছে। পরপদলেহন করা চাকরী আর মেয়ের বাপের সর্ব্বস্ব লইয়া কি আর কোন জাতি সমৃদ্ধশালী হয়, না হতে পারে?

বর্ষিয়সী মেয়ে মহলে সুহাসকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হইল।

কেহ বলিলেন 'অত বড় বড় মেয়ে যার ঘরে তার বাপ মার মুখে ভাত রোচে কেমন করে! অমন বয়সে আমি দু ছেলের মা হয়েছি।'

অপরা বলিলেন 'শাস্ত্রে বলেছে গৌরীদানের মত পুণ্যি কি আর আছে? ও মা ঘেন্নায় মরি—এদেশ সব কেশ্চান হয়ে গেল। জাত ধর্ম্ম আর রইল না।'

কোন রসিকা বলিলেন 'হরিহর মনে করে আছে ছেলে কোলে হলে তবে মেয়ের বিয়ে দেবে, জামাই বাবাজীর আঁতুড় খরচ আর লাগবে না।' এই বলিয়া তিনি ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বামন দিদির গা টিপিয়া দিলেন।

সুহাস তখন চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরোয় পা দিয়াছে।

এ দিকে সমাজও রক্তচক্ষু হইয়া হরিহরকে শাসাইতে লাগিল যে অচিরেই যদি মেয়ের বিবাহ দেওয়া না হয় তবে হরিহরের জাতি যাইবে। হরিহর প্রমাদ গণিল।

(৩)

সে দিন গোবিন্দপুরের রামজয় ভট্টাচার্য্য আসিয়া সুহাসকে দেখিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন হাঁ মেয়েটি দিব্যি, পুত্রবধূ করিবার যোগ্য বটে। তাহাতেই হরিহর সেখানে ছুটিয়াছিল যদি তিনি সামান্য কিছু কাঞ্চন মূল্য লইয়া তাঁহার চৌদ্দ পুরুষের সদ্গতি করিয়া দেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া যেরূপ বুঝিল তাহাতে অন্ততঃ দু হাজারের কমে মেয়ে পার করার কোন আশা নাই। ছেলে যে পাশ করা। ভয়ে ও ভাবনায় তাহার যেরূপ অবস্থা হইল লোকে উৎপারের সময় বোধ হয় অত ভাবনা ভাবে না।

মেয়ের কোন মূল্যই নাই এদেশে। তাই কাঞ্চনমূল্যে সেই অসার মাংসপিণ্ডের একটা মূল্য করিয়া দিতে হয়। যে নারী সৃষ্টিপ্রবাহের মূল শক্তি, সেই জননীর জাতি যেখানে লাঞ্ছিত, অবহেলিত সে দেশের লোক উৎসন্ন যাইবে না ত কি?

মেয়েদের শিক্ষিত করিবার, মানুষ করিবার কোন ব্যবস্থাই করে না সমাজ কিন্তু বিবাহ দিতে না পারিলেই মেয়ের বাপের জাত গেল, মান গেল, আর বিবাহ দিতে গেলে ধন গেল প্রাণ গেল! কেন যে আজও এদেশে মেয়ে জন্মায় তা মা জগদম্বাই জানেন।

সুহাস আড়ালে সবই শোনে। বুঝিতেও যে পারে না এমন নহে। বুঝিলে কি হইবে বুক ফাটিয়া গেলেও তাহার কাঁদিবার অধিকার নাই। নিতান্ত পাড়াগেয়ে তাই পিতার সম্মুখে বাহির হইতেও তার গা ছম ছম করে। তাহার হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে।

হরিহর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই ঠিক করিল, এক শুভদিনের শুভক্ষণে রামজয়ের পুত্র কালীকিঙ্কর বি-এর সহিত সুহাসের বিবাহ হইয়া গেল। লক্ষ্মীমণির আনন্দ আর ধরে না এই-বার সে গুমর করিয়া পাড়ার পাঁচজনকে জামাই দেখাইতে পারিবে। কিন্তু হরিহরের মুখ-খানি যেন পাষাণ, সে ক্ষুণ্ণ কি প্রসন্ন তাহার মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই।

রামজয় বাবু কোন এক ষ্টেসনের মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার অর্থের খ্যাতি চারিদিকে অনেক গুলি গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখন যে কোন প্রকারেই হোক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি-লেই সমাজে মান্য গণ্য হওয়া যায়। রামজয়ের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী যখন কালীকিঙ্কর ও হরিচরণ এই দুটি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন তখন রামজয় বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন, আবার? দুটী দুটী পুত্র রত্ন যখন বর্ত্তমান তখন এবয়সে আর ও কাজ করা হইবে না। শাস্ত্রে লেখা আছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। পিণ্ডপ্রাপ্তির ভাবনা যখন নাই তখন আর কেন? অতি যত্নে পুত্র-দ্বয়কে তিনি লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রদ্বয় জীবন পণ করিয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যত্নবান হইল।

এমনি করিয়া কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর কিসে কি হইল জানি না। হঠাৎ এক দিন তিনি একটী বয়স্থা কন্যাকে ভার্য্যারূপে বরণ করিয়া ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিয়া ফেলিলেন; কালী ও হরি তাঁহাকে আপন মাতার মত ভাবিয়া গ্রহণ করিল। মা বলিতেও যে কি আনন্দ তাহা মা-হারারাই জানে। নূতন বধূ কমলাও পুত্র দুটীকে স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ে ঢাকিয়া লইল।

কমলার একটী একটী করিয়া যেমন পুত্র কন্যা জন্মিতে লাগিল কোন এক অজ্ঞাত নিয়মে সতীন পুত্রের প্রতি তাহার ভালবাসাও ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কালীকিঙ্কর যখন সুহাসকে ঘরে লইয়া আসিল তখন পূর্ব্ব স্নেহের এক বিন্দুও তাহার জন্য অবশিষ্ট নাই। সুহাস অচিরে বুঝিতে পারিল তাহার বিবাহের ফোটা ফুলটীর মধ্যে এমন একটি গোপন কাঁটা আছে যাহা উঠিতে বসিতে রাত্রিদিন তাহাকে বিঁধিতে থাকিবে। কমলা তাহার নাম রাখিল হাঁস। সে নাকি হাঁসের মতন খায় আর হাঁসের মতই হেলে দুলে বেড়ায়। প্রথমে সামান্য ত্রুটীতে মৃদু তিরস্কার আরম্ভ হইল। ক্রমে সে তিরস্কারের মাত্রা ও তিক্ততা খুবই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যদিও তাহা নিতান্ত অসহ্য তথাপি সে মুখ বুজিয়া সব সহিতে লাগিল। আর না সহিয়াই বা করে কি!

এইরূপ ভাবে দিন কাটিতেছিল এমন সময় রামজয় কাহার আহ্বানে সাধের সংসার ও মাষ্টারী ফেলিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গেলেন। অল্প দিনের মধ্যে জানিতে পারা গেল তাঁহার যা কিছু সম্পত্তি সব রেলের ঘরেই আছে এবং তাহা তিনি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যের সেখানে দন্তস্ফুট করা অসম্ভব। ঘরে একটী পয়সাও সঞ্চিত নাই। বুদ্ধিমতী কমলা অনাবশ্যক কুপোষ্যগণকে শীঘ্রই জানাইয়া দিল

যে, সে তাহার স্বামীর অবিবেচনার জের টানিয়া চলিতে একান্ত অপারগ।

(৪)

কালীকিঙ্কর চক্ষে অন্ধকার দেখিল, সম্বলের মধ্যে তাহার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট গুলি। তাহাই লইয়া সে সংসার সাগরে ঝাঁপ দিল। অনেক দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে পিতার নামের খাতিরে রেলের এক অফিসে তাহার ৪০৲ টাকা মাহিয়ানার একটা চাকুরী জুটিল। চাকুরী সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই সুহাসকে বাসায় লইয়া আসিল। সুহাসের সুখের আর সীমা রহিল না। অনাস্বাদিত পূর্ব্ব প্রেমের নেশায় সে ভরপূর হইয়া উঠিল। সুহাসের হাসি আবার ফুটিল, ভরাগাঙ্গে চাঁদের আলো খেলিল, পুষ্পভরা কুঞ্জেতে আবার কোকিল ডাকিল। কালীকিঙ্করের ত কথাই নাই। সে ভাবিল 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

সুহাসের সন্তান সম্ভাবনা হইল। তাহার একান্ত সাধ যেন একটী ছেলে হয়। ভাবী পুত্রের নাম করণ লইয়া স্বামী স্ত্রীতে কত জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

যথা সময়ে সুহাসের সন্তান হইল কিন্তু পুত্র নহে কন্যা। ক্ষীণকায়া কন্যাটীকে দেখিয়া মাতৃ হৃদয় কি এক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

আমরা কন্যার বিবাহে ভাবী জামাতার রাশ দেখি, পাশ দেখি আরো কত কি দেখি কেবল দেখিনা সেইটী জীবনের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। দেখি নাই অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে ও শরীরকে অবহেলা করায় কালীকিঙ্করের জীবনীশক্তি কত পরিমাণে নষ্ট হইয়ে গিয়াছিল। কোন্ অমূল্য জিনিসের বিনিময়ে সে রঙ্গিন কাঁচ সংগ্রহ করিয়াছিল?

অল্প দিনের মধ্যেই কালীকিঙ্করের শুষ্ক শরীর আরও শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অল্প অল্প জরও হইতেছে। প্রথম প্রথম সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হয় নাই। যখন বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল তখন বন্ধু বান্ধবগণের পরামর্শে ও সুহাসের তাগিদে সে ডাক্তারের কাছে গিয়া শুনিল তাহার এমন একটি দুরারোগ্য ব্যাধির সূত্রপাত হইয়াছে সত্বরই প্রতিকার পরায়ন না হইলে তাহা সাংঘাতিক হইয়া পড়িবে। অবিলম্বে বায়ু পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন।

কালীকিঙ্করের বুক শুকাইয়া গেল। সুহাস কাঁদিয়া খুন। বিধাত! সুখের সংসারে আগুন ধরাইতে এত ভালও লাগে তোমার! সৃষ্টি এত সুন্দর করিয়া তাহাতে এত হলাহল কেন ঢালিয়া দিয়াছ!

অনেক ভাবনা চিন্তা পরামর্শের পরে পুরী যাওয়াই স্থির হইল। সুহাস পিতাকে এই দুসংবাদ দিয়া পত্র লিখিল, পত্রের উত্তর আসিল কিন্তু সে একবার আসিয়া দেখিয়াও গেল না।

পরামর্শ সব ঠিক হইল কিন্তু ঠিক হইল না সেই জিনিসটীর যাহা না থাকিলে পা থাকিতেও সংসারে এক পা চলা যায় না।

সুহাস দেবরকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো! এই হার ছড়াটি নিয়ে গিয়ে টাকার যোগাড় করে নিয়ে এস। খবরদার উনি যেন কিছু জানতে না পারেন।'

হরিচরণ অবাক হইয়া ভ্রাতৃবধূর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

(৫)

হরিহর কিসে কি করিয়া যে মেয়ের বিয়ের টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা সেই জানে আর জানিত তাহার সেই মহাজনটি যাহার কাছে সে সর্ব্বস্ব বন্দক রাখিয়াছিল। এ দেশের এই মহাজন নামক জীবগুলি যে কোন্ শ্রেণীর তাহা বোধ হয় শুনেছেন আপনারা। মহাযমের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশা করা যায় কিন্তু এই সকল মহাযমের হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই

মহাজন নামের এরূপ অপব্যবহার আর কোন দেশে আছে কি না জানি না।

হরিহর লক্ষ্মীকেও এ কথাটা বলে নাই। সে মনে করিয়াছিল সংসার খরচ হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া দেনাটা শোধ দিয়া তবে বলিবে। কিন্তু সন্তানের পর সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া যখন তাহার সংসার খরচের মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল এবং অঙ্ক শাস্ত্রের কোন এক অজ্ঞাত নিয়মে দেনাটা পুরুভুজের ন্যায় কেবলি বাড়িয়া চলিতে লাগিল তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী সকল কথা সেই দিন জানিল যে দিন দয়াময় মহাজন হরিহরের যথাসর্ব্বস্ব নিলাম করিয়া লইয়া তাহাকে কতকগুলি অনাবশ্যক বিষয়ের ভার হইতে মুক্তি প্রদান করিল। লক্ষ্মী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, হরিহরের মাথায় বজ্রাঘাত!

এই সময় হরিহর জামাতার অসুখের সংবাদ পাইল। তখন তাহার আর কোথাও যাইবার শক্তি বা সামর্থ্য কিছুই ছিল না। ভবিষ্যতের ভাবনায় তখন তাহার হাত পা অবশ, মন অবসন্ন ও প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি দিন তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে সেই ভীষণ দৃশ্য যেদিন তাহাকে স্ত্রীর হাত ধরিয়া, ক্ষুধাকাতর শিশু পুত্রগণকে কোলে করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় করিতে হইবে। মাথা গুজিবার মত স্থান এত বড় সংসারে তাহাদের জন্য কোথাও এতটুকু মিলিবে না।

অনেক কান্নাকাটি করার পর মহাজন এই মাত্র স্বীকার পাইলেন যে, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাটীতে থাকিতে দিবেন। মিয়াদ ফুরাইলেই তাহাকে বাড়ী ছাড়িতে হইবে। তিনি আর কোন কথা শুনিবেন না। ধর্ম্মের কাছে তিনি খালাস।

হায় এদেশের ধর্ম্ম! তুমি পুঁথির পাতায় যেমন হয়ে আছ তাহার শত ভাগের এক ভাগও যদি দেশের লোকের মনের মধ্যে থাকিতে!

হরিহরের যারা আত্মীয়, বন্ধু একে একে সবাই সরিয়া দাঁড়াইল। একটা মুখের সান্ত্বনা দিতেও একবারটি কেহ আসিল না। সমাজ গম্ভীর মুখে নাকে নস্য টানিতে লাগিল, একবার ফিরিয়াও দেখিল না কোথায় কোন একটি ক্ষুদ্র কীট তাহার রথ-চক্রের তলায় নিষ্পেষিত হইয়া 'হা বিধাতঃ' বলিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে।

বিলাত ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুক্রমিক)

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

লিভারপুল।

১৭ই ডিসেম্বর, বুধবার রাত্র নয়টায় জাহাজে বেলফাষ্ট থেকে রওনা হয়ে সকাল ৮টায় লিভারপুল পৌঁছলাম। ১০ নং নর্থ ষ্ট্রীটে স্যালভেসন আর্মির হোটেলে বাসা নিলাম। দেখলাম কলিকাতার চিঠি লণ্ডন থেকে ফেরত হয়ে হোটেলে মজুত রয়েছে। গাইড বই সঙ্গে নিয়ে নানাস্থান দেখলাম। মিউজিয়মটি অন্যান্য সহরের মত তবে আর্ট গ্যালারিতে বড় সুন্দর সুন্দর ছবি দেখলাম। আর্টগ্যালারীর সম্মুখে দ্বারের দুই পার্শ্বে জগৎ বিখ্যাত চিত্র শিল্পি দ্বয় র‍্যাফেল ও ম্যাঞ্জোলার প্রস্তরমূর্ত্তি রয়েছে। এখানকার অন্যান্য দৃশ্য মধ্যে মার্সী নদীর তীরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই লিভারপুল বন্দরটি সারা জগতের বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র সুতরাং জাহাজী ব্যাপার যে এখানে কি রকম বিশাল তা ভাবলেও

বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সমুদ্রের নিকটে মার্সী নদীর মোহনায় লিভারপুল। মার্সী নদীর পশ্চিম পারে লিবারপুল আর পূর্ব পারে বার্কেন-হেড বন্দর। এখানে নদীটি এক মাইলের উপর চৌড়া। নদীর দুই ধারে ক্রমাগত ৮ মাইল পর্য্যন্ত কেবল জাহাজে মাল খোয়াই করবার ডক্। এত বড় জাহাজের ডক্ পৃথিবীতে আর নাই। ছোট ছোট জাহাজগুলি অনবরত এপার ওপার খেয়া দিচ্ছে। এই খেয়া পারের জাহাজগুলিও সংখ্যায় ৩০ খানার কম নয়। আর যতদুর দৃষ্টি চলে কেবল জাহাজের শ্রেণী। সমুদ্রের মোহনায় গিয়ে দেখলাম নানা দিক থেকে সারি সারি জাহাজ আসছে-যাচ্ছে।

লিভারপুল থেকে এই সুপ্রশস্ত নদীর নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গপথে রেল গিয়েছে। আমি কথনও কখনও নীচে সুড়ঙ্গ পথে ট্রেনে নদীর অপর পারে গিয়ে বার্কেনহেড সহর দেখতাম। বার্কেনহেডের পাহাড় বড় সুন্দর। লিভারপুল নদীর তীরে আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় দেখবার আছে—ক্রমাগত ৮।১০ মাইল পথ নদী তীরের উপর দিয়ে রেল গিয়েছে। একে ওভারহেড্ রেলওয়ে বলে। বিশ হাত উপর দিয়ে লোহার থামের উপর বরাবর রেলপথ। এই ট্রেনে উঠে ডকগুলি দেখতে ও নদীতীর ভ্রমণ করতে বড়ই আনন্দ হয়। আমি দুই দিন এই ট্রেণে চড়ে সমস্ত দেখেছি। নদীর অপর পারে কয়েক মাইল দূরে পোর্টসান-লাইট অর্থাৎ সুবিখ্যাত সানলাইট সাবানের বন্দর। সাবানের নামে একটী মস্ত বড় বন্দর কেমন করে হল, ক্রমে বলব।

১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্নে আমি জাহাজে পার হয়ে সানলাইট বন্দরে সাবানের কারখানা দেখতে গেলাম। জাহাজ-ঘাটে নেমে মটরবাসে চড়ে খানিকটা গিয়ে সানলাইট বন্দরে, গিয়ে তাদের প্রধান আপিসে উঠলাম। নানা স্থানের বিদেশীরা এসে এই জগদ্বিখ্যাত সাবানের কারখানাটী দেখে থাকেন। দেখাবার জন্য কোম্পানি থেকে গাইড-ম্যান অর্থাৎ প্রদর্শক নিযুক্ত আছে। ম্যানেজার ভিজিট বহিতে আমার নাম ঠিকানা স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে একজন প্রদর্শককে আমার সঙ্গে দিলেন। কার্য্যক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চিত্র সম্বলিত এক খানি মনোহর পুস্তক উপহার পেলাম।

ভিতরে গিয়ে যা দেখলাম এই বিদেশ ভ্রমণের মধ্যে এটি একটী দেখবার মত বিষয়।

প্রথম আমরা সাবানের জ্বাল ঘরে গেলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার চৌবাচ্চায় সাবান জ্বাল হয়ে এক একটি নালা দিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে শীতল হচ্ছে। সহস্র সহস্র স্ত্রী পুরুষে সেগুলি কলে দিয়ে লম্বা সাবানের ছড় তৈরী করে রাখছে। আর একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে প্রায় দুই সহস্র স্ত্রীলোকে সেই গুলিতে কলের ডাইসে সাবান তৈরী করে বাক্সে প্যাক করছে। এসবই চমৎকার কলে হচ্ছে। চারি সহস্র পুরুষ আর ছয় সহস্র স্ত্রীলোক এই কারখানা ঘরে সর্ব্বদাই কাজ করে। পরিশ্রমের কাজগুলি প্রায়ই পুরুষেরা আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহজ কাজগুলি স্ত্রীলোকেরা করছে। বাক্স তৈরী ও ছাপাখানা অতি বিরাট। শুনলাম এরকম দ্রুত কাজের উৎকৃষ্ট ছাপাখানা পৃথিবীতে কমই আছে। এরূপ বিরাট কারখানা ভাষায় প্রকাশ করবার শক্তি আমার নাই, কাজেই কোন মতে দু-এক কথা লিখছি।

এই কারখানায় এবং এই কারখানার কাজ সম্বন্ধে বাহিরে এত অধিক লোকে কাজ করে যে এই কোম্পানিকে এর জন্যই একটী বন্দর তৈরী করিতে হয়েছে। কেবল এই সানলাইট সাবানের কাজ ভিন্ন এখানে আর কিছু হয় না। যারা এখানে কাজ করে তাদের বাসের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়েছে। এদের জন্য হাট বাজার হোটেল রেলষ্টেসন, মটরবাস্ লাইন, ডাকঘর প্রভৃতি নূতন ভাবে তৈরী হয়েছে। ইংরেজ জাতি আমোদ-প্রিয় একন্য এদের জন্য খেলার নানা রকম বড়

স্থান, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতিরও স্থাপন করা হয়েছে। একটি চমৎকার আর্ট গ্যালারিও এখানে স্থান পেয়েছে। মাত্র এইখানে এর শেষ নয়। পৃথিবীর নানা স্থানে এই কোম্পানী সানলাইট সাবানের কারখানা খুলেছে। আমেরিকায় নিউ-ইয়র্কে এদের কারখানা এখানকার কারখানারি চেয়েও বড়; তবে এইটাই এদের আদি স্থান।

পৃথিবীর নানা স্থানের প্রদর্শকেরা এই সান লাইট সাবানের কারখানাটি দেখতে আসেন। দর্শকদের দেখবার জন্য এই কোম্পানি এতই সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন যে এমন বন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই। কারখানার ঘরগুলিতে নীচেয় সহস্র সহস্র লোকে কাজ করছে, আর উপর দিয়ে দর্শকদের দেখাবার জন্য রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। এতে অল্প সময় মধ্যে বহুদূরের কাজ দেখবার সুবিধা হয়েছে। সেই পথগুলির নাম রাখা হয়েছে "ভিজিটর্স্ রুট্" অর্থাৎ দর্শকদের পথ। একটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সুগন্ধি সাবান ও ডাক্তারদের ব্যবহার জন্য নানারূপ মূল্যবান সাবান তৈরী হচ্ছে, এগুলি সব মেয়েরাই করছে। এগুলি হাত মেসিনে প্রেস করে তৈরি হচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসায় জানলাম হাতের মেসিনে যেমন ভাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজ হয় কলের মেসিনে তেমন হয় না।

আমার সঙ্গের গাইড যুবকটি প্রত্যেক বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিতেছিলেন। উপরে এক স্থানে নিয়ে সমস্ত সানলাইট বন্দরটি দেখালেন। দেখলাম তিন মাইল দীর্ঘ প্রস্থ এই সানলাইট বন্দরটি কেবল এদের কাজেই খাটছে মাত্র কারখানাটি দেখতে আমাদের ৫ ঘণ্টা সময় লাগল, অনেক রাত্রি হয়েছিল বলে আর্টগ্যালারি প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখা হল না। রাত্রি ৯ টায় সানলাইট কোম্পানির মটরবাসে ফিরে এলাম।

লিভারপুল সহর ছেড়ে দূরে একদিন নির্জ্জন পাহাড়িয়া অঞ্চল ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদের বাস দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন রবিবার, অনেক লোক বেড়াতে বের হয়েছিল।

পাহাড়ীয়া পল্লীর একটি উচ্চস্থানে উইণ্ড মিল অর্থাৎ একটি বায়ুচালিত কল দেখলাম। উচ্চ স্তম্ভ করে তার গায়ে প্রকাণ্ড চারিখানা পাখা লাগান হয়েছে, যে দিক থেকে বাতাস আসে সেই দিকে পাখার মুখ ফিরিয়ে দিলে পাখা বাতাস পেয়ে ঘুরতে থাকে, তার শক্তিতেই কল চলে। এই কল এক শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যবহৃত হত, ষ্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার হ্রাস পায়। এগুলি সাধারণত জমিতে জল দিবার জন্য এবং গৃহস্থদের গম পেষন করবার জন্য ব্যবহৃত হত।

দেখলাম উইণ্ড মিলটী পুরাতন অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এখন এটা কেবল একটি দৃশ্য মাত্র।

আমার মনে হয় এই মত কল আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত। জমিতে জল দিবার পক্ষে এরূপ কল বড়ই উপযোগী। অন্যান্য অনেক কাজ এই কলে করা যাইতে পারে।

বহুকাল থেকে আমাদের ঢেঁকিতে ধানভানা, ঘানিতে তৈল প্রস্তুত হয়ে আসছে, বর্ত্তমানে বিলাত থেকে নানা রকম কল আমদানি হচ্ছে, আমাদের দেশের পক্ষে এটা খুবই আশঙ্কার কথা যে, পাছে ঐ সব কলের বহুল প্রচলন হয়ে দেশের লোকের যা-কিছু একটু কাজকর্ম্ম ছিল তাও বন্ধ করে দিয়ে দেশকে অলস করে ফেলে। তাই আমার মনে হয় উইণ্ডমিলে দেশের লোকের যে পরিশ্রমের লাঘব হবে তাতে দেশের কোন ক্ষতির কারণ নাই। বরং নানা দিকেই সুবিধার কারণ।

ম্যাঞ্চেষ্টর।

২২শে ডিসেম্বর সোমবার—এদিন সকালে আমি লিভারপুল থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে এলাম। একটী হোটেলে উঠে আহারাদি শেষ করে সহরে বেড়াতে বের হলাম। আমার বার্মিং-

হামের প্রতিই মন টানছিল এজন্য ম্যাঞ্চেষ্টার সহরটি এক দিনের মধ্যে দেখে শেষ করতে মনস্থ করলাম।

ম্যাঞ্চেষ্টার কাপড় তৈরীর জন্য বিখ্যাত। প্রথমে সহরের একখানা গাইড বুক কিনে নিয়ে দেখলাম যে, কোন স্থানে কি বিশেষ দেখবার জিনিস আছে। পরে তার মধ্য থেকে ক্যানাল ডক, পিকাডেলি মিউজিয়ম, আর্টগ্যালারি ও একটি থিয়েটার এক দিনের মধ্যে দেখবার প্রোগ্রাম তৈরী করলাম। সমস্ত পথেই ট্রাম ও মটরবাস্ রয়েছে, চলতে ফিরতে মোটেই অসুবিধা নাই। আর গাইড বুকের বন্দোবস্তের গুণে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবারও বিশেষ দরকার হয় না।

বাসা থেকে ট্রামে ৪ মাইল দূরে গিয়ে ক্যানাল ডকটি দেখলাম। লিভারপুল থেকে খুব প্রশস্ত প্রায় আশী মাইল পথ খাল কেটে মাঞ্চেষ্টর পর্য্যন্ত আনা হয়েছে। এই পথে মাঞ্চেষ্টরে জাহাজ আসে। এই সব জাহাজেই আমাদের দেশের তুলা ওদেশে যায় আর কাপড় তৈরী হয়ে আমাদের দেশে আসে। সহরের রাস্তায় অনেক মটর লরীতে তুলার গাইট বোঝাই চলতে দেখলাম। জাহাজ থেকেও তুলা নামছে। আমি প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত জাহাজপূর্ণ ডক দেখে ফিরলাম। কতদূর পর্য্যন্ত এই ভাবে খালের ডকে জাহাজ সাজান রয়েছে জানবার সুযোগ হয় নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আর্টগ্যালারিতে গেলাম, আর্টগ্যালারী এবং মিউজিয়ম একই সঙ্গে। সবই সুন্দর, সবই আশ্চর্য্য। ইহার কোনটির কত কি বর্ণন করব। এর একটি বিষয় বর্ণন করতে অন্ততঃ দু ঘণ্টা কলম চালাতে হয়—এমন শত শত ছবি রয়েছে।

সমস্ত আর্টগ্যালারি ও মিউজিয়ম দেখা শেষ হলে পিকাডেলিতে গেলাম। এইটি সহরের কেন্দ্র স্থল এবং প্রায় সমস্ত বড় বড় বিষয়গুলিই এইখানে। লণ্ডনের পিকাডেলি নামক স্থানটিও লণ্ডনের মধ্যে সব চেয়ে জমকাল। এই মাঞ্চেষ্টারেও পিকাডেলিই সবচেয়ে বেশী সৌন্দর্য্যময়। আমি স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে একটি ভাল থিয়েটরে প্রবেশ করলাম। লিভারপুলে দুই দিন থিয়েটার দেখেছি এই মাঞ্চেষ্টারেও এক দিন দেখলাম কিন্তু পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানে যে সব আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখেছি তা অপেক্ষা অনেক নূতন দেখা গেল। থিয়েটারগুলিতে রবিবার ভিন্ন আর সব দিনই অভিনয় হয়। মাত্র দুই ঘণ্টা করে সন্ধ্যার পর থেকে দুই বার অভিনয় হয়। আমাদের দেশে দীর্ঘ সময় ব্যাপি থিয়েটার দেখতে কখন কখন বিরক্তি লাগে এখানে তেমন হয় না, সবই চিত্তাকর্ষক।

বার্ম্মিংহাম

২৫শে ডিসেম্বর (১৯২৪) তারিখে মাঞ্চেষ্টার থেকে বার্ম্মিংহাম এলাম। সমস্ত বড় বড় সহরে খৃষ্টীয় যুবক সমিতি (Y. M. C. A.) এবং স্যালভেসন আর্ম্মীর হোটেল আছে। খৃষ্টীয় যুবক সমিতিগুলি একটু অবস্থাপন্ন ধরণের লোকদের জন্য। সে সব হোটেলে থাকতে দৈনিক ১২ শিলিং (প্রায় ৯৲ টাকা) থাকা আর খাওয়াতেই খরচ হয়। স্যালভেসন আর্ম্মির হোটেলগুলিতে বিছানার জন্য দৈনিক এক শিলিং এবং খাওয়ার জন্য ছয় সাত শিলিঙেই এক রকম চলে। আমি স্যালভেসন আর্ম্মীর হোটেলেই ছিলাম। বড় দিনের এবং নূতন বৎসরের উৎসব এই হোটেলেই দেখলাম। বড় দিনে বেশ সাজ গোছ ও আহারাদির ঘটা। গীর্জ্জায় এবং অনেক গৃহস্থ পরিবারে এই সময় খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেশ ধর্ম্মাচরণ হয়। আমি স্যালভেসন আর্ম্মির হোটেলে বড় দিনের উৎসব করলাম। আহারের খুব ধুমধাম ছিল, সাধারণের জন্য যে সব আহারের ডিস সাজান হয়েছিল আমার জন্য তা অপেক্ষা একটু পৃথক বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষেরা করেছিলেন, আমি খাদ্য সম্বন্ধে একটু বাছ-কোছ করি তা এঁরা আগেই জেনে নিয়েছিলেন।

বৎসরের শেষ দিনে স্যাণ্ডিভেসন আর্শ্মির যে সভা হয়েছিল, আমি সে সভায় মানবাত্মার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে একটী ছোট বক্তৃতা দিয়েছিলাম। যদিও বিষয়টি গুরুতর তথাপি মনের ভাব প্রকাশ করতে কোনোখানে বাধা পেয়েছিলাম না, বেশ প্রাণের সঙ্গে বলতে পেরেছিলাম। আমার পরবর্ত্তী দুই জন বক্তার মুখে আমার বক্তৃতার উচ্চ সমালোচনা শুনে বুঝলাম শ্রোতাগণের ভাল লেগেছিল। আমার বলায় একটু বৈষ্ণব গন্ধ ছিল, কাজেই এঁদের কাছে একটু নূতন লেগেছিল। আমি এই কথাটিই পরিষ্কার করে বলেছিলাম যে, ভগবানের প্রাকৃত (natural) শক্তির সহায়তায় মানুষ কোনমতে জীবন কাটাতে পারে মাত্র কিন্তু আত্মার উন্নতি তাতে হয় না—আত্মার উন্নতির জন্য তাঁর অলৌকিক শক্তি (miracle) অনুভব করা চাই। এ সম্বন্ধে নিজ জীবনে যতটুকু অনুভব করেছি তারও কয়েকটি ঘটনা বলেছিলাম। বর্ষ শেষের সভায় আমার এ প্রসঙ্গের অর্থ এই যে, সারা বৎসরে কতটুকু আত্মার উন্নতি হয়েছে তার খতেন করতে হবে এবং এই আত্মার উন্নতি যতটুকু হয়েছে সেই টুকুই মাত্র তার এ বৎসরের 'লাভ' আর যত কাজ-কর্ম্ম সবই বাজে জমা-খরচ।

বিলাত-ফেরতাদের মুখে শুনতাম বিলাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম মোটেই নাই কিন্তু আমি যত লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করেছি তার মধ্যে অনেককেই ধর্ম্মপরায়ণ দেখেছি।

শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাই বার্শ্মিংহামের বিশেষত্ব। এত বড় শিল্পের সহর ইংরেজ রাজত্বে আর নাই। সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এইটাই কলকারখানার গুরুত্বে শ্রেষ্ঠ। আমি বার্শ্মিংহাম সহরের বাহিরে ট্রামে বা মটরবাসে কখন কখন ৭।৮ মাইল দূরে গিয়েছি; কিন্তু যে দিকেই যাই যত দূরেই যাই কেবল বড় বড় কারখানা দেখতে পেয়েছি। বার্শ্মিংহামের ৩০।৪০ মাইল দূর পর্য্যন্ত চারিদিকে এই রকম বড় বড় কলকারখানায় পূর্ণ।

ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধীয় কারখানাগুলির এক একটা যে কি বিশাল আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তার কিছুই ধারণা করা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের পদ্মা নদীর স্টীমার যে কোম্পানীতে গড়েছে তাদের কারখানা দেখলাম। ইহারা সমস্ত পৃথিবীতে বড় বড় পোল গড়ে। এই মত ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ভিন্ন ভিন্ন রকমের কারখানা রয়েছে।

এই বার্শ্মিংহামই আমার বিলাত আসা বেশী সার্থক করেছে। এখানে অনেক কারখানায় প্রবেশ করে কাজ কর্ম্ম দেখেছি। খুব বড় একটা পিতলের কারখানায় পিতল ও তামার পাত ও তার প্রস্তুত করার সমস্ত কার্য্য দেখেছি। এই পিতলের পাত ও তার প্রস্তুতের কারখানা আমাদের দেশে করতে আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা, এই জন্য এই কারখানার কাজ অতি তন্ন তন্ন করে দেখেছি। মনে হয় দেশে যৌথ কারবার করে এই পিতলের কারখানা স্থাপন করতে পারলে বিশেষ সুবিধা হতে পারে। ইচ্ছা রইল, হবে কি না জানি না। আমাদের জুয়েলারী কারখানা সম্বন্ধে অনেক কাজ এখানে সম্পন্ন করলাম। এখানকার পৃথিবী বিখ্যাত পালিশের কল ও পালিশের মসলা প্রস্তুতকারক ডব্লিউ ক্যানিং কোম্পানীর সহিত আমাদের আগে থেকেই কারবার রয়েছে, আমরা এদেরই পালিশের কল ও মসলা ব্যবহার করি। এদের সঙ্গে দেখা করে খুবই আনন্দ পেলাম এবং এদের কাছ থেকে ইলেক্ট্রো-প্লেটের কাজ শিখলাম। ইলেক্ট্রো-প্লেট সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান সরঞ্জাম এদের কাছ থেকে কিনে এনেছি।

আর একটি বড় কারখানা হতে বারশত টাকার জুয়েলারী মেসিন প্রভৃতি কিনে এনেছি।

আমাদের জুয়েলারী কারখানার মহিলা বিভাগে এই সব হ্যাণ্ড-মেশিনের দ্বারা অনেক সুবিধা হবে।

আর আর অনেক কাজ যা দেখে এসেছি কিছু কিছুর সম্বন্ধে ক্রমে ভাল করে বুঝে সুঝে পরে অর্ডার

করব ঠিক করলাম। আমাদের সোনার শাঁখার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও বার্ম্মিংহামে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

লণ্ডনে এবং আর আর বড় সহরগুলিতে আমি জুয়েলারী দোকানের অলঙ্কারগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেছি, আধুনিক ধরণের যত রকম ব্রেসলেট বিলাতে এ পর্য্যন্ত হয়েছে, আমাদের প্রস্তুত প্লেন শাঁখা চুড়ী প্রভৃতি যে সেগুলির সমান আসন পেতে পারে এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, বরং অল্প সোনায় ভাল গহনা প্রস্তুতের পদ্ধতি আমরা যা করেছি ঐ রকম বিলাতে এখনও হয় নাই।

বার্ম্মিংহাম জুয়েলারী কাজের অতি প্রধান স্থান, লণ্ডনে এত ভাল কাজ হয় না, আর এত জুয়েলারী কারখানা লণ্ডনে নাই। আমি বার্ম্মিংহামের অনেকের ভাল ভাল কাজ কর্ম্ম দেখলাম। রোল্ড গোল্ড এবং ইলেক্ট্রো প্লেটিং সোনার অলঙ্কারগুলি সবই মেসিনে প্রস্তুত হয়। এ সম্বন্ধে আমি যা কিছু শিখে এসেছি তা আমাদের দেশের অলঙ্কার প্রস্তুত প্রণালীর প্রথাকে অনেক উন্নত করবে আশা করা যায়।

মহাপ্রয়াণ

শ্রীকালিদাস বসু

ভারতের বরপুত্র, হে চিত্তরঞ্জন,
দানব্রত, গুণীশ্রেষ্ঠ, অতীব সজ্জন,
বক্ষে ধরি তোমা হেন কৃতী সুসন্তান
ধন্য দেশমাতৃকার তৃপ্ত মনঃ প্রাণ!
জ্ঞানে তুমি বৃহস্পতি, কর্ম্মে যত্নবীর,
দানে দাতাকর্ণ তুল্য, রণে পার্থবীর।
ভারতের বলবীর্য্য, ভারতের আশা,
জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি আর মর্ম্ম ভাষা
মূর্ত্তি ধরি উঠেছিল তোমাতে কেবল,
জাতবেদঃসমপূত, দীপ্ত দেববল!
নির্ভীকের অগ্রগণ্য যুদ্ধে মহারথী,
রামচন্দ্র তুল্য ধীর, ওগো মহামতি,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সম বিপুল গৌরবে
যবে অধিষ্ঠিত তুমি, ভগ্ন হাহারবে
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি ভারত ব্যাপিয়া
বিনামেঘে বজ্রাঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
ক্ষুদ্র স্বার্থ মগ্ন যবে ভারত সন্তান
সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে তুমি দিলে আত্মদান—
ভারতমাতার পদে, বিপুল বিভব
তৃণ সম তুচ্ছ গণি সমর্পিলে সব।
দেখি নাই বুদ্ধদেবে, দেখিনি' নয়নে
শ্রীচৈতন্যে পারিষদসহ, সনাতনে,
বুঝিয়াছি স্থূল চোখে তোমারে হেরিয়া,
মহাপুরুষেরা সবে তোমারে ঘেরিয়া
জ্যোতিঃরূপে রয়েছেন, রচি তব কায়,
মোর সম ক্ষুদ্র জনে দেখাতে ধরায়—
প্রবল পাপের স্রোতে কপটতা মাঝে
মূর্ত্তিমান সরলতা কেমনে বিরাজে!
শিখেছি তোমার কাছে পোষিতে এ আশা,
মাতৃভূমি এ ভারত, নহে স্রোতে ভাসা;
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হেরিয়াছ তার,
পরিপূর্ণ বিশ্বাসেতে, কি বলিব আর!

দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাশ

পণ্ডিত—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বংশপরিচয়

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা সহরে চিত্তরঞ্জন দাশ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশ। উদারতায়, মনস্বিতায়, প্রতিভায়, সরলতায় এবং স্বাধীনতা-প্রিয়তায় এই বংশ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কথিত আছে, এই বৈদ্যবংশের বহু লোক প্রাচীন বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল বিলের পার্শ্বস্থিত তেলিরবাগ নামে ক্ষুদ্র গ্রামে চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বপুরুষগণ ইদানীং আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর দাশ গ্রামের মধ্যে এক জন প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ লোক বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কাশীশ্বরের তিন পুত্র—দুর্গামোহন, কালীমোহন, ভুবনমোহন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র,—পরলোকগত সত্যরঞ্জন, রেঙ্গুনের জজ জ্যোতিষরঞ্জন এবং বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল সতীশরঞ্জন। ভুবনমোহনেরও তিন পুত্র—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। অপুত্রক কালীমোহন বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গামোহন, ভুবনমোহন ও কালীমোহন তিন ভ্রাতাই আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ভুবনমোহন এটর্ণী, দুর্গামোহন ও কালীমোহন উকীল। তিন ভ্রাতাই যৌবনে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তীকালে কালীমোহন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন। রসারোডের যে গৃহ চিত্তরঞ্জন সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাই কালীমোহনের আবাস ছিল।

এই বংশের সকলেই তাঁহাদের কৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দুর্গামোহন এবং ভুবনমোহন ব্রাহ্ম সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং তদানীন্তন সমস্ত সাধারণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন কেবলমাত্র এটর্ণী ছিলেন না, অধিকন্তু তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ও পিতামহ তাঁহাদের দরিদ্র প্রতিবাসীবর্গের সাহায্যার্থ মুক্তহস্তে অর্থদান করিতেন, চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে এই কৌলিক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া দানশৌণ্ড খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যশিক্ষা

বাল্যকালে চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে দক্ষতার সহিত বি, এ, পাশ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার সতীর্থগণ সাহিত্যে ও বাগ্মিতায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত গমন করেন। বিলাতে যে সময় দাদাভাই নৌরজী পার্লামেন্টের সদস্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময় চিত্তরঞ্জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিলাতে অনেক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতাগুলিতে

অসাধারণ প্রতিভা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। বিলাতে ও ভারতে অনেকে সেই বক্তৃতা পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহাই চিত্তরঞ্জনের যশের শৈলশিখরে উঠিবার প্রথম পদক্ষেপ।

সিভিল সার্ভিসে বাধা

ইহার কিছুদিন পরে বিলাতের পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জন ম্যাকনীল ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবমাননাজনক, অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময় চিত্তরঞ্জন ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া জলন্ত ভাষায় এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার প্রভাবে মিঃ ম্যাকনীলকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ও পার্লামেন্টের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার অল্পদিন পরে তাঁহাকে (মিষ্টার দাশকে) বিলাতে ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হয়। তিনি যে সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই সভার সভাপতি ছিলেন মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, মিঃ দাশ বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইলেও ঐ বক্তৃতার জন্য তাঁহার নাম শিক্ষানবীশদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়।

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন

সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া মিঃ দাশ ইনার টেম্পলে ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৯১ কিম্বা ৯২ অব্দে অত্যন্ত সম্মানের সহিত তিনি পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৯২ অব্দে মিঃ দাশ কলিকাতা হাইকোর্টের বারে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে নানা কারণে তিনি ব্যারিষ্টারীতে আপনার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই, নানা কারণে তাঁহার প্রতিভা বিকশের পথ রুদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রকৃত শক্তি কখনও চিরকাল উপেক্ষিত বা অনাদৃত থাকিতে পারে না।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার আসামী শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে মিঃ দাশ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ছয়মাস কাল এই মামলা চলিয়াছিল। মামলা চালাইবার জন্য যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, ব্যারিষ্টারের পারিশ্রমিকে কয় দিনে তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে দিয়া আর মামলা চালান অসম্ভব হয়; অনন্যোপায় হইয়া "বন্দে মাতরমের" কর্ম্মী—চিত্তরঞ্জনের বন্ধুরা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি চিত্তরঞ্জনকেই এই মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতে বলেন, চিত্তরঞ্জন সানন্দে ও সাগ্রহে সে ভার গ্রহণ করিয়া যে অসাধারণ ত্যাগের ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মামলা পরিচালনে উদারস্বভাব, পরদুঃখকাতর চিত্তরঞ্জন এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। এই সময় তিনি তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গাড়ী ঘোড়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ত্যাগস্বীকারের ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। এই মামলার ফলে ব্যবহারজীবি রূপে তাঁহার যশঃ ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং লোকে আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে অধিক ফি দিয়া মামলা পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে থাকেন। ডুমরাওয়ের মামলায়, নাগপুরের হোমরুল লীগের সেক্রেটারী মিঃ বৈদ্যের মামলায়, ব্রহ্মদেশে মিঃ মেটার পক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় তাঁহার যশঃ এত উচ্চ স্থানে উন্নীত হইয়াছিল যে, চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ার বন্দীরা তাঁহাকেই তাহাদের পক্ষের ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করে। অন্যে পরে কা-কথা, স্বয়ং ভারতসরকার মিউনিশান বোর্ডের মামলায় কৃতী চিত্তরঞ্জনকে তাঁহাদের পক্ষের ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন; কিন্তু এই মোকদ্দমা চালাইবার সময় তিনি অসহযোগ মত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যারিষ্টারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

ত্যাগী চিত্তরঞ্জন

যে সময় চিত্তরঞ্জন ব্যবহারজীবির কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি এক সহস্র মুদ্রার কমে কলিকাতা হাইকোর্টের কোন মোকদ্দমাই গ্রহণ করিতেন না। বিদেশ যাইতে হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত অধিক অর্থ প্রদান করিতে হইত। এই সময় তিনি যেমন এক দিকে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই মুক্তহস্তে তাহা দান করিয়াছিলেন।

পিতৃঋণ পরিশোধ

তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভুবনমোহন বাবু তাঁহার বংশের অন্যান্যদের ন্যায় অতীব উদার ছিলেন। পরদুঃখকাতরতার জন্য তিনি তাঁহার আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হাইকোর্টে তাঁহার নাম এবং প্রতিপত্তি থাকিলেও তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। ফলে তিনি ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে সেই ঋণজাল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি দেউলিয়া আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতা যে ঋণ পরিশোধ করিয়া যাইতে পারেন নাই, চিত্তরঞ্জন তাহা পরিশোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। যেমন তাঁহার হস্তে অজস্র অর্থ আসিয়া পড়িতে লাগিল, অমনই তিনি তাঁহার পিতার উত্তমর্ণদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ দিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পিতার ঋণের এক পয়সাও অবশেষ রাখেন নাই। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন হিন্দুর হিসাবে আদর্শ পুত্র ছিলেন। তাহার পর চিত্তরঞ্জন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও মুক্তহস্তে সেই অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এমন কোন ছাত্র, অধ্যাপক ও সাহিত্যিক নাই যিনি চিত্তরঞ্জনের অকাতর দানের অংশভাগী ছিলেন না।

সাহিত্য সেবায় চিত্তরঞ্জন

ব্যবহারজীবির কার্য্যপরিচালনে চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিলেও বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় তিনি বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন, তাঁহার প্রণীত "সাগরসঙ্গীতে" তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের আলোচনার কালে চিত্তরঞ্জনের মনে রাজনীতি আলোচনার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে বক্তৃতাকালে চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন, আমার মতে আমাদের দেশের কার্য্য করিতে হইলে, য়ুরোপীয় রাজনীতির আলোচনা করিলে চলিবে না। দেশের কাজ আমার ধর্ম্মের অংশ মাত্র। ইহা আমার জীবনের অঙ্গীভূত। আমার স্বদেশ সম্বন্ধে ধারণায় দেবত্বের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। দেশের সেবা এবং জাতির সেবা—মানুষের সেবা। মানুষের সেবাই ভগবানের আরাধনা।

উক্ত বক্তৃতাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি আরও দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন—"আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে অবদানস্বরূপ আমরা একটি মহতী সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এক আধ্যাত্মিকতার রক্ষক হইয়া আছি। সেই আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দান করিতে হইবে। আমরা সেই অগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত করিব। যাহা সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে জীবন্ত এবং উজ্জ্বল করিতে হইবে।" আর এক সময়ে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নাই। তাঁহার সেই কথাগুলির মর্ম্ম এইরূপ :—ভারত কখনও পরাজিত হয় নাই এবং ভগবানের ইচ্ছায় ইহা কস্মিনকালে পরাজিত হইবে না। পরন্তু

ভারত তাহার আদর্শ, তাহার সভ্যতা, তাহার শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত জগতের নিকট প্রকটিত করিবে। সেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, যত দিন পর্য্যন্ত ভারতের এই বাণী পৃথিবীর লোক উৎকর্ণ হইয়া না শুনিবে, তত দিন ইহার কার্য চলিতে থাকিবে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষে চিত্তরঞ্জন দাশ কতকটা ধর্ম্মভাব লইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বোধ হয় আবেদন নিবেদনে কখনই আস্থাবান্ ছিলেন না। ১৯১৭ অব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিব যে ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তার পরই চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। যে সময় রাউলাট আইনের পাণ্ডুলিপির ফলে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাশ উভয়ে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর পঞ্চনদের হাঙ্গামা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে দেশময় যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময় দেশবন্ধু দেশের কার্য্যে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পঞ্চনদের হাঙ্গামার অনুসন্ধানকল্পে কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। হাণ্টার কমিটী এবং কংগ্রেস তদন্ত কমিটী, এই উভয় কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। সেই কংগ্রেসে স্বরাজ লাভের, পঞ্চনদের অত্যাচারের প্রতীকারের এবং খেলাফতের অন্যায় ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তখন ঐ অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নাই। কিন্তু নাগপুর কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তিনি যুবরাজের আগমন বর্জ্জন পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সরকার যে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন অবৈধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সরকারের সেই কার্য্য তিনি অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই সময় তিনি দেশের লোককে এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, উত্তেজনার প্রবল কারণ থাকিলেও দেশের লোককে সম্পূর্ণ অহিংসভাবাপন্ন থাকিতে হইবে।

কারারুদ্ধ চিত্তরঞ্জন

১৯২১ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মৌলানা আবুল কালাম, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং অন্যান্য লোকের সহিত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু দাশকে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। কিন্তু কারারুদ্ধ হওয়ায় দাশ মহাশয় সভাপতি হইতে পারেন নাই। হাকিম আজমল খাঁ তাঁহার স্থানে সভাপতি হয়েন। তিনি যখন কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিয়া সরকারের সহিত দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মীমাংসা বৈঠক বসাইবার চেষ্টা করেন। দেশবন্ধু সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না। আমেদাবাদে কংগ্রেসের বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু দাশ মহাত্মা গান্ধীর নিকট তাঁহার অভিভাষণের খসড়া পাঠাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী পরে উহা 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই অভিভাষণে দেশবন্ধু দাশ কেন অসহযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন। তিনি প্রতিভাশালী ব্যবহারাজীবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইনের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এই আইনের দ্বারা আমরা কোন সুবিধালাভ করিতে পারিব না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্বরাজলাভ করিতে সমর্থ না হই, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে।

দ্বৈতশাসন ও চিত্তরঞ্জন

জেল হইতে বাহির হইলে পর তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই একবাক্যে চিত্তরঞ্জন দাশকে তাঁহাদের অবিসংবাদিত নেতা বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি দেশের কল্যাণ সাধন-কল্পে যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য দেশবাসী তাঁহাকে গয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের উপর্য্যুপরি তিনটি অধিবেশনে কাউন্সিল বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু দাশ মহাশয় সেই প্রস্তাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাউন্সিল প্রবেশ করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টায় তিনি সাফল্য লাভ করেন নাই। এই সময় তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হয়। তাঁহারই চেষ্টায় দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মৌলবী আবুল কালাম আজাদ ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ইহার পর কোকনদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়। ইহার পরই স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন। মধ্যপ্রদেশে এবং বাঙ্গালার স্বরাজ্য দল সত্য সত্যই দ্বৈত্য শাসনের সংহার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন জানিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা সরকার হস্তান্তরিত বিভাগ ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সংরক্ষিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আর মধ্যপ্রদেশেও এইরূপ অবস্থা চলিতেছে। চিত্তরঞ্জনের এই সাফল্য ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আমেদাবাদে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থন করেন। গান্ধী দাশের মিলনের ফলে স্বরাজ্যদলই কাউন্সিল গুলিতে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। স্বরাজ্য দল এবং স্বতন্ত্র দল সম্মিলিত হইয়া বার বার সরকারকে পরাজিত করিয়াছেন। বাঙ্গালায় মন্ত্রীর বেতন দিবার প্রস্তাব তিন তিনবার অগ্রাহ্য হয়, মধ্য প্রদেশে দ্বৈত্য শাসন অচল হইয়া যায়।

শেষ জীবন

আজ প্রায় ছয় মাস হইল চিত্তরঞ্জন দাশ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায়ও তিনি দেশের চিন্তা হইতে ক্ষণ কালের জন্যও বিরত হইতে পারেন নাই। তিনি পাটনায় স্বাস্থ্যলাভের জন্য গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি কিছু দিন ভালও ছিলেন। ইতিমধ্যে সরকার অর্ডিনান্স জারী করিয়া ধর-পাকড় আরম্ভ করেন এবং সেই অর্ডিনান্সকে আইনে পরিণত করিবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর পাটনায় স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি অসুস্থ দেহে কাউন্সিলে উপস্থিত থাকেন। বঙ্গীয় কাউন্সিল সেদিন বহুসংখ্যক ভোটে সরকারকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেই দিন বলিয়াছিলেন, এইবার আমার রোগ সারিয়া যাইবে।

তাহার পর ফরিদপুরে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একটি ইস্তাহারে তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার সেই বক্তৃতার কথা সকলেরই স্মরণ আছে। লর্ড বার্কেনহেড তাঁহার সে কথা লইয়া বিলাতে লর্ড সভায় আলোচনা করিয়াছেন।

প্রায় মাসাবধি পূর্ব্বে তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার

শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতেছিল, হঠাৎ গত ২রা আষাঢ় সোমবার তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। মঙ্গলবার অপরাহ্ন ছয়টার সময় সংবাদ আসে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর নাই।

দেশের ক্ষতি

দেশবন্ধুর চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম—এমন তীব্র স্বদেশপ্রেম এক লোকমান্য তিলক বা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে আমরা দেখি নাই। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ সত্যই বলিয়াছেন তিলকের পরেই দেশবন্ধুর স্থান। "দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে এখনি আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি"—এই কথা অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ আমাদের মনে হইতেছে, দেশের জন্য সত্যই তিনি প্রাণ দিলেন,—স্বদেশের সেবায় সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন।

আজ সমস্তই স্বপ্নবৎ মনে হইতেছে; মনে হইতেছে, বাঙ্গালায় আর মানুষ নাই, আকাশ যেমন নক্ষত্রবিহীন হইলে শূন্য বোধ হয়, বাঙ্গালার আজ সেই অবস্থা। বাঙ্গালী আজ নেতাহীন হইল—স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধুর পতাকা বহন করিবার যোগ্য লোক আর আমরা দেখিতেছি না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নাই, একথা আমরা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালার পরম দুর্ভাগ্য তাঁহার মত শক্তিশালী পুরুষ-জীবন মধ্যাহ্নে দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে হঠাৎ তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। একবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার পুরুষ-শার্দ্দূল আশুতোষ এমনই অকালে বাঙ্গালাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, আজ আবার দেশবন্ধু দাশের অকালে মহাপ্রস্থান,—বঙ্গজননী এ নিদারুণ আঘাত কিরূপে সহ্য করিবেন বুঝিতে পারিতেছি না! বোধ হয় বাঙ্গালার উপর বিধাতার কোন নিষ্ঠুর অভিশাপ আছে। আজ কাঁদো বাঙ্গালী, কাঁদো। বাঙ্গালার পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গলার মাথার মণি, বীর চিত্তরঞ্জনের জন্য কাঁদো;—বাঙ্গলার আজ মহাশোকের দিন, বাঙ্গলার গৌরব-গিরিচূড়া খসিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর নিবেদন

আমার প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুতে সমগ্র দেশের উপর দিয়া শোকের যে প্রবল ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার ও আমাদের পরিবারের সকলের শোক অনেকটা লাঘব হইয়াছে এবং তাহাই আমাদিগকে জীবনধারণে সক্ষম করিয়া রাখিয়াছে।

আমি দেশ দেশান্তর হইতে ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহুলোকের নিকট সান্ত্বনা পাইয়াছি, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড হইতেও অনেক তার আসিয়াছে। এখনও অবিরত আসিতেছে। আমার প্রিয়তম স্বামীর শবদেহ লইয়া যে বিরাট বিপুল শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, আমি তাহা একবার দেখিয়াছিলাম। আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া অসম্ভব। কাজেই আমি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এবং আমার অন্যান্য যে সমস্ত বন্ধুবর্গ তার করিয়া, প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া বা স্বয়ং আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সংবাদপত্রের মারফতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আর আমার দেশবাসী ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে যে ভাবে আমার শোকের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জানি আমার স্বামী তাঁহার নিজের মতই তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন। দেশবন্ধুর আপ্রাণ কার্য্যের তাঁহারই রোপিত ফল জনসাধারণের এই আকুল আন্তরিকতা, আজ আমরা ভোগ করিতেছি। রেল-কর্তৃপক্ষ দেশবন্ধুর শবদেহ আনয়ন ব্যাপারে আমাদিগকে যে সুবিধা দান করিতেছিলেন, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশবন্ধুর শবানুগমনের বিরাট মিছিলে দুই তিনটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে ইহাতে আমি আহতদিগের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। যাঁহাদের আত্মীয়গণ আহত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের ঠিকানা দান করেন, তাহা হইলে আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব।

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

সম্প্রতি আমি এক মহাবীরের বিধবা কি ভাবে নিজ বৈধব্য আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনা দিতেছি—

১৯১৯ সন হইতে আমি বাসন্তী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হই। ১৯২১ সনে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। তাঁহার সরলতা, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁহার অতিথিসৎকার প্রভৃতির বিষয় আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। ঐ সময়ে আমি নিজে এই সমস্ত কথার সত্যতা উপলব্ধি করি। যখন দার্জ্জিলিংয়ে দেশবন্ধুর সহিত আমার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে বাসন্তী দেবীর সঙ্গেও আমার আরও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বৈধব্যের পরে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় আরও বাড়িয়াছে। কেননা, যে সময়ে দার্জ্জিলিং হইতে দেশবন্ধুর শব লইয়া কলিকাতা আসেন, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমি এক প্রকার সব সময়েই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছি। বিধবা হওয়ার পরে প্রথমে তাঁহার জামাতার বাড়ীতে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার আশে-পাশে আরও অনেক ভদ্রমহিলা বসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বরাবর যখনই আমি তাঁহার ঘরে যাইতাম, তখনই তিনি আমার নিকট আসিতেন এবং আমি তাঁহার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিতাম। কিন্তু ঐ সময়ে আমি কি বলিব। আমি যে সময়ে পৌঁছিলাম, সেই সময়ে অনেক ভগিনী পুত্তলিকার মত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলেন। এক মিনিট পর্য্যন্ত তো আমি তাঁহাকে খুঁজিয়াই পাইলাম না। আগের মত কপালে সিন্দুর, মুখে পান, হাতে চুড়ি, সাড়ীর উপর লেস, হাসিমুখ চেহারা—ইহার কিছুই ছিল না; সুতরাং কিভাবে তাঁহাকে চিনিব, তাই অনুমান করিয়া একজনকে মনে করিলাম যে, ইনিই বাসন্তী দেবী হইবেন। তখন তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম, কিন্তু দেখা অসহ্য হইল। চেহারা কোনপ্রকারে চিনা যায়। রোদন সম্বরণ করা কঠিন হইল। পাথরে বুক বাঁধিয়া সান্ত্বনা পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না।

তাঁহার মুখে সদাশোভিত হাসি আজ কোথায়? সান্ত্বনা দিতে ও কথাবার্ত্তা বলিতে অনেক চেষ্টা করিলাম এবং অনেকক্ষণ পরে কতকটা সফল হইলাম।

দেবী একটু স্থির হইলেন, আমিও একটু সাহস করিয়া বলিলাম—আপনি কাঁদিতে পারেন না। আপনি কাঁদিলে সকলেই কাঁদিবে। মোনাকে (বড় মেয়ে) অতি কষ্টে শান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, বেবীর (ছোট মেয়ে) অবস্থা তো জানেনই, সুজাতা (পুত্রবধু) সর্ব্বক্ষণই কাঁদিতেছে—অতি কষ্টে তাঁহাকে একটু স্থির করা হইয়াছে। স্থির হউন। আপনাকে অনেক কাজেরই ভার লইতে হইবে।

তখন বীরাঙ্গনা দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন—কাঁদিব না, আমার কান্না আসে না।

আমি উহার মর্ম্ম বুঝিলাম—কতকটা সন্তোষও হইল।

ক্রন্দনে শোকভার লাঘব হয়। কিন্তু এই বিধবা একবার কাঁদিয়া শোকভার লাঘব করিতেছেন, আবার ক্রন্দন বন্ধ করিতেছেন। আমিই বা কি করিয়া বলি—ভগিনী আরও কাঁদিয়া শোকভার লাঘব কর।

হিন্দু-বিধবা দুঃখের প্রতিমা—সে সংসারের সমস্ত দুঃখভার নিজের মস্তকে বহন করে। তাহাকে দুঃখই সুখ মনে করিয়া লইতে হয়—দুঃখই উহার ধর্ম্ম। বাসন্তী দেবী

এখন পান, মিষ্টান্ন, মাছ, মাংস সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল পতির ধ্যান—পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত আছেন। এখন কেহ তাঁহাকে আর কাঁদিতে দেখেন না ; কিন্তু তাঁহার চেহারায় আর সেই তেজ নাই। মুখ দেখিলে মনে হয় যেন কঠিন ব্যারাম হইতে উঠিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমি একদিন তাঁহাকে মোটরে করিয়া হাওড়া লইয়া আসিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি উহাতে রাজী হন নাই।'

আজ ঘুরে আসিয়া আমি তাঁহার দুঃখ কল্পনা করিয়াও কম্পিত হইতেছি। সতী—আপনার দুঃখ আপনিই সম্বরণ করুন। বাসন্তী দেবীর জয় হোক্।

"নবজীবন"

বাসন্তী দেবীর প্রতি স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র

৩নং সানি পার্ক, বালিগঞ্জ।

২৯—৬—২৫

কল্যাণীয়া বাসন্তি,

কি লিখিব তোমাকে ? কেমন করিয়াই বা লিখিব ? অনেক কথাই লিখিতে প্রাণ চায়, কিন্তু কথাসমের আগায় তাহা ফুটাইয়া উঠিতে পারি কই ? এই সর্ব্বনাশা দুর্ঘটনায় যেন আমাকে হতবুদ্ধি—শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। এ সময় যদি তোমাদের কাছে গিয়া এক সঙ্গে একটীবার কাঁদিতে পারিতাম, তাহা হইলেও মনের জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারিত। শরীর অসুস্থ বলিয়া সে ইচ্ছাও পূর্ণ করিতে পারিলাম না, মনের সাধ শুধু একটা ক্ষোভ, আক্ষেপই রহিয়া গেল।

চিত্তরঞ্জনকে আমি তাঁহার বাল্যকাল হইতে জানি। তোমার শ্বশুর-পরিবারের সহিত তখনকার দিনে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। সামান্য কোন মেয়েলী ক্রিয়া কর্ম্মেতেও দাশ-মহিলাগণ আমাদের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিত হইতেন। তোমার বড়ঠাকুরাণী ঐ সময়ে প্রায়ই একটী ছোট ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সে আজ বহুদিনের কথা, চিত্তরঞ্জনের বয়স বোধ হয় তখন ছ' সাত বৎসরের অধিক নহে। মাতার সহিত বালক যখন মেয়ে মজলিসে আসিয়া দাঁড়াইত, চেহারা ও নামে তাহার পরিপূর্ণ মিল দেখিতে পাইতাম। চোখ দুটী ছিল তার বুদ্ধিসমুজ্জল এবং মুখখানি ছিল বেশ একটু ভাব-গম্ভীর। বালমুখে বাল সুলভ সেই গাম্ভীর্য্যটুকু আমার বড়ই মিষ্ট লাগিত। তাহার দিকে চাহিয়া নয়ন মন যেন তাহাতে বাঁধা পড়িয়া যাইত। একদিন এই বালকের এই চিত্তরঞ্জন রূপ মুগ্ধনয়নে দেখিতে দেখিতে তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এই ছেলেটী দেখছি বড় হ'য়ে নিশ্চয়ই একদিন বড়লোক হ'বে।" সেদিন হাসিতে হাসিতে যে কথা বলিয়াছিলাম, ভবিষ্যদ্বাণীর মতই পরে বর্ণে বর্ণে তাহা সফল হইয়াছে। বাঙ্গলার রাজনীতিক ক্ষেত্রে তিনি যে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। এখন তিনি মহারথী, মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যে পরাক্রান্ত শত্রুদুর্গ-শিখরে স্বরাজপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তাঁহার অসীম সাহস, নির্ভীক-প্রতাপে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হায়! তাঁহার মত যুদ্ধজয়ী বীর আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বরাজ-রাজ্য আধ ঘোর বিপত্তিসঙ্কুল। তাঁহার মত মহা প্রতাপে কে আর ইহাকে রক্ষা করিবে ?

বাসন্তি, তাঁহার বিয়োগে তুমি ত আজ একা পতিহীনা হও নাই, দেশের লক্ষ কোটী লোক প্রভুহীন—নেতাহীন—সহায়-বন্ধুহীন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কিন্তু এ রোদন কি শুধুই স্বার্থহানিজনিত দুঃখাবেগ মাত্র ? না—না, তাহা নয়। সমগ্র দেশের শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ শোকাঞ্জলি বর্ষিত হইতেছে। এই মাধুর্য্যময় কৃতজ্ঞতা-তর্পণে মৃত্যুর মধ্যেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ীমূর্ত্তিতে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মৃতিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

বাসন্তি, তুমি সৌভাগ্যবতী রমণী। তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া তুমি যে আদর্শশিক্ষাদীক্ষারূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ, কোন রাজরাণীর ভাগ্যেও সেরূপ ঐশ্বর্য্য ঘটে না। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসী আজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তোমার নিজের মহাক্ষতি অপেক্ষাও সেই দিকই তুমি বড় করিয়া দেখিতেছ এবং তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার সহিত একযোগে তুমি যেরূপ দেশসেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলে, অতঃপর তাঁহার অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যসাধন অভিপ্রায়ে সেইরূপই একাগ্র উদ্যমে দেশহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিবে, তাহাতে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই। আর কি বলিব ? ঈশ্বর তোমাকে এই ব্রত অবলম্বনে বল দান করুন, তোমার প্রতি এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বাসন্তী দেবীর প্রতি সরোজিনী নাইডুর পত্র

বাসন্তী, আমার বাল্যকালের খেলার সাথী, আমার প্রিয়সখী, তোমার নিকট আমি বহুবার পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু পারি নাই। আমি এমন ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই, যাহা দ্বারা তোমাকে দারুণ শোকে সান্ত্বনা দেওয়া যাইতে পারে।

তুমি আজ যে কি শোক পাইয়াছ, তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে ত সাধারণ বিধবার মত একাকী অন্ধকার গৃহকোণে বসিয়া শোক করিতে হইতেছে না। আজ ভারতবাসী মাত্রেই তোমার পতির মৃত্যুতে শোকার্ত্ত। তুমি রাণী—দেশবাসীর শোক তোমার মুকুট স্বরূপ হইবে। দেশবাসী যে তাঁহাদের রাজার মৃত্যুতে শোকাবনত—দেশবন্ধুর কথা মনে হইলে, আমার ঐ এক কথাই মনে পড়ে। ইতিপূর্ব্বে আমি দেশনেতা স্বাধীনতার যুদ্ধের সেনাপতি দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছি। কিন্তু আজ আমি ভক্তি জানাইতে আসি নাই। আমি আমার শৈশবের চিত্তদাদার প্রতি আমার ভালবাসা জানাইতে চাই। তিনি পৃথিবীর চক্ষে যাহাই হউক না কেন আমি তাঁহাকে চিরকালই আমার চিত্ত-দাদা বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি জানি, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কি মহান ছিলেন। ইতিহাস পাঠে সকলেই জানিতে পারিবে, তিনি স্বরাজের জন্য কিরূপ নির্ভীক ভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হয় নাই, তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না, সাংসারিক জীবনে তিনি কি মহান্, কি উদার ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রসবোধ, অসীম প্রেম, প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের সর্ব্ব প্রকার সৌন্দর্য্য উপলব্ধির অসীম শক্তি পৃথিবীর লোকে জানিতে পারিবে না। তাঁহার হৃদয়ে মহান কবি সুপ্ত ছিল, তাই সংসারের ক্ষুদ্র দুঃখ কষ্ট তাঁহার হৃদয়ে ভাবের বন্যা তুলিত, তাই তিনি বৈষ্ণবকবিদের ন্যায় শেষ জীবনে ঈশ্বরপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

আমি মনে প্রাণে তাঁহার হৃদয়ের এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। তাই আজ আমি শোকে এতদূর কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখ এই যে বসুমতী আজ এমন একটী রত্ন হারাইলেন। দেশবন্ধু মনে প্রাণে কবি ছিলেন। তাঁহার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইলে মনে হয়, একজন কবিকে পৃথিবীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে কবিজনোচিত একটা কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইত।

বাসন্তী, চিত্তদাদার সহধর্ম্মিণী; তোমার সৌভাগ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তুমিই ছিলে তাঁহার মহান হৃদয়ের আবাসস্থল। তোমাকেই তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন, ইহা যে কি সৌভাগ্য, তাহা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? বহু শরৎ, বর্ষা ও বসন্ত তোমাদের জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু তুমি ছিলে তাঁহার প্রেমরাজ্যের চিরবসন্ত। তুমি আদর্শ হিন্দু স্ত্রী ছিলে, তুমি তোমার নাম সার্থক করিয়াছ তাই আজ দেশবাসী তোমায় ভক্তি করে—পূজা করে।

মহাত্মাজী তোমার নিকটে আছেন, এই সংবাদে আমি আনন্দিত হইয়াছি; এবং তোমার স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমি আরও আনন্দিত হইয়াছি। আমি জানি, মহাত্মাজী স্ত্রীলোকের ন্যায় মানুষের দুঃখ কষ্ট অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। তাঁহার মধ্যে মাতৃত্বের অংশ আছে, তাই আমি তিনি তোমার নিকট আছেন শুনিয়া স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি।

আমার শরীর অসুস্থ। যত সত্বর সম্ভব তোমার সহিত মিলিত হইব। আমরা সকলেই দেশবন্ধুর আদর্শে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি জানি, তুমি শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না,—তোমার স্বামী—দেশের রাজা আজ পরলোকে; তুমি রাণী, তোমাকেই তাঁহার স্থান অধিকার করিতে হইবে।

দেশবন্ধু স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডার

দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহিলা হাঁসপাতালের ব্যবস্থা

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, পরলোকগত দেশবন্ধু জীবিত কালেই তাঁহার রসা রোডস্থ বাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা ট্রাষ্টির কাছে অবগত হইলাম যে, বাড়ীটার বর্ত্তমান মূল্য ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা হইতে পারে; কিন্তু বাড়ীটা ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ঋণের জন্য দায়াবদ্ধ আছে। কাজেই বাড়ীটার প্রকৃত মূল্য ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকার অধিক নহে।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ জানি যে, বাঙ্গলা দেশবন্ধুর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করিবে। বাস্তবিকপক্ষে গত ১৮ই তারিখে কলিকাতা ও দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার জন্য যে শোকদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তাহা উপরোক্ত ইচ্ছারই পরিচায়ক। আমরা জানি যে, দেশবন্ধুর তাঁহার বাড়ীটা দান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালার মাতৃজাতির উন্নতিসাধন করা। যদি উপরোক্ত বাড়ীটিতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্ত্রীলোকদের জন্য একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত করা হয় এবং ঐ স্থানে নার্সদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে দেশবন্ধুর ইচ্ছা পূর্ণ করা যাইতে পারে।

আমরা অনুমান করি যে, ১০ লক্ষ টাকার কমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমাদের বিশ্বাস যে, দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থে ১০ লক্ষ টাকা বড় বেশী নহে। আমাদের ইচ্ছা কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক বিহীন হইয়া সকল দলকেই উপযুক্তভাবে দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

স্মৃতিরক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন :—

১। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

২। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র।

৩। শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী।

৪। কুমারী সত্যবোহন ঘোষাল।

৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে কোন প্রকার দলাদলির ভাব যে বিদ্যমান নাই, তাহা জানাইবার জন্য উপরোলিখিত ট্রাষ্টিগণ ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাসকে অন্যতম ট্রাষ্টি স্বরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা স্যার রাজেন্দ্র নাথের নিকট ৭নং, হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

(স্বা:) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, পি, সিংহ, জগদীন্দ্রনাথ রায়, (নাটোর) এম, কে, গান্ধী, বি, চক্রবর্ত্তী, পি, সি, রায়, আবুল কালাম আজাদ, এস, আর, দাশ, বি, সি, মিত্র, নীলরতন সরকার, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এ, কে, গজনভী, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, এ, কে, ফজলুল হক, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, এ, এইচ, গজনভী, দেবেন্দ্রলাল খান (নাড়াজোল); এস, এন, মল্লিক, এন, এন, সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, সত্যমোহন ঘোষাল (ভুকৈলাশ) শুকলাল করণানী, নলিনীরঞ্জন সরকার, গোপাল ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, আবদুল্লা সুরাওয়ার্দ্দী, সত্যকিঙ্করপতি রায়, কুমারশঙ্কর রায়, জে, এম, সেনগুপ্ত, এইচ, এস, সুরাওয়ার্দ্দী, মহাম্মদ আলী মামুজী, রায় হরেন্দ্রলাল চৌধুরী, দোস্ত মহম্মদ, পি, সি, কর, অক্ষয় কুমার বসু, সতীশচন্দ্র সেন, প্রভুদয়াল হিমৎসিং, মদনমোহন বর্ম্মণ, কুমারকৃষ্ণদত্ত, নিশীথচন্দ্র সেন, বি, এ, নাগ, জে, এম, দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র বসু (সাময়িক-সম্পাদক, ৬৮।১ এলগিন রোড, কলিকাতা)।

মহাত্মাজীর নিবেদন

আমার বিশ্বাস, মৃত দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য লর্ড সিংহ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের স্বাক্ষরিত যে নিবেদনপত্র প্রচারিত হইয়াছে সেই নিবেদনপত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র বাঙ্গালী সাগ্রহে যোগদান করিবেন। আমি আশা করি যে, বঙ্গদেশের সকল অধিবাসী, অন্য দেশের যে সকল লোক এক্ষণে বাঙ্গলায় স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন এবং অন্য দেশের যে সকল লোক জীবিকার্জ্জন বা অর্থ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অধুনা বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন, তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানে দশ লক্ষ টাকা অনায়াসে এবং অবিলম্বে সংগৃহীত হইবে। অন্যান্য লোক অপেক্ষা বঙ্গবাসী যুবকগণই মৃত দেশবন্ধুর নিকট অধিকতর ঋণী। আশা করি, তাঁহারা এ পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। কোটিপতি দশ জন অনায়াসে এই দশ লক্ষ টাকা দান করিতে পারেন। কিন্তু দরিদ্রের প্রদত্ত সামান্য সাহায্যের দ্বারা ঐ দশ লক্ষ টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়, তাহাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। গত ১৮ই

জুন তারিখে দেশবন্ধুর শবানুগমনে শোভাযাত্রায় যে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দানে উক্ত পরিমাণ অর্থ সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে, ন্যূন পক্ষে দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা আবশ্যক। উহা অপেক্ষা অধিক টাকা সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে না। দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে, ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধের পর মাত্র মাত্র ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা থাকিবে। ইহা একটা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং শুশ্রূষাকারিণীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত অর্থ বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না।

১। জনসাধারণকে মনে রাখিতে হইবে যে, স্মৃতিরক্ষার ব্যাপার জাতি ধর্ম্মবর্ণ নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।

২। ভারতের মহত্তম সন্তানগণের অন্যতমের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই আয়োজন।

স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে যে কার্য্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা পূর্ণভাবে মানবহিতৈষণা সম্পর্কীয় কার্য্য। আমি জানি,— কলিকাতায় স্ত্রীলোকদের জন্য হাঁসপাতাল এবং শুশ্রূষাকারিণীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ অভাব আছে।

সংগৃহীত অর্থ যে প্রস্তাবিত কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে, সে পক্ষে ট্রাষ্টিদিগের নামই সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কুমারী বাণী চাটার্জ্জি বি, এ।

(দেশবন্ধুর পরলোক গমনে ১লা জুলাই ভাগলপুর মহিলা সমিতির শোক সভায় পঠিত)

যে ভারত সুদূর অতীতে একদিন জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে বলেছিল "ওগো আমার সন্তান তোমরা শোন— তোমরা অমৃতের পুত্র। আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জেনে তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাও"— যে ভারত ধর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি তা ভাল করে জেনেছিল ;- যে ভারত একদিন স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছিল— আজ সে পতিত, আজ সে ধূলায় লুণ্ঠিত। তাই ভারতমাতার এত ব্যথা, চোখে এত জল।

জননীর এই বুকভাঙ্গা কান্না— একি কারুর কানে গিয়ে পৌঁছয়নি ? ভারতমাতার ত্রিশ কোটি সন্তান তাদের কেউ কি এ দুঃখের কান্না শুনতে পায়নি ? পেয়েছিল বৈ কি ! তাইত ভোগের মধ্যে থেকে, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে দুঃখিনী মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁর বড় আদরের সন্তান চিত্তরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ! তাইত তিনি নিজের স্বার্থটাকে সবচেয়ে ছোট করে দেখে, নিজের সুখদুঃখকে একেবারে অগ্রাহ্য করে জননীর অশ্রু মুছিয়ে দেবার জন্যে, ভাইএর দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করবার জন্যে বিলাসিতা ও ভোগের আবরণ ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়লেন,—কর্ম্মের বিরাট ক্ষেত্রে আপনাকে সংযত করে নামলেন।

চিত্তরঞ্জন যে শুধু একাই এতবড় কাজ করবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নয়। ভারতমাতার, আরও কয়েকটী সন্তান তাঁদের আপন আপন স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবী দুঃখী মায়ের ডাক শুনে তাঁর জন্যে কারাবাসকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। জ্ঞানের শুভ্র আলোকে তাঁর অন্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাই তিনি আমাদের দেশের সাধারণ নারীর মত ঘরের কোণে বসে না থেকে স্বামীর কাজের সহায়তা করতে পেরেছেন।

এত বড় কর্ম্মী এত বড় দেশের সন্তান যখন নির্ভয় চিত্তে একটার পর একটা কাজ সুন্দর করে সম্পন্ন করছিলেন, দুঃখী ভাইদের বুকে তুলে নিয়ে তাদের উন্নতির জন্যে যত্নবান হয়েছিলেন—এমনি সময়ে একদিন মৃত্যুর দূত এখানকার কর্ম্মক্ষেত্র হতে তাঁকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়াল। তাঁর আত্মাকে সে কোন্ অজানা অচেনা দেশে নিয়ে চলে গেল। ভারত-মাতার বুকে এই নিদারুণ পুত্রশোক বড় আকস্মিক ভাবে বাজল—এযে বড় দারুণ ব্যথা, এ নীরবে সহ্য করা যে বড় শক্ত।

আজ আমরা চিত্তরঞ্জনের এই অকালমৃত্যুর জন্যে শোক প্রকাশ করতে সবাই মিলে একত্র হয়েছি। তাঁর চরণে ব্যথাভরা অন্তরে অশ্রুর অর্ঘ্য নিয়ে নিবেদন করে দিতে এসেছি। বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস আর চোখের জল ছাড়া কি আমাদের আজ তাঁকে দেবার কিছুই নেই? না—না, শুধু তাই নয়, তাহ'লে যে আমরা দেশবন্ধুর অযোগ্য ভগ্নী হলাম। অশ্রুর অর্ঘ্য তাঁর পায়ে ঢেলে দিয়ে আমরা যে আজ বলতে এসেছি "ওগো মহাপুরুষ, তুমি যেমন করে মায়ের দুঃখের কান্না শুনে ব্যাকুল হয়েছিলে, যেমন করে দুঃখী ভাইকে বুকে তুলে নিতে পেরেছিল আমরাও যেন তেমনি পারি। আমরা নারী, তোমার মত শক্তি আমাদের নেই, তবু বিশ্বদেবতার চরণে আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞানের আলোয় তিনি যেন আমাদের অন্ধকার মন আলো করে দেন, আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে ভালবাসবার শক্তিটুকু দেন।" চিত্তরঞ্জন যে কর্ম্মী ছিলেন—তাঁর পদানুসরণ করে আমাদেরও কর্ম্মক্ষেত্রে একটু করে অগ্রসর হ'তে হবে আর গাইতে হবে—

"আগে চল, আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!
দুঃখ আছে কত বিঘ্ন শত শত
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত
চলিতে হইবে মানুষের মত
হৃদয়ে ধরিয়া বল ভাই।"

রূপ ও প্রেম

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

হাসিয়া প্রেম কয়—হে কলা-কুশল,
হে চির রমণীয় হৃদয় হারী,
ভুবন গাহে মোর যে জয় মঙ্গল
ওড়ে যে দিকে দিকে কেতন সারি—
তুমি সে সেনাপতি আনহ জিনি,
ত্রিলোকবাসী তব সায়ক বলে,
প্রাসাদপুরে বসি স্বপনে শুনি
বিজয় ভেরী বাজে তোরণ তলে।
ভাবিয়া নাহি পাই প্রধান কে যে,
কে কার লাগি তুলি'পরবে মাথা,
তরুণ হিয়া হেসে কাহারে পূজে,
কাহার লাগি রচে মহিমা গাথা!
নমিয়া কহে রূপ যুড়িয়া পাণি
—সারথি আমি তব চালাই রথ,
তরুণ হিয়াগুলি কুড়ায়ে আনি
পারের লাগি দেই রচিয়া পথ!
দাঁড়ায় যবে তারা তোমার কাছে,
বাজিয়া ওঠে বীণা মুরজ বাঁশী,
পথের স্মৃতি থাকে পড়িয়া পাছে
শীতের ঝরা পাতা—অতীত হাসি!

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা

(১৯২৫)

ইউনাইটেড মিশনারী উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—সুনীতিকুমারী দাশগুপ্তা, বাসন্তী দাশগুপ্তা, স্নেহলতা বিশ্বাস, হাস্যমুখী বিশ্বাস, প্রফুল্লনলিনী আলি, আশালতা বিশ্বাস, ঊষাবতী রায়।

দ্বিতীয় বিভাগ—কাননবালা ক্ষেত্রফুল, সুধামুখী মণ্ডল।

ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন :—

প্রথম বিভাগ—লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী, সুব্রতা সরকার, শোভা সেন, সরযূ চৌধুরী।

দ্বিতীয় বিভাগ—লক্ষ্মীপ্রিয়া চলিহা।

মার্গারেট স্কুল, কলিকাতা :—

প্রথম বিভাগ—স্নেহলতা মণ্ডল।

দ্বিতীয় বিভাগ—রেবেকা স্তামুয়েল, নিহারিকা রায় চৌধুরী, হৃদয়বালা বসু, বসন্তকুমারী বসু।

তৃতীয় বিভাগ—ঊষাকুসুম মণ্ডল।

ডায়োসেসন কলিজিয়েট স্কুল, কলিকাতা :—

প্রথম বিভাগ—কনকলতা রাহা, পূর্ণিমা চৌধুরী, চঞ্চলা রাহা, ঊষাবতী মিত্র, বিজলী মিত্র, শকুন্তলা পাসরিকা।

বেথুন কলিজিয়েট স্কুল, কলিকাতা :—

প্রথম বিভাগ—স্নেহলতা ঘোষ, লীলা মুখোপাধ্যায়, অনুপমা সেন, শোভনা গুপ্ত, কনকলতা মিত্র, আশারাণী বসু।

দ্বিতীয় বিভাগ—সুষমা বসু, অন্নপূর্ণা দত্ত, রেণুকা দাঁ।

তৃতীয় বিভাগ—ইন্দিরা দাস।

ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—বীণাপাণি চক্রবর্ত্তী, মাধুরীলতা সরকার, কণিকা দাশগুপ্তা, সুনীতিবালা মজুমদার, কল্যাণী সেন, প্রভাবতী বসু, সুবর্ণ ঘোষ, সুলেখা ঘোষ, কল্যাণী দত্ত, কিরণ সেন, হিমানী সেন, বাণী ঘোষ, প্রতিভা সান্যাল, মাধুরী গুপ্ত, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরমা দত্ত, কমলরাণী চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় বিভাগ—জ্যোতিকণা রায়, প্রমীলা গুপ্ত।

দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল :—

প্রথম বিভাগ—শোভনা খাস্তগীর।

খৃষ্ট চার্চ্চ উচ্চ বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—সুষমা বিশ্বাস, চপলা দে, প্রতিভা দত্ত, রমলা ঘোষাল, Minnie Richard.

দ্বিতীয় বিভাগ—স্নেহ নায়ক, ননীবালা ঘোষ।

তৃতীয় বিভাগ—বিমলপ্রভা বসু।

শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—সুপ্রীতিবালা কর, লীলাবতি মজুমদার, বিন্দুবাসিনী দেব, প্রতিভা নিয়োগী, সুশীলা দেবী।

দ্বিতীয় বিভাগ—কিরণবালা দাস।

বরিশাল সদর বালিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—নলিনী বসু, অমিয়া দেবী, সুধান রায়।

চট্টগ্রাম ডাঃ খাস্তগীর বালিকা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—Iran Sheila Peters, সরোজিনী পাল, সুকৃতী দাশগুপ্তা, মুক্তা দত্ত।

দ্বিতীয় বিভাগ—অমিয়বালা চৌধুরী।

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় :—

প্রথম বিভাগ—ইলারাণী দেবী, শোভাময়ী রায়, মৈত্রেয়ী রায়, বগলাসুন্দরী রায়, কাকলতা চৌধুরী, কিরণবালা বসু, সন্ধ্যালতা সরকার, কুসুমমায়ী নিয়োগী, বাসন্তীলতা মজুমদার চৌধুরী, সুহাসিনী দাশ গুপ্ত, অমিয়ামুকুল চৌধুরী, প্রীতিময়ী সেন, মণিকা গুপ্ত, বেলারাণী দত্ত, সুনীতিবালা দে, আভারাণী বসু।

প্রাইভেট ছাত্রী :—

প্রথম বিভাগ—নুরজাহান খাতুন, Venetea Alice, Hussain, ইন্দুলেখা চৌধুরী, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকলতা ঘোষ, Florence Shirma Johory, সাবিত্রীবালা মুখোপাধ্যায়

লীলা রায়, বীণা ঘোষ, লীলাবতি সিংহ, বিজয়া সেন, ভূমিজা দেবী, কৃপাবতী শ্রীবাস্তব, নিরুপমা দেবী, Christina Philis, কল্যাণী দেবী, চম্পা দাস, নন্দরাণী ধর। Beatrice Pugh, Norasidian Lyngdoh, চারুবালা দে, মিস প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, লাবণ্যপ্রভা দেবী, গিরিবালা জানা, Ella Bose, উষারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বিভাগ—প্রতিভা সেন, ললিতা রায়, সরযূবালা ঘোষ, উমাশশী দেবী, প্রীতি দত্ত গুপ্ত, সুধা দেবী, শক সেন, Iqbal Fatma. Trogsng শান্তিলতা সেনগুপ্তা, নলিনীপ্রভা দত্ত, ননীবালা গুপ্ত, উষারাণী মল্লিক, নীলিমা গুহ।

তৃতীয় বিভাগ—সুপ্রীতি মজুমদার, Sapphirasukumarie Subara, বিমলা দেশপাণ্ডে, সরোজিনী মজুমদার, মানসী চৌধুরী, উদ্যানলতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি সেনগুপ্ত।

উত্তীর্ণা—Aley Joseph, K. Nagaratnam.

আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা

(১৯২৫)

প্রথম বিভাগ :—

নাম	কলেজ
নীলিমা ঘোষ—	বেথুন,
জ্যোতির্ম্ময়ী দত্ত—	ডায়োসেসন,
আভা সেন—	বেথুন,
Mary Saldanha—	Loreto House,
পদ্মাসনা সিংহ—	বেথুন,
Ena Marie Sweeney—	Loreto House,
Kathleen parton—	লরেটো হাউস
জ্যোৎস্না দে—	ডায়োসেসন,
মৃন্ময়ী দাস—	নন-কলিজিয়েট,
Sylvia Winfred Irane—	ডায়োসেসন,
মন্দাকিনী চাটার্জ্জী—	বেথুন,
Mwriel Gladys Seine—	ডায়োসেসন,
প্রতিভা দেবী—	নন-কলিজিয়েট,
কমলা সেন—	বেথুন,
স্নেহলতা দাশগুপ্ত—	ডায়োসেসন,
কমলকামিনী দেবী—	নন-কলিজিয়েট,
আশালতা খাস্তগীর—	নন-কলিজিয়েট,
অলকা চৌধুরী—	ডায়োসেসন,
শান্তিময়ী ঘোষ—	নন-কলিজিয়েট,
স্নেহময়ী সেনগুপ্ত—	ডায়োসেসন,
সুলেখা রায়—	ডায়োসেসন,
Mabel Therley platters—	লরেটো হাউস,
মীরা দত্ত গুপ্ত—	ডায়োসেসন কলেজ,
M. Khan Marjorie—	লরেটো হাউস

দ্বিতীয় বিভাগ :—

নাম	কলেজ
শৈলবালা অধিকারী—	নন-কলিজিয়েট,
অনুকণা দাশ গুপ্ত	নন-কলিজিয়েট,
রেণু দাস গুপ্ত—	নন-কলিজিয়েট,
সাধনা দাস গুপ্ত—	বেথুন,
মালতী দত্ত—	বেথুন,
লীলা গুপ্ত—	বেথুন,
Ma Yi—	নন-কলিজিয়েট
সুবর্ণ পুর কায়স্থ—	ডায়োসেসন,
মনোরমা—	বেথুন

তৃতীয় বিভাগ :—

নাম	কলেজ
রমা চৌধুরী—	বেথুন।

মাতৃ-মন্দির

[১৮২ পৃষ্ঠা]
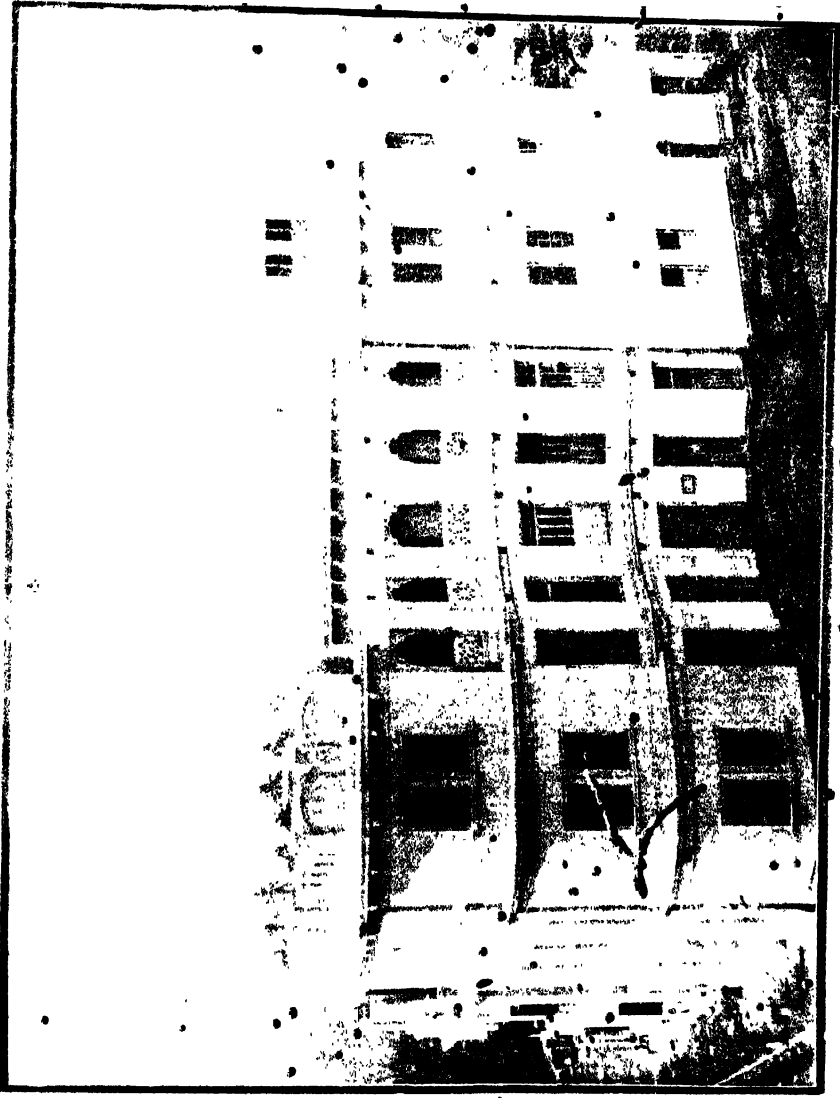
৩য় বর্ষ } ভাদ্র—১৩৩২ { ৫ম সংখ্যা

সামাজিক দুর্গতি

সমাজে মেয়েদের দুর্গতির কথা ভাবতে গেলে ভাবনার কূল কিনারা নাই। এই সমস্ত দুর্গতির মূলে রয়েছে মেয়েদের মনের দুর্ব্বলতা। তারা যে 'মেয়ে মানুষ' এই ভাবনাটাই আরো তাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে।

দশ এগার বছরের মেয়েটী, বেশ হেঁসে খেলে বেড়াচ্ছে, সংসারের কাজ কর্ম্ম শিখছে—হঠাৎ তার বিয়ের কথা। ছেলে ঠিক হ'য়ে গেল, দিন স্থির হল, বিয়ে হল; বিয়ে নয়—যেন বিয়ের খেলা। পরিণত বয়স ও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেওয়া কখন উচিত কি?

আবার এই বয়সে বিয়ে না হয়ে যদি তের বা চৌদ্দয় পড়ল, অমনি মেয়ের বাপ মা ভেবে অস্থির, পাড়াপড়শীর ঠাট্টা বিদ্রূপের চোটে আরও অস্থির। ভাল বর না জুটলেও কুপাত্রে-অপাত্রে যেমন করে হ'ক মেয়ে পার করতেই হবে। অপাত্রে কন্যা দান করার চেয়ে যতদিন ভাল বর না জোটে ততদিন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা ভাল, এ জ্ঞান কি আমাদের সমাজের কোন দিন হবে না?

তারপর অপরিণত বয়সে নূতন বৌ হয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে যে ভাবে জীবন কাটাতে হয় সে এক বিষম কারাগার বিশেষ। ঐ আষ্টে-পিষ্টে আইনে বাঁধা কারাগারের ভিতর বাস করে তার কৈশোরের সচঞ্চল মাধুর্য্যটুকু হারিয়ে বসে, তার পরিবর্ত্তে সে আইনে আইনে বাধা পেয়ে কলের পুতুলের মত হয়। তাকে দিয়ে যা করান হয় তাই সে করে বটে কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে হয়ে যায় জড়ের মত।

এই সময় ঐ অপরিণত বয়সের বালিকা বধূর প্রতি একটী পৈশাচিক অত্যাচারের অভিযোগ এখানে না তুলে পারব না, সেটি হ'চ্ছে স্বামীর সঙ্গে শয়নবাস। দেশের লোকে আমাদের যতই গালিবর্ষণ করুন, তা আমাদের মাথা পেতে নিতেই হবে, তবুও ঐ অত্যাচারের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা কর্ত্তে আমরা সংসারের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করবই। এই অবস্থায় অভিভাবকদিগের উচিত দিনের বেলায় তাদের সাধারণ ভাবে মিলনের সুযোগ দিয়ে রাত্রিতে পৃথক থাকবার ব্যবস্থা করা। বালিকা-বধূর স্বামী স্ত্রীকে

নানাভাবে শিক্ষিতা করবার ইচ্ছায় স্ত্রীর সঙ্গে নৈশবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু দিনের বেলায় স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া যেমন সুবিধা রাত্রিতে তার অনেকটা ব্যাঘাতই হয়ে থাকে। এসম্বন্ধে আর বেশী লিখব না, অভিভাবকগণকে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন দিনের বেলায় তাদের মেলা-মেশা করবার যথেষ্ট সুযোগ দেন।

অধিকাংশ বালবধূ অপরিণত বয়সেই সন্তানের মা হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় অনেক সময় সন্তান সুস্থকায় হলেও প্রসূতির শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। এই যে শরীরের বন্ধন শিথিল হতে আরম্ভ হয় এ আর সারাজীবনেও সারে না। তার পর থেকে প্রসূতি বরাবরই দুর্ব্বল সন্তান প্রসব করেন। এ অবস্থায় সংসারে এক বিষম দুঃখের সৃষ্টি হয় না কি?

কোলের শিশুসন্তান মায়ের দুধ খায়, এতে মায়ের শরীর যতটুকু ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তা পূরণ করবার কোন ব্যবস্থাই হয় না। মাকে যখন বুকের রক্তে সন্তান পালন করতে হয় তখন তার শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্যে পুষ্টিকর আহারের দরকার। প্রসূতির পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করা আর্থিক অবস্থার উপর যতটা নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে সংসারের বন্দোবস্তের দোষ-গুণের উপর। আমি একটি প্রসূতির খবর জানি, কয়েক বৎসর আগে তাঁদের সংসারে ননদ কর্ত্রী ছিলেন। প্রসূতি তাঁর একটা অসুখের জন্যে কাঁচা পেঁপের তরকারী খাওয়া বিশেষ আবশ্যক মনে ক'রতেন। কিন্তু ননদের ভয়ে তাঁর পেঁপের তরকারী খাওয়া জুটত না, ফলে তাঁর অসুখটি বেড়েই চলেছিল। এই ঘটনার পর যখন তিনি নিজে সংসারের কর্ত্রী হলেন তখন আবশ্যক মত পেঁপের তরকারী খেতেন, তার ফলে অসুখটি সেরে শরীর বেশ ভাল হয়েছিল এ কথাটি আমি তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি।

আমাদের দেশে একটা রীতি এই, স্ত্রীলোকদের সামান্য অসুখ-বিসুখের উপর কোন দৃষ্টি রাখা হয় না। অসুস্থ নারী নিজেও চিকিৎসা সম্বন্ধে যথেষ্ট তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান। এতে সংসারের কতখানি অকল্যাণ হয় সে বিষয় কেউই ভেবে দেখেন না। সাধারণতঃ কোলের ছেলের মাই বেশীর ভাগ অসুস্থ ও দুর্ব্বল, অথচ তাঁদের উপরেই সংসারের ভবিষ্যৎ আশাভরসা নির্ভর করে। রুগ্ন জননীর সন্তানও যে রুগ্ন হয় এ কথা কে না বোঝে?

এইবার একটু বিধবাদের কথা বলব। আমাদের হিন্দুর ঘরে যে যে কারণে বিধবার সংখ্যা বেশী সে সব কারণের উল্লেখ করলে হিন্দু সমাজের গতানুগতিক পদ্ধতির উপর দোষারোপ করতে হয়, সে কথা থাকুক। বিধবা হলেই চারিদিক থেকে তাঁর কাণে এই সংবাদ পৌছে, জগতের সকল সুখ থেকে তিনি বঞ্চিতা। সকলেই তাঁর কাছে তাঁর দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে, এর ফলে তাঁর নিজের মনের বলটুকুও তিনি হারিয়ে ফেলেন না কি?

আমাদের সমাজে বিধবাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ব্যবস্থাই নাই, যত রকম নির্য্যাতন বিধবাদের ঘাড়ে। সমাজ যতদিন নিশ্চেষ্ট থাকবে ততদিন এর প্রতিবিধান কোনমতেই হবার নয়। আমরা বিধবাদের এই সান্ত্বনা দিতে চাই, বৈধব্যকে তাঁরা যেন জীবনের 'সব-হারানি' অবস্থা মনে না করেন। পরন্তু বিশেষ ভাবে চিন্তা করলে ভগবানের বিধানের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, মানুষের সুখ দুঃখের বেশী তারতম্য তিনি করেন নাই, সকলের উপরেই তাঁর সমান দৃষ্টি। তার পর সাধারণতঃ দেখা যায় বিধবাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাঁদের চিত্তপ্রসন্নতা সধবাদের চেয়েও বেশী। এটি বিধবাদের উপর ভগবানের এক বিশেষ আশীর্ব্বাদ।

মেয়েদের দুর্গতির সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা গেল সমাজের প্রত্যেককে এ বিষয়ে আমরা ভাবতে অনুরোধ করি।

গোপা

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

গোপাকে অনেকেই জানেন না, কিন্তু সেটা গোপার দোষ নয়, দোষ আমাদের হিন্দুদের। আমরা অনেক কীর্ত্তি করিয়া জগৎবাসীর নিকট বাহবা লইয়াছি কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি হইতেছে গোপার স্বামীকে—জগতের শ্রেষ্ঠ মানবকে—তাঁর ধর্ম্ম ও সংঘকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। তাই আদর্শ সতী গোপাকে খুব অল্প লোকেই জানেন। কিন্তু আমরা না জানিলেও জগতের দুইএর তৃতীয়াংশ লোক ঐ মহিয়সী নারীর চরিত্রে মুগ্ধ, তাঁর আদর্শে বৌদ্ধদের নারীসমাজ গঠিত।

গোপা রাজকুমারী, রাজ কুললক্ষ্মী, স্বামীগত প্রাণা, স্বামীর মানে মানিনী এবং সরল, পবিত্র, পরমাসুন্দরী।

বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিবেন, রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাস স্বীকার করিবেন কিন্তু গোপাকে ত্যাগ করা ত সোজা নয়। তাই কৌশল অবলম্বন করিলেন, নিশীথে নিদ্রিতা স্ত্রীকে একা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গোপা দেখিলেন তাঁহার ঘর আঁধার, তাঁহার নয়নের মণি তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার কাণে আসিল স্বামী মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন এবং সমস্ত অলঙ্কার অঙ্গ হইতে খুলিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া দিয়াছেন, গোপাও তৎক্ষণাৎ নিজের একরাশ চুল কাটিয়া ফেলিলেন, গা হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন, কাহারো বাধা মানিলেন না, বৃদ্ধ শ্বশুর শুদ্ধোধন এত সাধ্যসাধনা করিলেন কিন্তু গোপা আর অলঙ্কার স্পর্শ করিলেন না।

আবার গোপার কাণে আসিল স্বামী মৃৎপাত্রে আহার করেন, ভূমিশয্যায় শয়ন করেন। গোপা গৃহ হইতে সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র দূর করিয়া দিলেন এবং মৃৎপাত্র অবলম্বন করিলেন। গৃহ হইতে খাট পালঙ্ক প্রভৃতি মূল্যবান আসবাবপত্র বিদায় হইল, গোপা মেঝের উপর অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ রাজপ্রাসাদের মধ্যে যেন পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রাজবধূ গোপা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কি অপূর্ব্ব চরিত্র! কি আশ্চর্য্য স্বাম্যনুবর্ত্তিতা! এমন না হইলে পুরুষোত্তমের সহধর্ম্মিনী হইবার অধিকার কে রাখে?

তারপর, সাত বৎসরের পরে পিতার একান্ত অনুরোধে বুদ্ধদেব একবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীকে দেখিয়া গোপার ক্ষণেকের জন্য অভিমান আসিয়াছিল, তিনি আত্মহারা হইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া অঘোর ঘোরে কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নহে। অল্প কালের মধ্যে তিনি আত্মসংবরণ করিলেন এবং পতির পার্শ্বে বসিয়া পরম আশ্চর্য্যময় অধ্যাত্মবাণী শুনিতে লাগিলেন, মনে মনে তিনি স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এত বড় সাহসিনী তিনি, শুধু নিজে নিজে স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, একমাত্র বংশধর, ভাবী রাজকুমার রাহুলকে—নিজের পুত্রকে, পিতার পথে যাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

একদিন জানালা দিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া স্বামীকে দেখাইয়া গোপা তাঁহার ছেলেকে বলিলেন, "পুত্র, ঐ যে একজন লোক বসিয়া আছেন, যাঁহাকে অনেকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তিনি তোমার পিতা। ওঁর কাছে যাইয়া বলগে, 'বাবা আমি আপনার কাছে আসিয়াছি, আমি আপনার সম্পত্তির

অধিকারী হইতে চাই। উনি যাহা করিতে বলিবেন তাহাই করিবে। যেথায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন সেথায় যাইবে। যাও পুত্র।"

ছেলেও তেমনি। মাতার কথা শুনিয়াই পিতার কাছে চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। গোপা অজ্ঞাতে স্বামীকে হারাইয়া, সজ্ঞাতে পুত্রকে হারাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সীতা যেমন কুশ লবকে রামের কাছে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন গোপাও তেমনি রাহুলকে বুদ্ধের কাছে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গোপা মনে মনে স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। বৃদ্ধ শোকাতুর শ্বশুর বর্ত্তমান, তাঁহাকে দেখিবে কে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে কে? শুদ্ধোধনের অবস্থা এখন দীনাথের মত। পুত্র গেল, পৌত্র গেল, আবার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আনন্দ, সেও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। শুধু কি তাই? একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র অনুরুদ্ধ, সেও আনন্দের পদানুসরণ করিল। রাজার বিরাট প্রাসাদ আজ মহারণ্য—তিনি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় মহাকালের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিলেন। কেবল সান্ত্বনা দিবার জন্য রহিল পুত্রবধূ গোপা।

ক্রমে মহাকাল সদয় হইলেন। বৃদ্ধ রাজাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তিনি নিজের রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

এইবার গোপার সবদিক মুক্ত; সংসারের সমস্ত ভার হইতে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। আর তাঁহাকে আটকাইয়া রাখে কে? তিনি স্বামীর কাছে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যাহাতে তাঁহাকে সংঘে লওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সেই সময় সংঘের আইন-কানুন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন এবং তখন স্ত্রীসংঘ প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করেন নি, তাই স্ত্রীকে সংবাদ পাঠাইলেন, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

কিছুদিন পরে গোপা আবার একবার ইচ্ছা জানাইয়া সংবাদ পাঠাইলেন। এবারেও সেই উত্তর আসিল। আবার অনুরোধ করিলেন, তৃতীয় বারেও তাই। আর গোপা স্থির থাকিতে পারিলেন না। বুদ্ধদেবের বিমাতা গৌতমীকে সঙ্গে করিয়া একেবারে তিনি স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এবার আর বুদ্ধদেব স্ত্রীকে ফেলিতে পারিলেন না। বিশেষ যে প্রৌঢ়া বিমাতা তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি যখন ধরিয়া বসিলেন পুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে তখন বুদ্ধদেব আর কি করিয়া তাঁদের বিদায় দিতে পারেন? তাঁহার আদেশে প্রথম স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং গৌতমী প্রথম ভিক্ষুণী হইয়া মঠকর্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। গোপা স্বামীর আদর্শ লইয়া ব্রহ্মচারিণী রূপে সেই মঠে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সরলতার আধার, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, অপূর্ব্ব সংযমশীলা, নয়নানন্দদায়িনী, রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ গোপা! মনে হয় একি বাস্তব না কবির কল্পনা! মনে হয় বুঝি ইনি ইতিহাসের কেউ নন, সহস্র কবি এক সঙ্গে বসিয়া, এক ধ্যান করিয়া এই মূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন।

আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের মধ্য হইতে আদর্শ বাছিয়া লইতে জগৎ হয়ত লজ্জিত হইবে। কিন্তু আমরা যদি স্বাধীন হইতাম, জগতের জাতি-সংঘের মধ্যে আমাদেরও যদি একটা আসন থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি গোপা জগতের প্রত্যেক পুরুষের স্মরণীয়া এবং প্রত্যেক নারীর আদর্শস্থানীয়া হইতেন। কিন্তু সেজন্য দুঃখ করি কেন? আমাদের সব যাক, থাকুক কেবল গোপা। এই রত্নের অধিকারী যাহারা তাহারা যে কত বড় ঐশ্বর্য্যশালী তা অপর কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক সাক্ষী থাকিবে আকাশের দেবতারা, সাক্ষী থাকিবে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, সাক্ষী থাকিবে অন্তর্য্যামী।

রাজপুতানা অঞ্চলের মহিলাদের কথা

শ্রীমূলচাঁদ মুন্দড়া।

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

রাজপুতানার মেয়েদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গলা দেশে বা অন্য কোন বিদেশে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিলাসিতা দেখা যায় এবং তাঁহারা বিলাতী কাপড়ই পরিধান করেন। কিন্তু যাঁহারা আদৌ বিদেশে আসেন নাই তাঁহাদের মধ্যে বিলাসিতা দেখা যায় না এবং তাঁহারা সেখানকার তৈয়ারী দেশী কাপড়ই পরেন। মেয়েরা সাদা সাড়ী পরেন না, রঙিন সাড়ী পরেন। রঙের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে, একটি কাঁচা রঙ আর একটি পাকা রঙ। আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ইঁহারা নির্দ্ধারিত সময়ের জন্য কাঁচা রঙের কাপড় পরেন না। বিধবারা আজীবন পাকা রঙের সাড়ী পরেন, কেহ কেহ বা সাদা সাড়ীও পরেন। ইঁহারা গায়ে সব সময়েই একটা কিছু কাপড় পরিয়া থাকেন, কোন সময়ে খালি গায়ে থাকেন না। অধিকাংশ বয়স্থা মেয়েরাই "কাঁচলি" নামক এক প্রকার জামা গায়ে দেন। এই কাঁচলিতে সামনের দিকে বোতাম থাকে আর পিছনের দিকে বাঁধিবার জন্য ফিতা থাকে, এ কারণ এই জামা ইচ্ছামত ঢিলা বা শক্ত করা যাইতে পারে।

এদেশের মেয়েরা মাথার চুল খোলা রাখেন না, লাল উলের সূতা দিয়া সর্ব্বদা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখেন। এত শক্ত করিয়া বাঁধেন যে খোঁপা হইতে একটি চুলও টানিয়া বাহির করা যায় না এবং একটি চুলেরও অগ্রভাগ দেখা যায় না। পাড়াপড়সী বা আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া মাত্র প্রত্যেকে প্রত্যেকের চুল বাঁধিয়া দিয়া থাকেন।

ইঁহারা গহনা খুব ভালবাসেন। পায়ে, হাতে, কোমরে, গলায়, নাকে, মাথায়, কানে, দাঁতে, চুলে, হাত ও পায়ের আঙুলে ইঁহার নানা প্রকার গহনা পরিয়া থাকেন, কপালের উপর চুলে বাঁধিয়া "বোর-বা-বোরিয়া" নামক ইঁহারা এক প্রকার গহনা পরেন, সেটি এ দেশের মেয়েদের সধবার চিহ্ন। বিধবারা এই গহনা পরেন না। অনেক সময় এ দেশের মেয়েরা খুঁটিনাটি সোনার কাজ স্বর্ণকারের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেরাই সারিয়া লন।

আলতা এ দেশের মেয়েরা ব্যবহার করেন না মেঁদির পাতা বাটিয়া ইঁহারা হাতে পায়ে লাগান। পূজা পার্ব্বণের সময়ের ছয়-সাত ঘণ্টা পূর্ব্বে লাগাইয়া পরে পা ধুইয়া ফেলেন, ইহাতে সুন্দর পাকা রঙ হয়। এই রঙ ছয় মাস পর্য্যন্ত থাকে।

বিবাহ ও পূজা পার্ব্বণের সময় এদেশের মেয়েরা অনেকে একত্রিত হইয়া আত্মীয় কুটুম্বগণের সম্মুখে মঙ্গলগান করেন। ইঁহারা ১০।১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে ৫।৭ দিন পর পর্য্যন্ত বিবাহ-বাটী মঙ্গলগানে মুখরিত রাখেন। বরকন্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজপথে ভ্রমণকালেও ইঁহারা সকলে মিলিয়া গান গাহিয়া থাকেন। অধিকাংশ মঙ্গলগানেই বিশেষ বিশেষ দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ, নমস্কার ও আহ্বান করা হয়। অনেক গানে হাসি তামাসা করা যায় এমন লোকের নাম জুড়িয়া দিয়া রসিকতা করাও হইয়া থাকে। অনেক গানে আবার বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হয়। জার্ম্মান এবং রুশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল এই যুদ্ধের বর্ণনাও এদেশের মেয়েদের গানের মধ্যে আছে।

বাঙ্গলা দেশের ন্যায় এদেশের মেয়েদের মধ্যেও ব্রতাদির অভাব নাই। সামান্য একাদশী হইতে তুলসী, পঞ্চভিখা, পঞ্চপর্ব্বি, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কঠিন ব্রতও ইঁহারা করিয়া থাকেন, তবে ব্রত উপবাসাদি বৃদ্ধারাই বেশীর ভাগ করেন।

ইহাদের খাদ্যাদির মধ্যে বাজরির খিচ্‌ড়া (খিচুড়ী) ও রুটি, গমের খিচ্‌ড়া, আটার রুটি, জোয়ারের খিচ্‌ড়া, চাউল ডাইলের খিচ্‌ড়া, ডাল, কচ্‌ড়ি বা শুষ্ক তরকারী, চিনি, দুধ, দধি, ঘৃত ও ঘোলই প্রধান। বিবাহ বা কোনও বড় পর্ব্বের সময় ইহারা ডাল ভাত করেন। বৎসরের মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া ভিন্ন অন্য কোন সময়ে খাদ্যের সহিত ইহারা তেঁতুল ব্যবহার করেন না। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময় যে সব তরকারী বা ফল হয় তাহা কাটিয়া শুকাইয়া বার মাস ব্যবহারোপযোগী ও বিদেশে প্রেরণোপযোগী করিয়া রাখা এদেশের মেয়েদের একটা প্রধান রীতি।

গরীব ঘরের মেয়ে-বৌরা গ্রামের নির্দ্দিষ্ট কুয়া হইতে কলসী মাথায় করিয়া জল লইয়া আসেন। ধনী মেয়েরা জল আনেন না। মেয়েরা জলের প্রাচুর্য্য এবং অভাব অনটন দেখিয়া জল খরচ করেন। বাসন মাজার জন্য এঁরা এক ফোঁটাও জল লাগান না। প্রথমে বাসনগুলির ভিতরস্থ অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্য কুকুরের খাবার জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী পাত্রে ফেলিয়া দেন। তারপর ভিজা বালি দিয়া বাসনগুলি শক্ত করিয়া ঘসিয়া বাসি ফেলিয়া দেন। অতঃপর শুষ্ক সাফ বালি দিয়া বাসনগুলি খুব ঘসিয়া পরিষ্কার নেকড়া দিয়া মুছিয়া দেন এবং বাসনগুলি সুন্দর, পরিষ্কার ও চক্‌চকে হইয়া যায়।

কাহারও কোন অসুখ হইলে অধিকাংশ স্থলেই ঠাকুরদিরা চিকিৎসা করেন। সর্দ্দিজ্বরে বয়স্থারা প্রায়ই ২৩ দিন উপবাস করিয়াই নিরাময় হন। ছোট ছেলেমেয়ের সর্দ্দিজ্বরে ঠাকুরদিরা "উকালি"র ব্যবস্থা করেন। উকালির প্রস্তুত প্রণালি এই:— অল্প ধনিয়া, দারুচিনি, লবঙ্গ, শুঁঠ, গোলমরিচ প্রভৃতি গুঁড়া করিয়া আধ সের জলে এই সব জিনিষ সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া তার পর অল্প মিছরী দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহাতে কি কি গুণাগুণ আছে তাহা চিকিৎসকেরাই জানেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সর্দ্দি জ্বর ইহাতে আরাম হয়। ইহারা ডাক্তারের সাহায্য খুবই কম লন। বিকানীর সহরে কয়েক জন মাত্র ডাক্তার আছেন।

এখানে সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীস্বাধীনতা না থাকিলেও, ইহাঁরা অন্ধকার সমাচ্ছন্ন গুহার ন্যায় অন্তঃপুরের মধ্যে থাকিয়া চোরের মতন জীবন কাটান না। এখানকার বালি শীতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম থাকায় মেয়েরা চটির ন্যায় এক রকম দেশীয় তৈয়ারী জুতা পরিধান করেন। ধনীর মেয়েরা সঙ্গে চাকর বা চাকরাণী লইয়া এবং গরীব ঘরের মেয়েরা একাই স্বচ্ছন্দে রাজপথে যাতায়াত করিয়া থাকেন। নাপিত, ঢোলি (বাদ্যকর), রঙ্গারা (যে কাপড় প্রভৃতি রঙ করে), মেথর, কৃষক প্রভৃতি অনেক জাতির ভিতর স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে খাটিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করেন।

কৃষকদের ক্ষেতে যে সময় ফসল পাকে এবং যে সময় তাহা কাটা হয় সে সময় পরিজনস্থ সকলে মিলিয়া সেই ক্ষেতেই একটী কুটীর বাঁধিয়া যতদিন পর্য্যন্ত ফসল না কাটা হয় ততদিন বাস করেন। এই সময় মেয়েরা সকলকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া এবং কেহ কেহ পুরুষদের সঙ্গে ফসল কাটিয়া পরে দিবসান্তে স্বামী এবং পূজনীয়দের সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। দুপুরে গরমের সময় বড় বড় রাজপুতানার বিখ্যাত মিষ্টি তরমুজ এবং বাঙ্গী খাইয়া এঁরা তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকেন। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা বুঝি তাহাতে বোধ হয় যে, ইহাঁর ভগবানের রাজত্বে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে এবং আনন্দেই বাস করেন।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৪)

নূতন বাসায় উঠিয়া যাওয়াতে এবং মনের অবস্থা ঠিক না থাকাতে অসীম পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাঘ মাসে দীপালিকে আনিতে যাইতে পারিল না। ফাল্গুন মাসের ২রা দীপালিকে সে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইবে বলিয়া শ্বশুরালয়ে পত্র দিল।

নূতন বাসায় আসিবার দিন তিনেক পরেই হঠাৎ একদিন সরিত অসীমের বাসায় আসিল।

অসীম তাহার ধৃষ্টতা দেখিয়া খুব রুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, কিরূপে যে সরিতকে জব্দ করা যাইতে পারে তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

সে তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া লেখা পড়া করিতেছিল। সরিত একেবারে ঘরে প্রবেশ করিয়া চেয়ারখানা টানিয়া সরাইয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। অসীমের কপালে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত দেখিয়া গম্ভীরভাবে সে বলিল "ভয় নেই আমি—"

বাধা দিয়া অসীম চেয়ার হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "প্রবোধ দিতে এসেছ এমনি ভাবে যেন আমার দোষ গুণের বিচার করবার কর্ত্তা তুমিই। আমি তোমাদের নিশ্বাস হতে নিজেকে বাঁচাবার জন্তে এত দূরে এনে ফেলেছি, এখানেও আবার কি করতে এসেছ সয়তান, বিশ্বাসঘাতক!"

ধীরভাবে সরিত বলিল "সয়তান হতে পারি কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নই।"

তাহার ললাটে দুটি একটি ঘৃণার রেখা ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে তেমনই শান্তস্বরে বলিল "এসেছি তার কারণ আছে।"

অসীম ঘৃণার হাসি হাসিয়া ভারি হইয়া বসিয়া বলিল "তা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।"

তাহার দিকে না চাহিয়া, তাহার কথা কাণে না তুলিয়া সরিত পকেট হইতে একখানা চেক বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। অসীম সেদিকে চাহিয়া বলিল "দয়াবতী বুঝি স্বামীর প্রতি দয়া করে এই চেকখানা পাঠিয়েছেন?"

গম্ভীর কণ্ঠে সরিত বলিল "তোমার নয়, হেমলতা রায়ের নামে। তাঁর স্বামী তাঁর কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা দেনা করেছিলেন, উইলে তা লেখা আছে। তাঁর পুত্রবধূ সেই কুড়ি হাজার টাকা আর তার সুদ এক হাজার তিনশ টাকা শোধ করেছেন। এই চেক তুমি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে যখনি ইচ্ছা টাকা উঠিয়ে নিতে পার।"

অসীম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার গম্ভীর সৌম্য মুখখানা দেখিয়া সে যেন কেমন মুসড়িয়া পড়িতেছিল। সরিত চেকখানা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অসীম চেক লইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া হেমলতার হাতে দিয়া বলিল "বাবা কি তোমার কাছে কুড়ি হাজার টাকা দেনা করেছিলেন মা?"

আকাশ হইতে পড়িয়া হেমলতা বলিলেন "দেনা? না, তিনি দেনা করেন নি তো। তবে আমার বাপ মরবার সময় আমায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে গেছলেম, সে টাকাটা ওঁরই কাছে গচ্ছিত ছিল বটে।"

অসীম বলিল "তিনি উইলে সেটা দেনা বলে উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর বিষয়ের অধিকারিণী বিষয় পেয়েই দেনা শোধ করে আগে তাঁকে নরক হতে উদ্ধার করেছে।"

হেমলতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "বাবা, খুব মেয়ে যাহোক, নাম রাখবে বটে।"

অসীম বাহিরে চলিয়া গেল।

সে ভাবিয়া পাইতেছিল না সেবিকার এই ব্যবহারে সে সুখী হইবে না দুঃখী হইবে? রাগ করিবে না আনন্দ প্রকাশ করিবে? তাহার উদ্ধত ব্যবহারের কথা মনে করিয়া সে রাগ করিতে গেল কিন্তু তখনি মনে হইল সে পুত্র হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে নাই, পুত্রবধূ হইয়া সেবিকা সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে; এখনও করিতেছে। পিতার দেনা পুত্রে শোধ করিয়া থাকে, অসীম তাহা পারিল না, সেবিকা তাহা পারিল।

হৃদয়টা তাহার হাহাকার করিতে লাগিল। সে চোখ দুটি উর্দ্ধে তুলিয়া অস্ফুট স্বরে একবার ডাকিল "বাবা।"

ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। খানিকটা কাঁদিয়া সে হৃদয়ে শান্তি পাইল।

মাঘ মাসের আটাশে দীপালিকে আনিতে যাইবার কথা ছিল। হেমলতা তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, মোকর্দ্দমার ওজর করিয়া সে কাটাইয়া দিল। দাসীকে ও ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়া সে কাছারী চলিয়া গেল।

২রা ফাল্গুন দীপালি নূতন বাড়ীতে পদার্পণ করিল। পথে আসিতে সে দাসীর মুখে শুনিতে পাইল স্বামী একটা নূতন বাড়ী করিয়াছেন এবং সেইখানেই আছেন। সোৎসুকে সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি?"

গম্ভীর মুখে দাসী বলিল "তিনি পুরাণ বাড়ীতেই আছেন।"

তাহাকে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও দীপালি আর কোনও কথা শুনিতে পাইল না। ব্যাপারটা যে কিছু সাংঘাতিক রকমই হইয়া উঠিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল। এখানে আসিবার জন্য সে ছটফট করিতেছিল, তাহার কারণ সে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবার আসিয়া সে সপত্নীর সহিত স্বামীর মিলন করাইয়া দিবে। সর্ব্ব প্রকারে দিদির আদর্শ লইয়া দিদির ছোট বোন হইয়া সে চলিবে। যে মুহূর্ত্তে দাসীর কাছে সে শুনিল অসীম বিমাতার সহিত নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেবিকা তাহার পুরাতন বাড়ীটাতেই পরিত্যক্তা হইয়া পড়িয়া আছে, সেই মুহূর্ত্তেই সে গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার সে চপলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। দাসী তাহাকে দেখাইবার জন্য দরজাটা একটু খুলিয়া দিতে গেল, জোর করিয়া সে দরজা বন্ধ করিল। বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কি হইবে?

গাড়ী গিয়া বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইবামাত্র হেমলতা আসিয়া বধূকে আদর করিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

প্রথমবারে সে নূতন বধূরূপে আসিয়া হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য অনুভব করে নাই, আজকে সেই চাঞ্চল্য অনুভব করিল। ঘরখানা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বাহিরে তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিয়াছে, তাহার মনে হইল তাহার হৃদয়খানাও তেমনই জমাট অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে।

কেন এমন হইল? যে সর্ব্বস্ব তাহাকে দিয়া নিঃশব্দে সকলের আড়ালে লুকাইয়াছিল তাহার জন্যই নয় কি? সে কি দীপালিকে এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে?

হেমলতাকে সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, গম্ভীর প্রকৃতি হেমলতাও পুত্রবধূর নিকট আপনার কথা ব্যক্ত করিয়া প্রাণ হাল্কা করিতে চাহিলেন না। তিনি ঠিক জানিতেন দীপালি অসীমের কাছে সবই জানিতে পারিবে।

আহারাদির পর দীপালি উপরে চলিয়া গেল। তখনও অসীম বাহিরে ছিল। যেদিন মক্কেল আসিত সেদিন তাহার অনেক রাত হইত; এইজন্য সে সেদিন সকলকে আহার সারিয়া তাহার আহার্য্য শয়ন গৃহে রাখিয়া দিতে বলিয়াছিল।

বামুন ঠাকুরাণী অসীমের আহার্য্য তাহার ঘরে রাখিতে গিয়া দেখিল দীপালি একটা জানালা খুলিয়া দিয়া খোলা জানালায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তখন কৃষ্ণাপক্ষমীর চাঁদখানা আকাশের গায় জলজল করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে পশ্চাতে কেবল দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা শ্রেণী, সেগুলি চাঁদের আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। পার্শ্বের বাড়ীতে হার্মোনিয়াম বাজাইয়া কে গান গাহিতেছিল। জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীতে সেই নীরবতার মাঝখানে গায়কের কণ্ঠ বড় মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বামুণ ঠাকুরাণী আহার্য্য ঢাকা দিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিল "কি দেখছেন বউ মা?"

সে যে এ গৃহে আসিয়াছে দীপালি তাহা জানিতেও পারে নাই। হঠাৎ পশ্চাতে তাহার কথা শুনিবামাত্র সে চমকাইয়া পিছন ফিরিল। তখনি নিজেকে সামলাইয়া একটু হাসিয়া বলিল "কেমন সুন্দর চাঁদখানি উঠেছে তাই দেখছিলুম।"

বামুন ঠাকুরাণী বলিল "আমি ভাবছিলুম বুঝি গান শুনছেন। মণিবাবু বড় চমৎকার গাইতে পারেন। আমাদের এখানেও মাঝে মাঝে গানের মজলিস বসে। বাবু আজ বড় ব্যস্ত বলে মণি বাবুকে ডাকাতে পারেন নি, নচেৎ যেমন শুনবেন মণিবাবু গান গাচ্ছেন অমনি নিজে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনবেন।"

দীপালি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হ্যাঁ গান খুব ভাল গাইতে পারেন উনি। কাল ডেকে এনো না বাবুর কাছে, গান শুনতে হবে। আচ্ছা, ওই যে বড় তেতালা সাদা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে খুব বড়, ওটা কার বাড়ী বলতে পার?"

বামুন ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিল "ওইটেই যে আপনার শ্বশুর বাড়ী? ওই যে বড় আলোটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে না, ওই ঘরেই যে থাকতেন আপনি?"

দীপালি একটু নীরব থাকিয়া বলিল "আচ্ছা, এঁরা ওখান থেকে চলে এলেন কেন? অমন খাসা বাড়ী ছেড়ে এই বাড়ীতে আসার মানে কি তা তো আমি বুঝিতে পারলুম না।"

বামুন ঠাকুরাণী মাথা নাড়িয়া বলিল "কি আর বলব মা, আপনাদের বড় ঘরের কথা আপনারাই জানেন। শুনেছি বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কি সব গোল হয়েছে, তাই বাবু চলে এসেছেন। আমি দেখলুম যা তাই বলতে পারি। বড় বউমা, আমরা যেদিন আসি সেদিন গিন্নিমার পা দুখানা ধরে কাঁদতে লাগলেন যেন কেউ সে বাড়ী না ছেড়ে আসেন। তিনিই চলে যেতে চাইলেন, কিন্তু গিন্নি মা কোন কথাই কাণে তোলেন নি, জোর করে চলে এলেন। আমরা মা গরীব লোক, পেটের দায়ে এসেছি চাকরী করতে, যা দেখেছি তাই বলেছি মা, আর কিছু জানিও নে, শুনিও নি।"

হেমলতার কথা বলিয়া ফেলিয়া সে বেচারী নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। চাকরী করিতে আসিয়া এ বাড়ীতে দাসী ভৃত্যকেও বড় কম নিগৃহীত হইতে হয় নাই। সকলেই হেমলতাকে চিনিত, সেইজন্য তাঁহাকে তেমনি ভাবে মানিয়াও চলিত।

দীপালি তাহার ভয় বুঝিয়া নরম ভাবে বলিল "যা দেখেছ তাই বলেছ, এতে আর দোষ হয়েছে কি মা? যাও তুমি, মা হয়তো তোমায় এখনি ডাকবেন।"

বামুন ঠাকুরাণী তাহার কথায় অনেকটা সাহস পাইয়া বলিল "আপনি ততক্ষণ শুয়ে পড়ুন না দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। বাবু এখন কত রাত্রে আসবেন তার ঠিক কি? বসে অনর্থক কষ্ট পাবেন কেন? যান শুন গে।"

দীপালি বলিল "তুমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যাও। আমার যখন ঘুম আসবে, তখন শোব এখন।"

গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য

ডাঃ রমেশচন্দ্র শর্ম্মা

কিছুদিনের জড়তায় গ্রামের অবস্থা খারাপ হইয়াছে, এখন গ্রামবাসীর এই দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে; সুতরাং গ্রামের দুর্দ্দশার কারণ এবং তাহার প্রতিকারের বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা হইলেই নিজের দেশের মঙ্গলাকাঙ্খীগণ কাজ করিবার পথ পাইবেন। অবশ্য এক দিনেই যে প্রত্যেক গ্রামবাসী উন্নতির পথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবেন এমন আশা করা যায় না, আবার গ্রামের একজনও যে উন্নতির জন্য মনে প্রাণে খাটিবেনি না, তাহাও হইতে পারে না। কুশিক্ষায় বিকৃত-রুচি, বিপথগামী দুই-একজন দ্বারা যেমন সর্ব্ব প্রথম গ্রামের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল আজ আবার সুবুদ্ধি, হিতাকাঙ্খী ব্যক্তিবিশেষের অক্লান্ত পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় দ্বারা গ্রামের উন্নতির পথ ক্রমশঃ খুলিয়া যাইবে। গ্রাম একদিনে যেমন এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই, তেমনি আবার হঠাৎ একেবারে একদিনেই উন্নতও হইবে না। কর্ম্মীগণকে নানা অসুবিধা এবং লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া ধৈর্য্যের সহিত খাটিয়া যাইতে হইবে; ফলের আশায় ব্যাকুল হইলেই কর্ম্মীর মন চঞ্চল হয় এবং দুই একবার অকৃতকার্য্য হইলেই কর্ম্মী হতাশ হন। কর্ম্মীকে এ বিষয় সাবধান হইতে হইবে। প্রথম প্রথম নানা বাধা বিঘ্ন আসিবেই। নিজের কাজের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলে কর্ম্মী কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবেন না, পক্ষান্তরে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত মনে প্রাণে খাটিবেন। নানা মারাত্মক ব্যাধি, জলাভাব, মামলা-মোকদ্দমা, বিবাদ এবং দুষ্ট লোকের দৌরাত্ম্যে গ্রামের অবস্থা হীন হইয়াছে; কৃতী ব্যক্তিগণ এবং জমীদারগণ সহরে বাস করায় গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। এত দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্যেও গ্রামের আকাশে, বাতাসে, খোলা মাঠে, নদীর ধারে, কৃষকের গানে, পাখীর কলরবে, সর্ব্বোপরি নিরক্ষর গ্রামবাসীর সরলতায়, অল্পে তুষ্ট, বৃথা আড়ম্বরহীন সহজ জীবন যাপনে যে শান্তি-সুখ পাওয়া যায়, সভ্যতাভিমানী, কোলাহলপূর্ণ সহরে তাহার একান্ত অভাব। সহরে সভ্যতা দিন দিন অধিকতর প্রচলিত হইয়া গ্রামের দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি করিয়াছে। বালক বালিকাগণের পাঠশালা, ছোট বড় বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, চাকুরে, ব্যবহারজীবী, স্কুল কলেজের ছাত্র—এই সব হইতেই প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিজাতীয় সভ্যতা গ্রামে বিস্তার লাভ করিতেছে। শিক্ষায় আজ যম, নিয়ম, সদাচার সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। স্বাস্থ্য রক্ষার পুস্তকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নাই। বহু ব্যয়সাধ্য ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্, সহজ, উত্তম ব্যয়বাহুল্যশূন্য দেশীয় খেলার স্থান অধিকার করিতেছে,—ঔষধালয় হইতে উগ্র বীর্য্য, বিদেশ হইতে আমদানী, বহুদিন পূর্ব্বের তৈয়ারী, অধিকাংশ স্থলেই এল্‌কহল মিশ্রিত ঔষধ দিন দিন গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে,—সামান্য সামান্য ঘরোয়া বিবাদ সহজে মিটমাট না হইয়া নানা উত্তেজনায় মামলায় পরিণত হইয়া গ্রামবাসীকে একেবারে দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে,—ধনতৃষ্ণার্ত্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বণিকগণ অল্প মূল্যের অনাবশ্যক বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া গ্রামবাসীর অর্থ শোষণ করিতেছে। সৎজ্ঞানের অভাবে আজ গ্রামবাসীর এত দুর্দ্দশা। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই সৎজ্ঞান লাভ হয় নাই।

ভারতবর্ষ আধুনিক উন্নত দেশ নহে; ভারতের অতীত অবস্থা গৌরবময়। নানাবিধ উন্নতি

বিধানের ন্যায় গ্রাম সংগঠন বিষয়েও আমাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে পৈত্রিক জ্ঞান গবেষণার তত্ত্ব লইতে হইবে। নচেৎ যথেষ্ট সৎ ইচ্ছা থাকা সত্বেও, বিজাতীয় উন্নতির প্রণালী গ্রামে চালাইতে গিয়া অমঙ্গলই অধিক হইবে। এ যাবৎ কাল হইয়া আসিয়াছেও তাহাই। ভুল ধরা পড়িয়াছে; এখন প্রকৃত উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত জীবন উন্নত না হইলে, সংঘবদ্ধ হইয়া কোন হিতজনক কাজ করা কঠিন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে নিজেদের আচার, ব্যবহার, সুসংযত করিতে হইবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ বাড়ীখানিকে স্বাস্থ্য পূর্ণ করিতে হইবে।

অল্প চেষ্টাতেই প্রত্যেক গৃহস্থ নিজের বাড়ীর জঙ্গল পরিষ্কার, খানা ডোবা বুঁজান, সাধারণ শাক সব্জীর বাগান করা, নিম এবং কাপাস গাছ বোনা, ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখা, ধূপ ধুনা দেওয়া, নিজ নিজ ধর্ম্মপ্রণালী অনুসারে সকাল সন্ধ্যায় একান্ত মনে সত্য সাধনা করা, স্ত্রী পুত্রের সহিত সদ্ আলাপ করা, অবসর সময়ে চরকায় সুতা কাটিয়া স্বল্প মূল্যের বস্ত্রের ব্যবস্থা করা—এই সব হিতানুষ্ঠান করিতে পারেন। আত্মবশ হইলেই সব সৎকাজ সহজে করা যায় এবং সুখেরও হয়।

গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক, ঐ পাঠশালাকেই আবশ্যক জ্ঞানপ্রচারের কেন্দ্র করিতে হইবে। আশা করি এই ভাবে কাজ আরম্ভ করা সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য হইবে।

জাগরণ

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

আজি কি সুরে গাহিল পাখী,
রমণীর প্রাতে রাঙা রবি, তুমি
আনিলে কি আলো ডাকি?
উজলি' সে করে সজ্জা-আজি রে
রমণী মেলিল আঁখি।
অযুত নিশার স্বপন টুটায়ে
শতেক মায়ার কুহক ঘুচায়ে
অর্ঘ্য দানিতে জননীর পায়ে
শুধু সে ছিল যে বাকি;
আজিকে তরুণ প্রভাত-আলোক
দিল কি তাহারে ডাকি?

ওই হাতে লয়ে ফুলসাজি
উঠিল রমণী উজ্জ্বল চক্ষে,
শঙ্খ উঠিল বাজি,
সকলের সাথে পূজিতে মাতাকে
মন্দিরে এল আজি
রমণী সে-ও ত তনয়া তাঁহার
তনয়-তনয়া ভেদ নাই মা'র,
বন্দনা-ধ্বনি ঘোষে অনিবার
—'লইয়া অর্ঘ্যর
এস এস বালা, মাতৃপূজার
সময় এসেছে আজি

অভাগিনীর পত্র

(কাহিনী)

শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী, বাণীবিনোদ।

প্রিয় বন্ধু আমার,

আজ আমার এই পত্রে পুরুষসমাজের নির্ম্মম অত্যাচারের কথা জানাতে বাধ্য হলুম; কারণ তুমিই আমায় প্রশ্ন করেছ যে, আমি পুরুষসমাজের উপর এত বিরক্ত কেন। ভেবেছিলুম একথা আর কাকেও জানাব না কিন্তু আজ নিরুপায় হয়েই জানাচ্ছি, কারণ এত বড় প্রশ্ন যেমন আজ পর্য্যন্ত কেও করেনি, তেমনি জীবনে আমিও কখন মিথ্যা কথা বলিনি। শুনে যাও বন্ধু এই অভাগিনী বন্ধুর লাঞ্ছিত জীবনের লাঞ্ছিত ক্ষুদ্র অধ্যায়, যে অধ্যায়টুকু আমার এই জীবনটাকেই অভিশপ্ত করে দিয়েছে।

* * * * *

মনে পড়ে আমাদের বাড়ীতে একদিন একটা আনন্দের বাজনা বেজে উঠল। সেদিন আমার সখীর দল, সঙ্গীর দল কত করে আমায় সাজালে। কত কথা বলে উপহাস করলে। সেদিন আমার বিয়ে। কত আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে সেদিন আমি এক অপরিচিত পথিকের সহচরী হয়ে জীবনের পথে পাড়ি দিলুম। আমিও জীবনকে ধন্য মনে করলুম। আর তিনি? আমার রূপের অভাব ছিল না, সবাই আমাকে সুন্দরী বলে প্রশংসা করত, লেখাপড়াও জানতুম বেশ, কাজেই তিনিও আমাকে পেয়ে বড় সুখী হলেন। উভয়েই ভাবলুম আমাদের ভবিষ্যৎ সংসারচিত্রের মধুময় সৌন্দর্য্যের কথা আর ভাবলুম ভবিষ্যৎ সুখশান্তির কথা।

আমার শ্বশুর শাশুড়ী ছিলেনি না, আমিই গৃহের একমাত্র গৃহিণী হয়ে পড়লুম। তাঁর আপনার বলতে আর কেও ছিল না, কাজেই সংসারে থাকলুম আমরা দুটী প্রাণী— আমি আর তিনি।

কত সুখে কত আনন্দে একটী বৎসর কেটে গেল। তার পর? তার পর একদিন কালের আবাহন এল। স্বামী আমার এই শূন্য সংসারে আমাকে একলা রেখে মহাপ্রস্থান করলেন। যাবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন "আত্মা, শোক, তাপ, দুঃখ ভগবানের অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ। আগুনে পুড়েই সোনা খাঁটী হয়। তোমার নিজের অবস্থার মধ্যেই নিজেকে সুখী রেখো। আমায় হারিয়ে নিজেকে নিঃস্ব মনে করো না। স্বামীরও স্বামী বিশ্বস্বামীকে স্মরণ করো।"

স্বামীর আদেশ স্মরণ করে নিজেকে নিজেরই অবস্থার মধ্যে সুখী রাখলুম।

সেদিনের কথা জীবনেও ভুলতে পারব না— যেদিনটা আমার সারা জীবনটাকেই অভিশপ্ত করে দিয়েছে। নদীতে জল আনতে গিয়েছিলুম। কে জানত দুরন্ত কালবৈশাখী তখন আমার পানে চেয়ে অলক্ষিতে অট্টহাসির অবতারণা করছিল। জল নিয়ে আসছি। দুপাশে জঙ্গল, মাঝে একটী সরু রাস্তা। হঠাৎ ভয়ঙ্কর ঝড় এলো, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। এক পাও এগিয়ে যেতে পারলুম না— একটা বটগাছের তলায় আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করতে লাগলুম। দেখতে দেখতে দ্বারকেশ্বরের প্রবল বন্যা আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

* * * * *

যখন ঘুম ভাঙল দেখলুম আমি এক সুসজ্জিত কক্ষে শায়িত। একটী তেরো বছরের মেয়ে আমায় বাতাস করছে। উঠবার চেষ্টা করলুম কিন্তু পারলুম না। মেয়েটী বললে, "উঠবেন না, ডাক্তার নিষেধ করেছে।" তিন সপ্তাহ পরে মেয়েটীর

অক্লান্ত সেবায় ও যত্নে সেরে উঠলুম। তার কাছ থেকে শুনলুম আমাকে তারা অজ্ঞান অবস্থায় নদীতীরে কুড়িয়ে পেয়েছে।

একে একে সব কথা স্মরণ হল।

মেয়েটীর নাম লতিকা। সে তার পিতা মাতার একমাত্র কন্যা। পিতা জমীদার। জমীদার-পত্নী মহামায়ার স্নেহ ও দয়ায় স্বর্গগতা জননীর কথা স্মরণ করে প্রাণে বিপুল তৃপ্তি অনুভব করলুম। বৃদ্ধ জমীদার রাধাকান্তবাবু সেদিন আমায় ডেকে বললেন "তোমার কথা-ত লতিকার কাছ থেকে সবই শুনলুম মা, এখন আমাদের ইচ্ছা তুমি এখানেই থাক—সেখানে একলাটী কোথায় থাকবে ?"

আমি তখন গর্ভবতী। স্বামীর উপদেশ বাণী প্রতিনিয়তই কাণে বাজত। ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তাতেই সম্মতি দিলুম। ছ মাস পরে একটী স্বর্গের কুসুম আমার বক্ষদেশ অলঙ্কৃত করলে। স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম করলুম। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পরল।

* * * * *

তিন বৎসর পরের কথা। লতিকা শ্বশুরালয়ে চলে গেছে। বৃদ্ধ জমীদার স্বর্গে গমন করেছেন। জমীদার-পত্নী কাশীবাস কচ্ছেন। আমি একখানা পাল্কীর সাহায্যে খোকাকে নিয়ে আমার স্বামীর ভিটায় এসে পৌঁছলুম। এসে দেখলুম গৃহের কোন চিহ্ন নাই। পাড়া প্রতিবেশী কেও একটা কথাও কইলে না, ব্যঙ্গস্বরে সকলে বলে যেতে লাগল কত কথা। একটা অস্ফুট কথা আমার কাণে এল—"পতিতা"। পরে শুনলুম—আমি সমাজত্যক্তা—পতিতা, আর এই শিশু, না—না সে কথা আর বলতে পারবো না। ক্ষোভে দুঃখে আমি কি যেন হয়ে উঠলুম. মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন জ্বলে গেল, তিন দিনের পথশ্রান্তির পর একটু বিশ্রামও করতে পেলাম না।

সমাজের নেতা প্রভৃতি সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন "ও পতিতা—ওকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দাও।"

ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলে সব মাথা পেতে নিলুম। তখনও লোকজন সব ফিরে যায় নি। তাদের সঙ্গে আবার আমার আশ্রয়দাতার ভবনে ফিরে এলুম। সব কথা লতিকাকে লিখে জানালুম। লতিকা লিখলে—"তোমার কোথাও যেয়ে কাজ নেই।"

* * * * *

ছ মাস পরে লতিকা বাড়ী এল। তারই চেষ্টায় ও সাহায্যে একটী নারীশিক্ষা-সমিতি স্থাপন করা হল। আমি তারই তত্ত্বাবধান করি।

আজ আট বছর হল এই শিক্ষাশ্রমেই কাজ করছি, খোকা বাঁকুড়ায় পড়ছে, লতিকা তার সমস্ত ভারই বহন করেছে।

আজ আমার কোন কষ্টই নাই; শুধু সেই একটা কথা আজও আমার জীবনের অভিশাপ রূপে মূর্ত্ত হয়ে রয়েছে—"আমি পতিতা!"

তাই বলছিলুম পুরুষ জাতটা এমনিই নির্ম্মম। তারা নিরপরাধিনী নারীজাতিকে বিনা অপরাধে যে কঠোর বিধি দান করে, নিজেদের শত অত্যাচার অবিচারেও সে বিধির প্রয়োগ করে না। তাদের জীবনব্যাপী অন্যায়েও তারা সমাজের চক্ষে নিরপরাধ আর বিনা দোষেও রমণী তাদের নিকট অপরাধিনী। কি আর বলব, বন্ধু, এই নারী জাতির নির্য্যাতন-চিত্র দেখে প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। জানিনা আবার কবে শক্তি স্বরূপিণী মাতৃজাতির জাগরণ হবে! তবে আসি বন্ধু, আবার দেখা হবে

আমি তোমারই—জ্যোৎস্না।

রন্ধন বিদ্যা

'এচোড়ের কালিয়া'

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

উপাদান:—এচোড়, আলু, ঘি, জাফরাণ, দৈ, তেল, হলুদ, আদা, জিরা, মরিচ, ধনে, লঙ্কা, তেজপত্র, লবণ, ও গরম মসলা।

কচি কাঁঠালের উপরকার খোসা ছাড়াইয়া পছন্দানুযায়ী কাটিয়া কিছুক্ষণের জন্য জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। আলুর খোসাগুলি ছাড়াইয়া আলুকে দুই টুকরা করিতে হইবে। এখন হলুদ, জিরা, মরিচ, ধনে, সামান্য লঙ্কা ও আদা বাটিয়া আলাদা রাখিতে হইবে। কুচনা এচোড় গুলি ভালরূপ সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধ জলগুলি নিংড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া আলাদা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এখন টক দৈয়ের সঙ্গে জাফরাণ গুলি ভিজাইয়া রাখিবে।

পাকপ্রণালী:—কড়াতে তেল চাপাইয়া আলু গুলি ভাজিয়া লইয়া সিদ্ধ এচোড় গুলিতে সামান্য হলুদ ও লবণ মাখিয়া ভাজিতে হইবে। ভালরূপ ভাজা হইয়া গেলে, টক দৈয়ের সঙ্গে যে জাফরাণ ভিজানো আছে তাকে দৈয়ের সঙ্গে ভালরূপ মিশাইয়া লইয়া কড়াতে তেল চাপাইয়া কয়েকটী তেজপাতা দিয়া বাটনার জিরা মরিচ ধনে, লঙ্কা সামান্য ও আদাবাটাটি দিয়া ভাজিবে। একটু ভাজা হইয়া উঠিলে এবং ভালরূপ মিশিলে দৈগুলি দিয়া খুব ভালরূপ নাড়িতে হইবে। মসলা গুলি ভালরূপ ভাজা হইয়াছে মনে হইলে এচোড়গুলি তার মধ্যে দিয়া নাড়িবে, যখন দেখিবে মসলাগুলিতে এচোড়গুলিতে ঠিক মিশ খাইয়াছে তখন ভাজা আলুগুলি দিয়া পরিমাণ মত জল দিবে। সুসিদ্ধ হওয়ার পরও যাতে সামান্য পরিমাণে রসা থাকে এভাবে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। মাঝা মাঝি সিদ্ধ হইয়া উঠিলে মাপানুযায়ী লবণ দিবে। যখন দেখিবে সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তখন গরম মসলা বাটিয়া গরম ঘিয়ের সঙ্গে মিশাইয়া কালিয়ার মধ্যে দিয়া নামাইয়া ভালরূপ ঢাকনার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিবে। ইহাই "এচোড়ের কালিয়া"।

শক্তি

শ্রীমতী শশাঙ্কশোভা দাসী।

ওমা শক্তিস্বরূপিণী বল্ আজি শৈলসুতে
রমণী কি শক্তিহীনা হয়েছে মা এ ভারতে?
তোরি ছায়া তোরি কায়া, তোরি তেজপূত প্রাণ,
তোর ক্ষমা, তোর রোষ, তোর সতী-অভিমান—
অবিকল তোর ছাঁচে গড়া যে ভারত নারী,—
অবিরাম তোরি পূজা করে দিয়ে ভক্তিবারি।

তোরি পায়ে জন্ম তার, তোরি পায়ে নির্ব্বাণ,
ভারতনারীর বুকে খেলে তোরি দেওয়া প্রাণ।
সেই তারা শক্তিসুতা, তবে কেন সারাক্ষণ
মুখ বুজে বুক পেতে সহিতেছে নির্য্যাতন?
জাগাও শকতি বুকে দূর করি তুচ্ছ ভয়,
দেখাও ভারতনারী আজি তব শক্তি-জয়।

...তের কথা

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

পূর্ণ একটি বৎসর বিলাতে কাটায়েছি। ভগবানের কৃপায় বিলাতে এই একটী বৎসরের মধ্যে আমাকে কোন অসুবিধাতেই পড়তে হয় নাই। আমার মনে হয় এই নন-কোঅপারেশনের দিনে যদি আমি বিলাতবাসীদের গুণ গাই তবে অনেকেই কানে আঙুল দেবেন—কিন্তু কি বলব এদের প্রত্যেকের ব্যবহারই আমার ভাল লেগেছে।

জাহাজে যাবার সময় আফ্রিকার পোর্ট সৈয়দে নেবে মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে তিন জায়গায় আমাকে ঠগের হাতে পড়তে হয়েছিল কিন্তু লণ্ডনে চলা ফেরা করতে ঠকা দূরে থাক, যার কাছে যতটুকু সদ্ভাব পাব বলে আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি।

লণ্ডনের নূতনত্ব লেখায় প্রকাশ করবার সাধ্য আমার নাই। সহরের প্রায় তিনভাগের এক ভাগই মাটির নিচেয়। রাস্তা-ঘাট ঠিক রাখা অত্যন্ত শক্ত, সবই গাইড-বই দেখে করতে হয়। রাস্তার পুলিস গুলিই দেশের সাধারণ বন্ধু। আমাদের দেশের পুলিসের সঙ্গে এদের মোটেই তুলনা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্থানে তাঁর বিলাতভ্রমণ বিবরণে লিখেছেন—"এদেশের লোকেরা আমাকে এতই মূর্খ মনে করে যে, ফটোগ্রাফের বিবরণটাও আমাকে বুঝাইয়া দেয়।" আমি বলি ওটা তাদের মানুষকে শিখাবার একটা ঝোঁক। কোন আফিসের কাজে, ব্যবসায়ের কাজে যখন যেখানে গিয়েছি সেখানেই নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে।

রাস্তায় কুলী মজুর কাজ করছে তারাও অতি ভাল মানুষ—লোকের উপকার করতে তাদের বড়ই আনন্দ। মাঝে মাঝে দু এক জন ভারত-ফেরতা ইংরেজের সঙ্গে দেখা হ'ত, তারা আমাদের দেশে থেকে যা একটু হিন্দি শিখে গিয়েছে তাই বলে বাহাদুরী দেখাত, ভারতবাসী পেলে তাদের বড় আনন্দ হয়। কুলী মজুরদের মধ্যে যে সব ভারত-ফেরতা দেখতাম, তারা প্রায়ই ভারতে সৈন্য বিভাগে কাজ করে গিয়েছে। উচ্চশ্রেণীর লোক যাঁরা আমাদের দেশে খুব বড় বড় কাজ করে গিয়েছেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে অতি মধুর ব্যবহার করেছেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে ভারতের গল্প করে খুব আনন্দ পেতেন।

ভারতীয় ছাত্র ওখানে অনেক আছে। ভারতে যে যে স্থানে জাহাজ ধরবার পোর্ট আছে, অর্থাৎ কলিকাতা, মান্দ্রাজ, কলম্বো, বম্বে, করাচী—, এই সব যায়গার ছেলেই ওখানে বেশী।

বিলাতে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে মান্দ্রাজ বোম্বাইএর মেয়েই বেশী এবং তাঁদের বরাবরের শ্রম-কুশলতার গুণে তাঁরা ওদেশে বেশ শিক্ষা লাভ করছেন। বাঙ্গালী মেয়ে অল্পই দেখতে পেয়েছি।

ভারতীয় ছাত্রদের থাকবার, লণ্ডনে প্রধান তিনটী স্থান আছে। একটী 21, Cromwell Road এ, এটী ভারত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে; একটী 112 Gower Street এ, এটী ভারতীয় Y. M. C. A. এর তত্ত্বাবধানে; আর একটী 54. Amhurts park এ, এটী শ্রীরামপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল Rev. W. Sutton Page সাহেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ছেলেদের এখানে থাকতে স্কুলের বেতন বাদে মাসে প্রায় দুইশত টাকা খরচ হয়। এদের মধ্যে কেউ গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিধারী কেউ বা খুব বড় লোকের ছেলে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্যবসায় বাণিজ্য বা কারবার সম্বন্ধীয় ভারতবাসী বিলাতে নিতান্তই কম। যা আছে ভারতের—

বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের দু-চার জন মা... বাঙ্গালীর ছেলেরা কেবল স্কুলের ছাত্র আর তাদের ভবিষ্যৎ আশা কেবল চাকুরী। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় তাঁরা যে চাল-চলন শিখে আসছেন, দেশে এসে যে বেতন পাবেন তাতে ঐ চাল-চলন করতে কুলোবে কিনা সন্দেহ।

বিলাতে সবই কাজের লোক, বসে থাকা লোক বা আমাদের দেশের মত তাস-দাবা খেলা করা লোক সেখানে বড় একটা নাই। ধনীর ছেলে সেও কাজ করে, গরীবের ছেলে সেও কাজ করে। ভিক্ষুক নাই বললেই চলে, আমি যা দু একটা ভিক্ষুক দেখেছি তা এই—

Charring Cross এ বহুলোকের সমাবেশ হয়। সেখানে দেখলাম একটা অন্ধ ভিক্ষা করছে, তার গলায় একটা বোর্ডে লেখা "BLIND."

একদিন রাস্তার ধারে দেখলাম কল ঘুরিয়ে একজন বাজনা বাজাচ্ছে—মুখে কোন কথাটী নেই, সে একজন ভিক্ষুক।

টেমসের ধারে প্রশস্ত রাস্তার এক পার্শে দেখলাম একটী লোক নানা রংয়ের খড়ি দিয়ে ফুটপাথের উপর অতি চমৎকার ছবি আঁকছে। জিজ্ঞাসা করলাম—এ করছ কেন? সে বলল আমার হাতে কাজ নাই তাই এখানে বসে ছবি আঁকছি, এতে আমার ভিক্ষা করা হচ্ছে, আর এই কাজ দেখে কেউ আমাকে কোন কাজে নিতেও পারে। মোটের উপর সবাই কিছু কাজ নিয়ে আছে।

ওখানকার প্রত্যেক লোকেই সংবাদপত্র পড়ে, হোটেলের ঝির কাছে জিজ্ঞাসা কর—আজকার খবর কি? সে তখনি দেশবিদেশের খবর বলে দেবে এবং তার একটা মূল্যবান সমালোচনা পর্য্যন্ত করে তবে ছাড়বে।

মেয়ে পুরুষ কাজকর্মে রাস্তা ঘাটে সব যায়গাতেই সমান। আমাদের দেশের মেয়েদের মত মেয়েলী সঙ্কোচ ভাব ওদেশের মেয়েদের নাই। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা কথাবার্ত্তা কইতে একটুও মেয়ে ... বলে বোধ হয় না—যেন ঠিক পুরুষের সঙ্গে ... বলছি। মেয়েরা কাজকর্ম করেন কলের মত দ্রুত। আমরা বায়স্কোপে ছবিতে যেমন দেখি ঠিক তেমনই এঁদের দ্রুত কাজ কর্ম; আর হাত পা চলার একটুও 'বে-দিশে' নাই, সবই যেন প্রাকটিস্ করে শেখা। বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে সতর হাজার শিক্ষিতা মেয়ে চাকরী নিয়েছিলেন।

বিলাতের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ইউরোপ ভিন্ন অন্য স্থানে সুসভ্য মানুষ নাই, তাই ভারতবাসীদের যা একটু আধটু বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে, তা দেখে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। বাঙ্গালী ছাত্রদের মুখে শুনেছি ওদেশবাসীরা তাদের কাছে প্রশ্ন করে—তোমরা নাকি বানর পূজা কর, বানর দেবতাটী কেমন? সেটিকে বেঁধে নিয়ে পূজা কর, কি তারা পূজার সময় ঠিক হয়ে বসে থাকে? সাপ দেবতাকে কি রকম পূজা কর, সেটাকে কেটে টুকরো করে পূজা কর, কি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ (মেস্মেরিজ) করে নাও? এই রকমের অদ্ভুত সব প্রশ্ন। একটী বাঙ্গালী ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে, একদিন তাঁর আঙুল কেটে রক্ত বের হয়েছিল, সেই রক্তের রং কাল নহে। ইংরাজদের রক্তের মতই লাল—দেখে একটী মেয়ে বিস্ময়াপন্ন হয়েছিল।

ইংলণ্ডবাসীদের গতিবিধির ভিতর দিয়ে এই শিক্ষাই আমাকে জাগিয়ে তুলেছে যে, কেমন করে আপন দেশকে, আপন Nation অর্থাৎ সমাজকে ভালবাসতে হয়। প্রথমে যখনই লণ্ডনের একটা নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, তখনই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—"ইংলণ্ড আপনার ভাল লাগছে ত? এদেশের লোকদের কাছে আপনি ভাল ব্যবহার পাচ্ছেন ত?" আমি অন্তরের সহিত উত্তর করতাম "সবই ভাল দেখছি, সকলের কাছেই ভাল ব্যবহার পাচ্ছি।"

ঐ যে সারাজগতের নানাদেশে রাজ্যবিস্তার করেছে এরা, ও কেবল ইংলণ্ডকে পুষ্ট করবার

জন্য। আপন জাতির উন্নতির জন্য এরা অসংখ্য রকম বিধান করেছে। বেশীর ভাগ লোকেই আপন উপার্জ্জিত ধনসম্পদ সাধারণের কল্যাণকর এক একটা বিশেষ কার্য্যে দান করে। এই দানের পরিমাণ এতই বেশী যে, দেশের গরীব দুঃখীরা এই দানের উপর নির্ভর করেই মানুষ হয়ে ওঠে। গরীবরা দেশের দান পেয়ে আপন দুরবস্থা কাটিয়ে পরে আপন উপার্জ্জিত অর্থ আবার অন্য গরীব দুঃখীদের জন্য দানের একটা ব্যবস্থা করে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের ধনসম্পদ অনেক হ্রাস পেয়েছে বটে, তথাপি এমন একটা লোক এখানে দেখা যায় না যার পরিধানে মলিন বস্ত্র, এমন লোক দেখা যায় না যার ভিক্ষা করে খেতে হয়, এমন লোক দেখা যায় না যার অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যাঘাত হচ্ছে। প্রত্যেকেই যেন সমপরিমাণ সুখী। ধনীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা আছে—নির্দ্ধনদের ছেলেমেয়েদের জন্য তার চেয়ে কোন অংশেই মন্দ ব্যবস্থা নয়। রাস্তা ঘাটে ধনী নির্দ্ধনের সমান ব্যবহার, সমান অধিকার। "ছোট লোক" কথাটার ব্যবহার ওখানে একেবারেই নাই।

কৃষক, শ্রমিক, শিল্পি, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের সহিত কলেজের প্রফেসর বা উচ্চতর রাজকর্মচারীদের সম্মানের কোন পার্থক্য নাই। কর্ম্মের ছোট বড় ওখানে নাই। যারা রাস্তা পরিষ্কার করে, যারা ধোবা নাপিতের কাজ করে, যারা রাস্তায় লোকের জুতা সাফ করে দেয় তাদের কাজও কোন অসম্মানের বলে গণ্য নয়। এই সম-সম্বন্ধের ফলেই মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। এদের এই স্বজাতি প্রীতিকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।

ইংলণ্ডবাসীদিগকে আমি সারাদিনই কাজ করতে দেখতাম, খুব বেশীর ভাগই পরিশ্রমের কাজ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি সারাদিনই ছুটাছুটি করে, ছেলেমেয়েরা পথে মা-বাপের সঙ্গে চলতে চলতে রাস্তার পাশের রেলিং ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এরা এত বেশী ছুটাছুটি করে যে, আমাদের দেশে হ'লে আমরা এদেরই অসভ্য ছেলে বলে তিরস্কার করি। বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরাও ঘরে, পথে সর্ব্বত্রই খুব ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়। সর্ব্বদাই এরা প্রফুল্লচিত্ত। বয়স্কেরা প্রায় প্রত্যেকেই স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে পার্কে শ্রমজনিত খেলা করে—এই স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে মুক্ত বায়ুতে খেলা করাই এদের মতে স্বাস্থ্যবান হবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। লণ্ডন সহরের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় পার্ক আছে, এক একটা পার্ক এতই বড় আর এমন বৃক্ষাদি পূর্ণ যে, সেখানে ঢুকলে সহরে আছি বলে মনেই হয় না। প্রত্যেক পার্কেই খেলা করবার নানা রকম ব্যবস্থা আছে। অনেক পার্কে আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ খাল কাটা আর তার দু ধারে বন জঙ্গল তৈরী করা, বিকালে বহুসংখ্যক লোক এই খালের ভিতরে ছোট ছোট নৌকা বেয়ে বেড়ায়, সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

ওদেশের লোকে চলা ফেরা, কাজকর্ম্ম সবই খুব দ্রুত ভাবে সম্পন্ন করে—সারা সহরটায় যখন যেদিকে তাকাতাম সমস্ত গতিবিধি গুলিই বায়স্কোপের ছবির মত মনে হত। আমি পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বাস করতাম সে বাড়ীর গৃহিনী অত্যন্ত মোটা, তিনি সারা দিন হাঁপাতে হাঁপাতে পরিশ্রম-জনিত কাজ করতেন, এক তিলও তাঁর ছুটাছুটির বিরাম ছিল না। দুটী মেয়ে একজিবিশনে আমাদের হলে কাজ করত, একটী ২১ বছরের আর একটী ১৫ বছরের। এদের যখন একটু পরিশ্রমের কাজ দিতাম তখন এদের বেশী আনন্দ হ'ত, বলত—হাতে কাজ পেলে সময় আনন্দে শীঘ্র শীঘ্র কাটে। এদের যেমন শারীরিক বল যথেষ্ট, তেমন নৈতিক বলও অসাধারণ। আমি এদের প্রত্যেক গতিবিধির ভিতর দিয়াই কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করতাম। দেখতাম বৃদ্ধরাও শ্রম-বিমুখ নন, বড় বড় জিনিষপত্র পূর্ণ ব্যাগ প্রত্যেকেই নিজে বহন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লণ্ডনে গিয়ে

আমি মুটে কেমন তা দেখিনি। স্ত্রীপুরুষ বিশেষে হাটবাজার করে আপন আপন জিনিষপত্র নিজেরাই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে নিয়ে পথে চলা ফেরা করে। মেয়েরা অনেকেই বড় বড় ঝুড়ীতে বাজার সওদা কাঁকে নিয়ে চলে, ঝুড়ীর ফিতা বা আংটা কাঁধে দিয়ে ঝুড়ী কাঁকে ঝুলিয়ে দেয়। ঝুড়ী বা ব্যাগ গুলিও অতি সুন্দর, তাতে সওদাগুলিও এমন ভাবে রাখে যে মনে হয় বহু চিন্তা করে ঝুড়ীতে ঐ জিনিষগুলি সুন্দর করে সাজান হয়েছে। এদের এই কর্মকুশলতার গতিবিধি দেখলে কর্ম্মের প্রতি ভক্তি হয়।

সময় ওদেশের লোকের কাছে বড় মূল্যবান। সময় আবার কেমন করে মূল্যবান হয় এটা আমাদের ধারণা করাই কঠিন। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের যেমন মূল্য ধার্য্য আছে—সময়ও এদের তেমনি। শুধু লণ্ডন সহরে কেন, আমার মনে হয় এদের কোন পল্লীতেও এমন কোন লোক নেই যে এক তিল সময় বৃথা নষ্ট করে। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, গল্পের সময় গল্প করা—এর কোনটাতেই সময়ের অপব্যবহার এরা করে না। আমাদের দেশে অনেকে ঘড়ি ব্যবহার করেন পোষাকী ধরণের, কিন্তু এদের প্রত্যেকেই সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্যই ঘড়ি ব্যবহার করে। আমাদের দেশে একাল পর্য্যন্ত ঘড়ি প্রস্তুত হয়নি কেন? এর মূলে চিন্তা করলে এই উত্তরই পাওয়া যায় যে, সময়ের মূল্য না জানলে ঘড়ির অভাব-চিন্তা জাগবে কেন? ঘড়ি তৈরী অতি শক্ত কাজ, পোষাকের জন্য যে ঘড়ির ব্যবহার তাতে কি আর অত বুদ্ধি প্রয়োগ চলে? ঠিকঠাক সময়মত কাজ গুলি সম্পন্ন করার জন্য এদের কাজকর্ম্মের যে কত সুবিধা হয় তা আর বলে শেষ করা যায় না। এরা কাজকর্ম্মে সময়ের ব্যতিক্রম মোটেই করে না।

বিলাতে রাস্তা ঘাট ঘরবাড়ী সবই অতি পরিষ্কার। সকলেই নিজের কাজ নিজে করে, ঝি, চাকর এদের দরকার হয় না। দু-একটা বিলাসী বড়লোকের বাড়ীতে আবশ্যক মত কাজের জন্য লোক নিযুক্ত থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু অতি কম। আমাদের দেশে কাজ মাত্রকেই লোকে অপমান-জনক মনে করে এজন্য অধিকাংশ কাজ চাকর দ্বারা করায়. ওদেশে কাজের মান-অপমানের বালাই নাই, তাই প্রত্যেক কাজটি সংসারের লোকে নিজে হাতে করে। বাড়ী ঘর লেপা-পোঁছা, পাইখানা পরিষ্কার করা—কোন কাজেই ওখানকার লোক অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে না। ওখানকার প্রত্যেক ধনী দরিদ্র গৃহস্থের ঘরের মেঝে সর্ব্বত্র কার্পেটে মোড়া. দেয়াল নানারকম চিত্রিত শক্ত কাগজে মোড়া, রান্নাঘর পাইখানাঘর পর্য্যন্ত ঠিক একই ভাবে মোড়া, সব অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভ্রমক্রমেও কখন কেউ দেয়ালে বা মেঝেয় থুথু ফেলে না, এক টুকরা কাগজ পর্য্যন্ত যেখানে-সেখানে ফেলে না, এর জন্য পৃথক পাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। দিনের বেলায় পাইখানায় প্রস্রাব করে কিন্তু রাত্রির জন্য পাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ওদেশে জিনিষপত্র সহজে পচে না বা দুর্গন্ধ হয় না—কোন পাইখানায় কখনও কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না, সরকারী মলমূত্রের পাইখানা গুলিতেও কখন কোন দুর্গন্ধ হয় না। খাদ্য-দ্রব্যগুলিও অনেকদিন পর্যন্ত টাটকা থাকে, এটা ওদেশের হাওয়ার গুণ। খাদ্য-দ্রব্য পেটে গিয়ে কখনও অপাক উৎপাদন করে না, পেটে গিয়ে হজম হবার আগে পচলেই বদহজম হয়, ওদেশে তেমন প্রায়ই দেখা যায় না, সবই বেশ পরিপাক হয়।

ওখানকার খাদ্যদ্রব্যের বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী হয়। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বেশীর ভাগ মাছ, মাংস, মাখম, ফল শস্যাদি এনে এরা খায়। জাহাজে আসতে দু-এক মাস সময় লাগে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাছ, মাংস, ফল প্রভৃতি দ্রব্য জাহাজে আনবার বন্দোবস্তের গুণে ঠিক টাটকার মতই এসে পৌছে। লণ্ডনে থেকে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানের খাদ্য দ্রব্যই ভোগ করতে সুযোগ পেয়েছি।

রন্ধনপ্রণালী যদিও বহুপ্রকার প্রচলিত আছে তথাপি এরা বেশীর ভাগ জিনিষই সিদ্ধ ও পোড়া খায়। পোড়ান ব্যাপারটী আমাদের দেশের মত আগুনের ভিতর দিয়ে পোড়ান নয়, এক রকম পাত্র আছে তার ভিতর রেখে পাত্রটী উত্তাপপূর্ণ উনানের মধ্যে রাখলেই অল্প সময় মধ্যেই পোড়াসিদ্ধ হয়, এতে জিনিষের মৌলিক স্বাদ বৃদ্ধি পায়। নানা জিনিষ মিশ্রিত রান্না এরা পছন্দ করে না. সমস্তই পৃথক ভাবে সিদ্ধ করে। আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটী বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে—খাদ্যদ্রব্যকে যত স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা ক'রে খাওয়া সম্ভব হয় ততই সেই দ্রব্যের প্রকৃত গুণ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। বড় বড় নামকরা হোটেল গুলিতেও এই সিদ্ধ রান্না প্রচলিত।

আমি যখন নিজে রান্না করে খেতাম, তখন আমার বেশী তৃপ্তি হত। আমাদের দেশের মত চাউল, আলু, মটর, মুসুর ডাইল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মাছ, মাংস, দুধ ওখানে কিনতে পেতাম। আমার শরীর ওখানে গিয়ে আট সের বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার শোনা ছিল যে, বিলেতে গেলে স্বহস্তে পাক ক'রে খাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমার রান্না করে খেতে একটুও অসুবিধা হত না। ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে থেকে আমাদের অনভ্যস্ত আহার্য্য খেয়ে অজস্র অর্থব্যয় করেন, তা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হত। আমি লণ্ডনে তাঁদের নিজেদের একটী ছাত্রাবাস করতে অনুরোধ করতাম।

অনেকদিন আগে থেকেই বিলাত যাবার ইচ্ছাটা ছিল, বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন উপলক্ষে ওখানে যাবার ফলে অল্প সময় মধ্যে অনেক দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এই একজিবিশনটি ইংরেজ রাজত্বের এক বিরাট কীর্ত্তি। এখানে সারা জগতের একটা সংক্ষিপ্ত আদর্শ দেখলাম। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বর্ম্মা, হংকং, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু বহু দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি শিখবার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছিল। এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বক্তৃতা, বায়স্কোপ প্রভৃতি নানা বিধান ছিল। প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য, প্রধান প্রধান সহর বন্দরের এক একটা চমৎকার মডেল করা হয়েছিল। এমন বহু বহু মডেল অর্থাৎ স্থানের দৃশ্য মোম, মাটী, মাখম প্রভৃতি দ্বারা এবং চিত্রাদির দ্বারা সাজান দেখেছি যার এক একটার দিকে একঘণ্টা অপলকনেত্রে দৃষ্টিপাত করলেও দেখার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে যায় বই কমে না। এমন মডেল সহস্রের উপর করা হয়েছিল যার এক একটির মূল্য লক্ষ টাকার বেশী। ছয়টী মাস পর্য্যন্ত রোজ এক ঘণ্টা থেকে দেড়ঘণ্টা করে একজিবিশনের নানাস্থান দেখতাম। এ ছাড়া প্রত্যেক দিন প্রত্যেক স্থানে কত নূতন নূতন দ্রষ্টব্য দেখান হত। প্রায় প্রতি রাত্রিতেই আকাশে নানাভাবের এরোপ্লানের খেলা হত। এরোপ্লানে যুদ্ধাদির যখন দৃশ্য দেখান হত তখন মনে এমনই ভীতির সঞ্চার হত যে, এই কৃত্রিম যুদ্ধের কামান গোলা বোমা প্রভৃতির দৈব দুর্ঘটনায় পাছে নিজের প্রাণটি হারাই। আশ্চর্য্য এই যে, শত শত আগুনের কাণ্ডকারখানায় কারো কোন ক্ষতি হয় নাই।

একজিবিশনে ইণ্ডাষ্ট্রি অর্থাৎ শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিংএর জন্য বিরাট বাড়ী করা হয়েছিল; সে সমস্ত আশ্চর্য্য যন্ত্রাদির সুবিস্তার বর্ণনের ছোট সাধ্য নাই?

মোটের উপর দেখলাম—কেমন করে ত্যাজীর জগতে রাজ্য বিস্তার করে প্রভুত্ব করতে হয়, কহ বা করে সারা জগতের শিল্প বাণিজ্য আপন আয়ত্তগকে আনতে হয়, কেমন করে সারা জগতের উপভোগ দর্শন-ভোগ করতে হয়। বিলাত আমার বড় অদ্ভুত লেগেছে। 'রিয়া

আগামী আশ্বিন সংখ্যায় লণ্ডন নগরীর প্রতির প্রধান দর্শনীয় বিষয় গুলির বর্ণন করবার ইচ্ছা রহিল।

সারদেশ্বরী আশ্রম

হিন্দু মহিলাদের জন্য এ পর্য্যন্ত যত প্রকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলায় হইয়াছে, সারদেশ্বরী আশ্রমকে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

১৩১৮ সালে তপস্বিনী মাতাজী গৌরীপুরী দেবী ক্ষুদ্রাকারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমাগত ১২।১৩ বৎসরের চেষ্টায় ইহাকে একটী বৃহৎ মহিলা-আশ্রমে পরিণত করিয়াছেন। এই সঙ্গে একটী বালিকা-বিদ্যালয়ও হইয়াছে।

১৩৩১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ ২৬ নং হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে আশ্রমের নিজস্ব নূতন প্রশস্ত ত্রিতল বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ বাড়ীর চিত্র মাতৃ-মন্দিরে এই সংখ্যার প্রথমে দেওয়া গেল।

আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষা— শ্রীস্বরূপাপুরী দেবী ব্যাকরণতীর্থা। আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী— শ্রীশ্রীগৌরীমা। আশ্রম সম্পাদিকা— শ্রীদুর্গাপুরী দেবী বি, এ, ব্যাকরণতীর্থা।

রকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রী সারদাদেবী হিন্দু রমণী ছিলেন, মাতাজী গৌরীদেবী দেবের শিষ্যা ছিলেন। সারদাদেবী এই প্রতিষ্ঠার জন্য গৌরীদেবীকে উৎসাহ ও দেন। সারদাদেবীর নাম অনুসারে এই মের নামকরণ হইয়াছে।

আমরা এই আশ্রমের কার্য্যবিবরণী হইতে হণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

আশ্রমের উদ্দেশ্য :—

(১) আদর্শ নারীচরিত্র গঠন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে আত্মজ্ঞান জাগ্রত করা।

(২) হিন্দু বালিকা ও মহিলাবৃন্দের হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ও কালোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা।

(৩) সদ্বংশজাতা নিরাশ্রয়াগণকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও সমাজ সেবিকা গঠিত করা।

(৪) নিজেদের (বোর্ডিং ফি ব্যয়ভার বহনক্ষম অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়েদের (বোর্ডিং স্কুলে) রাখিয়া শিক্ষা দান করা।

(৫) প্রয়োজন হইলে নারীগণ যাহাতে শিল্পাদির সাহায্যে সদুপায়ে স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন এবম্বিধ কার্য্যকরী শিক্ষা দান করা।

(৬) সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও সচ্চরিত্র মহিলা কর্ম্মীবৃন্দের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মহিলাসমিতি এবং নারী-শিক্ষামন্দিরের এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা।

কায়মনোবাক্যে সত্যানুসরণ এবং ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া চরিত্র গঠন এবং জ্ঞানানুশীলন করাই এই আশ্রমের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষক অথবা শিক্ষয়িত্রীর চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলে তাঁহার প্রতি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থিনীর শ্রদ্ধার ভাব জাগিতে পারে না। শিক্ষয়িত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন না হইলে এবং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা না থাকিলে সে শিক্ষা কখনও চরিত্র গঠনের সহায়ক এবং পরিণামে শান্তি বিধায়ক হইতে পারে না। এই শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্যই পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিদ্যার্থীকে দ্বাদশবর্ষকাল নিতান্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও দিবারাত্র গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত। ইউরোপ প্রভৃতি দেশেও উৎকৃষ্ট এবং প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি অনেকাংশে আশ্রমাদর্শে (Residential Universities) পরিচালিত হয়, দেশেও পুনরায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যত অধিক প্রতিষ্ঠিত হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই আশ্রম উপরোক্ত সমস্তগুলি আদর্শই যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। হিন্দু বালিকা এবং কুলবালাগণ এই আশ্রমের শিক্ষায় সর্ব্বগুণের আধার হইয়া শান্তিময়ী আদর্শ বধূ ও জননীরূপে এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও জনসেবিকারূপে সমাজের অশেষ বিধ কল্যাণ করিতে পারিবেন—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা ৩৩ জন। তন্মধ্যে ২৭ জন কুমারী, ৫ জন বিধবা এবং ১ জন সধবা। এঁদের মধ্যে ১৪ জন ব্রাহ্মণ, ৪ জন বৈদ্য এবং ১৫ জন কায়স্থ। ১২ জন অভিভাবকের ব্যয়ে আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন এবং অবশিষ্ট সকলের ব্যয়ই আশ্রমের খরচে অর্থাৎ সাধারণের দানে নির্ব্বাহ হয়। ইহাদের মধ্যে নিতান্ত অল্পবয়স্কা (৫।৬ বৎসরের) বালিকাও আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী (প্রেসিডেন্ট) এবং শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী (সম্পাদিকা)ও আশ্রমে বাস করেন।

আশ্রমবাসিনীগণ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করিয়া নিজ নিজ ভাবে ভগবানের নাম জপ, ধ্যান ও স্তোত্র পাঠ করেন। আশ্রমেই ঠাকুর মন্দির আছে। তারপর জলযোগান্তে যাঁর যাঁর পালামত সমস্ত গৃহকর্ম্ম ও অধ্যয়ন করেন। রন্ধন, ঘর-কাপড়-বাসন পরিষ্কার প্রভৃতি আশ্রমের যাবতীয় গৃহকর্ম্ম বালিকাদিগের ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলকেই স্বহস্তে করিতে হয়। আহারান্তে বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বাহিরের মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের কাজ হয়। আশ্রমবাসিনী বয়স্থা এবং শিক্ষিতা নারীগণ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য্য করেন। ছোট মেয়েরা দুপুরে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। দ্বিপ্রহরে ও অপরাহ্নে বালিকাগণ চরকা, তাঁত ও সেলাইর কাজ করেন, বৈকালে সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছামত খেলা অথবা বিশ্রাম করেন। সায়াহ্নে আবার প্রাতঃকালের মত ঠাকুরের নাম হয়। রাত্রিতে রন্ধন, আহারাদি ও অধ্যয়ন সমাপন করিয়া প্রায় ১১টার সময় নিদ্রা যাইবার নিয়ম। কেহ কেহ অধিক রাত্রি পর্য্যন্তও পাঠাভ্যাস করেন। ছোট ছোট মেয়েরা ইহার পূর্ব্বেই নিদ্রা যাইয়া থাকে।

অবসর মত এবং ছুটির দিনে শ্রীশ্রীমাতাজীর নিকট বালিকাগণ সৎকথা শ্রবণ করেন, কেহ বা সদ্গ্রন্থ পাঠ করেন। সময় সময় তাঁহাদিগকে লইয়া কোথাও ঠাকুর দর্শনে অথবা প্রসিদ্ধ দর্শন-যোগ্য স্থানে যাওয়া হয়। কোনও বালিকার অসুখ হইলে বয়স্থারা অক্লান্তভাবে তাহার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন প্রকৃতির বালিকাগণ এখানে যেন এক বৃহৎ শান্তিময় পরিবারের মা-বোনের মত মনের আনন্দে বাস করেন।

ঝগড়া, হিংসা, লোভ, বিলাসিতা, পরনিন্দা বা বাজে কথা তাঁহাদের মধ্যে নিতান্তই বিরল।

আশ্রমে বালিকাদিগের সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় ও উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আশ্রম হইতে (প্রাইভেট ভাবে) শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী ব্যাকরণতীর্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন, শ্রীমতী সুতপা দেবী সংস্কৃত পরীক্ষায় ব্যাকরণতীর্থা উপাধি (Government Title Examination) লাভ করেন। শ্রীমতী সুতপা দেবী বেদান্তের "মধ্য" এবং শ্রীমতী স্বরূপা দেবী বেদান্তের "আদ্য" পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া ৮০৲ বৃত্তি পাইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বেদান্তের "উপাধির" জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত ৫ জন কুমারী সাংখ্য পড়িতেছেন ও ৩ জন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আশ্রমবাসিনী কয়েকজন কুমারীর কয়েকটী প্রবন্ধ এবং কবিতা ৩।৪ খানা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রমে ৩ খানা তাঁত, ১২।১৩টী চরকা, ৩টী সেলাইএর কল (Sewing Machine) এবং অন্যান্য নানাপ্রকার শিল্প চর্চ্চার বন্দোবস্ত আছে। বালিকারা চরকায় সুতা কাটেন। তাঁতে কাপড়, জামার ছিট, তোয়ালে ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। কাট ছাট সেলাইএর (দর্জ্জির) কাজও ইঁহারা বেশ শিখিয়াছেন এবং ফরমায়েস মত নানাপ্রকার (স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ব্যবহার্য্য) জামা তৈরী করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী ও আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে আশ্রম-বালিকাগণ দুইটী কোট উপহার দিয়াছেন। এই কোটের সুতা (অধিকাংশই) আশ্রমের চরকায় বালিকাদের হাতে কাটা, আশ্রমের তাঁতে মেয়েদের হাতে বোনা, তাহাদেরই হাতে রং (dying) করা এবং কাট ছাট সেলাইও তাহাদের হাতে করা। উল, ভেলভেট এবং লেসের কাজও ইঁহারা করিয়া থাকেন। এই দুই বৎসরে শিল্প বিভাগে ২৮৮৶৫ পয়সার জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে। টাকার সুবিধা হইলে অন্যান্য প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

সহরের অনেক ভদ্র মহিলা প্রায়ই আশ্রমের ঠাকুর মন্দির, শ্রীশ্রীমাতাজী এবং আশ্রম কুমারীদিগকে দেখিতে ও তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিতে আসিয়া থাকেন। আশ্রমের আদর্শ এবং কার্য্য প্রণালী জানিবার জন্যও অনেক বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এখানে আসিয়া এবং পত্রদ্বারা উপদেশ লইয়া থাকেন।

আমরা এই আশ্রমের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। যাঁহারা আদর্শ হিন্দুমতে কন্যাকে শিক্ষা দিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা এই আশ্রমের সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিই।

হৃদয়হীনা

(ছোট গল্প)

শ্রীমতী সুনীতিপ্রভা দেবী।

সে ছিল শিশুকাল অবধিই চিররোগী। বয়স যদিও তার ষোল পার হয়েছিল তবু যৌবন-সুলভ লাবণ্য তার দেহে ছিল না। তার মুখে এমন একটা বিষণ্ণ ভাব, এমন একটা ম্লান সৌন্দর্য্য ছিল যা নাকি মানুষের মনে একটা করুণার ভাব জাগিয়ে তুলতো। একবার তার মুখের দিকে চাইলে আর একবার ফিরে না তাকিয়ে পারা যেতো না। স্থানীয় মেয়েস্কুলের থার্ডক্লাশে সে পড়তো। নীচের ক্লাশ থেকে এ পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদাই ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হয়ে এসেছে। প্রত্যেকবারই সে একটা না একটা প্রাইজ্ পেতোই। সবাই একটু অবাক হয়ে যেতো অদ্ভুত মেয়েটার এই কৃতিত্বে।

মুখে তার হাসি ছিলই না। তার ক্ষীণ দেহখানার পানে চাইলে মনে হতো সে যেন আর কিছুতেই তার এই রুগ্ন জীবনটার ভার বইতে সক্ষম হচ্চে না। ক্লাশে সব সময় বইএর দিকে মুখ করে সে বসে থাকতো, কারো সঙ্গে বড় একটা কথা কইতো না। টিফিনের সময় যখন মেয়েরা ছুটোছুটী লুটোপুটি খেলা করতো, সে তখন অনেকটা দূরে চুপ করে একলাটী বসে থাকত। কেউ যদি সে সময় তার পিছনে এসে চুপটী করে দাঁড়াত, তাহলে দেখতে পেত সে যেন আপন মনে গুণ গুণ্ করে কি গাইছে আর দুই চোখ বেয়ে তার জলের ধারা পড়ছে। হয় ত অমনি কেউ একটু সহানুভূতির সুরে তার কাঁধে হাতখানা রেখে জিজ্ঞাসা করতো "কি গান গাচ্ছিস্ বল্ না ভাই রাণী"। সে চমকে উঠে তার কষ্ট-আনা ম্লান হাসিটুকু হাঁসিয়া মিনতি ভরা চোখে তাদের পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত। তার চোখের ইঙ্গিত যেন তাদের বলতো "কেন ভাই তোরা এমনি করে আমার বুকের লুকান ব্যথা, যা নাকি আমারও জানা নেই তা জিজ্ঞেস করে আমায় বিব্রত করিস্?" প্রশ্নকারিণী তখন একটু লজ্জিত, একটু বিরক্ত হয়ে চলে যেত। এমনি করেই তার দিন এই আনন্দময় বিশ্বের মাঝে চির নিরানন্দে কাটছিল।

তার পর একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল মোটামুটি লেখাপড়া জানা একটী সচ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে। তার এই রুগ্ন দেহখানা বিয়েতে বাধা দিতে পারলে না। যাক্, শ্বশুর-শাশুরী পাঁচজনের ঘরেই সে পড়েছিল। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই যদিও তার রূপ দেখে খুব সুখী হয়নি তবু তার প্রাণপণ সেবা-যত্ন ও বিনীত ব্যবহারে তারা অনেকটা মুগ্ধ হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল বোধ হয় তার সেই করুণাভরা কাতর চাহনি। সে শুধু নীরবে সবার আদর যত্ন আহরণ করে যেতো, কৃতজ্ঞতা স্বীকার মুখ ফুটে করতে পারতো না। সংসারের কাজ কর্ম্ম তাকে বেশী করতে হত না, তবু এক ঘর থেকে আর এক ঘরে হেঁটে যেতেই তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত, বুকটা কেঁপে উঠত—এমনি অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল দেহ ছিল তার।

একদিন তার স্বামী অরুণ বাড়ী এলো। বেচারার বিয়ের পরে স্ত্রীর সঙ্গে তিন-চার দিনের দেখা, তারপর চলে গিয়েছিল দূরদেশে কর্ম্মস্থলে। স্ত্রীর ভালবাসা সে মোটেই উপভোগ করতে পারেনি, তাই কুড়ি দিনের ছুটী নিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এসেছিল স্ত্রীর প্রেমভরা বুকের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু এসে যা সে দেখলে তাতে বুঝতে পারলে যে, অনেকটা নিরাশ হয়েই তাকে

ফিরে যেতে হবে। স্ত্রীকে যখন সে কাছে টেনে আনতো সে তার শিথিল দেহখানা এগিয়ে দিত বটে কিন্তু সে যেন একটা আগ্রহশূন্য ভাবে। আসতে হবে তাই যেন সে আসতো। যখন অরুণ সোহাগ ভরে তার শীর্ণ গাল দুটী চুম্বনে লাল করে দিত তখন সে ছোট্ট একটু "আঃ" বলেই মুখখানা ফিরিয়ে নিত অসীম বিরক্তি ভরে। এর বেশী জোর অরুণ তার স্ত্রীর কাছে করতে পারতো না। তার সেই মিনতি ভরা চাহনিতে অতি বড় পাষাণের প্রাণেও যে দয়া আসে! নীরবেই সে রয়ে যেত, তবু মুখ ফুটে বলতে পারতো না "ওগো আমার এই অকর্ম্মণ্য দেহ যে প্রতিদান দিতে পারে না।" যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা অরুণ কিছুতেই দমন করতে পারতো না। সে যা চাইতো তা পেতো না, তাই তাঁর সুপ্ত রসনা যেন আরো জাগ্রত হয়ে উঠতো। তখন দয়ার সঙ্গে বিরক্তি আসত, আপন মনে সে বলতো "কেন সে এটুকু দিতে পারে না আমার দু'দিনের জন্য, আমি তো আর সারা বৎসর ভরে চাইবো না। বেশী কিছু চাই না ত, শুধু দুটী মুখের কথা।"

একদিন সে রাত এগারটা পর্য্যন্ত রাণীর অপেক্ষায় ঘরে পায়চারী করছিল। অনেকক্ষণ পরে দেখতে পেল সে রাণী আসছে, কিন্তু অন্য দিনের চেয়ে আজ তার মুখে আরো কালিমা মাখা, আরো বিষণ্ণ ভাব। সমস্ত মনটা তার তিক্ত হয়ে উঠল, ছুটে গিয়ে সে তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় ছিলে এতক্ষণ রাণী?" রাণী একটু থমকে গিয়ে তার সরল সহজ দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে তার পানে চাইলে, তারপর ধীরে ধীরে বললে "যাইনি ত কোথাও, ভাল লাগছিল না তাই বাইরে বসে ছিলুম।" অরুণ একটু অধীর ভাবে তার হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললে "রাণী, আমার সঙ্গে তোমার এমন ব্যবহার কেন, উঃ কি হৃদয়-হীনা তুমি! আমাকে কি ভালবাসতে পার নি? আজ আমি শেষ কথা শুনতে চাই।" বালিকার হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল—কিছু বলবার শক্তি তার ছিল না, একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সে অরুণের কোলে লুটিয়ে পড়ল। তারপর অরুণের চীৎকারে সবাই যখন জড় হলো তখন দেখতে পেলো সে হার্ট ফেল করেছে, তার সংজ্ঞাহীন দেহখানাই কেবল পড়ে রয়েছে।

সে যে সত্যিকার হৃদয়হীনা ছিল না, একটু অনুভূতি যে তার হৃদয়ে ছিল তা সে সেদিন দেখিয়ে দিয়ে গেল।

অকিঞ্চিৎ

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

কোরকে রুদ্ধ পরিমল কাঁদি কহে
পথ দাও হায় পথ দাও মোরে ছাড়ি,
দখিণ পবন বহিছে মৃদুল মর্ম্ম
মঞ্জরী কাণে শর্ত্ত গীতি গুঞ্জরি!
মাধবী মুকুল হের বেয়াকুল জাগে
চিরনিশা তোর অবসান অবসান;

এল ঋতুপতি হিরণ হরিৎ রাগে
ভূলোকে দ্যুলোকে পুলকে উছলে তান।
বাজায়ে পিণাক এল বৈশাখ চণ্ড
পলকে,—ঝলকে ছলকে বহ্নিধারা
বহিল ঝঞ্ঝা—শুষ্ক পেলব গণ্ড
লোটে ফুল ভূমে ছিন্ন, বৃন্তহারা।

গ্রন্থ-আলোচনা

নারীমঙ্গল—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রবর্ত্তক অরবিন্দের ভাবধারা লইয়া কর্ম্মজগতে নামিয়াছেন। ইঁহারা নিত্যই নূতন সত্যধারা জগৎকে দিয়া আসিতেছেন। নারীমঙ্গল পুস্তকখানির ভিতর দিয়া নারীজাতির পক্ষের বর্ত্তমান সময়োপযোগী অনেক নূতন ধারা দিয়াছেন। পুস্তকখানি সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল নরনারীর আলোচনার বিষয়। আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে, এই পুস্তকখানি আমাদের মাতৃ-মন্দিরের সুরের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। আমরা এই পুস্তকখানির প্রত্যেক বাক্যটি অনুমোদন করি। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

সতীত্ব-মাহাত্ম্য— শ্রীমতী কমলাসনা দেবী প্রণীত। সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা প্রভৃতি কয়েকটি নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট অতি নিপুণভাবে অঙ্কন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। মেয়েদের উপহার দিবার জন্য বাজে উপন্যাসাদির পরিবর্ত্তে এইরূপ পতিভক্তি-শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ দেওয়া বিশেষ কল্যাণকর। ছাপা কাগজ চমৎকার। মূল্য মাত্র ছয় আনা। লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ—কিরাত-অর্জ্জুন, স্বর্গারোহণ, সুভদ্রা। প্রাপ্তিস্থান—মণ্ডল লাইব্রেরী লিঃ, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা।

সংস্কার ও সংগঠন—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস প্রণীত। গ্রন্থকার বাংলার কয়েকটি জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবার সময় পল্লীর দুরবস্থা চিন্তা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন, তাহারই ফলে পল্লী সংস্কার ও সংগঠন সম্বন্ধে অতি আবশ্যক বিষয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থকার একস্থলে বুঝাইয়াছেন—শুধু গভর্ণমেণ্টের সুব্যবহার পল্লীর সংগঠন হইতে পারে না—যদি পল্লীবাসীদের প্রাণে জাগরণের সাড়া না পাওয়া যায়। সুতরাং পল্লীবাসীগণকেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজ পল্লী সংস্কারে ব্রতী হইতে হইবে, তাহারই ফলে বাহিরের সাহায্য হইতে তাহারা শক্তি পাইবেন। গ্রন্থে পল্লীর ধনবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা বিস্তার, সালিসী নিষ্পত্তি, আনন্দউৎসব প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ের সুন্দর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের ইউরোপ ও জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা গ্রন্থখানিকে আরও সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে। আমরা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই গ্রন্থের শুভ প্রভাব দেখিতে আশা করি। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

হরনাথ চরিতামৃত—কবিরাজ সত্যচরণ সেন প্রণীত। হরনাথ বাঁকুড়া জেলা বাসী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ সন্তান হইয়াও উচ্চ অঙ্গের সাধক। আমরা তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তৃপ্ত হইয়াছি। তবে আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার তাঁহাকে চৈতন্যদেবের পুনরাবির্ভাবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রন্থের নামকরণেও তাহার আভাস রহিয়াছে। বর্ত্তমানে জীবিত লোকের প্রতি ভগবানত্ব আরোপ করা গ্রন্থলেখক ভক্তের পক্ষে সম্ভব হইলেও সাধারণে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না। পুরীধামে হরনাথের আশ্রম আছে, ভক্তগণসহ সেখানে গিয়া মাঝে মাঝে তিনি উৎসবাদি করিয়া থাকেন। এই শক্তিশালী সাধুপুরুষের জীবনী পাঠ কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল্য ১৲ টাকা।

অপরিণীতা—উপন্যাস। লেখক—শ্রীবিজয়গোপাল বক্সী, প্রকাশক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র, ৬২ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার এই পুস্তকে আধুনিক বঙ্গসমাজের একখানি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা শশিভূষণের দুঃসাহস, আদর্শ কন্যা সন্ধ্যার আজীবন কুমারী থাকিয়া দেশকল্যাণে আত্মনিয়োগ, পণপ্রথা-উচ্ছেদকারী, দেশহিতব্রতী; উচ্চ শিক্ষিত যুবক যতীনের মহৎ অন্তঃকরণ—সবই অতি সুন্দরভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে। পুস্তকখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষার কিছু কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে; আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিবেন। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর। উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী।

অশ্রুকণা—শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন সরকার প্রণীত। কবিতার বই। বইখানি কবির প্রথম উদ্যমের ফল বলিয়াই মনে হইল। কবিতাগুলির ভিতর ভাবের দৈন্য নিতান্ত না থাকিলেও ভাষার দোষ খুবই রহিয়া গিয়াছে, কবিত্বেরও বিশেষ অভাব, ছন্দ নাই বলিলেই চলে। রচনাকে ছাপার অক্ষরে দেখিবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে লিখিয়া যাওয়া দরকার। যাই হউক কবি সাধনা করিয়া যাউন, ভবিষ্যতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

একটি নবজাত শিশুর প্রতি

শ্রীঅমিন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ।

কোথা হতে এলি তুই,
গিয়েছিল কে তোরে ডাকিতে ;
সব কাজ ফেলে থুয়ে
সেধেছিল কে তোরে আসিতে !
কার গানে ভেসে এলি,
স্পর্শে কার উঠিলি রে জাগি
জীবনের কচি বৃন্তে
কোন নব প্রভাতের লাগি !
কণ্ঠে তোর কোন বাণী,
আঁখি-কোণে স্বর্গের সন্দেশ,
নন্দনের শোভা কিরে
নিয়ে এলি করিয়া নিঃশেষ !
হে নব অতিথি আজি
কি দিয়া করিব অভ্যর্থন,
কোন মন্ত্রে ডাকি লব
কোন মন্ত্রে করি আবাহন !
হেথা সব আধা আধি,
পুরে না'ক একটী কামনা ;
হাসি অশ্রু মেশামিশি,
আলো আর ছায়ার রচনা !
হে বিদেশী ! তবু আজ
সব গান সব হাসি দিয়ে
লব তোমা সুপ্রভাতে
আমাদের কুটীরে বরিয়ে।
সব দুখ সব কাঁটা
শেষ হ'ক আমাদের দিয়ে
এস তুমি নব প্রাতে
নব যুগ নব মন্ত্র নিয়ে।
সেদিন আকাশ হ'ক
চির নীল প্রসন্ন উজ্জ্বল,
সেদিন যমুনা গঙ্গা
প্রেমাধার বহুক নির্ম্মল।
আর হ'ক ভাই বোন
জগতের যত নরনারী,
এস তুমি শুভ্র দুটি হাতে
লৈ অমৃত বারতা বিথারি !

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ

গত ৬ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। সামান্য কয়েকদিনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুরেন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত দেশসেবার জন্য যতখানি করিয়াছেন ততখানি করিয়া উঠা এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

লর্ড কর্জ্জনের সময় বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ সিংহ-বিক্রমে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে স্বদেশী যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই হইতেই বাঙ্গালী যুবকের প্রাণে এক নব জাগরণ আসিয়াছে. কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন সুরেন্দ্রনাথেরই সাধনার ফল, স্বদেশী আন্দোলন ও নব বাঙ্গলার মুখপত্র স্বরূপেই তিনি "বেঙ্গলী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করেন। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে বাঙ্গলা যে সাড়া দিয়াছে, তাহা সেই স্বদেশী যুগেরই প্রভাব।

স্বদেশী যুগে গরম দল বলিয়া একটি উগ্র স্বদেশী দল সারা বাঙ্গলায় প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারায় বহু সাধারণ কর্ম্মে সুরেন্দ্রনাথ যোগ দিবার সুযোগ পান নাই। যাহাই হউক, তাঁহার জীবনের মধ্য সময়ে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গলাকে অনন্তকাল শক্তি যোগাইবে।

———

নানা কথা

সহরে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য—

সম্প্রতি কলিকাতায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগের প্রবল প্রকোপ দেখা যাইতেছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার অনেক বেশী। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা বলেন যে, এই মহামারী প্রসারের জন্য অবরোধপ্রথা অনেক পরিমাণে দায়ী। নারীগণকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য হিন্দু মুসলমানগণ ছোট ছোট গলির ভিতরে বাড়ী করিতে বাধ্য হন। যে সকল বাড়ীর ভিতরে আলো, বাতাস ঢুকিতে পায় না, প্রায়ই সে সকল বাড়ী স্যাঁতসেতে হয়। ইহা যক্ষ্মা রোগের একটী প্রধান কারণ।

হিন্দু-ব্রাহ্মে বিবাহ—

বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রজমোহন কলেজের প্রফেসারের পদ ত্যাগ করতঃ কলিকাতা গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার কন্যা বরিশালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইনি পাত্রী। পাত্র—বরিশালের ডাক্তার ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। এঁরা হিন্দু।

বিবাহের সময় সতীশবাবু বরিশাল ছিলেন না—তাঁহার ভ্রাতা যতীশবাবু সম্প্রদানকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বিবাহ সম্পূর্ণ হিন্দুমতে হইয়াছে—শালগ্রামশিলা সমক্ষে পুরোহিত ঠাকুর সংস্কৃত মন্ত্র দ্বারা বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়াছেন।

হিন্দু-সমাজ আজ কাল উদার; অতএব ক্ষীরোদবাবুর কোনও বিশেষ বাধা পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ যাবৎ ব্রাহ্ম-বালিকা বিবাহ করিতে গিয়া অনেক হিন্দু-যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে—এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম-বালিকা হিন্দু বরকে বিবাহ করিবার জন্য হিন্দুসমাজে উত্থিত হইলেন। ইহাও একটী অভিনব ব্যাপার। (বরিশাল-হিতৈষী)

দুর্নীতির প্রসার বন্ধ করিবার চেষ্টা—

আমরা কলিকাতা ভিজিল্যান্স এসোসিয়েসান বা প্রহরী সমিতির ১৯২৪-২৫ সালের বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম। এই সমিতি একটী প্রধান উদ্ধারাশ্রম, বালিকাদের জন্য একটী আশ্রম ও শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য প্রায় সাড়ে বার হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আমরা আশা করি হিন্দু সমাজের কর্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে অগ্রণী হইবেন।

অদ্ভুত পুরুষ—

হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ, আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমির এক প্রান্তে এক জাতীয় লোক বাস করে, তাহাদের পুরুষগুলি সব নারী অর্থাৎ আমাদের দেশের মেয়েদের মত অন্তঃপুরবাসী। তাহারা এক গা গহনা পরে, ঘোমটা দিয়া গৃহস্থালীর কার্য্যাদি করে, মেয়েদের কাছে তাহারা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতি। মেয়েরা ঘোড়ায় চড়িয়া ইচ্ছামত যাতায়াত করিয়া বাহিরের সমস্ত কার্য্যাদি করে, মেয়েরাই পুরুষ জাতির অভিভাবক। কুমারীরা ভিন্ন গ্রামে গিয়া মনোমত যুবক সন্ধান ও মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করে।

বিলাতী চুড়িতে বিপদ—

সকলে বোধ হয় অবগত আছেন, বাজারে এক প্রকারের বিলাতী গালার পেঁচের চুড়ি উঠিয়াছে। ঐ চুড়ি বড় মারাত্মক, অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। সম্প্রতি ঐ চুড়ির প্রচলন এত হইয়াছে যে, কি ভদ্র কি ইতর সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে ঐ চুড়ি হাতে পরিয়া রান্না করিতে গেলে কত বিপদ। ঝিনাইদহ থানার অন্তর্গত সাগান্না গ্রামে কাপালীদের একটি স্ত্রীলোকের হাতে ঐ চুড়ি ছিল, রন্ধন করিতে গিয়া অগ্নি সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে ও হাত পুড়িয়া যায়। তাহার হাতের ঘা খুবই মারাত্মক হইয়াছে, কতদিনে সারিবে বলা যায় না। এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া চুড়ি খরিদ করিবেন।

বিধবা-বিবাহ—

গত ২৩শে বৈশাখ কেশিয়াড়ী থানার জামদী গ্রামে ৺মহেন্দ্র নাথ মাকুড়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী থাকমণি দাসীর সহিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র খিলার শুভ পরিণয় সাধিত হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই গোপ জাতীয়। পাত্রীটি ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল, এখন তাহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র।

হিন্দু-রাজপরিবারে বিধবার কার্য্য—

কোলাপুরের মহারাজার বিধবা ভ্রাতৃবধূ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন।

বিলাতে ভারতীয় মহিলার নার্স শিক্ষা—

গত ২৭শে মে লেডি রেডিং লণ্ডনের এলিজাবেথ গ্যারেট এণ্ডারসন হাসপাতাল পরিদর্শন কালীন দেখিলেন যে, দুইটী

ভারতীয় মহিলা য়োগীশুশ্রূষা বিদ্যায় শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছে। তাঁহাদের নাম মিস্ মৌলাবক্স ও মিস্ লেভিনা মেমা।

বাঙ্গালী লেখিকার মৃত্যু—

বরিশালের ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ যে, 'গীতিপুষ্প'গুলি' ও অন্যান্য গীতি কবিতা ও গল্পের লেখিকা সরোজবাসিনী গুপ্তা গত ২২শে জুন ৩৩ বৎসর বয়সে তাঁহার ঝালকাটির বাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১২ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়ার দুই বৎসর পরেই চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বিধবা হন।

বেশান্তের বিলাতযাত্রা—

ভারতের প্রজাতন্ত্র বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে শ্রীমতী আনি বেশান্ত বিলাত যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার বিদায় সম্বর্দ্ধনার্থে মান্দ্রাজে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উহাতে সকল রাজনীতিক দলের লোক উপস্থিত ছিলেন।

রাণী নিরুপমা দেবীর বিবাহ-বিচ্ছেদ—

কুচবিহারের ঈশানীশ্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী তাঁহার স্বামী প্রিন্স ভিক্টর জিতেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে বিবাহ-বন্ধন ছেদের মামলা করিয়াছিলেন। স্বামী রাণীর প্রতি এমনই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন যে মনোকষ্টে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। রাণী আদালতে ইহাও প্রমাণ করেন যে, স্বামী অন্য কয়েকটী রমণীর সহিত ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট ছিলেন।

জজ বাহাদুরের আদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ সাব্যস্ত হইয়াছে। রাণী এই মামলার খরচাও প্রিন্স ভিক্টরের নিকট হইতে পাইবেন। রাণী অতঃপর প্রিন্স ভিক্টরের নিকট হইতে মাসিক চারিশত টাকা নিজ খরচ জন্য পাইবেন।

আমরা রাণী নিরুপমা দেবীর নির্ম্মল দেবোপম চরিত্রের বিষয় বিশেষ অবগত আছি। তিনি নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই আদালতের স্মরণাপন্ন হইয়া এ কার্য্য করিয়াছেন। এমন মহিয়সী নারীর ভাগ্যে স্বামী-বিচ্ছেদ ভগবান কেন লিখিলেন?

রাণী নিরুপমা দেবীর সম্পাদিত "পরিচারিকা" পত্রিকা, তাঁহার রচিত "ধূপ" নামক গ্রন্থ তাঁহার জীবনের মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ইংরেজ-মহিলাদের ভারতীয় রুচি—

লণ্ডনে গত বৎসর বৃটিশ এম্পায়ার প্রদর্শনীতে কিনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের বীণাপাণি-শাঁখা প্রভৃতি অলঙ্কার ইংরেজ মহিলাগণ খুবই কিনিয়াছিলেন, স্পেনের মহারাণী পর্য্যন্ত কিনিয়া নিজে পরিয়াছিলেন। এই বৎসরও ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র নন্দীর তত্ত্বাবধানে উক্ত প্রদর্শনীতে বহু পরিমাণে অলঙ্কার বিক্রয়ের জন্য গিয়াছে। একটা কৌতুহলের বিষয় এই যে, হাতে তাগা পরা একরূপ ভারতে শিক্ষিত সমাজ হইতে কমিতেছে কিন্তু ইউরোপে তাগার প্রচলন বাড়িয়া চলিতেছে। বীণাপাণি শাঁখার পরিবর্ত্তে বীণাপাণি-আর্মলেট (তাগা) সেখানে অধিক বিক্রয় হইতেছে। এবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মহিষী কুইন মেরী বীণাপাণি-আর্মলেটের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ-সমিতি—

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ-সমিতির কার্য্যকারী সম্পাদক ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় লিখিতেছেন যে, অনেকগুলি উচ্চশিক্ষিত যুবক ও বিপত্নীক হিন্দুমতে বালবিধবাদিগের পাণিগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ৩ জন ব্রাহ্মণ যুবক (একজন ছাত্র, দুইজন অফিসার); ২ জন ক্ষত্রিয় (একজন ডাক্তার, অন্যজন ব্যবসায়ী) ৫ জন কায়স্থ (একজন অধ্যাপক, উকিল ও বিখ্যাত ইংরাজি সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, একজন প্রিণ্টার, অন্য তিনজন অফিসার) এবং ৩ জন মাহিষ্য যুবক—ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব বর্ণানুসারে হিন্দুমতে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এতজ্জন্য সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন যে, যাঁহারা হিন্দুমতে বালবিধবাদিগের বিবাহ দিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা ১২৬ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা এই ঠিকানায় ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন। পত্রাদি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে আহ্বান প্রদান হইবে।

বিবাহে অসমর্থতায় কুমারীর আত্মহত্যা—

গত ১২ই আষাঢ় গৈলা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা কেরসিন তৈল গায়ে দিয়া আত্মহত্যা করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে মুক্তি দিয়াছে। দগ্ধ অবস্থাতে সে তিন চারি ঘণ্টা জীবিত ছিল সে সময় সে তাহার মৃত্যুর যে করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছে তাহার অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় অতিশয় দরিদ্র, সুপাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না, বহু কষ্টেও টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার এই অবস্থা দর্শনে কন্যার মনে জীবনের প্রতি ধিক্কার আইসে উক্ত দিবস সে নিজেকে অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া পিতাকে সকল চিন্তা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছে।

উপযুক্ত পাত্রের অভাবে কন্যাগণের বিবাহ কান্ত রাখিয়া তাহাদের কুমারী-জীবন যাপন হিন্দু-সমাজে গ্রহণীয় হইতে পারে কিনা সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকুন অবস্থা দিন দিন ভীষণ হইয়া উঠিতেছে যে!

পরলোকে হিরণ্ময়ী দেবী—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী গত ১৩ই জুলাই তাঁহাদের বালিগঞ্জস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি বরাবরই দেশের নানাপ্রকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বালিগঞ্জস্থ মহিলা-শিল্পাশ্রম তাঁহারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় এবং তিনিই ইহার সম্পাদিকা ছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। অনেকদিন তিনি সুপ্রসিদ্ধ ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকার কার্য্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

চরকায় সূতা কাটা—

মেদিনীপুর জেলার তমলুক নিবাসী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সহস্তে চরকায় সূতা কাটিয়া তের খানি কাপড় তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছেন। ঐ বাড়ীর শ্রীমতী কমলা দেবী সংসারের সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া অবসর-সময়ে সূতা কাটিয়া তিনখানি এবং বাড়ীর একজন পরিচারিকা সহস্ত-নির্ম্মিত সূতায় একখানি কাপড় প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছেন।

এ সংবাদে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাংলার মা-বোনদের আমরা এই আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

নারী

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ।

বিশ্বের 'সৌন্দর্য্যরাশি মথি' ধীরে অয়ি নারী, হে বিশ্ববন্দিতা,
পুষ্পের কোরক-সম সৃষ্টিমাঝে এলে তুমি হে অবগুণ্ঠিতা,
নন্দন-মন্দার-গন্ধে সুরভিত হ'য়ে গেল চঞ্চল বাতাস
অপরূপ সুষমায় দীপ্ত হ'ল নিখিলের শুভ্র নীলাকাশ!
স্রষ্টার বিমুগ্ধ আঁখি অনিমিখ চাহি হ'ল আনন্দ মগন
হৃদয়ের অন্তস্তলে উচ্ছ্বসিল আনন্দের মৃদুল কম্পন,
সে ছন্দের মূর্চ্ছনায় তব দেহ মন ধীরে উঠিল বিকশি'
সুন্দর-প্রতিমা তাই, আনন্দের নির্ঝরিণী তুমি হে উর্ব্বশী!
তাই তুমি প্রতি ক্ষণে প্রকাশিছ সুন্দরের আনন্দ-মূরতি—
হাসে, লাস্যে, প্রেমে, স্নেহে রাঙাইছ মানবের জীবন-আরতি!
শৈশবের ক্রীড়া মাঝে কলহাস্যে ভরি দেছ পিতৃ-মাতৃ-গেহ,
কৈশোরের অন্তস্তলে যৌবনের ফল্গুধারা দেখেছে কি কেহ?
যৌবনেতে প্রেম দিয়ে সঞ্জীবিত করিয়াছ পতির পরাণ,
দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে রিক্তা করি আপনারে করিয়াছ দান;
প্রেমের সুষমা দিয়ে হরিয়াছ ধরণীর আঁধার-রজনী,
একনিষ্ঠ প্রেমে তুমি পতি মাঝে বিশ্বনাথে হেরিলে আপনি।
বার্দ্ধক্যে মাতৃত্ব ভারে লুটাইছ আপনার দেহলতা-খানি
স্নেহের পীযূষ-ধারে সন্তানেরে বাঁচাইলে হে মুগ্ধা জননী!
কত মূঢ় কত ভাবে অকথা কুকথা কত কহিয়াছে জানি,—
আমি জানি তুমি কন্যা, তুমি ভগ্নি, ভার্য্যা, মাতা, হে চিরকল্যাণী!

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তা ছাত্রীগণের তালিকা

(১৯২৫)

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী হাই—

মৈত্রেয়ী রায়	...	২০৲
কণকলতা চৌধুরী	...	১৫৲
শোভাময়ী রায়	...	১৫৲
সন্ধ্যালতা সরকার	...	১৫৲
কিরণবালা বসু	...	১০৲
বগলাসুন্দরী রায়	...	১০৲
সুহাসিনী দাশ গুপ্ত	...	১০৲

ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসন—

লক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী	...	১০৲

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—

কমলরাণী চক্র	...	১৫৲
বীণাপাণি চক্র	...	১৫৲
কণিকা দাশ গুপ্ত	...	১০৲
সুরমা দত্ত	...	১০৲
সুবর্ণ ঘোষ	...	১০৲

বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয়—

নলিনী বসু	...	১০৲

চট্টগ্রাম ডাঃ খাস্তগির হাই—

মুক্ত দত্ত	...	১০৲

বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা

(১৯২৫)

অনার্স, ইংরাজী—

এডনা উইংগাটনার (১ম বিঃ)	লরেটো হাউস
ম্যাকলারেন মার্গারেট (১ম বিঃ)	,,
জুলিয়া স্মিথ (২য় বিঃ)	,,
মেরী এন্টোনি (২য় বিঃ)	,,
সুফলা রায় (২য় বিঃ)	বেথুন কলেজ
আইরিন এস্ মিত্র (২য় বিঃ)	,,

অনার্স, ফিলজফি—

বাণী চাটার্জ্জী (১ম বিঃ)	বেথুন কলেজ

বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণা—

লাবণ্যপ্রভা দাশ	নন-কলিজিয়েট
ফজিলতন্নাসা	,,
নীহারবালা ঘোষ	বেথুন কলেজ
শান্তিবালা সিংহ	,,
লাবণ্য দত্ত	,,
সুষমা গুপ্ত	ডায়োসেসন

পাস্-কোর্স—

প্রভা বসু	নন-কলিজিয়েট
সরোজবালা চক্রবর্ত্তী	নন-কলিজিয়েট
এফ্ ডিঙ্গার	,,
কল্যাণী গুপ্ত	,,
সুমতিবালা রায়	,,
হিমাংশুপ্রভা শিকদার	,,
প্রভাসনলিনী দাশ	বেথুন কলেজ
প্রভাসনলিনী দাশগুপ্ত	,,
সুরমা দত্ত	,,
জ্যোৎস্নাময়ী লাহিড়ী	,,
সাধনা মিত্র	,,
লাবণ্যপ্রভা মল্লিক	,,
মৃণালবালা নন্দী	,,
প্রতিমা সেন	,,
শোভনা সরকার	,,
শান্তিলতা দাশগুপ্ত	,,
পুষ্পকেশী মহান্তী	,,
নীহারবালা হল্দো ডরোথি	ডায়োসেসন
ফ্রাঙ্কলিন ড্রিলসিবন	,,
সরোজবালা হাজারিকা	,,
বজবালা মণ্ডল	,,
লতিকা রুদ্র	,,

৩য় বর্ষ } আশ্বিন—১৩৩২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

এস মা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

মা শক্তিরূপিণী, সন্তানের যত দুর্ব্বলতা, যত অযোগ্যতা সবই তুমি জান। সন্তান যতই দুর্ব্বল হ'ক, যতই অযোগ্য হ'ক তোমার পূজার অধিকার তার আছে—এই ভরসা নিয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমাদের প্রাণে আশা দাও, বল দাও।

হে শিবে কল্যাণরূপিণী, সর্ব্বদাই আমরা কুভাবের মধ্যে ডুবে রয়েছি, আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তা ঠিক করতে আমরা নিতান্তই অক্ষম, তুমি মঙ্গলাধার—আমাদের মঙ্গল কর।

জননী, তোমার অভাবে আমাদের অন্তররাজ্যে দিন দিন অসুরের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে উঠছে, আমরা ভীত চঞ্চল হয়ে পড়েছি, আমাদের জীবন দুর্ব্বহ—অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তুমি আমাদের শান্তি দাও।

যেখানে তোমার অভাব সেইখানে দুর্ব্বলতাও পরাধীনতার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বাহিরে অনাচারে অত্যাচারে ঘিরে রয়েছে, আমাদিগকে এ সকল হ'তে উদ্ধার কর।

ঐ দেখ তোমার দুর্ব্বল সন্তানদের সম্মুখে তোমার শক্তিরূপিণী মূর্ত্তির লাঞ্ছনা—বাঙ্গলার নারীহরণ; কি পাপে, কি অত্যাচারে দেশ ঘিরে রয়েছে! তোমার সুসন্তানগণকে শক্তি দাও!

ঐ দেখ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিধবার বুকভরা বেদনার নীরব অশ্রু, তারা আজ অসহায়া, নিরাশ্রয়া। তুমি মঙ্গলের উৎস, শক্তির দেবতা, তুমি এর সুবিধান কর।

বাঙ্গালার নারীর বেদনা—সে যে অনন্ত—অসীম। নারী হয়ে যদি তুমি না বুঝবে তবে কে আর বুঝবে মা! ওগো দুর্গতিনাশিনী শিবে, একবার চেয়ে দেখ—ঘরে ঘরে কি দুর্ব্বহ বেদনা। তোমার প্রাণে কি পৌঁছুনা—সবই ত জান, তবে কেমন করে নীরব রয়েছ—এ তোমার কেমন পরীক্ষা!

ঐ দেখ বাঙ্গলার পল্লীভরা ব্যাধির যাতনা,

ক্ষুধার তাড়না, দুর্ব্বল মাতার কোলে রুগ্ন সন্তান্—কি হবে মা, কোন্ পথে বাঙ্গলার কল্যাণ হবে মা!

এই শরতে তোমার পূজা—একদিন কত আনন্দের ছিল সারা বাঙ্গলা জুড়ে, আজ তোমার পূজায় সে আশা, সে আনন্দ কিছুই নাই যে! তোমার পূজা হয় সত্য—তার মধ্যে আমাদের প্রাণ নাই, আনন্দ নাই। মা গো, দেশের সর্ব্বত্র নারী-নির্য্যাতনের অনাচার অত্যাচার, বিধবার ক্রন্দন, গৃহ-কলহ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ,—এই সবের মধ্যে কি আর তোমার পূজা হয় মা!

মা তুমি শক্তির আধার, শান্তির আধার, সকল দুর্ব্বলতা দূর হবে তোমার কৃপায় তুমি আবার সত্য হয়ে বাঙ্গলার প্রাণে এস। মা গো, কত সাধক ছিল, কত ভক্ত ছিল তোমার বাঙ্গলার সন্তানদের মধ্যে—তখন ঘরে ঘরে শক্তিপূজা হ'ত। কিছুদিন আগেও সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের মধ্য দিয়ে তোমার পূজার পরিচয় পেয়েছি। এখন সীতারামের দশমহাবিদ্যা, প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীর প্রস্তরমূর্ত্তি মাত্র তোমার শক্তিপূজার চিহ্ন হয়ে প'ড়ে রয়েছে। এই সেদিনও সব-হারা হয়ে ভক্ত রামপ্রসাদ, ভক্ত রামকৃষ্ণ তোমার জন্য নিশিদিন চ'খের জলে মা মা করে কেঁদে গিয়েছেন।

আবার কি বাঙ্গলায় তোমার শক্তিমান সন্তান জন্মাবে মা? আবার কি শত দুর্ব্বলতা কেটে গিয়ে বাঙ্গলার সন্তান দিগ্বিজয়ী হবে না,—বাঙ্গালার ঘরে কি আনন্দ দেখা দেবেনা মা?

আজও বাঙ্গালী সন্তান তোমার শক্তির পূজা করে বটে কিন্তু সে কেবল মৃৎ-মূর্ত্তির পূজা—কেবল প্রথা রক্ষা মাত্র—তাতে প্রাণের সাড়ার নিতান্তই অভাব। বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীদের প্রাণে তোমার সত্য পূজার আকাঙ্ক্ষা কবে জাগবে মা!

বেদনার মধ্য দিয়েই শক্তির আবির্ভাব হয়। আমাদের সপ্তকোটি বাঙ্গালী-হৃদয়ের আঁধার নিশীথ রাতের বুক ভরা অশ্রুর ভিতর দিয়ে তোমার আগমন হবে—জননী শক্তিময়ী, আমরা সেই প্রতীক্ষায় রইলাম।

এস শক্তিরূপিণী দশবাহু প্রসারণে আমাদের অন্তর মধ্যে এস তোমার জ্ঞানদা তনয়া সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যময়ী তনয়া লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে—এস তোমার শক্তিমান কুমার কার্ত্তিকেয়, সিদ্ধিপ্রদ কুমার গণেশ সহকারে। আমাদের অন্তরের সকল প্রকার জড়তার নাশ কর, অসুর-ভাব নাশ কর—আমাদের বাঙ্গলার ঘরে ঘরে শান্তির প্রতিষ্ঠান কর।

সঙ্কটতারিণী, তোমার প্রসাদে সকল সঙ্কট দূর হয়, জ্ঞানার্থী তত্ত্বজ্ঞান পায়, তুমি ভক্তের কাছে মনোরম,—আবার রণক্ষেত্রে দানবনাশিনী। তুমি কভু শান্ত কভু রুদ্র, তোমাকে শত প্রণাম করি।

মাগো, আবার দিগ্দিগন্ত ভরিয়া তোমার জয় ধ্বনি উঠুক, আবার চারিদিকে শান্তির সঙ্গীত উঠুক, ঋষিগণের বেদগানে চারিদিক ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের রূপ দাও—জয় দাও—যশ দাও, তোমাকে শত শত প্রণাম করি।

পল্লীর ডাক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

(১)

আয় বাঙ্গালী ঘরের ছেলে
আয় রে ফিরে আয় রে,
ওই যে বোধন বাঁশীর সাড়া
আবার শুনা যায় রে।
ভ'রলো দীঘি কমল দলে
কাটবি সাঁতার সুনীল জলে,
শিশির-ভেজা পল্লীবীথি
আবার তোরে চায় রে

(২)

কাবেরী কি রেবার বাঁকে
আয়াবলীর শিরে,
রেঙ্গুন লাদাক্ যেথায় থাকিস্
আবার দলে ভিড়সে।
লুপ্তি রাওলপিণ্ডি ছাড়ি
বঙ্গ-দুলাল আয়রে বাড়ী,
সন্ধ্যামণি শিউলি ফুলে
তোর আঙিনা ছায় রে।

(৩)

ছেড়ে আঙুর আমৃরুদ আনার
ঘইর আটার আড্ডা,
এসো ডাকে মিষ্টি ডাঁটা
মাছ তেঁতুলের খাট্টা।
খেত ভরেছে পোন্‌কা পুঁয়ে
শশার মাচা পড়ছে নুয়ে,
নূতন ফোটা নয়নতারা
হায় কি শোভা পায় রে!

(৪)

ইঞ্জিনেরি কয়লা ধোঁয়া
তারের টরে টক্কা
ডাকের ব্যাগের বিপুল বহর
আজকে লাগে ফাকা,
কালি কলম কাজের বোঝা
খাতার পাতা আজকে বোজা,
আবাহন আজ পল্লী-মা তোর
চৌদিকে পাঠায় রে।

(৫)

বকুল বীথি আকুল আজি
অযুত মধুপ গুঞ্জে
অসময়ে দোল যে আজি
লাল করবীর কুঞ্জে।
মায়ের চরণ পড়বে বলে
কমল দুধে আল্‌তা গুলে
যত্নে আহা রাখছে তুলে
আর দেরী কোথায় রে।

(৬)

শানাই বাঁশীর বিরাম নাহি
সেই পাপিয়া ডাকছে,
সেই যে প্রাচীন মণ্ডপেতে
নূতন এলুন আঁকছে।
বুকের প্রীতি সুখের স্মৃতি
ভিড় করিছে হেথায় নিতি
শৈশবের সে নৌকা এনে
ভিন ঘাটে লাগায় রে।

(৭)

আবার পাবে মা হারারা
মা বলে যে ডাকতে,
আসছে মা যে বুকের কাঁটা
কুসুম দিয়ে ঢাকতে।
আয় ক্ষুধিত আয় তাপিত,
দুদিন তরে মা প্লাবিত,
আয় পিপাসু আনন্দেরি
ঝরণা বয়ে যায় রে।

মায়ের প্রভাব

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্।

সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব কি অপরিসীম, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সন্তান মায়ের হাতের তৈরী পুতুল,—মা সন্তানকে যেরূপ গঠন করেন, সন্তান সেরূপই হয়। মা যদি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা হন, তবে সন্তানও প্রায়শঃ সুশীল ও সচ্চরিত্র হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মায়ের স্বভাব যদি মন্দ হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় সন্তানের স্বভাবও মন্দ হইয়া থাকে। আমরা এক একটি সন্তানের শিক্ষার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি কিন্তু এক জননী যদি শিক্ষিতা হন, তবে তদ্দ্বারা বাল্যে সন্তানের যে শিক্ষা হয়, বহু শিক্ষকের নিকট হইতেও সে শিক্ষা আশা করা যায় না। জর্জ্জ হার্ব্বাট যথার্থই বলিয়াছেন, "একজন উত্তম জননী এক শত শিক্ষকের সমান।" কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কয়জন এ মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া থাকি?

সকল দেশের সকল বড় লোকের জীবনী পাঠ করিলেই দেখা যায়, তাঁহাদের জননীগণ তাঁহাদের জীবনকে কিরূপ প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। অলিভার ক্রমওয়েল, পিট, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, স্যার ওয়ালটার স্কট প্রভৃতি য়ুরোপ আমেরিকার মহামনীষি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের চরিত্র ও উন্নতির জন্য স্ব স্ব জননীর নিকট বিশেষরূপে ঋণী ছিলেন। ক্রমওয়েলের জননী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"তিনি অতিমাত্রায় স্বাবলম্বী ছিলেন, একান্ত বিপদ ও দুরবস্থাতেও কখনও স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে পাঁচটি কন্যাকে উচ্চ বংশে বিবাহ দেন। সততা ও সরলতাই তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার পুত্রের চরিত্র কিভাবে সুগঠিত হইবে, পুত্র কি ভাবে সকল প্রলোভন ও পাপের পথ হইতে দূরে থাকিবে, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল।" মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জননী যে কিরূপ অসামান্য বুদ্ধিমতী ও চরিত্রবতী রমণী ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। নেপোলিয়ন প্রায়ই বলিতেন, 'আমি আমার মায়ের হাতের তৈরী পুতুল মাত্র।" তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "ফরাসী দেশের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ফরাসী জননীদের উন্নতি।" কবিবর বার্ণস্ তাঁহার মায়ের নিকট অনেক কল্পনাশক্তি লাভ করেন। বিখ্যাত জার্ম্মান মনীষি গেটেকে তাঁহার জননীই সাহিত্যসাধনায় উদ্বোধিত করেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলে আইনজীবি হয়, কিন্তু গেটের জননী পুত্রের মনের গতি ঠিক মতই ধরিতে পারিয়াছিলেন। বিখ্যাত ব্যবহারজীব লর্ড ল্যাণ্ডেল নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও উন্নতির জন্য তাঁহার জননীর নিকট এত দূর ঋণী ছিলেন যে, তিনি প্রায়ই বলিতেন, "তুলাদণ্ডের একদিকে সমস্ত পৃথিবী আর একদিকে যদি আমার মাকে রাখা হয়, তবে আমার মা-ই ভারি হইবেন।"

বিদেশের এরূপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিদেশের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের কোনই অভাব নাই। আমাদের প্রাচীন কালের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কৌশল্যা বা কুন্তীর চরিত্র রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা রামায়ণ মহাভারতের পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, এ বিষয়ে অধিক না

বলিলেও বোধ হয় চলে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের মহামনীষিগণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলেও আমরা একই সত্য দেখিতে পাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, লালা লজপৎ রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতের মহাপুরুষগণ তাঁহাদের জননীগণের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী প্রাতঃস্মরণীয়া ভগবতী দেবীর কথা কে না জানে? বিদ্যাসাগরের অপরিসীম দয়া, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজির প্রধান উৎস ছিলেন তাঁহার জননী ভগবতী দেবী। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের মূলে ভগবতী দেবীর কতখানি প্রভাব ছিল, তাহা যাঁহারা বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

স্বর্গীয় দাদাভাই নওরোজী তাঁহার জীবনের সকল প্রকার উন্নতির জন্য তাঁহার জননীর নিকট কতদূর ঋণী ছিলেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বরচিত জীবন-বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন, "এই বৃত্তান্তে একজনের কথা যদিও সর্ব্বশেষে লিখিতেছি, তথাপি তিনি আমার জীবনে সকল সময়ে সকলের অগ্রস্থানীয়া ছিলেন—তিনি আমার মা। তিনি তাঁহার এক ভ্রাতার সাহায্য লইয়া তাঁহার শিশুটির জন্য খাটিতেন। তিনি নিরক্ষরা ছিলেন এবং আমার প্রতি স্নেহে তাঁহার হৃদয় মন পূর্ণ ছিল। তিনি খুব বিবেচক ছিলেন, আমাকে সর্ব্বদা শত শাসনে রাখিতেন; কখনও আস্কারা দিতেন না এবং আমার আশে পাশের সকল প্রকার কুপ্রভাব হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিতেন। তিনি পাড়ার সকলের বিজ্ঞ পরামর্শদাত্রী ছিলেন। তৎকালীন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের জন্য আমি যে সব চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি আমাকে 'সাহায্য' করিয়াছিলেন। আমি যাহা, তিনিই আমাকে তাহা করিয়াছেন। আমি একমাত্র তাঁহারই হাতের তৈরী মানুষ।"

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী স্বর্গীয়া জগত্তারিণী দেবীও উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্তা জননী ছিলেন। তিনি অশেষ গুণের আধারস্বরূপিণী ছিলেন। পিতার ন্যায় জননীও পুত্র আশুতোষের অভ্যুদয়ের অন্যতম প্রধান কারণ, আশুতোষ স্বয়ং এ কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। যাঁহারা আশুতোষের পারিবারিক অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননীও কিরূপ অসামান্য গুণবতী রমণী ছিলেন এবং গুরুদাসের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনে তাঁহার মঙ্গলহস্ত কতদূর কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নাই।

ভারতের অন্যতম জননায়ক পাঞ্জাবকেশরী লালা লজপৎ রায়ের জননীও একজন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার সরলতা, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার মিতব্যয়িতা প্রভৃতি বহু সদ্গুণই তাঁহার পুত্রে বর্ত্তিয়াছে। বাস্তবিক স্বীয় চরিত্রের সদ্গুণাবলীর জন্য লজপৎ রায় পিতার অপেক্ষা মাতার নিকটেই অধিকতর ঋণী। বস্তুতঃ লজপতের চরিত্রে ও জীবনে তাঁহার জননীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এখনও লালাজী জননীর নানাবিধ গুণরাশির কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। লালাজী তাঁহার মাতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমি যেটুকু উন্নতি করিতে পারিয়াছি, তাহা আমার মাতা পিতার জন্যই। বিশেষতঃ মাতার আদর্শ আমার জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমার জননীর মত গুণবতী মহিলা অতি কম দেখা যায়। প্রথমে আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু আমার জননীর গঠনশক্তি এবং বারম্বার পরিশ্রমের ...

কালে আমারা কোনপ্রকার অভাবই বোধ করিতে পারি নাই। আমাদের মাসিক আয় যখন ৫০৲ টাকা ছিল, জননীর ব্যবস্থাগুণে তখনও যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছি, সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াও তখনকার অপেক্ষা অধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করি নাই।"

নবভারতের মন্ত্রগুরু যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধীর জীবনে তাঁহার জননীর প্রভাব যে কত সুবিস্তৃত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া যুবক গান্ধী যখন ১৭ বৎসর বয়সে বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করেন, তখন যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার জননী পুত্রকে এক জৈন সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া যান এবং বলেন, "এই মহাপুরুষের পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর বিলাত যাইয়া মদ, মাংস ও মেয়ে মানুষ স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

গান্ধী সেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে জননী পুত্রকে বিলাত যাইবার অনুমতি দিলেন। বিলাত যাইয়া এক ভারতীয় বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া গান্ধীর মতিগতি ফিরিয়া গেল। বন্ধুটি গান্ধীকে সাহেবী আদব-কায়দা শিখাইতে অগ্রসর হইলেন এবং গান্ধীও পুরাদস্তুর সাহেব হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি বিলাতী নাচ, বিলাতী গান, বিলাতী বাদ্য শিখিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন তিনি বন্ধুর সহিত এক ভোজে বসিয়াছেন, খানসামা আসিয়া টেবিলের উপর খানা দিয়া গেল। খানার মধ্যে নানাবিধ সুস্বাদু মাংস রহিয়াছে। মাংস দেখিয়া গান্ধীর হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়িল মায়ের সেই বিদায়বিহ্বল হৃদয়, সেই স্নেহসজল আঁখি, সেই স্নিগ্ধ সৌম্য জৈন সন্ন্যাসী, বিদায়-কালের সেই সমগ্র চিত্রটি তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, তাঁহার কাণে ধ্বনিত হইতে লাগিল মায়ের সেই দৃঢ় করুণ কণ্ঠস্বর,—"প্রতিজ্ঞা কর, বিলাত যাইয়া মদ, মাংস আর মেয়েমানুষ স্পর্শ করিতে পারিবে না।" তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝড় বহিতে লাগিল। একদিকে বাহ্য চাকচিক্যময় আপাত-মনোরম বিলাতী আদব-কায়দা, পুরাদস্তুর সাহেব সাজিবার প্রলোভন, অপর দিকে মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালবাসা, মায়ের প্রতিজ্ঞা! অবশেষে মাতৃস্নেহই জয়লাভ করিল—গান্ধী নিঃশব্দে টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বন্ধুর প্রবল প্রতিবাদ, চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের চোরাচাহনি ও ফিস্‌ফিসানি, কিছুতেই গান্ধীকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সাহেবীয়ানা চিরতরে বিসর্জ্জিত হইল,—ঠিক এই মুহূর্ত্তে নবভারতের মন্ত্রগুরু যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর নবজীবনের সূত্রপাত হইল।

বাস্তবিক, সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব যে কত বড়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। তাই নব্য ইতালীর দীক্ষাগুরু ম্যাট্‌সিনি একবার বলিয়াছিলেন, "মনে রাখিও, যে প্রেরণা শৈশবে মা তোমার প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছেন, পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা মিলে না।" সত্যই ইহা অতুলনীয়—অপরিমেয়।

বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বাংলার মায়েদের উন্নতি। বাংলার মায়েরা যতদিন না জাগিবেন, ততদিন বাঙ্গালী জাতি জাগিতে পারে না। ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি যে দিকেই আমরা যতই উন্নতি করিতে চাই না কেন, যতদিন সে উন্নতির প্রেরণা মায়ের জাতির নিকট হইতে না আসিবে, ততদিন আমরা কিছুই করিতে পারিব না। সুতরাং বাংলার মায়ের জাতি যাহাতে শিক্ষায় দীক্ষায় গরীয়সী হইয়া উঠেন, এজন্য আমাদের সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করা উচিত।

পেটের ছেলে

শ্রীঅখিল নিয়োগী।

(১)

পারুল তেলে বেগুনে জ্বলে বলে উঠ্‌ল, তাই বলে ছেলেটাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবো? আফিমের নেশায় বুদ্ধি শুদ্ধির মাথা কি খেয়েছো?

হৃদয়নাথ মাথা চুলকে আমৃতা আমৃতা ক'রে বল্লে, কি জান বড় বউ, আমি তো কিছু বলিনি— তবে মা-ই বল্লেন, ঘর সংসারের কাজকর্ম নিয়ে তুমি একা পেরে উঠ্‌ছ না, তার উপর ছেলেটার জন্য আবার ক'দিন থেকে রাত জাগা হচ্ছে—

হৃদয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পারুল বল্লে, তাই ওকে হাঁসপাতালে ফেলে দিয়ে আসি, কি তোমার আক্কেল গা!

হৃদয় ভয়ে ভয়ে বল্লে, আমিও তাই মাকে বলছিলুম—লোকে শুন্‌লেই বা কি বল্‌বে?

একটু হেসে পারুল বল্লে, ও—তুমি শুদ্ধ লোকের কথারই ভয় কচ্ছিলে? আচ্ছা—লোকে যদি কিছু না বলে তবে তুমি ছেলেটাকে হাঁস-পাতালে দিয়ে আসো কেমন?

তা কেন'—তা কেন' বল্‌তে বল্‌তে অপ্রস্তুত হৃদয়নাথ খাটের ওপর বসে পড়ল।

পারুল কাছে এসে হৃদয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে, ছিঃ ওসব কথা মুখেও এনো না। ঐ কচি ছেলে, হাঁসপাতালে গিয়ে থাক্‌তে পারবে?—আর হাঁসপাতালেই বা দিতে যাবো কেন? আমরা কি মরেছি?

একটু সাহস পেয়ে হৃদয়নাথ বল্লে, তবে এই ঘরেই ওর বিছানা হ'বে নাকি?

পারুল খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বল্লে, কেন গো, তোমার ভয় কচ্ছে নাকি? বাবা, এমন মানুষ ত দেখিনি!

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, মা-গো-মা, বাড়ী শুদ্ধ যেন একদিনে একেবারে নিঝুম হ'য়ে গেছে। এ কোনে ফুস্‌ফুস্—ও কোনে ফিস্‌ফিস্—কেন, কি হ'য়েছে কি? আর কোনো বাড়ীর ছেলের অসুখ হ'য় না?

বেগতিক দেখে—এই তাই বল্‌ছিলাম কি—বল্‌তে বল্‌তে হৃদয়নাথ বৈঠকখানার দিকে ছুট্‌লো।

(২)

প্রথম পক্ষ গত হ'বার পর দু'মাস যেতে না যেতেই হৃদয়নাথ পারুলকে বিয়ে করে আনে, আর তার সঙ্গে যৌতুক স্বরূপ নিয়ে আসে শ্বশুর বাড়ীর একদল পোষ্য।

হৃদয়নাথের শ্বশুরের মৃত্যু হ'য়েছিল বহুদিন আগে। তার শাশুড়ী ছেলে মেয়ে কটি'কে নিয়ে এক রকম অসহায়া অবস্থায়ই ছিলেন।

এইবার মেয়ের বিয়ে দিতে বেশ ভাল এক অভিভাবক তাঁর জুটে গেল!

তাই 'বিয়ের পর দিনই বরকনের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে ক'টির হাত ধরে হৃদয়ের শাশুড়ী ঠাকুরুণও গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। উদ্দেশ্য ছিল—নূতন জামাই-মেয়ের ঘর সংসার গুছিয়ে দেওয়া।

কিন্তু সেই থেকে, তিনি জামাই-বাড়ী ছেড়ে যাবার আর কোন রকম আগ্রহ দেখান নি।

আপন-ভোলা হৃদয়ের এতে আপত্তির কোনই কারণ ছিল না। সকালে বিকালে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে পাশা'খেলার ডাকে পাড়া মাৎ করে আর সন্ধ্যে বেলায় আফিমের বেশ একটু চিন্‌চিনে গোলাপী নেশায় হৃদয়ের সময় কেটে যাচ্ছিল বেশ! মাঝে মাঝে এই পারুলই যা' একটু গোল বাধাতো। হৃদয় কিন্তু সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্‌তো,

—মা এসেছেন আমার বাড়ী, তা, থাকুন না দিন কয়েক। পারুল রাগে গস্‌গস্ করতে করতে কাজের ভিড়ে চলে যেতো।

হৃদয়ের সংসারের মধ্যে প্রথম পক্ষের পাঁচ বছরের ছেলে পঞ্চু ছাড়া আর কেউ ছিল না। জগদম্বা ঠাকরুণের সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি পড়ল এই অনাবশ্যক ছেলেটার ওপর।

একদিন তিনি মেয়েকে কোনে ডেকে বল্লেন, হ্যালা পারি, সতীনপো'র জন্যে আবার দু'সের ক'রে দুধ রাখা কেন? জামাইয়ের পাতে দু'বেলা দুধ দিলেই পারিস! আর তোকেও তো কই দুধ খেতে দেখিনি?

পারুল কিন্তু মায়ের দিকে এম্‌নি এক কটাক্ষ করে চলে গেল যে, জগদম্বা ভয়ে আর কিছু বল্‌তে সাহস পেলেন না।

সেদিন সকালবেলা পারুল এক কাপড়-ওয়ালা ডেকে পঞ্চুকে ভাল ভাল পোষাকী কাপড় কিনে দিচ্ছিল।

জগদম্বা ঠাকরুণ আর দেখে স্থির থাকতে পারলেন না, বল্লেন, তোর যে কি মেজাজ পারি কিছু বোঝবার যো নেই! অত কাপড় কি ছাই ও' পরতে পারে? হ্যাঁ তোর কাপড় কেন্‌বার সখ হ'য়ে থাকে—নিজের ভাইদের দু'খানা কিনে দেনা কেন?

পারুল মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বল্লে, কেন তোমরা আমার ছেলেতে এত বাদ সাধ বল দেখি? বেশ করবে কাপড় কিন্‌বে। কেন, ও কারো খায় না পরে?

রাগে জগদম্বার শরীর জ্বলে উঠল। অ্যাঁ! কি বল্লি? তোর বাড়ী এসেছি বলে আমায় এত কথা শোনালি? যাচ্ছি আমি এক্ষুনি জামায়ের কাছে। তোর বাড়ীর অন্ন যদি আমি মুখে দি—

ধমক দিয়ে পারুল বলে উঠল, ওসব অকথা কুকথা আমার বাড়ীতে বলতে পারবে না, ছেলের ওতে অকল্যাণ হয়—এই বলে ছেলে কোলে নিয়ে পারুল পাশের ঘরে চলে গেল।

রাত্তিরে হৃদয়ের খাওয়ার সময় এক কথায় দশ কথা সাজিয়ে জগদম্বা ঠাকরুণ মেয়ের গুণ-কীর্ত্তন ক'রে বল্লেন, তাই বলছিলুম কি বাবা, আমি আর ক'দিন। তা—না হয় আমায় কাশীই পাঠিয়ে দাও।

হৃদয় খাওয়া দাওয়া সেরে শোবার ঘরে গিয়ে ডাকলে, বড় বৌ।

পারুল এসে সাম্‌নে দাঁড়াতেই বল্লে, মাকে কি বলেছ? তিনি কত দুঃখু কচ্ছেন। এ তোমার বড্ড অন্যায় বড় বৌ তিনি আমার বাড়ী সাধ করে এসেছেন, এমন হ'লে সইবেন কেন বলতো?

রাগে, দুঃখে, অপমানে পারুলের চোখ ফেটে জল আসছিল। কিছু না বলে সে ধপ্ করে বিছানায় শু'য়ে পড়ল।

হৃদয়নাথ বল্লে, ওকি অসময়ে শু'লে যে? একেবারে খেয়েই এসো না।

পারুল বল্লে, আমার ক্ষিধে নেই—খাবোনা।

হৃদয়নাথ কাছে স'রে এসে মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, অসুখ করেছে নাকি? হঠাৎ হাতখানা সরিয়ে নিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বল্লে, ওকি কাঁদছ কেন?

সমস্ত দিনের রুদ্ধ অভিমান যে মেঘটুকু জমা ক'রে রেখেছিল—এতক্ষণে হৃদয়ের শীতল হাতের পরশ পেয়ে তা' ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

পঞ্চু, মাকে খেতে ডাকতে এসে চড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

নিরুপায় হৃদয়নাথের তখন হুকোর আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথই রইল না।

(৩)

সেবার দেশে ভয়ানক বসন্তের ধুম। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে শীতলা পূজো আর সংকীর্ত্তনও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল।

প্রথামত হৃদয়নাথের গ্রামেও বারোয়ারী তলায় খুব ধুম ক'রে দেবীর পূজো হ'ল; আর সেই আমোদে মেতে—সারারাত জেগে পঞ্চু যখন ঘরে ফিরে এলো—গা তখন তার আগুনের মতো পুড়ে যাচ্ছিল।

পারুল ছুটে এসে তাকে বুকে নিয়ে বল্লে,

সারারাত হিমে কাটিয়েছিলি বুঝি? বল্লুম তখুনি গিয়ে কাজ নেই, তা কে তোর যেমন গোঁ।

পঙ্কুর অবসন্ন দেহ পারুলের কোলের ওপর নেতিয়ে পড়ল!

তাকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পারুল হৃদয়নাথকে ডেকে পাঠালে।

হৃদয়নাথ তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাড়া মাৎ করে হাঁকছিল ক—চ্ছে—বারো। কিন্তু পারুলের হুকুম অমান্য করবার সাহস হৃদয়নাথের ছিল না। এত্তেলা পাবা মাত্রই শোবার ঘরে এসে হাজির হ'ল।

পারুল বল্লে, ভাখো দেখি তোমার কাণ্ড! বল্লুম তক্ষুনি কাজ নেই সারারাত জেগে পুজো দেখে, তা তুমি তো মানা করবে না—

হৃদয়নাথ বল্লে, ও আমার কথা শোনে কিনা, জ্বর হ'য়েছে বুঝি?

পারুল বল্লে, গা যেন আগুনের মতো পুড়ে যাচ্ছে। গায়ের কাপড় সরাতেই ভ'য়ে ভয়ে বলে উঠ্‌ল, ওমা সারা গায়ে লাল লাল এসব কি উঠেছে গো!

হৃদয়নাথ সরে এসে বল্লে, ও কিছু নয়, মশার কামড়।

চ্যাঁচামেচি শু'নে জগদম্বা ঠাক্‌রুণ ঘরে ঢুকে বল্লেন, কি বল্‌ছিস পারি?

পারুল বল্লে, দেখ তো মা, পঙ্কুর গায়ে লাল লাল কি উঠেছে!

জগদম্বা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ কপালে তুলে বল্লেন, সরে আয় পারি—ওমা, সারা গায়ে মায়ের কৃপা হ'য়েছে যে!

(৪)

তিন রাত ক্রমাগত জেগে পারুলের শরীর একেবারে ভেঙে পড়্‌ল।

বাড়ীর একটি প্রাণীও এসে ছেলের খোঁজ নিলে না। কেবল হৃদয়নাথ ভয়ে ভয়ে রাত্তিরটুকু ঘরে কাটিয়ে যেতো।

পারুল কাউকে কিছু বল্লে না—ঠায় তিনরাত পঙ্কুর শিয়রে বসে কাটিয়ে দিলে।

চার দিনের রাত যেন আর কাটতে চায় না।

নিঝুম রাত—চার দিক থম্ থম্ কচ্ছে, পারুল একা জেগে। সমস্ত বাড়ীটায় যেন কে এসে ঘুমের কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

শেষ রাতে পারুলের একটু ঝিম এসেছিল। হঠাৎ কি একটা শব্দ শু'নে চমকে উঠে গায় হাত দিয়ে দেখে পঙ্কুর দেহ হিম—অসাড়!

পারুল ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল!

পরদিন শ্মশানে পঙ্কুর শেষ স্মৃতি-টুকু ধুয়ে ফেলে হৃদয়নাথ যখন ঘরে ফিরে এলো, পারুলের দু'চোখ বেয়ে আবার বান ডেকে এলো।

জগদম্বা ঠাক্‌রুণ ঘরে ঢুকে বল্লেন, কেন মিছিমিছি এত চোখের জল ফেল্‌ছিস্ পারি? এতে যে জামায়ের অকল্যাণ হ'বে। হাঁ, এও তোকে বলে রাখি—ঢের ঢের মেয়ে দেখ্‌লুম—এই বয়েসে—কিন্তু ধন্যি তুই! তবু যদি ছাই পেটে স্থান দিতিস!

অমৃত

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

আজিকার এ গোধূলি, এ মায়ার খেলা
ছায়ার ধূসর পরে সোণার দেয়ালা
রবে কতক্ষণ?
সাঁঝের নয়ন ঝরা অশ্রুর শিশিরে
আলো ছায়া মুছে ফেলা নিশার তিমিরে
হবে নিমগন!

নিভৃত প্রাণের পুঞ্জ অম্লান মাধুরী
ভঙ্গুর ধরণী পরে অমৃতের পুরী
রবে চিরদিন,
নন্দন মন্দার ফুল চির মধুমাসে
সপ্তর্ষির অন্তহীন আলোক আশ্বাসে
অনন্ত নবীন।

কুন্তী

পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

কুন্তী, প্রাচীন ভারতের অপূর্ব্ব স্ত্রী-রত্ন। ইনি যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। কন্যাবস্থাতে ইনি মহর্ষি দুর্ব্বাসার সেবা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষির নিকট অপূর্ব্ব মন্ত্র লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুখদুঃখ-জড়িত নানাপ্রকার ঘটনাপূর্ণ ইঁহার জীবনী—সকল অবস্থাতেই ইনি স্বীয় মহত্ত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জতুগৃহ দাহের পর একচক্রা নগরীতে বিপন্ন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার সময়—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পুত্রগণকে উত্তেজিত করিবার সময় ইনি যে উৎসাহ-পূর্ণ উপদেশ দেন তাহা বাস্তবিকই অমূল্য।

বিপন্ন ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ ভীমকে বক রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিবার সময় যুধিষ্ঠির বিশেষ ভীত হইয়া পড়েন। তখন কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন—"যুধিষ্ঠির! তুমি বৃকোদরের জন্য সন্তাপ করিও না। আমি বুদ্ধিহ্রাস বশতঃ এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। বৎস! আমরা এই ব্রাহ্মণগৃহে যে রূপ সুখে বাস করিতেছি, তাহার প্রত্যুপকারের জন্য এরূপ করিতে স্থির করিয়াছি। উপকার করিলে যিনি প্রত্যুপকার করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ। বিশেষতঃ যিনি যে পরিমাণে উপকার করেন তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রত্যুপকার করাই বিধেয়। জতুগৃহে ভীমের যেরূপ বিক্রম দেখিয়াছি, সে যেরূপে হিড়িম্ব বধ করিয়াছে তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহার বাহুদ্বয়ের বল অসীম। যে বৃকোদর তোমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে স্কন্ধে করিয়া বহনপূর্ব্বক বাহির হইয়াছে—এরূপ ভীমের সমকক্ষ বলবান অবনীমণ্ডলে কেহই বোধ হয় নাই। আমার ভীম বজ্রধারী পুরন্দরকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ। হে পুত্র! এই জন্যই আমি ব্রাহ্মণের শত্রু ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছি. লোভ অথবা মোহহেতু ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। হে যুধিষ্ঠির, এই কার্য্যের দ্বারা দুইটি বিষয় নিষ্পন্ন হইবে। প্রথম যে স্থানে বাস করিতেছি তাহার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয়—পরম ধর্ম্ম সম্পাদন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ক্ষত্রিয় হইয়া যিনি ব্রাহ্মণের হিত বিষয়ে সাহায্য করেন তিনি শুভলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করেন তিনি ইহ ও পরলোকে বিপুল যশলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যের সাহায্য করিলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রজারঞ্জক হন, ক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্র অথবা শরাণাগতকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলে ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ও রাজপূজিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। হে পৌরবনন্দন, পূর্ব্বকালে ভগবান ব্যাসদেব আমাকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আজ আমি এই ধর্ম্ম করিতে মনস্থ করিয়াছি।"

মাতার যুক্তিযুক্ত কথায় যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণের এবং সেই জনপদবাসীর রক্ষার জন্য রাক্ষসের নিকট ভীমকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। ভীমের বাহুবল পাণ্ডবদিগের আশাভরসা এবং বিপদসমূদ্র হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় স্বরূপ ছিল জানিয়াও যুধিষ্ঠিরের একটু দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, কুন্তী দেবীর কথায় তাহা তাঁহার দূর হইয়া গেল। কুন্তীর শক্তি অক্ষুন্ন ছিল, বিপন্নের কাতরতা দেখিয়া তিনি নিজের অপার দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলেন। যাঁহার কাছে উপকৃত হইয়াছেন

তাঁহার সাহায্যের জন্য—যেদেশে অবস্থান করেন স দেশের বিপদ দূর করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে বলিপ্রদান করিতে তিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও কুণ্ঠিত ন নাই। দেশের কল্যাণের জন্য—আর্ত্তের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার নয়নের ধ্রুবতারাকে উৎসর্গ করিলেন।

এই অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের জননীদের কাছে আলোচিত হউক —এই প্রাণপ্রদ উদাহরণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যপথের অন্ধকার দূর করুক।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর যুধিষ্ঠিরের পক্ষ হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূত হইয়া কৌরবসভায় গমন করেন। পুত্রগণকে কুন্তীদেবী যে সঞ্জীবনী উপদেশ কহিতে কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়বত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বলিয়াছিলেন—"হে কেশব, তুমি আমার কথানুসারে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিও যে, তোমার ধর্ম্মের যথেষ্ট হানি হইতেছে। যুদ্ধাদি দ্বারা নিত্য প্রজাপালনতৎপর হইবে—ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। হে পুত্র! পিতৃপিতামহগণের অনুষ্ঠিত রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর। তুমি যে ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে অভিলাষী হইয়াছ তাহা রাজর্ষিগণের ধর্ম্ম নহে। বৈক্লব্যযুক্ত হইলে প্রজাপালন রূপ ফললাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তুমি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে যেরূপ আচরণ করিতেছ, সেরূপ আচরণ করিবার জন্য পূর্ব্বে পাণ্ডু, পিতামহ বা আমি—আমরা কেহই এরূপ আশীর্ব্বাদ করি নাই। আমি নিত্যই তোমার যজ্ঞ দান, প্রজ্ঞা, সন্তান মাহাত্ম্য, বল ও পরমায়ুরই প্রার্থনা করিতাম। শুভপ্রদ ব্রহ্মণগণও সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হইয়া তোমার দীর্ঘায়ু, ধন ও পুত্রাদি প্রার্থনা করিয়া প্রত্যহ স্বাহা, স্বধা দেবলোকের উদ্দেশে প্রদান করিয়াছিলেন। পিতৃগণ ও দেবতারাও নিত্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও প্রজাপালনের কামনা করিয়া থাকেন। হে পুত্র! তুমি এই সকল পালন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরা সৎকুলসম্ভূত ও বিদ্যাবন্ত হইয়াও এক্ষণে জীবিকাবিরহে পীড়া প্রাপ্ত হইতেছ। তুমি ক্ষত্রিয়, বিপন্নের ত্রাণকর্ত্তা, বাহুবীর্য্যই তোমার জীবন ধারণের উপায়। হে মহাবাহো, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা নীতি দ্বারা, যে কোন উপায়ে শত্রুহস্তে পতিত পৈত্রিক অংশের পুনরুদ্ধার কর, রাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর। কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া পিতৃপিতামহদিগকে পাপে নিমজ্জিত করিও না।

"হে কেশব! তুমি আমার অর্জ্জুনকে কহিবে—তোমাকে প্রসব করিয়া যখন আমি নারীগণ বেষ্টিতা হইয়া আশ্রমে উপবেশন করিয়াছিলাম তখন অন্তরীক্ষে এই মনোহারিণী দৈববাণী হইয়াছিল—'হে কুন্তি, তোমার এই পুত্র ইন্দ্রতুল্য হইবেন, সমবেত কৌরবগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিবেন। ভীমসেন সহ ইনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া মথিত করিবেন। ইঁহার যশ স্বর্গ স্পর্শ করিবে। বাসুদেবের সাহায্যে কৌরবগণকে পরাভূত করিয়া ইনি পৈত্রিক নষ্ট রাজ্যাংশ উদ্ধার করিবেন। ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।' হে কৃষ্ণ, দৈববাণী যাহা বলিয়াছে তাহা যেন পূর্ণ হয়।

"হে মাধব, নিত্য উদ্যোগী বৃকোদরকে বলিবে—ক্ষত্রিয়রমণী যে জন্য পুত্র প্রসব করেন, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাদব! ভীমের বুদ্ধি তুমি ভালরূপই জান, সে শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে সংহার না করিয়া শান্তিলাভ করে না।

"হে কৃষ্ণ! মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, সকল ধর্ম্মে বিশেষজ্ঞা, যশস্বিনী, কল্যাণী, কৃষ্ণাকে এই কথা কহিবে—হে সৎকুল সম্ভূতে! হে মহাভাগে! তুমি আমার সকল পুত্রের প্রতি যে আচরণ করিয়াছ তাহা তোমার উপযুক্ত হইয়াছে।

"হে পুরুষোত্তম! ক্ষত্রধর্ম্ম নিরত মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিবে—বৎসগণ তোমরা প্রাণপণ করিয়া বিক্রমার্জ্জিত ভোগসুখের প্রার্থনা কর। বিক্রমলব্ধ

অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মবী মনুষ্যের প্রীতিকর হইয়া থাকে। পুত্রগণের রাজ্যহরণে অথবা বনগমনেও আমার দুঃখের কারণ হয় নাই, কিন্তু সেই পতিপ্রাণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদী সভা মধ্যে রোদন করিতে করিতে যে দুরাত্মাগণের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই আমার মর্ম্ম বিদারণ করিতেছে। ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরতা, স্ত্রীধর্ম্মযুক্তা পাঞ্চালী নাথবতী হইয়াও অনাথ হইয়াছিলেন। এ দুঃখ যে আমি রাখিতে পারি না।

"হে মহাবাহো! তুমি সেই সর্ব্ব ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া কহিবে যেন সে দ্রৌপদীর অবস্থা ভুলিয়া না যায়। ভীমার্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে অমরগণকেও মরমার্গে উপনীত করিতে সমর্থ। তাহারা এরূপ বীর্য্যসম্পন্ন হইলেও তাহাদিগের মহিষী সভামধ্যে আনীতা হইয়াছিল ইহা অপেক্ষা অধিক অপমান আর কি হইতে পারে? কুরুগণের সমক্ষে দুঃশাসন ভীমকে যে সকল কটু কথা কহিয়াছিল তাহাও স্মরণ করাইয়া দিও। আমার হইয়া পাণ্ডবদিগকে কুশল কথা জিজ্ঞাসা করিও, আর আমারও কুশল কথা জানাইও।

কুন্তী দেবী যেরূপ শক্তিশালিনী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও হৃদয়ে বলসঞ্চার হইয়া থাকে। তাঁহার এই অপূর্ব্ব উপদেশবাক্য ভীরুগণের হৃদয় হইতে বিভীষিকা বিদূরণ করিয়া থাকে। বাগ্‌বিদাম্বরা কুন্তী দেবী প্রথমে পুত্রগণের অতীত জীবনের ঘটনা পরম্পরা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করিলেন। অবশেষে দ্রৌপদীর অবমাননা, জ্ঞাতি জনের কটুবাক্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পুত্রগণকে যুদ্ধের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে উপদেশ দিলেন। দুঃখ দৈন্য দুর্ব্বলতা অবসাদ দূর করিয়া তাহার স্থলে উৎসাহ, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি আনয়নের পক্ষে এমন অমোঘ মহৌষধ আর নাই। প্রাচীন মাতার এই পীযূষবর্ষিণী উপদেশ বর্ত্তমান কালের মাতারা গ্রহণ করিয়া পবিত্র হউন।

আগমনী

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

এস মা আনন্দময়ি! বঙ্গ-নিকেতনে
সুখময় শরতের প্রসন্ন প্রভাতে;—
সুন্দর শেফালিপুঞ্জ নিকুঞ্জ-কাননে
রচেছে কুসুমাসন, শিশির-সম্পাতে!
বরষার ধারাসারে সজীব শীতল
সাজিয়াছে নব সাজে প্রকৃতি সুন্দরী
বল্লরী, বিটপী, শষ্প, নবীন নির্ম্মল
জাগায় বিস্মিত বিশ্বে আনন্দলহরী!

তব আগমনে মাগো, মুগ্ধ চরাচর
হাসিছে ভাসিছে যেন স্নেহের সরসে;
হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্র, মরুত মন্থর,
পুলক-চঞ্চল তব আশীষ-পরশে!
এস মা করুণাময়ি, দীন বঙ্গভূমে,—
কি দিয়া পূজিব তব ও রাঙা চরণ,—
সাজায়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, ভকতি-কুসুমে
সযতনে করিলাম অঞ্জলি অর্পণ!

পতিতার কথা

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ।

মাতৃ-মন্দির মায়ের জাতির সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে, সেই জন্যই আজ সাহস করে তারই বুকে কালীর আঁচড়ে মায়ের জাতের কলঙ্ক-স্বরূপা রূপে যারা বিরাজ করছে তাদের কথা একটু বলতে এলাম। সমাজ এদেরকে পরিত্যাগ করছে, জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করে এরা ঘৃণ্য, নৈরাশ্যময় জীবন যাপন করছে। নারীজাতির কলঙ্ক এরা বলে নারী এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখেন, পুরুষের তো কথাই নাই। যে পুরুষ এদেরকে এই পথে টেনে নিয়ে আসে, পাপ-পঙ্কে ডুবিয়ে দেয়, এদের ঘৃণ্য-ব্যবসা চালাবার সহায়তা করে সেও এদেরকে ঘৃণা করবার স্পর্দ্ধা রাখে; নিজেকে সম-অপরাধী ভাবতে চায় না।

মহাত্মা গান্ধী এদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যতদিন এরা পাপ-ব্যবসা পরিত্যাগ না করে, যতদিন এরা সৎপথ অবলম্বন না করে ততদিন এদেরকে কোনও শুভ-কার্য্যে যোগদান করতে না দেওয়া উচিত; এরা ঘৃণ্য, অস্পৃশ্যই হয়ে থাকবে।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই— এই ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য যারা তাদেরকে স্পৃশ্য, আচরণীয় করে তুলতে হবে কি-না। এরাও তো মানুষ, অমৃতের সন্তান এবং অমৃতের অধিকারী—এদেরকে মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশক যা কিছু আছে তার থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখবার অধিকার কার? যে পুরুষ তার ভিতরকার দেবতাকে চায় না—খালি মাটির ঢেলা নিয়ে খেলা করে সেই পুরুষই কি এদের সম্বন্ধে আইন কানুন প্রণয়ন করবে, বলবে যে Thus far thou shalt goest and no further? (অর্থাৎ এই তোমার সীমানা) না করবে নারীজাতি, যাদের কলঙ্ক রূপে এরা বিরাজমান এবং যাদের পতিপুত্রের অমঙ্গলরূপিণী হয়ে এরা প্রকাশ পায়?

নারী যদি এদের বিচার করে, তবে এদের মধ্যে যারা এ জীবনকে ত্যাগ করে সৎপথে আসতে চায় তাদের জীবন-যাত্রা সহজ হয়ে আসে, পাপের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে, বিগত-কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে তাদের সুবিধা হয়।

প্রায়ই দেখা যায়, পুরুষের সাহায্য নিয়ে এরা উঠতে চায়, আপনাদের পতিতা নাম ঘুচাতে চায় কিন্তু কৃতকার্য্য হয় না। এটা অবশ্যই ঠিক যে যারা উঠতে চায় তাদেরকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে, নিজের উপরই নির্ভর করতে হবে, অপরের উপর নির্ভর করলে মোক্ষলাভ হবে না। তার উপর এই অপর যদি পুরুষ হয় তবে যারা উঠতে চাচ্ছে তাদের চাওয়ার সততা সম্বন্ধেও লোকে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

কিন্তু এরা যখনই উঠতে চায়, তখন এদের মধ্যে অনেক সমস্যা জেগে ওঠে। পেটের দায়ে যাদেরকে এই ব্যবসা চালাতে হচ্ছে তাদের চিন্তা আসে অন্নবস্ত্র জুটবে কোথা থেকে? আমি জানি কোনও কোনও যায়গায় চরকা চালিয়ে অন্নবস্ত্রের যোগাড় করবার চেষ্টা হয়েছিল—কিন্তু শুধু চরকা যে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যবস্ত্র যোগায় না তাই কেবল যে প্রমাণিত হ'ল তা নয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে ব্যবসায়ীর অস্বাস্থ্য, অস্বস্তি, দুঃখ, লজ্জা, গ্লানির থেকে পরিত্রাণ পেতে এরা চেয়েছিল তাকেই এদের ধরে রাখতে হ'ল।

পরের বাড়ীর বাসন মেজে, নোংরা পরিষ্কার করেও তো এরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে, এই কথা হয়তো অনেকে বলবেন। সব সময়ে এরকম কাজ পাওয়া যায় না—একথা এর একটা উত্তর বটে কিন্তু আরও একটা কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, যে ছিল বিলাসের মধ্যে নিমগ্ন,

যে ছিল দাসদাসীর কর্ত্রী, অনেক সময় এরকম "ছোট কাজ" যাকে বলা হয়—কাজ 'নিজ হাতে' করতে পারে না, তার মন সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে এবং ওঠে, ফলে পতন আবার ঘটে। সাধুতা যাঁর কাছে সহজ, যিনি আপনার মানবত্বের মধ্যে পশুত্ব যেটুকু তাকে জয় করে দেবত্বকেই নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি হয়তো বলবেন, বাস্তবিক সে শ্রেয়কে চায় না, বাস্তবিক সে পাতিত্যের উপরে উঠতে চায় না, কাজেই সে এইসব অর্থহীন ওজর আপত্তি দেখাচ্ছে। কিন্তু আমাদের জীবনেই তো আমরা প্রতিদিন দেখছি শ্রেয়কে চাওয়া আর শ্রেয়ের সাধনা করা এক নয়। শ্রেয়কে চাই—তবু তো তাঁর সাধনার পথে পদে পদেই কতবার স্খলিত হই, কত বাধা রচনা করি।

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে" যারা, যাদের বাতি উদ্দাম, প্রচণ্ড ঝড়ে নিভে গেছে, অন্ধকারে যারা নিজেদের গায়ে দুর্গন্ধ লেপেছে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে কারা? যে ফিরে শুচিস্মিতা হতে চাচ্ছে তার সহায়ক হবে কে? সমাজে তার স্থান কোথায় হবে সে নির্দ্দেশ করে দেবে আজ কে?

মানুষ সামাজিক জীব। এরাও মানুষ, এরাও সমাজ চায়। তার উপর এদের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখেছে, যারা কাব্য, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে জীবনের নানা রসের সন্ধান পেয়েছে, তারা তাদের এই ঘৃণ্য জীবন ছেড়ে দিলে সেই সমস্ত রস থেকে সম্পূর্ণরূপে যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখবে কে? এরা নিজেরা নিজেদের ভিতরে ক্লাব গড়লে শুধু হবে না—অন্তরা যে এদের সঙ্গ আর বিষবৎ পরিত্যাগ করছে না, এদের মনের চোখে সেই সত্যকে পরিস্ফুট করে তুলবে কে?

এই কাজ তো নারীর। নারীকেই, নারীজাতির কলঙ্ক হয়ে যারা আছে তাদের কলঙ্ক মুছিয়ে দিতে হবে—নারী সমাজকেই পতিতা-উদ্ধার করতে হবে, তাঁদেরকেই সেই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা হবে মনের ক্লেদ নিবারণের জন্য, দুর্গন্ধময় জীবনের পঙ্ক-কালিমা ধৌত করবার জন্য পূতসলিলা সুরধুনী।

শরতের গান

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

আজি এ নিখিল বিশ্ব-সভায়
বীণাঝঙ্কৃত গানের মেলায়
প্রেম-উৎসব-সোহাগ-খেলায়
মাতিবারে আমি এসেছি।
হৈমপুরীর আনিয়াছি হাসি,
এনেছি পেলব মিলনের বাঁশী,
মনের গোপন মাধুরী বিকাশি'
এ ধরারে ভালবেসেছি।

ফুলের হৃদয়ে বিলাফু গন্ধ,
তটীরে দিয়েছি নটীর ছন্দ,
নব যৌবন লীলা-আনন্দ
চৌদিকে ওগো ঢেলেছি।
সুধার জোছনা নিঙাড়ি পরাণ
এনেছি বন্ধু, লহ এই দান,—
আমার বাসনা কমল সমান
ভুবনের বুকে মেলেছি।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২১

খোলা ছাদের উপর সরিত ও সুধীর বসিয়া ছিল। সামনে কিছুদূরে গঙ্গার ওপারে সূর্য্য তখন লোহিত রঙে রঞ্জিত হইয়া ডুবিয়া যাইতেছে, তাহার লাল আভা ফিন্‌কি দিয়া ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যাহা কিছু পড়িয়াছে সব রঙিন করিয়া তুলিয়াছে। আষাঢ় মাস ঘুরিয়া আসিয়াছে কিন্তু গঙ্গার বুকে আজও লালরঙের জলধারা নামিয়া আসে নাই। ওপারে ধুধু করিতেছে শুষ্ক বালুর চর, তাহার উপরে দুই একটা গরু তখনও দেখা যাইতেছিল।

উভয় বন্ধুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাহারা বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা ভাবিয়াই তখন ব্যাকুল, কোনদিকে চাহিবার অবকাশই নাই

নীচে রাজপথে সেই সময়ে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া সরিত মুখ বাড়াইয়া দেখিল; উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "দেখে যাও সুধীর, আমাদের সমাজের একটা অবস্থা দেখ।"

সুধীর মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটী বালিকাকে একটী যুবক নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। অনেক লোক সেখানে জমা হইয়াছিল, কিন্তু কেহ সেই যুবকটীকে নিবৃত্ত করে নাই।

সরিত লম্ফে লম্ফে সিঁড়ি পার হইয়া পথে পড়িল। মুখ চোখ লাল করিয়া বালিকাকে আড়াল করিয়া বলিয়া উঠিল "থামো, থামো বলছি এখনও।"

তাহার গর্জ্জন শুনিয়া যুবক পিছাইয়া গেল; সরিতের পানে চাহিয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল "আপনি বাধা দিতে আসছেন কেন? এ আমার স্ত্রী, আমি একে যা খুসি তাই করতে পারি, কারও তাতে কথা বলবার কোনও অধিকার নেই।"

হাঁ, এ কথা ঠিক? সরিত পিছাইয়া গেল। সত্যই তাহার কি অধিকার আছে ইহাতে? নারীর প্রতি পুরুষ চিরকাল নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে, তাহাকে সবই সহ্য করিতে হইবে, কারণ সে তাহার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছে।

সরিত ফিরিয়া দেখিল পার্শ্বে সুধীর দাঁড়াইয়া। সে বলিল "বাস্তবিকই তোমার অন্যায় সরিত, চলে এস।"

গম্ভীর মুখে সরিত ফিরিয়া গেল।

উন্মুক্ত ছাদে আবার দুজন আসিয়া বসিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

অনেকক্ষণ পরে সরিত নিস্তব্ধ ভঙ্গ করিয়া বলিল "তুমি কি বাস্তবিকই মনে করছ সুধীর এটা আমার অন্যায় হয়েছে?"

সুধীর বলিল "নিশ্চয়ই।"

উত্তেজিত ভাবে সরিত বলিল "তুমিও বলছ

অন্যায় হয়েছে ? কি করে অন্যায় হল বল দেখি ? সামনে স্ত্রী তার স্বামীর হাতে নির্দ্দয়রূপে প্রহারিতা হবে, তাকে রক্ষা করতে যাওয়া অন্যায় ?"

সুধীর তাহার হাতখানা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল "থামো, হে, অতটা উত্তেজিত হওয়া ভাল নয়। দেখা যাচ্ছে আমরা যে বিষয়ের সমালোচনা করছিলুম ঠিক তাই আমাদের সামনে এসে পড়েছে। এইটেই তো আমাদের সমাজের দোষ। নারী যে মা তা ভাবে কে ? তুমি আমি ভাবলেই তো হয় না, সকলেরই এটা ভাবা চাই। ও লোকটা ওর স্ত্রীকে মারছে, তুমি যে ওর মাঝখানে গিয়ে পড়লে, মেয়েটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে, এটা তুমি জানছ ভাল কাজই করছ, কিন্তু ও লোকটা নিজের সর্ত্তের জোর দেখিয়ে এক কথায় তোমায় স্তম্ভিত করে দিলে। এখানে তুমিও দেখলে বাস্তবিক তোমার কোনও জোর নেই কাজেই তোমায় সরে আসতে হল। যখন সে তোমার ন্যায়কে অন্যায় বলে ধরে নিলে, তখন এটা অন্যায় বই কি।"

সরিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের পশ্চিম দিকটার পানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে ফিরিয়া বলিল "এমনি অত্যাচার সইতে হয় তো অনেক মেয়েরই ?"

সুধীর বলিল "হয় বই কি। আমাদের গ্রামেই একটী ভদ্র লোক আছেন। তাঁর নাম করব না, তাহলে তুমি চিনতে পারবে। তিনি নিজেকে শিক্ষিত বলে অহঙ্কার করেন, বাইরে লম্বা লেক্‌চার দিয়ে বেড়ান, অথচ তাঁর স্ত্রীর এমন দুর্দ্দশা যে কি বলব। ঝিয়েরও স্বাধীনতা থাকে কিন্তু এদের তা নেই, এরা বিয়ের সময় নিজের স্বাধীনতা বিক্রয় করে। আফ্রিকায় দাসদাসীর ব্যবসা ছিল, না, বাংলাতে স্ত্রী ব্যবসায় যথেষ্ট আছে ? ইংরাজীতে টমকাকার কুটীর বলে বইটা বোধ হয় পড়েছ, আমার খুব ইচ্ছা আছে আমিও বাংলার মেয়েদের দুর্দ্দশা বলে একটা বই লিখব।"

সরিত অধৈর্য্য হইয়া বলিল "লিখলেই সব হল আর কি ? ও সব কল্পি এখন রাখ। বল দেখি কি করে এই সব মেয়েদের জাগিয়ে তোলা যায় ? তাদের মধ্যে যে শক্তিটা ঘুমিয়ে আছে কি করলে তাতে চেতনা দেওয়া যায় ? আর এই যে পুরুষ, যারা মেয়েজাতকে শুধু বিলাসের জিনিষ বলে মনে করে, এদের মনের এ ধারণাটাই বা কি করে কাটিয়ে দেওয়া যায় ?"

সুধীর বলিল "একটা স্কুল করতে পারলে খুব ভাল হয় কিন্তু। তুমি আর আমি মাষ্টার হব, আর মেয়েদের মাষ্টার হবে বিনীতা ; এমনি করে ক্রমাগত পড়িয়ে যদি আমাদের এ জ্ঞানটা তাদের দেওয়া যায়।"

সরিত রাগিয়া বলিল "তোমার কেবল ঠাট্টা।"

সুধীর হাসিল "মাইরি, ঠাট্টা একটুও করছিনে। যথার্থ কথাই বলছি আমি, এমনি করলে যদি শিখাতে পারা যায়। আমরা যে জ্ঞানটা পেয়েছি এটা ছড়িয়ে ফেলতে হবে, সকলেই যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আমরা যে আনন্দ পেয়েছি, এ আনন্দ সকলের ভিতরে বিতরণ করতে হবে।"

সরিত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "অনেকে জ্ঞান পেয়েও যে হারিয়ে ফেলে।"

তাহার মনে অসীমের কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল। অসীমের না ছিল কি ? সে যে সরিতের প্রধান সহচর ছিল। তাহাকে হারাইয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে সুধীরকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

সুধীর বলিল "কার কথা বলছ তুমি ?"

সরিত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমি কাউকেই লক্ষ্য করে এ কথা বলি নি।"

"আচ্ছা দাদা, এমন সুন্দর সন্ধ্যাবেলাটা তোমরা কি কথা নিয়ে কাটাচ্ছ বল দেখি ? আর সুধীরদা, আপনারই বা কি আক্কেল তাই আমি জিজ্ঞাসা করি—

বলিতে বলিতে বিনীতা হাসিমুখে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

সুধীরের মুখ হঠাৎ সাদা হইয়া গেল, তখন সে হাসিয়া বলিল "কি আক্কেল দেখলে আমার ?"

বিনীতা সরিতের পানে চাহিয়া বলিল "দেখছ দাদা, সকালে যখন সুধীরদা এলেন, হাজার বার বললুম আজ আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজটা তো বড্ড বেশী কিনা ! আমি ড্রয়ারটা ঝাড়ব আর বইগুলো একটু গুছাব তাতে একটু সাহায্য করবেন।"

সরিত হাসিয়া বলিল "সুধীর আসবার আগে আর একটী সাহায্যকারীর তো দরকার হয় নি বিনীতা ? হঠাৎ সুধীর বেচারীকে পেয়ে তার উপরে এত দয়া হল কেন ?"

বিনীতা হাসিয়া বলিল "সত্যি আমার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। আপনি জানেন না সুধীরদা, কত পুরোনো হাতের-লেখা বই আছে আমার কাছে। আমি সেইগুলো আপনাকে দেখাতুম। নিশ্চয়ই তাতে আপনার খুব আনন্দ হতো।"

সরিত মাথা নাড়িয়া বলিল "কিছু না। খবরদার সুধীর, ওর কথা শুনে ভুল না। সে সব বইএর এমনি অক্ষর যে তাতে দন্তস্ফুট করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আনন্দ দূরে যাক্ দেখলেই ভয় করে। সেই সব কঠোর বইগুলো নেড়ে বিনীতার যে কি আনন্দ হয় তা ও-ই জানে। তোমায় গোবেচারি পেয়ে এখন নিয়ে গিয়ে সেই দুর্ব্বোধ্য অক্ষর গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। আমার কথা যদি শোনো, তবে খবরদার যেয়োনা বলছি।"

বিনীতা ঝগড়ার সুরে বলিল "তা বই কি ? তোমার মত হিংসুকে যদি আর দ্বিতীয়টী দেখা যায় দাদা। কতক্ষণ ঝগড়া করনি বলতো ?"

সুধীর হাসিয়া বলিল "এখনিই যে দ্বিগুল বীরের মতন ঝগড়া করতে, তা বুঝি জান না ?"

বিস্ময়ে বিনীতা বলিল "কার সঙ্গে ?"

সুধীর বলিল "একটা লোক তার স্ত্রীকে পথে মারছিল, তার সঙ্গে। শেষে হেরে গিয়ে পালাবার আর পথ পায় না।"

বিনীতা বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ আমিও দেখেছি বটে। স্ত্রীর অপরাধ সে স্বামীর কথা শুনতে পারেনি কারণ তার জ্বর এসেছিল। দুজনে খুব ঝগড়া হয়, তাতে স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছিল, লোকটা তাই এসে মারছিল। বাস্তবিক কি অন্যায় এটা! আমারই তখন ইচ্ছে করছিল লোকটার গলা ধরে তফাৎ করে দিয়ে মেয়েটীকে নিয়ে আসি। এ দোষ কার বলতো দাদা ?"

সরিত বলিল "তুই বল দেখি ?"

বিনীতা বলিল "নিশ্চয়ই সমাজের। সমাজে এটা বেশ চলনও আছে, নিন্দা খুবই কম শুনতে হয় এতে। সমাজসংস্কারটা আগে দরকার—না সুধীরদা ?"

সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল "নিশ্চয়ই।"

বিনীতা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "কিন্তু বড় কঠিন কাজ। তাদের আগাগোড়াই কুসংস্কার, থাকবে সে ভাল, যদি সংশোধন করতে গেলে, তা হলেই চটে উঠল। তারা বলবে যা আমাদের সমাজে চলে আসছে আমরা তা করব না কেন? বাপ-মা যা করবে ছেলেও তাই দেখে শিখবে এটা ঠিক কথা। এমনি করেই সমাজটা অধঃপাতে যাচ্ছে। এমন কে আছে যে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, একে নূতন ভাবে গড়ে তুলবে, সমাজও তার কথা মাথা পেতে নেবে ? এটা ঠিক কথা, যে কেউ সমাজ সংস্কারে হাত দেবে, দেশের লোক তাকে হয় ব্রাহ্ম নয় খৃষ্টান বলে ঠিক করে নেবে, সর্ব্বাংশে তাকে বর্জ্জন করেই চলবে। আমি যখনই এ কথাগুলো ভাবি তখন আর আমার জ্ঞান থাকে না। যাক্ সে সব কথা ভেবে অনর্থক মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমরা যা করতে এসেছি তাই করে যাই, বাস্, ফুরিয়ে গেল সব ; লোকে আমাদের কি বলবে না বলবে তা দেখবার দরকার

নেই। আসুন সুধীরদা ওসব চিন্তায় অনর্থক মাথা ঘরাবেন না।”

তার্হার আগ্রহাতিশয্যে সুধীর হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সরিত বিনীতাকে তাড়না করিয়া গেল “তোর সবই বাড়াবাড়ি! সন্ধ্যেবেলাটা দুই বন্ধুতে নানা বিষয়ের আলোচনা করে কাটাচ্ছিলুম অমনি এসে টানাটানি আরম্ভ করে দিলে।”

সুধীর বলিল “তা বেশ তো, তুমিও এস না, দুজনে খানিক পড়া যাবেখ’ন।”

বিনীতা বিনয়ের সুরে বলিল “এস না দাদা?”

মুখ বিকৃত করিয়া সরিত বলিল “বড় দায় পড়েছে আমার। ওসব দেখটেখা আমার দ্বারা হবে না। তুই যে খাসা পাঠক পেয়েছিস, তাকেই নিয়ে যা।”

বিনীতা তাহার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, “আসুন সুধীরদা। সাধে দাদার সঙ্গে আমার বনে না? এই সব জন্যেই তো ঝগড়া হয়, আর দাদা বলে আমি ওঁকে দেখতে পারি নে।”

হাসিয়া সুধীর তাহার সঙ্গে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শারদ প্রাতে

(গান)

[মালকোষ—একতালা]

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

শারদ প্রভাতে কে,—
চরণ প্রদানি’ হাসাল ধরণী,
সোণার বরণী এ কার ঘরণী,
অমিয় মাধুরী ছড়াইল গেহে
জাগাইল ধীরে যে!

আকাশের গায় কৈশোরী আলো,
ভাসে হাসি গান নব পরিমল,
গুঞ্জন-রত গাছে পাখীকুল
ফুলে ফুলে হল বে’।

মাধবী মালতী আবেশে বিভোরা
শিউলি বকুলে লুটাইছে ধরা,
কোথা হতে এল এ পুলক-ধারা,
সরস পরশ এ।

বেদনাহতের বন্ধ দুয়ারে
কে করে আঘাত মৃদু মধু করে,
স্নেহে প্রেমে মাখি ডাকিছে সাদরে
দ্বারে দ্বারে আজি রে।

আবাহন

শ্রীমতী তমাললতা বসু

আজ এই শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশে প্রাণমন স্নিগ্ধ করা সুধামাখা চাঁদের হাসিতে, শেফালিকার কুঞ্জে কুঞ্জে, কাশের গুচ্ছে গুচ্ছে, দিগদিগন্তে তোরই আগমনী ঘোষিত হচ্ছে মা! তোরই আগমনের আনন্দে উন্মুখ হয়ে দেশের নরনারী তোকে বরণ করে নেবার জন্যেই আজ ব্যাকুল।

সারা বছর ধরে তোর সন্তানরা এই শুভক্ষণের জন্য যে আশাপথ চেয়ে আছে মা। তুই যে অশিবহারিণী, করুণাময়ী, তাই আজ তোর কন্যাদের এই দারুণ কাতরতার দিনে তোকেই তারা স্মরণ করেছে। তুই না বুঝলে তোর কন্যাদের এ মর্ম্মবেদনা কে আর বুঝবে, কে আর তাদের দুঃখ ঘোচাবে মা!

আয় মা দুর্গতিহারিণী দশভুজা বরাভয়করা, এসে দেখ মা আজ তোর অংশসম্ভূতা নারীজাতির কী ভীষণ অবমাননা—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে নারীর প্রতি দিনে দিনে অত্যাচার অনাচার নির্য্যাতন কি রকম প্রবল হয়ে উঠছে। সর্ব্বরকমে তারা নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা প্রতারিতা, প্রপীড়িতা, লাঞ্ছিতা হচ্ছে, ঘরে ঘরে নারীজাতির আকুল ক্রন্দনে দেশ প্রকম্পিত হচ্ছে। শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, অসুরদলনী জননী, তোর কন্যাদের এ দুর্দ্দশা কেন? তুই নিজে এত শক্তিশালিনী হয়ে তোর কন্যাদের এ লাঞ্ছনা কেমন করে নীরবে দেখছিস্ মা।

আয় মা শক্তিময়ী, তোর তেজে আজ তাদের শক্তিদৃপ্ত কর, তাদের গৌরবের পথে পরিচালিত কর। তারা মহিষমর্দ্দিনী জননীর মান রেখে নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়াক আর এই অত্যাচারের প্রতিবিধানে সমর্থ হোক্।

শিক্ষা, সাধনা, স্বাধীনচিন্তা সকল দিক্ দিয়েই নারীকে কুণ্ঠিতা করবার ব্যবস্থা চারিদিকে, তাদের এ দুঃখ দূর করবার জন্যে আজ এই শুভদিনে সহায় হ মা। যতদিন নারীজাতি শক্তিশালিনী, বিমুক্ত-শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াতে না পারবে, যতদিন তাদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা তারা মানবজাতির কাছে আদায় করতে না পারবে ততদিন দেশের কল্যাণ, উন্নতি, খ্যাতির দুয়ার রুদ্ধই থাকবে।

তাই বলি মা, আজ তোর কন্যাদের প্রাণে উৎসাহ দে, বাহুতে শক্তি দে। আজ তোর শুভ আশীর্ব্বাদে তারা শক্তিশালিনী হয়ে আবার দেশের মুখে হাসি ফুটাক্।

নাস্তিক

শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর

মানুষেরে ভয় করি রীতিমত
হরিরে ভুলেও ডরি না,
মনে মনে তাই পাপ করে যাই
দেখিয়ে তা কিছু করি না।
তাঁর সন্তোষ কখনো চাহি না
লোকযশ শুধু চাইগো,
ডঙ্কা পিটিয়ে করি সুকর্ম্ম
গোপনে করিনা তাইগো।
তোষে রোষে যাঁর উদাসীন রই
ধারি কভু তাঁর ধার কি?
সাধু সাজিবারে করি নাম, আমি
নাস্তিক ছাড়া আর কি?

সাতকড়ির মা

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"গা'ব গীতি খুলি' হৃদি-দ্বার,
মহিয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার!"
সুরেন্দ্রনাথ।

শরতের এই শুভদিনে—মাতৃপূজার মহা আয়োজনের মধ্যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ বাঙ্গলা ১২৮২ সালের এক শুভ শারদীয় প্রভাতে এক সজীব মাতৃমূর্ত্তির যে মহিমাময়ী আদর্শ দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল এবং কোন কোন বিষয়ে যে দেবীর অপূর্ব্ব প্রভাব এ জীবন নিয়মিত করিয়াছে, তাঁহারই পুণ্যস্মৃতির পরিচয় কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাল্যকালে প্রতিবৎসর পূজার সময় আমি আমার পিতামহের জন্মভূমিতে যাইতাম। তখন সেখানে আমাদের বাড়ী ছিল। বাড়ী ছিল বটে, কিন্তু বাড়ীতে কেহ থাকিত না—থাকিবার মত কেহ ছিলও না। সুতরাং সেটা প'ড়ো বাড়ী—বন-জঙ্গলে ঢাকা! আমি যাইতাম, পিতামহের মাতামহের বাড়ীতে। সে বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। এ বাড়ীও আমি তখন নিজেদের বাড়ীর মতই বুঝিতাম, কেননা তাঁহাদের সহিত এতই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

যে গ্রামে যাইতাম যদিও তাহা আমার এই জন্মভূমির মতই, পল্লীগ্রাম বটে, তথাপি বড় বড় অট্টালিকা সকল তথাকার পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় প্রদান করিত। এখানে কয়েকখানি গণ্ডগ্রাম ঘন সন্নিবেশিত থাকায়, দুর্গোৎসব হইত অনেক। আমাদের বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে চারিখানি পূজা ছিল। এই কয়খানি পূজাই ব্রাহ্মণবাড়ীর। এই গ্রামগুলি ব্রাহ্মণ-প্রধান বলিয়া বহু ব্রাহ্মণ বাড়ীতেই দুর্গোৎসব হইত। আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক পূজা-বাড়ীতে আমার সমবয়সী এক বন্ধু ছিল, তা'র নাম চন্দ্র এবং অনতিদূরে আরও একটি বন্ধু ছিল, তার নাম সাতকড়ি। অন্যান্য বন্ধুগণের অপেক্ষা এই দুজনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা অধিক ছিল। কিন্তু হায়, উভয়েই আজ লোকান্তরে!

আজ এই নারীজাগরণের যুগে আমার স্বর্গীয় বন্ধু সাতকড়ির মা'য়ের কিছু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। সাতকড়ির মা, সাতকড়ির গর্ভধারিণী নহেন—বিমাতা। বয়স ৩০এর মধ্যে। পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী, সুতরাং বলিষ্ঠা ও কর্ম্মিষ্ঠা। সাতকড়ি শিশুবয়সেই পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়া এই দেবী-রূপিণী বিমাতার বক্ষে লালিত পালিত হইতে-ছিল।

যেদিন সাতকড়ির সঙ্গে প্রথম তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সম্মুখে সাতকড়ির মায়ের করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, সেদিনের কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আমরা যখন উঠানে, তখন তিনি রকের উপর দুলেপাড়ার ৮।১০টি ছেলে মেয়েকে মুড়ী-মুড়কী ও নারিকেল নাড়ু বিতরণ করিতে-ছিলেন। তা'দের প্রতি কি সস্নেহ মাখা ভাষা! তা'দের উপর কি সে প্রাণঢালা ভালবাসা! আমি সেই বালক বয়সেই তাঁহার মাতৃত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দিকে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এসো বাবা!"

সাতকড়ি দুলেপাড়া হইতে একটা শালিকপাখী ৵০ দু'আনা মূল্যে কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটা তখন সাতকড়ির হাতে একটা খাঁচার মধ্যে। খাঁচাটাও দুলে বাড়ী হইতে কেনা হইয়াছিল।

সাতকড়ি যখন মাকে বলিল, "মা এই পাখীটা খাঁচাশুদ্ধ কিনে এনেছি, এটা পুষ্‌বো।" মা তখন করুণার দৃষ্টিতে পাখীটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন, "আমাদের ত' অনেক পাখী আছে, তবে আবার ওটা কেন? ওকে ছেড়ে দাও!" সাতকড়ি একটু দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমাদের আবার পাখী কই?"

মা বলিলেন, "আমাদের বাড়ী যত পাখী আসে, তারা সবই আমাদের। আমরা যদি বাছাদের ভয় না দেখাই—তাড়া না দেই—তা'দের ভালবাসি—খেতে দেই, তবে দেখ্‌বে তারাও আমাদের ভালবাস্‌বে—আমাদের পোষা হ'য়ে যাবে। পাখীকে খাঁচায় পুরে রাখ্‌লে তার কষ্ট হয়—দুঃখ হয়। তোমায় যদি কেউ একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে খুব ভাল ভাল খাবার খেতে দেয়—ভাল ভাল জামা কাপড় দেয়, কিন্তু কোথাও যেতে না দেয় তুমি কি তা'তে সুখী হও?"

সাতকড়ি কি ভাবিল জানি না; আমি কিন্তু পাখীটির জন্য বড় কাতর হইয়া উঠিলাম এবং পাখীটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাতকড়িকে অনুরোধ ও করিলাম। আমি পূর্ব্বেও পাখী পোষার পক্ষপাতী ছিলাম না—পুষিবার জন্য কখন কোন পশুপক্ষীকে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, তাই আজ এই দেবীর বাক্য আমার মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া গেল।

তারপর মা অনেক বুঝাইয়া খাঁচার দ্বার খুলিয়া দেওয়াইলেন। সাতকড়ির কত সাধের শালিকটি স্বাধীনতা লাভ করিয়া পেয়ারা গাছের ডালে বসিয়া মায়ের দিকে করুণদৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সে আজ কতদিনের কথা, কিন্তু আমার চক্ষে এখনো তেমনই উজ্জ্বল ও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে! কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী দেখিলেই আমার সেই দেবীর কথা মনে পড়ে!

সাতকড়ির মা, আমাদেরও মা। আমার অন্যতম বন্ধু চন্দ্র বড়লোকের ছেলে, তা'দের বাড়ীতেও দুর্গোৎসব হয়। সাতকড়ির পিতা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান রাখিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং জগন্মাতার মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি সাতকড়িদের চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া না তুলিলেও, বিশ্বমাতার অংশভূতা স্নেহ-দয়া-করুণার সজীব মূর্ত্তি সাতকড়িদের বাড়ীখানিকে উল্লাস-মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল ও প্রকৃতই তাহা শান্তিনিকেতন করিয়া তুলিয়াছিল! অবসর সময়ে সাতকড়িদের বাড়ীতেই মেয়েদের মজ্‌লিস বসিত। সে মজ্‌লিসে রামায়ণ, মহাভারত বা চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতেন পিসিমা। বোধ হয় সে মেয়ে-মজলিসের মধ্যে একমাত্র পিসিমাই লেখাপড়া জানিতেন। পিসিমার পরিচয় অন্যদিন দিবার চেষ্টা করিব।

সাতকড়ির মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইতে খুব ভাল বাসিতেন। তিনি নিজের ছেলেকেও যেমন যত্নে খাওয়াইতেন, পরের ছেলেকেও তেমনি যত্নে খাওয়াইতেন। বার ব্রত উপলক্ষে অন্যান্য মেয়েরা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, সাতকড়ির মা বালক-বালিকা ভোজন করাইতেন; বলিতেন ইহারাই দেবদেবীর সাকার মূর্ত্তি। নিতান্ত ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রয়োজন বুঝিলে উপনয়ন-সংস্কার-বিশিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ বালককে নিমন্ত্রণ করিতেন।

আমি যে বাড়ীতে যাইতাম, সে বাড়ীর পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষার ভার হরিদাদা ও আমার উপর পড়িত। সুতরাং নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আমাকে অন্যান্য বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে যাইতে হইত। তখন যদিও আমার উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল কিন্তু দু'চার বার খাওয়ার পক্ষে বাধা ছিল না—বর্ত্তমানের মত পরিপাকেরও কোন বিঘ্ন ছিল না, সুতরাং যেখানে নিমন্ত্রণ হইত, সেখানেই যাইতাম এবং সর্ব্বত্রই পেট পুরিয়া খাইতাম। কিন্তু যেখানেই যাই, আর যতই খাই, সাতকড়ির মার কাছে বসিয়া তাঁহার হাতে করিয়া দেওয়া কিছু না খাইলে যেন পেট ভরিত না। তাই

অধিক রাত্রে একবার তাঁর কাছে যাইয়া আহার করিতাম এবং কোন কোন দিন তাঁহারই স্বহস্ত-রচিত শয্যায় দুই বন্ধুতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতাম। হায় কি সুখের দিন গিয়াছে!

পূজার কয়দিন তাঁহার কাছে আহার করিবার জন্য একটু অধিকরাত্রে যাইবার কারণ ছিল। পূজার কয়দিন তিনি শেষ রাত্রে স্নান করিয়া আমাদের কিছু খাওয়াইয়া ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট কোন পূজাবাড়ীতে ভোগ পাক করিতে যাইতেন। তিনি পাক করিতেন, পরিবেশন করিতেন; ক্রিয়াবাড়ীর ছেলেপিলেদের তিনিই খাওয়াইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছেলেদের খাওয়াইতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। ছেলেদের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত—সকলেই তাঁহাকে আপনার বলিয়া জানিত। ক্রিয়াবাড়ীর কাজকর্ম্ম শেষ হইলে তিনি বাড়ী আসিয়া স্নান করিতেন। তারপর দেবীর আরতি দর্শন করার পর জল গ্রহণ করিতেন। সুতরাং এ কয়দিন কিছু অধিক রাত্রি ব্যতীত তাঁর দর্শন লাভ ঘটিত না।

সাতকড়ির মা লেখাপড়া জানিতেন না। সুতরাং তাঁহার বিদ্যা (যদি মাত্র লেখাপড়াটাই বিদ্যা হয়) ছিল না বটে; কিন্তু বিবেচনার অভাব কোন দিনও অনুভব করি নাই। গ্রামের বর্ষীয়সীরাও সাতকড়ির মা'র পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। লোক খাওয়ানর সময় অনেক কর্ম্মকর্ত্তা সাতকড়ির মা'কে ডাকিয়া তাঁহার উপদেশ পাইতেন। তিনি গ্রামের প্রায় সকলেরই বউমা ছিলেন। এই "বউমা"র উপদেশ কাহাকেও অগ্রাহ্য করিতে দেখি নাই।

তখনকার দিনে সকল মেয়ের শিক্ষাই সাতকড়ির মা'র আদর্শে দেওয়া হইত। ছোট বয়স হইতেই মা-পিসির কাছে সকলকেই রন্ধন কার্য্য শিক্ষা করিতে হইত। পরিণত বয়সে সকলেই রন্ধন কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। যে মেয়ে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম বিশেষতঃ রন্ধন কার্য্যে যোগ্যতা দেখাইতে না পারিতেন, নারী সমাজে সে মেয়ের নিন্দা রটিত। তাই তখন এই আশ্বিনে অন্নপূর্ণার আগমনে গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইত! কিন্তু আ'জ?

উপসংহারে মাতৃচরণে এই স্মৃতি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

বরণ

শ্রীমতী লীলা দেবী।

যে মনোহরণ বরণ করেছি
ধরিতে দাও তা ধারণা,
যে অশেষ ব্যথা সাধিয়া ল'য়েছি
সাধিতে তা দাও সাধনা।
যে ধরম নিজ মাথায় করিয়া
রাখিতে তা দাও শকতি,
যে পূজা ল'য়েছি সকল খুঁজিয়া
পূজিতে দাও তা ভকতি।
যে ত্যাগ বরিণু আপনার হাতে
পারি যেন তাহা যাপিতে,
ধ'রে রেখো মোরে যদি পড়ি টলে
যদি দেখো কভু কাঁপিতে!

শক্তিপূজা

শ্রীমতী সুশীলাবালা নন্দী।

মহাপ্রতাপান্বিত সুরথ রাজা ম্লেচ্ছ রাজাদের হাতে পরাজিত হইয়া মনোদুঃখে বনে গমন করিয়াছেন—অন্যদিকে সমাধি নামে এক উচ্চবংশজাত, ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনরত্নে যশোগৌরবান্বিত বৈশ্যসন্তান ঘটনাচক্রে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন। বনে মহাজ্ঞানী মেধস মুনির আশ্রমে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে উভয়ের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইহার প্রতিকারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন।

মুনি তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন সমস্তই মায়ার খেলা—মায়া হইতে মোহ এবং মোহ হইতে দুঃখের সৃষ্টি হয়। মনের দুর্ব্বলতা বা শক্তির অভাবই এই সকল দুঃখের কারণ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তির আরাধনা করিলে, তাঁহার আবির্ভাবে এই সকল দুঃখের বিনাশ হয়।

দেবগণ সময়ে সময়ে অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপদে পড়িতেন, পরে মহাশক্তির উপাসনা করিয়া তাঁহার সাহায্যে অসুর বিনাশ করিতেন। মহাশক্তি এইভাবে যোগনিদ্রারূপে মধু-কৈটভ বধ করিয়াছিলেন, চণ্ডিকারূপে মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন।

মেধস মুনি সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে সেই সকল কথা শুনাইতেছেন,—

মহা প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি নাশ হইয়াছে, জগৎময় কেবল এক অনন্ত সমুদ্র থৈ থৈ করিতেছে। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী কিছুই নাই, চারিদিকে কেবল জল আর জল। সেই অনন্ত সমুদ্র মধ্যে অনন্ত নাগ অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া ভাসিতেছেন, আর অনন্ত ভগবান সেই নাগের উপর ঘুমাইয়া আছেন। এ ঘুম কেবল মহামায়ার সৃষ্টি। মহামায়া যোগনিদ্রারূপে ভগবানে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণুর নাভিপদ্মের উপর ব্রহ্মা ধ্যানে আছেন।

হঠাৎ বিষ্ণুর কানের ময়লা হইতে দুইটি অসুরের সৃষ্টি হইল, তাহাদের নাম মধু ও কৈটভ। অসুরদ্বয়ের প্রবল প্রতাপে ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু তিনি কি করিবেন? বিষ্ণু সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি না জাগিলে এ অসুর বধ হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ অসুর বধ না হইলেও আর রক্ষার উপায় নাই।

তখন ব্রহ্মা মধু-কৈটভ নাশের জন্য যোগমায়াকে স্তবস্তুতি করিয়া জাগাইলেন। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগমায়া ধীরে ধীরে বিষ্ণুর শরীর হইতে বাহির হইলেন। বিষ্ণু জাগিলেন। অতঃপর মধু-কৈটভের সহিত তাঁহাদের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যুদ্ধে মহামায়ার প্রভাবে অসুরদ্বয় জ্ঞানহারা হইয়া গেল। তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বিষ্ণুকে পরাজয় করিয়াছে মনে করিয়া বলিল, আমাদের নিকট বর চাও।

বিষ্ণু বলিলেন, আমি বর চাই যেন তোমাদিগকে বধ করিতে পারি।

অসুরেরা নির্ব্বিকার চিত্তে ঐ বরই দান করিল। তবে বলিল, আমাদের জলে মারিতে পারিবে না, অন্যত্র যেখানে ইচ্ছা মারিতে পার। তাহাদের মনের ভাব—জল ছাড়া যখন অন্য কোন জায়গাই নাই, তখন তাহাদিগকে মারে কে?

বিষ্ণু তখন এক কৌশল করিলেন। তিনি জলের উপর থাকিয়া নিজ উরুর উপর অসুরদের মাথা রাখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া ফেলিলেন।

এইবার মহিষাসুরের সহিত দেবতাদের যুদ্ধের কথা। এ যুদ্ধ বড় ভয়ানক যুদ্ধ। দেবতারা এই

যুদ্ধে হারিয়া গেলেন। অসুরগণ দেবতাদের তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গ অধিকার করিল। স্বর্গচ্যুত দেবতাগণ নারায়ণ ও মহাদেবের নিকট গিয়া অসুরদের অত্যাচার-কাহিনী নিবেদন করিয়া কহিলেন, নিরুপায় হইয়া আমরা আজ আপনাদের কাছে আসিয়াছি। আপনারা মহিষাসুরকে নিধন করিয়া আমাদের বাঁচিবার উপায় করুন।

অসুরের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া দেবগণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নয়ন হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল, শরীর দিয়াও আগুনের মত এক তেজ বাহির হইতে লাগিল। কিয়ৎকালের মধ্যে দেব শরীর বহির্গত তেজরাশি হইতে এক উজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল এবং দেবগণের এক একজনের তেজে উক্ত দেবীর এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতাদের অস্ত্র হইতে দেবীর হাতের অস্ত্র হইল। বসন-ভূষণও দেবগণ নিজেরা দিয়া উক্ত দেবীকে সুসজ্জিতা করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে দেবী শক্তি-স্বরূপিণী হইয়া মহিষাসুর বধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেবগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

দেবগণের এই জয়ধ্বনি অসুরদের কানে গেল। তাহারা রণসাজে সজ্জিত হইয়া সদলবলে দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। দেবী রণরঙ্গিণীমূর্ত্তিতে অসুর নিধনে উন্মত্ত হইলেন। মহাশক্তির কাছে অসুরদের বাহুবল আর কতক্ষণ? তাহারা একে একে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেবী মহিষাসুরকে পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহার বক্ষদেশে ত্রিশূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহিষাসুর বধ হইল, দেবগণ আনন্দে পুনরায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

কিছুদিন দেবতারা নিরুদ্বেগে ছিলেন। ইতি মধ্যে পাতালে আবার এক অসুর বংশবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ... নিশুম্ভ নামে আবার দুই অসুর পাতাল প্রদেশের রাজা হইয়া দেবতাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহাদের অত্যাচারে দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অল্পকালের মধ্যে অসুরেরা দেবগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল।

মহিষাসুর বধের সময় দেবী বলিয়াছিলেন, কোন বিপদে পড়িলেই তোমরা আমায় স্মরণ করিও, আমি তোমাদের সকল বিপদ দূর করিব।

দেবতারা স্থির করিলেন এইবার দেবীর আশ্রয় প্রার্থনা করা ভিন্ন উপায় নাই। তিনি ভিন্ন এই শুম্ভ নিশুম্ভের হাত হইতে তাঁহাদের কে উদ্ধার করিবে? দেবী তখন হিমালয়ে ছিলেন, দেবগণ একমনে দেবীর আগমনের জন্য স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবগণের ঐকান্তিকপূর্ণ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দেবী নিজ শরীর হইতে শক্তিরূপা আর এক দেবী বাহির করিলেন, তাঁহার নাম হইল কৌশিকী।

রূপে আলো করিয়া কৌশিকী দেবী এক পর্ব্বতের চূড়ায় বসিয়া আছেন এই সংবাদ অসুরেরা শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট জানাইল। দেবীর রূপের কথা শুনিয়া শুম্ভ বলিল, এখনি তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আমাদের রাণী করিতে হইবে। শুম্ভ নিশুম্ভ দেবীর নিকট অসুরগণকে প্রেরণ করিল। তাহারা দেবীর নিকট গিয়া অসুর-রাজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

দেবী তাহাদের কথার উত্তরে বলিলেন, আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিলে আমি অসুর-রাজকে বরণ করিব।

শুম্ভ নিশুম্ভ এই কথা শ্রবণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধূম্রলোচন নামক একজন অসুরকে বলিল, এখনি সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া আমাদের নিকট লইয়া এস। ধূম্রলোচন আস্ফালন করিয়া দেবীকে হরণ করিয়া আনিবার জন্য যাত্রা করিল।

দেবীর নিকট পৌঁছিবামাত্র ধূম্রলোচনকে তিনি

তাঁহার তেজরাশিতে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন ও তাহার সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।

সৈন্যসহ ধূম্রলোচন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ, চণ্ড মুণ্ড প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া যুদ্ধে গমন করিল। সৈন্যগণের হুঙ্কারে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

শুম্ভ নিশুম্ভের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া দেবী মৃদু হাসিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি তাঁহার ভ্রূ হইতে কালীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। কালী অসুরগণকে একে একে গ্রাস করিতে লাগিলেন। অল্প কালের মধ্যে চণ্ড-মুণ্ড ও অসুররাজের সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট হইল। চণ্ড মুণ্ড বিনাশ করিলেন বলিয়া মহাশক্তি কালিকার আর এক নাম হইল চামুণ্ডা।

চণ্ড-মুণ্ড নিহত হইবার পর অসুরগণ দেবীকে ঘিরিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবী চণ্ডিকা হাস্যমুখে স্বীয় বাণ দ্বারা সব কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন রক্তবীজ নামক শুম্ভ নিশুম্ভের প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে আসিল। সে বড় ভয়ানক অসুর, তার একফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িলে তাহা হইতে ঠিক তারই মত আর একটি অসুর জন্মায়। দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যত রক্ত মাটিতে পড়িতে লাগিল ততই একটি করিয়া অসুর জন্মাইতে লাগিল। চণ্ডিকা দেবী তখন পুনরায় চামুণ্ডা দেবীকে স্মরণ করিলেন, চামুণ্ডা আসিয়া রক্তবীজের সমস্ত রক্ত মুখ পাতিয়া পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও কিছু হইল না, চামুণ্ডার মুখেও রক্তবীজ জন্মিতে লাগিল। তখন চামুণ্ডা দেবী দাঁত দিয়া চিবাইয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। আর রাখে কে?—তখন রক্তবীজের দেহ চণ্ডিকা অস্ত্রাঘাতে খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। স্বর্গপথে দেবগণ চণ্ডিকার জয়রবে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।

এইবার আসিল শুম্ভ নিশুম্ভ। কিন্তু মহাশক্তির কাছে কাহার শক্তি? দেবীর শূলের আঘাতে শুম্ভ ভূপতিত হইল। ইহা দেখিয়া নিশুম্ভ ধাইয়া আসিল। দেবী তাহাকেও ত্রিশূলে বিদীর্ণ করিলেন, তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শুম্ভের চেতনা হইল, সে দেখিল নিশুম্ভের মৃতদেহ গড়াগড়ি যাইতেছে। শুম্ভ হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল, পরের সহায্য লইয়া তোমার এত বিক্রম, একা একবার যোঝ ত, দেখি তোমার কত শক্তি!

মুহূর্ত্তের মধ্যে চামুণ্ডা সহ দেবীগণ চণ্ডিকার শরীরে মিশিয়া গেলেন। দেবীর সহিত শুম্ভের ভীষণ যুদ্ধ হইল। শুম্ভ দেবীকে হত্যা করিবার জন্য একলম্ফে আকাশে উঠিল। দেবী তাহার কেশাগ্র ধারণ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। শুম্ভ দেবীকে দ্বিগুণ তেজে বধ করিতে উদ্যত হইল, দেবী ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। আর শুম্ভ রক্ষা পাইল না, সে ভীষণ শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল, সমস্ত পৃথিবী তাহাতে কাঁপিয়া উঠিল—সমুদ্রের জলরাশি উথলিয়া উঠিল—প্রবল বারিধারায় সব ভাসাইয়া লইয়া গেল;—শুম্ভ বধ হইল।

স্বর্গের দেবগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নানা ভাবে তাঁহারা দেবীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, মহাশক্তির শুভাশীর্ব্বাদে স্বর্গে শান্তি স্থাপিত হইল।

মহাশক্তির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য আপন আপন দুঃখ দূর করিবার জন্য তিন বৎসর আসিয়া ভক্তিভরে চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিলেন।

দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিলেন। রাজা সুরথ শত্রু দূর করিয়া রাজ্য লাভ করিলেন এবং পরজন্মে অষ্টম রাজত্বের অধিকারী হইলেন। আর বৈশ্য সমাধি দিব্যজ্ঞানে মায়া মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিলেন।

এই হইতে জগতে চণ্ডীকা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। ইহাই আমাদের দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব। মহাশক্তি চণ্ডিকার পূজাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

মায়ের আগমনে

[রচনা—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক]

শরতের আজ শুভক্ষণে
শিউলি-ঢাকা আঙিনাতে
স্নিগ্ধ হাসি উঠ্‌ল' ফুটে
ও কার চরণ-কমল পাতে!
ভরিয়ে গৃহ মধুর গানে,
পুলক দিয়ে সবার প্রাণে,
আশীষ-ধারার পাত্র নিয়ে
কে এল আজ সোণার প্রাতে?
সুদীর্ঘ এক বরষ পরে
মা এসেছেন আজ্‌কে ঘরে,
আয়রে প্রাণের অর্ঘ্য নিয়ে
প্রণাম করি সবার সাথে।

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ভৈরব—কাওয়ালী।

স্থায়ী।

০		১		২		৩	
II{গা	গা |	-মা	গা I	-ঋা	ঋা |	-সা	-া |
শ	র	০	তে	র্	আ	০	জ

০		১		২		৩	
| ন্া	দ্া |	-স্া	স্া I	-দ্া	দ্া |	-ণ্া	-া |
শু	ভ	০	ক্ষ	০	ণে	০	০

০		১		২		৩	
| সা	-ঋগা |	মা	। I	পা	পা |	-মা	-া |
শি	০ উ	লি	০	ঢা	কা	০	০

০		১		২		৩	
| গা	গা |	-ঋা	ঋা I	-গমা	পমা |	-গা	-মা |
আ	ঙি	০	না	০০	তে০	০	০

০ ১ ২´ ৩
| মা -মদা | -া দা I পা দা | -পা -মা |
স্নি ০০ গ্ ধ হা সি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| পা -া | -দা দা I পা পা | -মা -া |
উ ০ ঠ্ ল ফু টে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| পা পা | -দা -া I পা পা | -মা -া }
ও কা ০ র্ চ র ০ ণ্

০ ১ ২´ ৩
| গা গা | -ঋা -া I গা মা | -গা -মা } II
ক ম ০ ল্ পা তে ০ ০

১ম অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II {মা দা | দা র্সা I -র্ননা -র্ঋা | -র্সা -া |
ভ রি য়ে গ্ ০ হ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| র্ঋা র্মা | -র্গা -র্ঋর্সা I না না | -র্সা -া |
ম ধু ০ ০ র্ গা নে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| র্ঋা র্মা | -র্গা -া I র্ঋা র্ঋা | -র্সা -া }
পু ল ০ ক্ দি য়ে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| না র্ঋা | -র্সা -া I র্সপা দা | -পা -া } |
স বা ০ র্ প্রা ণে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| পা পা | -দা -া I পা মা | -পা -া |
আ জি ০ ব্ ধা রা ০ ব

০ ১ ২´ ৩
| মা -পা | -দা র্সা I না র্ঋা | -র্সা -া |
পা ০ ০ জ নি য়ে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
পা -মা | গা দা I পা -মা | -পা া |
কে ০ এ ল আঁ ০ জ্ ০

০ ১ ২´ ৩
গা -গা | -ঋা -া I পর্মা পমা | -গা -মা } II
সো ণা ০ র্ প্রা ণে০ ০ ০

২য় অন্তরা।

০ ১ ২´ ৩
II {মর্ণা দা | -না দা I না -া | -র্সা া |
স্থ০ দী র্ ঘ এ ০ ক্ ০

০ ১ ২´ ৩
ঋা র্সা | -দা -না I না র্সা | -র্গা -ঋা |
ব র ০ ষ্ প রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
ঋা -র্সা | র্গা ঋা I র্সা -না | -র্সা া |
মা ০ এ সে ছে ০ ন্ ০

০ ১ ২ ৩
না -র্সা | ঋা -র্সা I ণা দা | -পা -দা } |
আ জ্ কে ০ ঘ রে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
পা -দা | -া পমা পমগা মা | -া -গা |
আ ০ র রে০ প্রা ণে ০ র্

০ ১ ২´ ৩
মা -ণদা | র্সা -ঋা I র্সনা দা | -র্সা -ঋর্সা |
ম ০র্ ঘ্য ০ নি০ য়ে ০ ০০

০ ১ ২´ ৩
নর্সা ণদা | -া -া I র্সমা র্সা | -া -ঋা |
প্র ণা০ ০ র্ ক০ রি ৩ ০

০ ১ ২´ ৩
র্সা ণা | -দা -পা I দণা দা | -পদা -পমা} II II
ন বা ০ র্ সা০ থে ০০ ০০

লণ্ডনের দৃশ্যাবলী

শ্রী মার নন্দী।

লণ্ডন সহরটী পনর ষোল মাইল দীর্ঘ এবং বার তের মাইল মাইল প্রস্থ। ইহা ছাড়া সহরের চারিদিকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত লণ্ডনের প্রভাব। সমগ্র সহরটীতে সত্তর লক্ষ লোকের বাস। কলিকাতার লোক সংখ্যা অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ অধিক।

টেমস নদী— সহরের পনর মাইল স্থানের মধ্যবর্ত্তী টেমস নদী সমুদ্রের দিকে আট শত হাত প্রস্থ হইবে। ইহা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হুগলি নদীর তিন ভাগের দুই ভাগ মাত্র। সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ভিক্টোরিয়া এম্ব্যাঙ্কমেণ্টে টেমসের প্রশস্ততা ছয় শত হস্তের অধিক নহে এবং সহরের প্রান্তে মাত্র তিন শত হাত প্রস্থ হইবে। ইহা বাঙ্গালা দেশের একটী ছোট নদীর মত। সহরের মধ্য অংশে টেমসের উপর ঘন ঘন পোল ও দুই তীরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণী।

টেমসের সুড়ঙ্গ— সমুদ্র হইতে সহরের ভিতরে জাহাজ আসিবার সুবিধার জন্য টেমসের ঐ অংশের উপর কোন পোল করা হয় নাই। নদীর তলার বহু নিম্ন দেশ দিয়া দু-তিন মাইল অন্তর অন্তর চারিটী সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে। আমি দুই দিনে ইহার দুইটী সুড়ঙ্গ দেখিয়াছি, তাহার একটীর নিচে দিয়া ট্রামে পার হইয়াছি, অপরটীতে হাঁটিয়া পার হইয়াছি। সুড়ঙ্গের ভিতরে দুই স্থানে উপর হইতে বায়ু প্রবেশের পথ আছে। শ্রেণী বদ্ধ ভাবে আলো, দিবা রাত্রি সে আলো জ্বালা থাকে। সুড়ঙ্গের ভিতর দিকে ৩৫ ফিট চওড়া ২০ ফিট উচু করিয়া শ্বেতবর্ণের এনামেল মাটীর গাঁথুনি। কোন মতে জল চুয়াইয়া আসিবার আশঙ্কা নাই। বহু গাড়ীঘোড়া মোটর ও লোকজন সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করে। সুড়ঙ্গটি দৈর্ঘে এক মাইলের বেশী হইবে।

টেমসের পোল—চারিটি সুড়ঙ্গের পরে টেমসের উপরে টাওয়ার ব্রীজ নামক আশ্চর্য্য পোল। গাড়ীঘোড়া লোকজন সমস্তই ইহার উপর দিয়া অনবরত যাতায়াত করে—আবার জাহাজ আসিবার সময় ইহার মাঝখান হইতে খণ্ড হইয়া দুই পাশে দুইখানি বিরাট কবাট উপরে উঠিয়া যায়। জাহাজ চলিয়া যাইবামাত্র আবার কবাট নামাইয়া দেওয়া হয়। এই পোল পার হইয়া সহরের অতি জমকাল অংশে লণ্ডন-ব্রীজ নামক পোল পর্য্যন্ত জাহাজ আসিতে পারে। ইহার পর হইতেই টেমসের উপরে সহরের দশ মাইল স্থানের মধ্যে চব্বিশটী বৃহৎ পোল আছে। ইহার তিনটীতে সুপ্রশস্ত রেল পথ, এবং বাকী গুলিতে ট্রাম, মটরবাস, গাড়ী ঘোড়া ও লোকজন চলে। প্রত্যেকটী পোলের বিভিন্ন রকমের সৌন্দর্য্যময় গঠন। ইহা ছাড়া টেমসের নিচে দিয়া আরও কয়েকটী—Under-ground Railway অর্থাৎ সুড়ঙ্গ রেল পথ আছে।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে ও অন্যান্য যান— সহরে লোকের গতিবিধির জন্য সাধারণতঃ তিন রকম উপায় আছে,—ভূগর্ভ রেলওয়ে, ট্রামওয়ে ও মটর বাস। ভূগর্ভ রেলওয়েকে বিলাতে আণ্ডার গ্রাউণ্ড বা টিউব রেল বলে। এই আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে লণ্ডনের অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। দশ-পনর মিনিটের মধ্যে সহরের যে কোন অংশে যাওয়া যায়। সাধারণ জমির ৫০।৬০ ফিট নিম্নদেশ দিয়া সুপ্রশস্ত সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া রেল গাড়ী চলে। সেই ৫০।৬০ ফিট নিচেয়ই খুব বড় বড় ষ্টেসন। Lift কলে সহজেই, উপরে ওঠানামা করা যায়। পায়ে হাটিবার সিঁড়ি পথও আছে। শীঘ্র গতিবিধির জন্য এই রেলওয়ে বড়ই সুবিধা। সহরে ট্রামওয়ে খুব বেশী

না হইলেও কলিকাতার বিশগুণের কম নহে। ট্রাম গাড়ীগুলি দ্বিতল। মটর বাসেই বেশী লোক যাতায়াত করে, জনাকীর্ণ রাস্তায় প্রতি মিনিটে যাতায়াতে চল্লিশ পঞ্চাশ খানা মটর বাস চলে। কলিকাতায় সম্প্রতি এক প্রকার ছোট রকমের মটর বাস চলা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু লণ্ডনের মটর বাস তাহা অপেক্ষা বৃহৎ এবং দ্বিতল।

পার্ক— সুবিশাল সহরের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় পার্ক আছে, তাহার এক একটা এতই বিশাল ও এমনই বৃক্ষাদি পূর্ণ যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে চারিদিকের সহরের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না, সহরে আছি বলিয়া মনেই হয় না। হাইড পার্ক অতি বিশাল, ইহার মধ্যে যেমন বেড়াইবার স্থান তেমন আবার নৌকায় ভ্রমণের জন্য সুন্দর আঁকা বাঁকা খাল কাটা আছে। রিজেণ্ট পার্কের মধ্যে বোটানিকাল গার্ডেন, এবং জুলুজিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত। এই শীতের দেশে সারা পৃথিবীর গরম দেশের জীবজন্তু ও গাছপালা খুব বড় বড় কাঁচের ঘর করিয়া সেই দেশের উপযোগী গরমের বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। লোহার চোঙের মধ্য দিয়া গরম ষ্টিমের প্রবাহ করিয়া ঘরের তাপ রক্ষা করা হয়। জুলুজিকাল গার্ডেন বা চিড়িয়াখানাটীতে সমগ্র জগতের জীবজন্তু কীট পতঙ্গ মৎস্যাদির নমুনা রাখা হইয়াছে।

বৃটিশ মিউজিয়াম— লণ্ডন সহরে বহু সংখ্যক মিউজিয়াম আছে, তন্মধ্যে বৃটিশ মিউজিয়াম নামক সুবিখ্যাত যাদুঘরটী যেদিন দেখিলাম, সেদিন মনে হইল, জীবন যেন বহু গুণ বাড়িয়া উঠিল। সে অপরিসীম জ্ঞান ভাণ্ডার। সেই সমস্ত দৃশ্যাবলীর বিবরণপূর্ণ তালিকাপুস্তক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক সহস্র ভলুমের কম হইবে না। লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে আবার ইহার বিভিন্ন শাখা আছে।

ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম— ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়মটীতে রাজকীয় ঐতিহাসিক বিষয় পূর্ণ। জগতের প্রত্যেক দেশ হইতে বিভিন্ন সময়ের নানা প্রকার অমূল্য দর্শনীয় ও শিল্প সম্পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

ন্যাচারাল হিষ্টোরিক্যাল মিউজিয়াম— এখানে জগতের যাবতীয় প্রাণীর মৃতদেহ জীবন্তবৎ রহিয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশের মানবমূর্ত্তি একস্থানে রহিয়াছে—তার মধ্যে ভারতীয় হিন্দুর মূর্ত্তিটি দেখিয়া অতি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। লম্বা চুল, লম্বা গোফ-দাড়ীযুক্ত কিম্ভূত কিম্বাকার তিলক কাটা মূর্ত্তি একটীর নাম 'হিন্দু' রাখা হইয়াছে।

সায়েন্স মিউজিয়ম—প্রাচীনকাল হইতে একাল পর্য্যন্তকার সমুদয় কল কারখানার নমুনা এখানে রক্ষিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগের শকট যান হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের রেল, জাহাজ, মোটর কারের ক্রমোন্নতি স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেখান হইয়াছে। নূতন নূতন নানা প্রকার ব্যবহারিক যন্ত্রের ক্রিয়া দেখান হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভের জন্য ইহা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। বালকেরা সেখানে গিয়া খুবই আমোদের সহিত ঐ সকল কলের ব্যবহার করে। কোনটী ঘুরাইয়া জল তুলিতেছে, কোনটী ঘুরাইয়া জাহাজে মাল তোলার পদ্ধতি দেখিতেছে, কোনটীর কল টিপিলে ইলেকট্রিক সংযোগ হইয়া নানা প্রকার কল ঘুরিতেছে, কোনটী টিপিলে আগুণ জ্বলিতেছে। এই মত নানা বিষয় লইয়া ক্রিয়া কৌতুকের সঙ্গে বালক বালিকারা শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিতেছে।

ইণ্ডিয়া মিউজিয়াম—ইণ্ডিয়া মিউজিয়মটীতে ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্মা, আফগানিস্থান, তিব্বত, শ্যাম প্রভৃতি দেশের নানা প্রকার প্রদর্শনীতে পূর্ণ। সদর দরজায় তাজমহলের চমৎকার একটী মডেল তৈরী করা হইয়াছে। কলিকাতার যাদুঘর অপেক্ষা বহুগুণ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ।

অষ্ট্রেলিয়া হাউস—অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডের ঐশ্বর্য্যের বিবরণপূর্ণ সুবৃহৎ ভবন। এখানে অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধীয় নানা বিষয় প্রতিদিন বিনামূল্যে

বায়স্কোপের সাহায্যে দেখান হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডকে ইংরেজেরা আর একটী স্বদেশ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, বহু ইংরেজ পরিবার সেখানে বসবাস করিয়া ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। এই জন্য ইংরেজদিগের অষ্টেলিয়া গমনের সুবিধার্থ নানা সুবিধান এখান হইতে করা হয়।

ন্যাসন্যাল গ্যালারী— এখানে যে সকল চিত্র দেখিয়াছি তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। এক একটী ছবি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলেও দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, কমে না। দেশ দেশান্তর হইতে চিত্রকরেরা আসিয়া ঐ সকল ছবি দেখিয়া ছবি আঁকিয়া লইয়া যাইতেছে। চিত্রকরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—উহার এক একটি চিত্রের অনুকরণ করিতে কাহারও এক বৎসর, কাহারও ৩।৪ বৎসর সময় কাটিতেছে। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন মাত্র চিত্র অঙ্কন করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে।

ম্যাডাম টুসউডস্— মেরী টুসউড নাম্নী সুইজর্লণ্ডবাসী এক মহিলা ভাস্করের প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের ও ঐতিহাসিক ঘটনার মোমের প্রস্তুত প্রতিমূর্ত্তি এখানে সজ্জিত; বৃটিশ রাজ্যের অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেক বিষয়টী একেবারে সত্য বিষয়ের মত তৈরী। প্রত্যেক মানুষটীকে প্রত্যেক বিষয়টীকে একেবারে সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে কত কি দেখিলাম—কত কি শিখিলাম। একটী রাজকন্যা ঘুমাইয়া আছে, তাহার বক্ষের নিশ্বাসের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। সেই ছবিটী এমনই সজীব অনুভূত হইতেছিল যে একটী বৃদ্ধাকে সত্য সত্যই তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে দেখিয়াছিলাম। একটী হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তাহার রক্ত যেন এখনও শীতল হয় নাই এমনই সজীবের মত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিটী দেখিয়া সত্যই যেন তাঁহাকে দেখিলাম বলিয়া আমার মনে হইতেছিল। *

লণ্ডন টাওয়ার—টেমসের তীরে অতি সুশোভন প্রাচীন দুর্গ। অতি প্রাচীন কালে ইহা কারাগার ছিল। বর্ত্তমানে লণ্ডনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐতিহাসিক বিষয় পূর্ণ দর্শনীয় স্থান। এখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুট ও অন্যান্য মূল্যবান রাজকীয় রত্নাভরণ দেখিলাম। এখানে টেমসের তীরে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন কালের যে সকল কামান দেখিলাম তাহা এত বৃহৎ যে ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ইহার কোন একটী ভারতীয় কামান কি কলিকাতার যাদুঘরে রাখা উচিৎ ছিল না? ভারতীয় যাদুঘরে স্থান পাইবার মত যত ঐতিহাসিক গৌরবের বিষয় আছে তাহার প্রধান প্রধান গুলিই বিলাতে লওয়া হইয়াছে। এই লণ্ডন টাওয়ারে প্রাচীন কালের সৈনিকদের অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জা বহু পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের কারাগার দেখিলাম, সেকালের শাস্তি দিবার অনেক যন্ত্র-পাতি দেখিলাম, ফাঁসিকাষ্ঠ দেখিলাম, অপরাধী লোককে বধ করিবার প্রকাণ্ড দা (রাম দাও) ও যে কাষ্ঠের উপর রাখিয়া গলা কাটা হইত সে কাষ্ঠ খণ্ডও দেখিলাম।

মার্ব্বেল আর্চ্চ—বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে প্রবেশের তোরণ দ্বার রূপে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা হাইডপার্কের এক কোনে খুব জনসমাগমস্থলে স্থাপিত করা হইয়াছে। শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত সুবৃহৎ তোরণ দ্বার। লণ্ডনে এইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বটে কিন্তু আগরায় মুসলমান রাজত্বের আমলের রাজ প্রাসাদ গুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাকে অতি তুচ্ছ মনে করিবেন।

বাকিংহাম প্যালেস— বৃটিশ সাম্রাজ্যের লণ্ডনস্থ

* দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি লণ্ডনের একটী বালিকার পত্রে জানিয়াছি, ম্যাডাম টুসউডস সম্প্রতি পুড়িয়া ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল, সেই সজীব-বৎ অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ জগতে আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

অতি বিশালায়তন রাজ-প্রাসাদ, ভিতরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই, কাজেই বাহিরে চারিদিকে ঘুরিয়াই দর্শন আকাঙ্ক্ষা শেষ করিলাম। ইহার নিকটেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নামে মহারাণী ভারতেশ্বরীর অতি সুশোভন মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত করা হইয়াছে এবং নানা প্রকার প্রস্তর শিল্পে ইহার গুরুত্ব বর্দ্ধন করা হইয়াছে।

মনুমেণ্ট—টেমস্ নদীর নিকটে দুইশত ফিট উচ্চ মনুমেণ্ট। দুইদিন ইহার উপর উঠিয়া লণ্ডন সহর ও টেমস নদীর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি। লণ্ডন সহরে এক সময়ে আগুন লাগিয়া বহু লোকজন ও ধন সম্পদ ধ্বংস হয়, তাহারই স্মৃতি স্বরূপ এই মনুমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে।

অলিম্পিয়া— ইহা একটী রমণীয় প্রদর্শনীক্ষেত্র। এইখানে নানা বিষয়ের প্রদর্শনী হইয়া থাকে। লণ্ডনের একটী বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম এবং বহু প্রকার আমোদ উৎসব দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেখানে অভাবনীয় আশ্চর্য্য সার্কাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একটী হোটেলের কর্ত্তার ছোট ছোট দুটী ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়াছিলাম বলিয়া সেদিনকার উৎসব দর্শন আমার অতি আনন্দের হইয়াছিল। নাগোরদোলা, ঘোড়াকল, জুয়া খেলা, সার্কেস সবই বাংলাদেশের মেলায় দেখিয়া থাকি—তাহারই একটা অত্যুন্নত সংস্করণ দেখিলাম।

কৃষ্টাল প্যালেস— কাঁচ ও লৌহনির্ম্মিত সুবৃহৎ গৃহ। ১৬০০ ফিট দীর্ঘ। পূর্ব্বে ইহা হাইড পার্কে একটা বড় প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেখান হইতে ৬.৭ মাইল দূরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহা লণ্ডনের আমোদ উৎসবের একটী কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। প্রতি সপ্তাহে একদিন ইহার ভিতরে আলোক বাজী পোড়ান হয়, কাঁচময় গৃহ তখন রমণীয় রূপ ধারণ করে।

গ্রীণউইচ অবজারভেটরী— ইহা জগদ্বিখ্যাত মানমন্দির। লণ্ডনের উত্তরাংশে গ্রীনউইচ পাহাড়ের উপরে স্থাপিত। এই মানমন্দির সারা পৃথিবীর ঘড়ীর সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এখানকার ঘড়ীর সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধান সহর গুলির ঘড়ীর সহিত এমন বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে যে এই ঘড়ীতে যখন যত বাজে, ঠিক অন্য সহরের ঘড়ীতেও তাহাই বাজে। এটি জ্যোতিষ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু গবেষণার স্থান।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভজনালয়। এখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজগণের রাজ্যাভিষেক হয়। রাজগণের সমাধিও এখানে হয়। বহু সংখ্যক দেখিবার বিষয় এখানে আছে।

সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল—সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালও ঠিক ঐ মত আর একটী ভজনালয়, ৫১২ ফিট দীর্ঘ, ২৫০ ফিট প্রস্থ, অতি বৃহৎ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাসের বহু বিবরণ এখানে আছে। বহু প্রাচীন ধার্ম্মিকগণের দেহ এখানে সমাহিত।

লণ্ডনে হাইডপার্ক কর্ণার, ট্রাফালগার স্কোয়ার, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, পিকাডেলি, ভিক্টোরিয়া ষ্টেসন প্রভৃতি স্থানের গুরুত্ব ও জনাকীর্ণতা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পিকাডেলিতে একটী ভারতীয় হোটেল আছে, ইহার নাম আর্ল্লা রেষ্টুরেণ্ট।

সহরের মধ্য অংশে পিকাডেলির চতুঃপার্শ্বে বহু থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতির স্থান। রাত্রিতে এই সকল স্থান ইন্দ্রপুরীর মত আলোকে সুশোভিত হয়। রাত্রিকালের বৈদ্যুতিক আলোর চলংশীল অভিনব ধরণের বিজ্ঞাপন গুলি সহরকে আরও আলোকোজ্জ্বল করিয়া তোলে। সুবিশাল লণ্ডনের দৃশ্যাবলীর গোটাকয়েক বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিতে গিয়া, আমার লিখিবার আকাঙ্ক্ষা একটুও মিটিল না। শত শত দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে কয়েকটী মাত্র লেখা গেল।

মাতৃ-মন্দির.

Vidyodaya Press, Calcutta

৩য় বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৩২ | ৭ম সংখ্যা

অবশেষ

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ।

ফাগুনের খেলা মিটিল এবার
শ্রাবণ-হিন্দোলা,
রাখীর মিলনে প্রাণ একাকার
রাসের বাসর ভোলা!

গেরুয়া আজিকে তব উত্তরী
আমার আঙিয়া কালো,
মুখের কথা সে চোখে ওঠে ভরি'
পরাণে হাসির আলো!

বন্ধু, নীরব মোহন বাঁশরী,
শিঙা হাঁকে বারি বার,
হরের বিভব পেয়েছেন হরি,
বীণা মোর একতার।

সমুখে এমন ভাগীরথী স্নান
উত্তর অয়ন শেষে,
বিশ্বজিৎ যাগ, রিক্ত হয়ে দান,
যাত্রা উত্তর দেশে।

রূপান্তর

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত।

আজ আমি তোমাদের চোখে নোংরা শতচ্ছিন্ন রাস্তার ধূলি ও কর্দ্দমলিপ্ত এক টুকরা কদর্য্য বস্ত্রখণ্ড মাত্র! আমার দেহে তোমাদের পা ঠেকলেও তোমরা ঘৃণায় মুখ-বিকৃত ক'রে সরে যাবে; কিন্তু এই আমি তিনবৎসর পূর্ব্বে কি ছিলাম, তোমরা এখন আমায় দেখে কল্পনাও ক'রতে পারবেনা। এই সতত-পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর ভাগ্যবিপর্য্যয় বা সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের দ্রুত আবর্ত্তন যে কী বিস্ময়কর ব্যাপার তা' আজ আমাকে দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারবে।

ঐ যে মূল্যবান দুগ্ধফেণনিভ শাদা বিলাতী-চামড়ার উঁচু গোড়ালি 'লেডীস্-সু' পায়ে দিয়ে বিলাতী এসেন্সের সুমিষ্ট তীব্র সৌরভে বাতাস ভারাক্রান্ত করে 'মভ্' রংয়ের মহার্ঘ্য সূক্ষ্ম ক্রেপের সাড়ী-ব্লাউজপরা ক্রিম্ ও পাউডার চর্চ্চিতা চশ্মা-চোখে পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি মোটরে গিয়ে উঠলেন, যাঁর ধবধবে শাদা-জুতার কোণে আমি একটু ঠেকেছিলুম ব'লে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে খানসামা 'বয়' বেহারাদের ডাকাডাকি ক'রে তাদের হিন্দি ও ইংরাজী মিশ্রিত গালাগালি দিয়ে যিনি আমাকে শীঘ্র বাড়ীর চতুঃসীমানার বাইরে রাজপথে 'ডাষ্ট্‌বিনে' নিক্ষেপ ক'রতে আদেশ দিয়ে গেলেন উনিই আমার জন্মদাত্রী মা।.........অবিশ্বাস ক'রছ? বিস্মিত হ'চ্ছ? না, আমায় পাগল ভাবছ?

পাগল নই গো, পাগল নই। তবে ভাবতে গেলে পাগলই হ'তে হয় বটে! কারণ, সংসারে সব সওয়া যায় কিন্তু মাতৃজাতির অবনতি বড় অসহনীয়, বড় ব্যথাদায়ক, আর মাতৃজাতির স্বার্থ ভোগানুরক্তি মনুষ্য-সমাজে সবচেয়ে অমঙ্গল ও অশুভের চিহ্ন। মায়ের অনাদর সওয়ার ব্যথা যে কী, তা' আমি এই ক্ষুদ্র জড়-জীবনে যা বুঝেছি, পৃথিবীতে আর যেন কাউকেই এ' বেদনা এত তীব্রভাবে উপলব্ধি ক'রতে না হয়।

তোমরা হয়তো বল্‌বে "তুমি তো জরাজীর্ণ গলিত-দেহ ধরার মালিন্য মণ্ডিত এক টুকরা নোংরা 'ন্যাকড়া' মাত্র! ঐ উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী যুবতী সিভিলিয়ান-পত্নী তোমার জন্মদাত্রী মাতা কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে? আর, তোমার এত সুখ দুঃখের করুণ কাহিনীই বা কি থাকতে পারে?"

ওগো, আমারও 'প্রাণ' আছে, সুখ আছে, দুঃখ আছে, 'মা' আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর পর্য্যন্ত আছে।

* * * *

ঐ যে নিখুঁতভাবে সুসজ্জিতা সুন্দরী মেয়েটি মোটরে চড়ে বায়োস্কোপ দেখতে চলে গেলেন, উনি কি করে আমার মত দীনহীনের জন্মদাত্রী মা হ'লেন শুনতে চাও? বলচি।

নিজের মায়ের দুর্ব্বলতা ও অবনতির কথা ব'লতে মাথা নুয়ে আসচে, বুক ভেঙে কান্না আসচে, তবুও বল্‌চি। হায়! জন্মজন্মান্তরে কত বড় মহাপাপ ক'রলে সবচেয়ে যাকে ভালবেসে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া যায়, তারই দোষ নিজমুখে ব্যক্ত ক'রতে হয়!

আমার শৈশব-জীবনের কথা যত দূর মনে পড়ে, মনে আছে, বালিগঞ্জে এক ধনী আইন্-ব্যবসায়ীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের এককোণে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমির উপর কতকগুলি তরুণ কার্পাস গাছে আমার জন্ম হয়েছিল। ঐ মেয়েটি, যাঁকে আমার 'মা' বলে নির্দ্দেশ করেছি, উনি প্রত্যহ

দু'বেলা নিয়মিতভাবে স্বয়ং ঐ কার্পাসগাছ গুলির তত্ত্বাবধান ক'রতেন। ঐ মেয়েটির সহিত একটি যুবকও মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে আসতেন। তিনি মেয়েটির দাদা, সেই বাটীর গৃহকর্ত্তা। তাঁরা ভাইবোনে সেই গাছগুলিকে সন্তানের মত স্নেহ এবং যত্ন ক'রতেন, আর, বাড়ীতে আত্মীয় অনাত্মীয় স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যে কেহ আসতেন, তাঁদের প্রত্যককে সাথে করে এনে ঐ গাছগুলি দেখানো মেয়েটির প্রধান আনন্দ ও গৌরবের বিষয় ছিল।

আমি ভিন্ন ভিন্ন গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভক্ত হয়ে জন্মেছিলাম। তখন বসন্তকাল, দখিন হাওয়ায় গা-ভাসিয়ে হাসতাম, দুলতাম, আর প্রত্যহ যখন ঐ মেয়েটি চাঁপারঙ, ফিকে বাসন্তীরঙ কিম্বা গৈরিক রঙের মোটা খদ্দর সাড়ীতে ক্ষীণ তনুখানি ঢেকে কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টা না করে নিতান্ত সহজ অনাড়ম্বরভাবে শঙ্খবলয় মাত্র আভরণে তপঃ-পরায়ণা পার্ব্বতী বা জ্যোতির্ম্ময়ী কুমারী গায়ত্রীর মত দেবীমূর্ত্তিতে এসে আমার সামনে দাঁড়াতেন, আমি প্রতি গাছ হতে দুলে দুলে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার নীরব-ভাষায় জিজ্ঞাসা করতাম, —"মাগো, আর কত দেরী? কত দেরী আর তোমার কাজে লেগে জীবন ধন্য হ'বার? আজও সময় হয়নি কি মা?"

তার পর একদিন প্রভাতে তিনি যখন কতকগুলি খদ্দর-পরিহিত কুমারী-সঙ্গিনীর সহিত উপস্থিত হয়ে উৎফুল্ল মুখে স্বহস্তে আমাকে সমস্ত গাছগুলি হ'তে বৃন্তচ্যুত করে বেতের সাজিটি পূর্ণ করলেন, সেদিন কুমারী মায়ের পবিত্র চম্পকাঙ্গুলির স্পর্শে আমার কার্পাস জন্ম যেন সার্থক ও ধন্য হয়ে উঠলো।

তারপরে তাঁর নিজের কক্ষে আমাকে নিয়ে এসে স্বহস্তে আমার অঙ্গ-সংস্কার করে 'পাঁজ' তৈরী ক'রলেন ও একটি সুন্দর নতুন চরকায় আমার সূত্র মূর্ত্তিতে রূপান্তর আরম্ভ করে দিলেন। প্রতিদিন সেই চরকার গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের মৃদুমন্দ সঙ্গীত গুঞ্জন শুনতে শুনতে আনন্দে আত্মহারা আমি ক্রমাগত বেড়ে চলতাম দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হয়ে। সাজীর ভিতরে আমার তুলা মূর্ত্তি যত নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগল, আর লাটাইটি তত পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল আমার শাদা যজ্ঞোপবীতের সুতা মূর্ত্তিতে।

তারপর ছোট্ট এক টুকরা খদ্দরশিশু হয়ে যেদিন 'তাঁতঘর' থেকে বাড়ী এলাম, আমার মনে আছে, কী বিপুল আনন্দ ও গর্ব্বমিশ্রিত নেত্রে আমার সারা অঙ্গের উপর মা তাঁর আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি বারম্বার সতৃষ্ণ ভাবে বুলিয়েছিলেন এবং আমার সুকোমল অঙ্গে কতবারই না স্নেহহস্ত বুলিয়ে আলমায়রার কাচের মধ্যে আমায় সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন!

সেই ঘরে কত বালক বৃদ্ধ যুবক তরুণ এবং যুবতী ও তরুণীর দল আসতেন, আমি তাঁদের চিনতাম না, আমি চিনতাম শুধু মা'কে এবং মায়ের অগ্রজ গৃহকর্ত্তা যুবকটিকে। সেই গৃহাগত পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেরই হাতে আমি একবার করে উঠেছি এবং প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছি। মা আমায় নিয়ে সকলকে দেখিয়ে খুব গর্ব্ব অনুভব ক'রতেন।

তারপরে মা'র চিন্তা হ'ল আমাকে তিনি কিরূপে ব্যবহার্য্য করে গড়ে তুলবেন! অনেক চিন্তার পর তাঁর একটি সখী পরামর্শ দিলেন, দেশী গুটীপোকার রেশম দিয়ে আমার সারা অঙ্গে 'এম্‌ব্রইডারী' চারুশিল্পে ফুল লতাপাতা চিত্র সূচের মুখে সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করে সোণালী রেশমের পাড় বুনে চারধারে বসিয়ে নিজের একটি ব্লাউজ তৈয়ারী ক'রতে। মা আন্দাজ করে আমায় মেপে দেখলেন, তাঁর গায়ের একটি ব্লাউজ হয়েও কিছু কাপড় অবশিষ্ট থাকবে। সেই অবশিষ্টাংশে একখানি রুমাল তৈরী করে তার চারিপাশে দেশী 'মুগা-সিল্কের সোণালী বর্ডার দিয়ে সেই রুমালখানি মা তাঁর দাদাকে উপহার দেবেন ঠিক করলেন। আমি আরও সৌন্দর্য্যলাভ করে 'ব্লাউজ' জন্ম নিয়ে মায়ের স্নেহভরা বুকের উপরে অবস্থিতি ক'রবো

শুনে আনন্দে বিভোর হ'য়ে হাওয়ায় ফর্‌ফর্‌ ক'রে উড়তে লাগলাম।

ক্রমশঃ আমার সারাদেহে চিক্‌মিকে রেশম দিয়ে বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে লতাপুষ্প পত্র চিত্রিত হল এবং এটি অতি সুন্দর নতুন-প্যাটানের 'স্কয়ারনেক্‌' ব্লাউজ কাটা হ'ল। মা প্রাণপণ প্রয়াসে বহু পরিশ্রম করে আমাকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সুন্দরতম করে গড়ে তুলছিলেন।

ইতিমধ্যে আমার অবশিষ্টাংশ, একখানি বড় চৌকা রুমালে পরিণত হয়েছিল এবং তারও সোণালী সরু বর্ডার ও একটি কোণে সূচের মুখে চিত্রিত পুষ্প গুচ্ছের মধ্যে লাল টুকটুকে রেশমে "ভক্তি-উপহার" অক্ষর কটি সযত্নে প্রস্তুত হয়েছিল। আমার সেই রুমাল-ভ্রাতা আজও বেঁচে আছে কিনা জানিনা। কারণ, প্রায় একবৎসর আমি তার কোনও খবর পাইনি, শুধু এইমাত্র জানি, তার প্রভু আমার মায়ের দাদা অসহযোগিতা ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর পুরাতন আইন্ ব্যবসায় গ্রহণ করেছেন, তাঁর গৃহ হতে সেই চরকা ও খদ্দরের উৎসব তিরোহিত হয়েছে।

...... যাক্‌! কি বলছিলাম? হ্যাঁ,—তারপর মা 'সিঙ্গার মেশিনে' চড়ালেন এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে বিলাতী 'রিলে'র সুতা তার তীক্ষ্ণ দন্ত ফুটিয়ে দিতে লাগল, আমি কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগলাম, মা আমার নীরব-রোদন মেশিনের বিশ্রী চীৎকারে শুনতে পেলেন না। তিন চার ঘণ্টা তার মধ্যে থাকবার পর যখন আমি ব্লাউজ্‌ জন্ম নিয়ে বেরিয়ে এলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মা আমাকে নিয়ে আনন্দ-দীপ্ত মুখে একটা মস্ত বড় হল-ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। সেঘরে মা'র দাদা এবং আরও ২।৩ জন অপরিচিত পুরুষ নারী খদ্দর চরকা ও অসহযোগের স্বপক্ষে খুব উত্তেজিত ভাবে কথা বার্ত্তা ব'লছিলেন্‌। তাঁরা আমাকে দেখে খুব হর্ষ প্রকাশ কর্ত্তে লাগলেন। মায়ের দাদা সেই ব্যারিষ্টার বাবু, আমার রুমাল-ভাইকে নিয়ে তো বারম্বার মাথায় ঠেকাতে লাগলেন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

আমি একটি কথাও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ক'রে বলছিনা। আমি খদ্দর, ভারতের এক সত্যসন্ধ মহাপুরুষ আমার স্রষ্টা, আমি মিথ্যাকে আন্তরিক ঘৃণা করি। অনাদর অত্যাচার অপমান সমস্তই আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য ক'রতে পারি, পারিনা শুধু সত্যের অবমাননা, কপট-ভণ্ডামী মিথ্যাচার সহ্য করতে।

তারপর মা'র সুন্দর তনুখানি বেষ্টন করে আদুরে কচি শিশুটির মতে যখন তাঁর বুক পিট ও গ্রীবাদেশ আমি জড়িয়ে রইলেম, তখন কী বিপুল গর্ব্বেই না আমার বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছিল! সেদিন আমি ভেবেছিলাম, আমার জননীর মত এমন অপার স্নেহময়ী জননী পৃথিবীতে ক'জন পায়? আমার মত এমন সৌভাগ্যবান কয়জন আছে? হায়! তখন কি বুঝেছিলাম, আমার সে আদর আমার যথার্থ-স্বরূপের আদর নয়। আমি তাঁর বিপুল সম্মান শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জনের যন্ত্র মাত্র হয়েছিলাম, এবং 'ফ্যাসান' 'হুজুগ' বা নূতন-বৈচিত্র্যতার মোহে তাঁর চপল লঘুচিত্তের সাময়িক উত্তেজনার একটা খেয়াল বা খেলা মাত্র হয়েছিলাম! তার মধ্যে গভীর-আন্তরিকতা প্রকৃত অর্থবোধ এবং সত্যকারের প্রাণের একান্তই অভাব ছিল। তা'নইলে কি এত শীঘ্র আজ এই দারুণ অবস্থায় আমার জীবন ডাষ্ট্‌-বিনের ময়লাস্তূপের মধ্যে শেষ হয়!

সত্য হোক্‌, মিথ্যা হোক্‌, খেয়াল হোক্‌, খেলা হোক্‌ মা তখন আমায় খুবই যত্ন করতেন এবং ভালও বাসতেন। যখনই কোনও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-স্থলে, স্বদেশী নেতাদের গৃহে, খদ্দর চরকা প্রচার প্রভৃতি স্বদেশী-কর্ম্মে বাইরে যেতেন, অন্যান্য খদ্দর-জামা গুলির চেয়ে আমাকেই পরে যেতে তিনি বেশী ভালবাসতেন।

আমার জন্মেতিহাস শুনে এবং দেহে কারু-

শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য দেখে বাইরের সকলেই শতমুখে ধন্য ধন্য করতেন। আমি প্রায় ১২।১৩টি খদ্দর প্রদর্শনীতে গিয়েছি এবং দুই তিন জায়গায় পুরস্কারও পেয়েছি। মা আমাকে খদ্দর প্রদর্শনীতে যখন পাঠাতেন, আমার জন্মেতিহাস একটুকরা কাগজে লিখে, সেই কাগজখানি আমার বুকে 'পিন্'করে দিতেন। প্রায় দু'বৎসর প্রভূত সম্মান প্রশংসা এবং আদরের মধ্যে দিয়ে কাটবার পর, মাকে যেন কেমন অন্যতর বোধ হ'তে লাগল।

মা প্রায় ছ মাস বাড়ী ছাড়া হ'য়ে বোম্বে না কোন্ দেশে তাঁর দাদার সঙ্গে চলে গেলেন। আমি আলমায়রার মধ্যে বন্ধ রইলাম। বোম্বে থেকে মা যখন ফিরিলেন, তখন মায়ের বেশভূষা সাজসজ্জা ও আচার ব্যবহারের অনেকখানি পরিবর্ত্তন বোধ হ'ল। তখনও খদ্দরই ব্যবহার করলেও তার মধ্যে এমন কি যেন একটা নতুন পরিবর্ত্তন দেখছিলাম, যেটা ঠিক বুঝতেও পারছিলাম না অথচ বড্ড কষ্টকর বোধ হ'চ্ছিল।

বিদেশীয় বেশভূষা ও পণ্যদ্রব্যাদি যা কিছু আমার একান্ত অপ্রিয় ছিল। মায়ের পরিবর্ত্তন কোথায় হয়েছে তারপর বেশ বুঝতে পারলাম। মা'র এখন আর আমাদের উপর অর্থাৎ খদ্দরের উপর মোটে প্রীতি বা টান্ নেই! জ্যৈষ্ঠ মাসের গ্রীষ্মে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিক্ত-মনেই খদ্দর ব্যবহার করেন! শুধু লোক-সম্মুখে চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাদের ত্যাগ করে বিলাতী সৌখীন বস্ত্র ব্যবহার ক'রতে পারছেন না! চরকা কাটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে নিতান্ত দায়ে পড়ে বাইরে কোনও খানে বের্ হ'তে হলে, আমাকেই গায়ে দিতেন বটে কিন্তু (বলতে মাথা কাটা যাচ্ছে) ভিতরে ভাল মসৃণ বিলাতী কাপড়ের সেমিজ পেটীকোট্ প্রভৃতি প'রতেন! অপবিত্র ঘৃণ্য বস্তুগুলির উপর স্থানলাভ ক'রে ঘৃণায় দুঃখে বেদনায় আমার বুক ভেঙে কান্না আসতো। মার এই অবনতিতে ও হীন প্রতারণায় দুঃখে ঘৃণায় মনোকষ্টে অর্দ্ধমৃত আমার দেহ ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে আসতে লাগল।

মা আগে দেশীয় প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার ক'রতেন দেখেছি। ইদানীং দেখতাম, দেশী 'চন্দন-সাবান' 'হিমানী' 'অগুরু' 'কুন্তলীন' প্রভৃতি ড্রেসিং টেবিলের উপর শুধু লোক-দেখানো ভাবে সাজানোই থাকে। মা ড্রয়ারের ভিতর থেকে 'হোয়াইট্-ক্রীম্' 'মার্কলাইজ্-ওয়াক্স্' 'পীয়ার্স-সোপ' প্রভৃতি গোপনে বার ক'রে নিয়ে ব্যবহার করেন।

বোম্বে থেকে আসবার পর একটি ইংরাজ-বেশধারী সুরূপ বাঙালী যুবক প্রত্যহ দু'বেলাই আমাদের বাড়ী আসত। তার বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ আমার দু'চক্ষের বিষ ছিল। তাকে মা'র সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশতে দেখে ও সদা সর্ব্বদা মা'র কাছে কাছে থাকতে দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে যেত। ঐ 'শনি'ই যে আমার মায়ের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন অবনতির হেতু, আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেই ময়ূরপুচ্ছধারীর অপবিত্র সংস্পর্শে মায়ের ও দেশমাতার পূজা বা স্বদেশী-সাধনার ব্যাঘাত হ'চ্ছে বলে আমার মনে হ'ত।

একদিন বিকেলে মা আমাকে গায়ে দিয়ে কোন্ এক অসহযোগী নেতার বাটী যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময়ে সেই রূপসর্ব্বস্ব 'পলাশফুল'টা এসে উপস্থিত হ'ল। মা'র গায়ে আমাকে দেখে, আমার এম্ব্রইডারীগুলি মায়ের নিজের হাতে তৈরী কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলে। মা উত্তরে শুধু সম্মতিজ্ঞাপকভাবে মাথা হেলালেন। তখন সে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে শ্লেষ ও বিদ্রূপ-মিশ্রিত স্বরে বলতে লাগল "এমন নাইস্ 'এম্ব্রইডারী যদি ঐ বিশ্রী 'ক্যাডাভ্যারাস্' মোটা চুটের উপর না করে 'ফাইন্ ভয়েলে'র উপর করতে তা'হলে সে এর চেয়ে ঢের বেশী 'বিউটীফুল্' হ'ত এত 'লেবার্' তোমার একেবারেই 'ফ্রুটলেস্

হ'য়েছে। কারণ ঐ মোটা চট্ 'সামারে' পর'র পক্ষে একেবারেই 'আন্‌ফিট্' অথচ 'উইন্‌টারে'ও ঠিক 'ইউজ্' করা চলেনা। আর 'সোসাইটি'তে 'রাফ্-ক্লথ্' চালাবার চেষ্টা করা একেবারেই পাগলামী।"

আমি ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় ফুলতে লাগলাম কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, যে-মা আমাকে নিয়ে এত গর্ব্ব এত গৌরব ক'রতেন, তিনি ঈষৎ লজ্জিত ভাবে আমার প্রতি কুণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করে সেই হতভাগাটাকে মৃদুস্বরে কি বল্‌তে বলতে তার সঙ্গে মোটরে গিয়ে উঠ্‌লেন।

মোটরে সে মাকে বুঝাতে লাগল এই মোটা বিশ্রী খদ্দরের জন্ম তাঁর মত সম্ভ্রান্তবংশীয়া উচ্চ শিক্ষিতা তন্বী সুন্দরীর জন্য নয়। খদ্দর ধনী সুষান্ত ভদ্রলোকের একান্ত অব্যবহার্য্য। কৃষক কুলী মজুর মুটীয়া প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র 'ছোটলোক' যারা, তাদেরই জন্য খদ্দর। তারাই স্বহস্তে সুতো কেটে খদ্দর বুনে সেই খদ্দরের কৌপীনের দ্বারা লজ্জা নিবারণ ক'রবে। যাঁরা অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত তাঁরা তাঁতি জোলাদের মত যদি সকলেই চরকা নিয়ে সুতো কাটতে লেগে যান, তবে দেশের অন্যান্য উচ্চ কাজ কে ক'রবে ?

কতকগুলি বাজে হুজুগে লোকের কু-পরামর্শে মা যে এই বাতুলজনোচিত ভ্রমাত্মক পথে পরিচালিত হয়েছেন এবং খদ্দর ব্যবহার না করেও যে দেশের কাজ বা স্বদেশোদ্ধারের যথেষ্ট সহায়তা করা যায়, দু'আনা বাংলার সহিত চৌদ্দ আনা ইংরাজী মিশ্রিত করে তীব্র ওজস্বিনী-ভাষায় সে বক্তৃতা দিতে লাগল। মা ভাল-মন্দ উত্তর দিলেন না, পাষাণ-পুত্তলির মত স্থিরভাবে মোটরে বসে রইলেন। হায়! তখনও আমার মৃত্যু হ'লনা!

তারপর একদিন দেখলাম বালিগঞ্জে মায়েদের বাড়ীখানি খুব সুন্দর উৎসব-বেশে সাজানো হয়েছে কিন্তু সে সজ্জার উপকরণ অধিকাংশই বিলাতী। সমস্ত দিন বাড়ীতে সুমিষ্ট-করুণ সুরে নহবত্ বাজতে লাগল। কোন্ অজানা-আশঙ্কায় আমার বুক কেবলি কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

বিকেলবেলা একজন চাকর আরও কতকগুলি জামা সেমিজ রুমালের সহিত আমাকে গরম-জলে সাবান মাখিয়ে স্নান করাতে নিয়ে গেল। সমস্ত গায়ে সাবানের ফেণা মাখিয়ে একখণ্ড পাথরের উপর সে আমাকে আছ্‌ড়াচ্ছিল, এমন সময়ে দেখলাম মা একটি মহা-মূল্যবান মুক্তা-খচিত বাদামী রংয়ের বিলাতী সিল্ক ড্রেসে হীরা মুক্তা ও পুষ্পালঙ্কারে সুসজ্জিতা হ'য়ে সেই 'শনিগ্রহে'র হাত ধরে বিবাহ-সজ্জায় হাসতে হাসতে বাইরে যাচ্ছেন। জন্মাবধি মাকে এ'রকম পরিচ্ছদে কখনও দেখিনি। আমি চাকরের হাত থেকে পাথরের উপর আছড়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লাম,—"মাগো—মা—", আমার বুক ফেটে শতধা হয়ে গেল।

চাকরটি একটু দুঃখিত ও ভীতভাবে আমাকে তুলে নিয়ে আমার বিদীর্ণ বক্ষস্থল হাতে করে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। সে ভাব্‌ল তার অপরিমিত শক্তি প্রয়োগে বুঝি আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হায়, তাতো নয়, আমি স্বচক্ষে আমার স্নেহময়ী জননীকে নিষ্ঠুর 'বিমাতা'তে পরিণতা হ'তে দেখে আর সহ্য করতে পারলাম না। অনেক সহ্য করে করে বুক জীর্ণ দুর্ব্বল হয়ে এসেছিল এবারকার তীব্র-আঘাতে শতধা-বিভক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়্‌ল।

তারপর প্রায় তিন মাস মাকে আর দেখতে পাইনি, শুনেছিলাম তিনি নব-পরিণীত স্বামীর সহিত 'মধুচন্দ্রিকা' যাপনে সমুদ্রতীরে গেছেন। তিন মাস পরে সাহেবের দোকানের মূল্যবান সৌখীন পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা মা ফিরে এলেন। তারপর একদিন আমরা যতগুলি খদ্দরের সাড়ী সেমিজ সায়া পেটীকোট্ রুমাল প্রভৃতি ছিলাম, সবগুলিকে একত্রিত করে একটি মস্ত বড় বিলাতী চামড়ার 'সুট্‌কেসে' বন্দী করে তাঁর স্বামীগৃহে নিয়ে এলেন। আমার এই বুক-ভাঙা অন্তিম অবস্থা

দেখেও মাকে একটু ব্যথিতা বা দুঃখিতা হতে দেখলাম না।

মা'র সিভিলিয়ান-স্বামীর বিলাতী আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ঘরের এককোণে সেই বাক্স শুদ্ধ নিতান্ত অবহেলার সহিত আমরা পড়ে রইলাম। প্রায় ৬ মাস পরে একদিন মাকে মানুষ-করা পুরাণো বুড়ি দাই সেই বাক্স হ'তে আমাদের উদ্ধার করে বারান্দার রেলিংএ রৌদ্রে দিয়েছিল! বিকেলবেলা মায়ের সাহেব-স্বামী কোর্ট থেকে ফিরে আমাদের দেখতে পেয়ে রাগে জলে উঠ্‌লেন এবং দুর্ব্বোধ্য ইংরাজী ভাষায় বহুক্ষণ তর্জ্জন করে আমাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। আমি তাঁর ষ্টিকের আঘাতে দোতলার রেলিংএর উপর থেকে এক-তলায় একটি 'ফার্ণের্ টবের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। সেদিন রাত্রে খুব মুশলধারে বৃষ্টি হ'ল, আমি সেই টবের মাটীর ভিতরে বৃষ্টির জলে অর্দ্ধপ্রোথিত হয়ে লিপ্ত হয়ে রইলাম।

প্রায় মাসখানেক সেই ফার্ণের টবে অর্দ্ধ গোর অবস্থায় থাকবার পর, আজ উড়েমালী তার খুরপা'র মুখে টব থেকে আমায় উদ্ধার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মালী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে আমি গাড়ীবারান্দার নীচে মোটর দাঁড়াবার চৌকা দাগকাটা পরিস্কৃত সিমেন্টের উপর এসে পড়েছিলাম। মাটীতে পড়ে পড়ে নিজের ভাগ্য-চিন্তা ক'রছি, এমন সময়ে বুকে কার জুতার স্পর্শ ঠেকল, চেয়ে দেখি মা। কিন্তু এ'আমার সে-মা নয়, তার কঙ্কালও নয়—তবুও প্রাণের ভিতরটা কেমন করে উঠ্‌লো, মায়ের পা-টা জড়িয়ে ধরবার একটু ক্ষীণ-চেষ্টা করলাম, তার ফলে তাঁর 'হোয়াইট্-ওয়ে'র সেলে ক্রীত ২৭৲ টাকা মূল্যের জুতা আমার নোংরা স্পর্শে অপবিত্র হওয়ায় চাকরেরা সকলে তিরস্কৃত হ'ল এবং তৎক্ষণাৎ একটুকরা বাখারির অগ্রভাগ দ্বারা আমি এই ময়লার টিনে নিক্ষিপ্ত হ'লাম।

আমি জানি আমার জীবনের এই করুণ পরিণাম-কাহিনী কারুর মর্ম্মস্পর্শ করে ব্যথা জাগাতে পারে কিন্তু তার জন্য আমি চিন্তিত নই, কারণ আমি এ'ও জানি সে বেদনা বা সেটুকু সহানুভূতি খুব অল্পক্ষণ স্থায়ী। তার গভীরতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমি জীবনে বিশ্বাস করে ও ভালোবেসে অত্যন্ত আঘাত পেয়েচি এবং ঠকেচি।

তবে আমি এ'ও বলে যাচ্ছি, আমার স্রষ্টার কঠোর-তপস্যা কখনই ব্যর্থ হবেনা। এই শুষ্কতরু একদিন তাঁরই তপস্যার গুণে মুঞ্জরিত হয়ে উঠবেই।

লতার সাধ

"লতিকা"

হে মোর হৃদয়রাজ!
তোমার চরণ বেড়িয়া উঠিব
হইব মাথার তাজ।
পরশে তোমার সরস হইয়া,
শত বাহু মেলি রাখিব ঘেরিয়া
বাহিরের তাপ লাগিতে দিব না
পরব নূতন সাজ।

হে মোর হৃদয়রাজ!
আশ্রয় দিও, দিওনা সরিয়ে
জঞ্জাল বলে ফেলনা ছিঁড়িয়ে
দিওনা উষর মাটীতে লুটিয়ে
সমাজে দিওনা লাজ;
ক্ষীণ এ বুকের ছোট আশাটুকু
পুরাও হৃদয়রাজ!

ভগিনী

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ।

ভগিনী আমাদের বড় স্নেহময়ী, সংসার-জীবনে বড়ই সহায়। সুখে দুঃখে সহোদরা অকাতরে শরীর ও মনকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের জন্য যত করেন আর কেহই তত করেন না।

মাতাপিতার অবিচ্ছিন্ন যত্নে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত সন্তানের সংখ্যা বোধ হয় অনেক অল্প। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর একমাত্র যত্নে, ঐকান্তিক স্নেহে ও সাহায্যেই মায়ের অনেক সন্তান বাঁচিয়া থাকে। সংসারের চৌদ্দআনা কাজের ভার কন্যা স্বভাবতই গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিবাহের পরেও আপদে বিপদে মাতাপিতার নানাবিধ সাহায্য কন্যারাই করেন। যত সহজে তাঁহাদিগকে বলা যায় এবং যত অনায়াসে তাঁহারা সেই আদেশ প্রতিপালন করেন—তেমন আর কেহ করে কি? যে সব জনকজননী মফঃস্বলে থাকেন এবং যাঁহাদের কন্যাগণ সহরস্থ স্বামীর কর্ম্মস্থলে বাস করেন সেইসব জনকজননী পুত্রদের শিক্ষার স্থান কন্যাগৃহে স্থির করেন। পিতামাতা স্বীয় সন্তানকে মেয়ের আশ্রয়েই প্রথমতঃ রাখিতে চাহেন, আর কন্যার নিকট পুত্রকে রাখিয়া তাঁহারা যত নিশ্চিন্ত থাকেন আর কোথাও তেমন পারেন না। মাতার সমান যত্নে ভগিনী আপন সহোদরকে লালনপালন করেন, তাঁহাদের যত্নেই অনেকে বিদ্যাশিক্ষা করেন, অনেকেরও সংসার বাস সম্ভব হয়।

পরিবারের প্রাণ সহোদর—সহোদরার স্নেহে ও মাতাপিতার সন্তানবাৎসল্যে বর্দ্ধিত হয়। আমি দেখিয়াছি, ছোট ভাই কি বোন্ কিছুতেই দিদির কাছ ছাড়া হয়না, খাওয়াপরা দিদির হাতে, খেলা করা দিদিকে লইয়া, দিদিকে ছাড়িয়া বেড়ানও হয় না। যখন শিশুসন্তান কাঁদিয়া আকুল হয়—মাও শান্ত করিতে পারেন না, তখন দিদিকে দেখিলে—দিদির আদরের ডাক শুনিলে সেই শিশুর চোখের জলেই হাসি ঝলসিয়া উঠে।

দিদির স্নেহ অপরিসীম। ভাই দীনদরিদ্র হইলে ভগিনীর সর্ব্বদাই চিন্তা হয় কিসে তিনি ভ্রাতার দুঃখ দূর করিবেন, ভাই ঋণগ্রস্ত হইলে ভগিনী সেই ঋণমুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং সম্ভব হইলে ভাইকে ঋণদায় হইতে মুক্তও করেন। ভ্রাতার অবস্থার উন্নতিকল্পে ভগিনীর চিন্তা অনুক্ষণ সজীব থাকে। ভগিনী নিজের ও নিজের সংসারের সকল চিন্তার সঙ্গে ভ্রাতার জীবনের সকল চিন্তা জড়িত করিয়া লন। ভগিনীর দুইটী রাজ্য—একটী স্বামীর সংসার, অপর ভ্রাতৃগৃহ। ভ্রাতাকে সম্পদে বিপদে সাহায্য না করিতে পারিলে ভগিনীর মন স্থির হয় না। ভ্রাতৃবধূর অসময়ে নিজে অকাতরে সেবা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন, নিজের ব্যয়ে ভ্রাতার গৃহে উপস্থিত হইতে তাঁহাদের সঙ্কোচ আসে না, অল্পাহারে—অনাহারেও তথায় সুখ; ভাইএর সকল দোষ প্রক্ষালন করিতে তাঁহার আনন্দ। দিদিকে বিরক্ত করিতে—দিদির নিকট আবদার করিতে ভ্রাতারও সঙ্কোচ হয় না। নিজের সকল অবস্থা অকপটে নিজের মুখে কহিতে দিদির নিকট লজ্জা করে না বরং বলিতে পারিলে, এমন কি হৃদয় খুলিয়া দেখাইলেও যেন তাহার সুখ হয়, মনের দুঃখের লাঘব হয়। ভাইএর যত অপরাধ দিদি যেন সন্তান জ্ঞানে ভুলিয়া যান।

অনেক মাতৃ-পিতৃহীন অসহায় শিশু একমাত্র ভগিনীর স্নেহযত্নে পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। সকল প্রাণ নিঙ্গড়াইয়া যে সুন্দর পবিত্র স্নেহ-ভগিনী অকাতরে ভ্রাতার উপর অবিরাম বর্ষণ করেন,

প্রাণভরা যে আশীর্ব্বাদ ভগিনী মুক্তপ্রাণে ভাইকে দান করেন তাহার ফলস্বরূপ অধিকাংশ ভ্রাতার জীবনই সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠে। ভগিনী ছোট হইলে ভক্তির আবরণে সে দাদাকে ঢাকিয়া রাখে, দাদাকে দেখিলে তাহার দলিত প্রাণে আনন্দের যে বিমলধারা প্রবাহিত হয় তাহা আর কোথাও সম্ভব নয়। ভাই-ভগিনী ত একবৃন্তে দুইটী ফুল, এক রক্ত—এক মাংস—একমনে গড়া, একই স্নেহে—একই আশ্রয়ে বর্দ্ধিত; তাই নিজের প্রতি নিজের যে মমতা, ভাইবোনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরেরও সেই অবিমিশ্র স্নেহবন্ধন। তাই বেদে ভগিনীকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছেন। বিভিন্ন সমাজেও ভগিনীর স্থান অতি উচ্চে। সকল দেশেই ভগিনী মাতৃবৎ পূজ্যা। যে নারীর সঙ্গে কাহারও কোন সম্পর্ক নাই সে সকলের ভগিনীপদবাচ্যা। ভ্রাতা ও ভগিনী যেন এক দেহের দুইটী মূর্ত্তি—এক ভাবের দুইটী প্রকাশ।

ভগিনী যদি সহৃদয়া, নির্ম্মল স্বভাবা ও শান্তিপ্রিয়া হন, তাঁহার সংসর্গে ও তাঁহার অমিত প্রভাবে ভ্রাতার চরিত্রও নির্ম্মল না হইয়া পারে না।

নিজেকে দাসীবৎ করিয়া সেবা করিতে - নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলই মঙ্গল ইচ্ছা করিতে—নিজের প্রাণ বিনিময়ে ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিতে—অনাহারে অনিদ্রায় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ না করিয়া সুখ দিতে ভগিনীই একমাত্র সমর্থা। ভ্রাতার মুখে হাসি দেখিলে আপনিই ভগিনীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, চোখের একবিন্দু অশ্রু ভগিনীর হৃদয়ে দুঃখের বাণ ডাকিয়া আনে। ভগিনী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তাই দুঃখকুজ্ঝটিকাপূর্ণ প্রপঞ্চময় সংসারমঞ্চে ভগিনী এত পূজ্যা—এত আদরণীয়া—এত স্নেহশীলা।

ভগিনীর দায়িত্ব অতীব গুরুতর। সংসারে চলিবার সময়ে এ হেন ভগিনীকে প্রত্যেক পদক্ষেপে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। যে ভ্রাতা এরূপ স্বর্গীয় স্নেহে বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত, ভগিনীর প্রতি তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। পবিত্র ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পুলকিত প্রাণে ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করা তাহার উচিত। যাহারা এরূপ ভগিনীকে স্নেহ ও সম্মান করিতে জানে না,—পরিবারের ভিতরে নিজের সঙ্গে এমন দেবী লাভ করিয়াও তাঁহার যত্ন ও পূজা করিতে বিমুখ হয়, সে বিবেকহীন ও নীচমতি সন্দেহ নাই। নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি যাহারা উদাসীন তাহারা দেশের ব্যাধি। মঙ্গলময় পিতার সন্তান আমরা—সকল পুরুষ আমাদের সহোদর ও সকল স্ত্রীলোক আমাদের সহোদরা।

বিধান ও বিশ্বমানব

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

বিধান ডাকিয়া কয় বিশ্বমানবেরে—
চিরবন্দী তুমি মোর করে,
দুর্মোচনীয়ের দণ্ড সনে শৃঙ্খলিত
কারারুদ্ধ নিষেধ প্রাচীরে—
তট সম তোমারে ঘেরিয়া
আমি আছি নিত্য দাঁড়াইয়া!

অভিযুক্ত কহে হাসি উপেক্ষার ভরে—
অপ্রমেয় আমি দুর্নিবার,
তোমারে হেলায় গড়ি তরঙ্গ তাড়নে
ফুৎকারেতে করিয়া সঞ্চার
প্রাণবায়ু। আমি ধ্বনি, তার
প্রতি স্বর তুমি মূর্চ্ছনার!

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২২)

সেদিন স্নানযাত্রা। সেবিকা দ্বিতলের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাজপথের পানে চাহিয়া ছিল। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ স্নানান্তে ঠাকুর দর্শন করিয়া ফিরিতেছে। বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও আকাশে সূর্য্য উঠে নাই। সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও মাঝে মাঝে তুষারকণার মত ঝির ঝির করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছে।

উপরের কার্ণিশের উপর একটা কাক বসিয়া ডাকিয়া উঠিল। তাহার কর্কশ স্বরে সেবিকা আকৃষ্ট হইয়া তাহার পানে চাহিল। কাকটা উড়িয়া গেল, সেবিকা অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

মনে পড়িল গত বৎসরের সেই অতীত স্নানযাত্রার কথা। তখন ললিতবাবু জীবিত ছিলেন। সরিত ও অসীম ভোরে এখান হইতে চা খাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, বেলা বারটার সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিয়াছিল। সেই দিনই অসীমের সে কি জ্বর, সেবিকা সেদিন তাহার মাথার কাছ হইতে নড়িতে পারে নাই। জ্বরের ধমকে অসীম তাহার হাতখানা টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়াছিল, কি একটা কথা বলিয়াছিল।

সেবিকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, সেদিন চলিয়া গিয়াছে, আছে শুধু তাহার স্মৃতিখানি। সে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু হৃদয়ের মধ্য হইতে মুছিয়া যাইতে পারে নাই। তাহার ছোট বড় সব কথা গুলিই সেবিকার বক্ষে আঁকা আছে।

মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন? এই পথ দিয়া কোর্টে গেলে সহজ হয়; কিন্তু পাছে সেবিকা দেখিতে পায়, তাই অসীম অন্য পথ দিয়া যাওয়া আসা করে। প্রত্যহ সেবিকা সকল কাজ ফেলিয়া তাহার কোর্টে যাওয়ার সময় ও ফিরিবার সময় এই জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়; অসংখ্য লোক যাতায়াত করে, কই তাহার মধ্যে তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিতের মূর্ত্তিখানি ভাসিয়া উঠে না তো। সেবিকার চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়ে, সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠে "ভগবান।"

তখনই সে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে। ভগবানকে ডাকিয়া সে কি স্বামীর অকল্যাণ প্রার্থনা করিল? ওগো না ঠাকুর—না, সে তোমায় ডাকে নাই। তাহার স্বামী সুস্থ থাকুন, দীপালি ভাল থাক। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ কর। নিজের জন্য সে কিছুই চায় না।

মনকে সংযত করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও আবার যেন যে সে নিয়মিতরূপে এইখানে আসিয়া

দাঁড়ায়, তাহা সে জানে না। সে জানে অসীম কখনও এ পথে আসিবে না, তবু আশার একটা ক্ষীণ জ্যোতি সেই অন্ধকারময় হৃদয়ে আবার ফুটিয়া উঠে, আসিতেও তো পারে। ওদিককার পথটা কোনও রকমে বন্ধ হইয়া যাইতেও তো পারে।"

আজ সে চাহিয়া ছিল অসীম যদি আসে, যদি তাহাকে দেখা যায়। কিন্তু বৃথা আশা। সেই সব অপরিচিতের মধ্যে সেই চিরপরিচিত মুখখানা জাগিয়া উঠিল না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কেন সে দেখিতে চায় অসীমকে? বিনীতার উপদেশ কি সে ভুলিয়া যাইতেছে? একজনের উপর সমস্ত আবেগট ঢালিয়া দিলে যে হইবে না, জগতের উপর এ আবেগ ঢালিয়া দিতে হইবে। এই স্নেহ ভালবাসাটা পুত্রস্নেহে পরিণত করিয়া জগতের উপর ঢালিয়া দিতে হইবে যে। বিনীতা যে বলিয়াছে—কিসের স্বামী, স্বামী যদি হইত কখনও তোমায় ত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত না।

সেবিকা উচ্ছ্বাস পূর্ণ কণ্ঠে আপনাআপনি বলিয়া উঠিল "তবু সে আমার স্বামী, সে যাই করুক, আমায় ঘৃণা করুক, ব্যভিচারিণী ভাবুক, তবু সে আমার স্বামী, আমার সকল দেবতার উর্দ্ধে সে, আমার সকল কাজের শ্রেষ্ঠ কাজ তার সেবা। সে আমার কে—কে জানবে তা? সে যে আমার সর্ব্বস্ব।"

দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নীচে রামলালের ব্যগ্রকণ্ঠ শুনা গেল, "বউমা—বউমা।"

রামলাল অসীমের সহিত যায় নাই। সেবিকাকে নিজের আড়ালে ঢাকিয়া লইয়া সে এই সংসারেই রহিয়া গিয়াছে।

সেবিকা উঠিয়া বারাণ্ডায় গিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি রামলাল?"

রামলাল তাহাকে উপরে দেখিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া আসিল। বলিল "সারদা ঝিয়ের কলেরা হয়েছে, কি করব বলুন দেখি? শুনছি এ কলেরা ভারি খারাপ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মারা যায়। ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়? আমি এ বাড়ীতে ও রকম রোগী রাখতে বড় ভয় পাচ্ছি। ওর ছেলে আছে নারিকেলডাঙায়, সেখানে পাঠিয়ে দিলে হয় না পাল্কীতে করে?"

সেবিকা স্থিরভাবে বলিল "পাঠাতে পারতুম রামলাল যদি ছেলে মায়ের যত্ন করত। তুমি তো জানই সে হতভাগা ছেলে মায়ের গায়ে হাত তুলতে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হয় না। এ রকম অবস্থায় আমি কোনও মতে সে ছেলের কাছে একা পাঠাতে পারব না।"

রামলাল মাথা চুলকাইয়া বলিল "তবে ধর্ম্মশালায়।"

সেবিকা তিরস্কারের স্বরে বলিল "তুমি পাগল হয়েছ রামলাল, সেটা কি আমাদের মনুষ্যত্বের কাজ হবে? সে যখন ভাল ছিল তখন কাজ নিয়েছি, মাইনে দিয়েছি, এইটুকুই কি সম্পর্ক তার সঙ্গে? না, আমি এত দূর হৃদয়হীনার কাজ করতে পারব না। তাকে আমি কোনও রকমে কোথাও পাঠাতে পারব না। সে আজ ব্যারামে পড়েছে বলে তার উপর এমন করে অত্যাচার করতে পারা যায় কখনও? হতে পারে কেউ তার সেবা করবে না; কিন্তু আমি তো আছি রামলাল। জানই তো সেবা কাজটা আমি যত ভালবাসি এত আর কিছু ভালবাসি নে। আমার ভয় নেই, আমিই তাকে নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি।"

রামলাল থতমত খাইয়া বলিল "আপনি—"

বাধা দিয়া সেবিকা বলিল "হ্যাঁ আমিই। বাধা দিয়ো না। জেনো এর মত মহৎ কাজ আর কিছু নেই।"

সে নীচে নামিয়া গেল। সারদা দাসী যে গৃহে থাকিত সেই গৃহে গিয়া দেখিল বড় অপরিষ্কারের মধ্যে সে পড়িয়া আছে। তখনি সে সেসব পরিষ্কার করিয়া রামলালকে দিয়া আলাদা বিছানা আনাইয়া

তাহাকে শোয়াইল। রামলাল ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

"দিদি!

হঠাৎ বহুকাল পরে এ কার আহ্বান? সেবিকা চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল দীপালি। ব্যগ্রভাবে সে গৃহমধ্যে পা বাড়াইতেই সেবিকা বলিয়া উঠিল "এসো না, এসো না, এ ঘরে এসো না।"

দীপালি থমকিয়া দাঁড়াইল।

সেবিকা বাহিরে আসিয়া বলিল "আমার একটী ঝির কলেরা হয়েছে। এদিকে এসো, ওখানে থেকনা, শুনছি এ কলেরা বড় খারাপ।"

দীপালি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি কেন ও ঘরে রয়েছ তবে? অমন রোগীকে কেন বাড়ীতে রেখেছ তুমি?"

সেবিকা হাসিয়া বলিল "আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি যখন সেবাধর্ম্মকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছি, তখন কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি ব্যারামের ভীষণতা দেখে পিছিয়ে গেলে চলবে না। আর কাউকে তা বলে ওসব রোগের কাছে যেতে দিতে পারিনে।"

দীপালি মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেবিকা তাহার হৃদয়ের কথা বুঝিল; সাহস করিয়া বলিল "ভয় কি দীপালি, আমার কিছু হবে না। আমি চিরকাল রোগই মাড়ছি, আমার কোনও রোগ কখনও তো হয় নি।"

দীপালি চোখ মুছিতে মুছিতে অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "এমন করে নিজের জীবন নষ্ট করবার মানে কি? এ রোগ না চেনে এমন লোক কে আছে? পরের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে যাওয়া কেন? বলা যায় কি কখন রোগ শরীরে ঢুকে পড়বে, তখন তোমায় দেখবে কে?"

সেবিকা বলিল "দেখবেন ভগবান, আমি তো কারও কাছ হতে উপকার ফিরে পাব বলে উপকার করতে যাইনে বোন। কেউ আমায় দেখুক না দেখুক, আমি আমার কাজ করে যাব। পর বলছ কাকে? আমরা সবাই এক মা-বাপের সন্তান যে ভাই। ওরা যে আমারই ভাই বোন আমার বড় কাছাকাছি আত্মীয়। জগতে পর কেউ নেই, সব আপন।"

দীপালি স্তব্ধভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল কি স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাহার মুখখানা উদ্ভাসিত। তাহার স্বামী কি জ্ঞানহীন, এমন স্ত্রীকে সে চিনিল না, হীরক ফেলিয়া কাচ তুলিয়া লইয়া সাদরে বুকে পরিল?

সেবিকা বলিল "তুমি হঠাৎ এলে কি করে বোন?"

দীপালি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলুম।"

সেবিকা বলিল "মা আসেন নি?"

দীপালি বলিল "না, তাঁর জ্বর হয়েছে। এখানে সেই করে এসেছি দিদি, তোমায় আর একবার দেখবার জন্যে যে কি ছটফটানি ধরেছিল আমার তা আর বলব কি। ভয়ে কারও কাছে বলতেও পাচ্ছিনে —কারণ সকলেরই সমান ভাব। আজ গঙ্গাস্নান করব বলে ধরে বসলুম। তাঁরাও কিছুতে মত দেবেন না, আমিও কিছুতেই ছাড়ব না। এমনি করে তবে আসতে পেরেছি। সত্যি বলছি দিদি, গঙ্গার উপর ভক্তি আমায় ঘরের বার করতে পারেনি, তোমার উপর ভক্তিই আমায় টেনে এনেছে। আমি তোমায় একবার দেখবার জন্যে পাগল হয়ে গেছলুম।"

সেবিকা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল "কাজটা তোমার ভাল হয় নি বোন। আমি তোমার কে? স্বামী যে নারীর দেবতা, তাঁর কথার অবাধ্য হয়েছ কেন? এ যে মহাপাপের কাজ হয়েছে।"

দীপালি মুখ তুলিয়া বলিল "দেবতা যদি অন্যায় করতে বলেন—জেনে শুনেও সে অন্যায় কাজটা করতে হবে [illegible] এমন কোনও কথা থাকিতে পারে না।"

সেবিকা বলিল "কি অন্যায় বলেছেন ?"

দীপালি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "তোমার কাছে আসতে বারণ করেন কেন ? আমার মন যখন বলছে এটা অন্যায় নয় তখন কেন আমি আসব না ? এ যদি মহাপাপের কাজ হয় দিদি, তবে এ মহাপাপ আমি আদর করে মাথায় তুলে নিলুম, জন্ম জন্ম এই মহাপাপ যেন আমার বহন করতে হয়।"

সেবিকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া গোপনে সে চোখ মুছিয়া বলিল "সঙ্গে কে আছে ?"

দীপালি বলিল "আমি গাড়ীতে এসেছি ; ঝি আছে, তাকে গাড়ীতেই রেখে এসেছি।"

সেবিকা বলিল "এখন চল বোন তোমায় গাড়ীতে দিয়ে আসি। তোমায় এ বাড়ীতে বেশীক্ষণ রাখতে আমার সাহস হচ্ছে না। এ বাড়ীতে আসার অপরাধে তোমায় অনেক কথা সইতে হবে ; আরও এ বাড়ীতে যখন এমন সাংঘাতিক রোগ—"

বাধা দিয়া দীপালি বলিয়া উঠিল "তোমার চেয়ে আমার জীবটা কি এতই মূল্যবান দিদি ?"

সেবিকা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হ্যাঁ, এতই মূল্যবান বোন।"

তাহার মনের কথা দীপালি তখনি বুঝিয়া লইল। দীপালি যে সেবিকার স্বামীর প্রণয়পাত্রী, অসীমের বড় ভালবাসার জিনিস, তাই সেবিকা দীপালিকে বাঁচাইতে চায়, নিজের আড়াল দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে চায়।

দীপালীর চোখ আবার আস্তে আস্তে জলে ভরিয়া উঠিতেছিল ; ধন্য স্বামীর প্রতি ভালবাসা—এখনও এত অচল অটল ! সে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "বড় অসময়ে এলুম দিদি, তোমার বুকের মধ্যে নিজেকে আজ লুকোতে পারলুম না, তোমার স্নেহের চুমো পেয়ে নিজের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করতে পারলুম না। যাবার সময় পা দুখানাও ছুঁতে পারব না দিদি ?"

সেবিকা বলিল, "আমি যে রোগীর বিছানা পরিষ্কার করছি বোন, আজ আমি কোন মতেই তোমাকে তোমায় ছুঁতে দেব না।"

দীপালি নত হইয়া সেই স্থানের ধুলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর দিদি, স্বামীভক্তি যেন অচলা থাকে। আমার শ্রদ্ধা যেন বিন্দুমাত্র হ্রাস না হয়।

সেবিকা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আশীর্ব্বাদ করছি বোন।"

যখন সে তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দেবার জন্য বাহির হইয়াছিল সেই সময় সরিত আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই দীপালিকে দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "এ কি—তুমি ?"

দীপালি ম্লান হাসি হাসিল। নত জানু হইয়া বিস্মিত সরিতের পায়ের ধুলা তুলিয়া মাথায় দিয়া বলিল "বড় আশ্চর্য্যের কথাই বটে এটা না ? কিন্তু ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য নয়। পৃথিবীতে আশ্চর্য্য বিষয় কিছুই নেই—সবই সম্ভব' তা জানেন বোধ হয়।"

তাহার কথার মধ্যে একটুও জড়তা ছিল না। সরিত একবার তাহার দিকে একবার সেবিকার দিকে চাহিতে লাগিল। সেবিকা হাসিয়া বলিল "ঠাকুর পো, দীপালি আমার ছোট বোন। আমায় দেখবার জন্যে আজ সকলের কাছে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছে।"

দীপালি সরিতকে নির্ব্বাক দেখিয়া বলিল "প্রণাম করলুম তাতে আশীর্ব্বাদও করতে পারলেন না যে। হয়তো মনে মনে বল্লেন নিপাত যাও ! যাই হোক, মুখে সেটা প্রকাশ করতে কিছু বাধা নেই আপনার।"

সরিত হতবুদ্ধি হইয়া এই প্রগলভা কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল "তোমাকে সে আশীর্ব্বাদ করবার দরকার আমার ?"

দীপালির কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, তাহার স্বাভাবিক সুস্থ কণ্ঠ ফুটিল না। কেমন যেন একটা কান্নামাখা সুর বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সে বলিল "মানে অনেক আছে। আমিই তো এ সব কাণ্ডের মূল। আপনি ভাবছেন আমি কিছু শুনিনি, কিন্তু তা নয়, সব শুনেছি। প্রথম যদি আমাদের ঘাটে না দেখা হতো, আপনাকে বন্ধু হারাতে কখনই হত না। আপনার অপরাধ আপনি তাঁকে উপদেশ দিতে গেছলেন। দিদি কখনও স্বামী হারাত না, দিদির ছোট খাট ত্রুটী-গুলো তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠত না। সব তো আমারই দোষ। সময় সময় ভাবি যদি আমি মাঝখান হতে সরে যাই তাহলে বোধ হয় আবার আপনাদের মিলন হতে পারে।"

সেবিকা বলিয়া উঠিল "সাবধান দীপালি, সে কথা ভেব না। ভাবনা সর্ব্বনাশের মূল তা জেনো।"

সরিত কোমল কণ্ঠে বলিল "না দীপালি, আমি সে আশীর্ব্বাদ করি নি, কখনও করব না। অসীম যে নিজের ভুল বুঝবেই, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। একদিন সে স্বীকার করবেই আমি তার বন্ধু। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সুখিনী হও, যাকে দিদি বলছ তাকে সুখিনী কর।"

দীপালি অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া বলিল "তাই আশীর্ব্বাদ করুন, দিদিকে যেন সুখী করতে পারি, আমি মাঝখানে এসে পড়ে যে বিভ্রাট বাধিয়েছি, তা যেন আবার ঘুচাতে পারি।"

ধীরে ধীরে সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সরিত সেবিকার পানে চাহিয়া বলিল "বিনীতা, বেলা তিনটের মধ্যেই আসছে বউ-দি। সে এখন দিনকয়েক দিন থাকবে তোমার কাছে, তাই আগে আমি এই নিমন্ত্রণের খবর দিতে এসেছি।"

সেবিকা বুঝিল কেন বিনীতা আসিতেছে। বলিল "আমি তো আছি ঠাকুর পো, রোগীর সেবার অভাব তো কিছুই হবে না।"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল "তা আমি জানি। কিন্তু আমি বুঝলেও সে বোঝে কই? তোমাকে সে একলা ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় না, তোমার অর্দ্ধেক বোঝা সেও মাথায় নিতে চায়। তোমাদের কাজ তোমরাই বুঝবে বউদি, আমি কিছুই জানি নে। আমায় বললে তোমাকে বলে যেতে, আমি বলতে এলুম। দেখে এলুম যে তার হোমিওপ্যাথী বাক্স গুছাতে বসে গেছে। সে এলে বিবেচনা করো দুজনে, আমায় মাঝখানে রেখে গুঁড়িয়ে ফেলবার দরকার নেই কিছু।"

হাসিমুখে সে চলিয়া গেল।

দীপালি গাড়ীতে বসিয়া দেখিল কি মহান ব্রত ইহারা গ্রহণ করিয়াছে। সেবিকা স্বামি-সেবা ছাড়িয়া দিয়া জগতের সেবায় দেহ প্রাণ ঢালিয়াছে। ইহারা কত উচ্চে, সে ইহাদের কত নীচে পড়িয়া আছে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যায় দীপালি মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল সেবিকা সেইখানে সেই ভাবে তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

দীপালির মনখানা সেবিকার প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর্দ্র চিত্তে সে কপালে হাত দুখানা রাখিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আশীর্ব্বাদ কর দিদি, যেন তোমার আদর্শ নিয়ে তোমার পথে চলতে পারি, তোমার পায়ের রেখা আমার সম্মুখ থেকে যেন না মুছে যায়, আমি সেই রেখারই অনুসরণ করে চলব।"

গাড়ী হইতে নামিতেই সে সম্মুখে অসীমকে দেখিতে পাইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

হঠাৎ এত ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া অসীম হাসিয়া বলিল "এ আবার কি?"

"গঙ্গাস্নান করে এলুম কিনা, গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, তাই প্রণাম করলুম।"

হাসিতে হাসিতে দীপালি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

হিন্দুসমাজে বিধবার স্থান

(প্রেরিত পত্র)

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, এম্-আর-এ-এস্।

হিন্দুসমাজে বিধবার স্থান কোথায় এ কথার সুন্দর মীমাংসা এপর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিলেন না। বিধবা হইলে বিধবার শারীরিক, মানসিক শান্তি, সুখ সবই দূর হইয়া যায়, যেন তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম, কেহই তাহাদের প্রতি স্নেহবান নহে। সাধারণতঃ পতিবিয়োগ ঘটিলেই তাহাদিগকে পিতৃ-গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূর গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগ আর তাহাদের ছেলে-মেয়ে পালন করাই তাদের প্রধান কার্য্য। শিশু-বিধবাদিগেরও সামাজিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। অতি গ্রীষ্মের দুর্দ্দিনে শিশু-বিধবাকেও একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপবাস করিতে হয়। এদিনে রোগে ঔষধের ব্যবস্থাও হতভাগ্য-দের নাই। এই অত্যাচার হইতে উহাদিগের রক্ষা পাওয়ারও উপায় নাই।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-সম্মত কার্য্য বলিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কলিতে পরাশর স্মৃতি চলে কিন্তু বিধবার বেলায় পরাশরকেও আমরা গ্রাহ্য করিনা, তাই বলিতে হয় আমরা শাস্ত্রবিধিকেও অগ্রাহ্য করি। তিনি তাঁহার পুত্রের বিধবাবিবাহ দিয়া তৎকালে পতিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে সেই বিধবা-বিবাহকারী পুত্রের পুত্রকন্যাদের বিবাহ শুদ্ধসমাজেই চলিতেছে। বাঙ্গালায় যে অঞ্চলে বেশীর ভাগ বিধবা-বিবাহ হইতেছে সে সকল স্থানে দুইদল, একদল বিধবা বিবাহকারীদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সমাজ করেন না; তবে যাহারা বিধবা-বিবাহকারীদের সহিত আহারাদি করেন তাঁহাদের সহিত তাঁহারা আহার ও সামাজিকতা রহিত করেন না, তাহা করিলে নব্য সম্প্রদায়—পুত্রাদির সহিত পৃথক সমাজ করিতে হয়। সুতরাং প্রাচীনেরা নব্যের সহিত এইভাবে সমাজ গঠন করিতেছেন। তাই বলিতে হয় বিধবাবিবাহ-কারীগণ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে আর তাহা-দিগকে পতিত করিয়া রাখিবার শক্তি কাহারো নাই।

আগে এদেশে সতীদাহ প্রথা ছিল। জোর করিয়া বিধবাকে স্বামীসহ পোড়াইয়া ফেলা হইত। এখনকার বিধবাদের প্রতি অত্যাচার অপেক্ষা তখনকার ব্যবস্থা ছিল ভাল, তিলে তিলে বিধবাকে পোড়াইয়া না মারিয়া একদিনেই তার সমস্ত যন্ত্রণা শেষ করিয়া দেওয়া হইত, সে ছিল ভাল। নিষ্ঠুর, অত্যাচারী সমাজ হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে। আগে এদেশে বিধবাদের পক্ষে দেখিবার কেহ ছিল না, বর্ত্তমান কালে বিধবাদের বিবাহও হইতেছে, তাদের জন্য আশ্রয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বিধবা হইলে সকল সুখ হইতে তারা বর্জ্জিত হয়, সকল শুভকার্য্যে তাদের অধিকার থাকে না। যত কিছু অকল্যাণের জন্য তারা হয় দায়ী, হাহাকার অমঙ্গল হইলে যত অপরাধ হয় তাদের। ঐ সকল অমঙ্গল সৃষ্টির দরুণ শাশুড়ী, ননদী, সকলেই তাহাদিগকে গঞ্জনা দিয়া মারে। সমাজ এইরূপে অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করিতে চাহে না। এখন যেরূপভাবে বিধবাবিবাহ সমাজে চলিতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই তাহা সমাজ প্রচলিত হইয়া যাইবে। হায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি দেখিয়া যাইতেন

যে বিধবার একটা গতি হইতেছে। নব্য সম্প্রদায় উদার হইতেছে, সুতরাং এবার অনেক আশা করা যায়।

মনস্বী ও হিতৈষীগণ স্ত্রী ও বিধবা, সমাজের অধুনা প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ও সদয় ব্যবহার করুন, দেখিবেন স্ত্রীজাতি দ্বারা আমাদের কত উপকার হয়। তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না, মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করুন।

দয়ার ভিখারী

শ্রীমতী মা কুমারী বসু।

ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
প্রকৃতি বিবশা দিশা হারা,
কিছুই দেখিনা আর
জলে জলে একাকার,
বিশ্ব বুঝি গ'লে গেল—রবি, শশী, তারা,
বাদলে ডুবে যে গেল তা'রা!

হেন বরষায় ভিজে ভিজে—
শুনি কার আর্দ্র স্বর কি যে—
"ও গো মা, দুয়ার খুলে
অভাগারে লহ তুলে"
কি ব'লে কাতরে কাঁদে বুঝিনা'ক নিজে
কার ও করুণ রব কি যে!

"মা! আমার কেউ নাই ভবে,
তোমার কি দয়া নাহি হবে?
বাড়ী ঘর মোর নাই
নাহি দাঁড়াইতে ঠাঁই
আপনার কেহ নাই কাছে ডেকে ল'বে,
আমারে কি দয়া মা'র হবে!

"একদিন মা ছিল আমার
আমারে বলিত আপনার,
ভিজিলে বরষা জলে
মুছিত সে স্নেহাঞ্চলে,
কাঁদিলে মুছায়ে দিত নয়ন আসার,
একদিন ছিল মা আমার।

"আজি সেই মা'রে মনে করি
সাধি মা তোদের পায়ে ধরি,
তোদেরো মায়ের প্রাণ,
তাতে তো রক্তের টান?—
শীতে তনু কাঁপে আর শিরে পড়ে বারি,
আজ আমি দয়ার ভিখারী!"

কোথা আছ দেবী করুণার
খো'ল মাতৃ-মন্দিরের দ্বার,
নিরাশ্রয়ে ডেকো কাছে,
ও বুকে যে স্নেহ আছে
দিও তারি এক বিন্দু—'সুধা' নাম যার,
মা হ'য়ে বোসো ও অভাগার।

রন্ধনে সহজ পন্থা

শ্রীমতী সুরবালা দত্ত।

রান্নার সময় আমাদের উনান থেকে র নিচে দিয়ে যে আগুনের শিখা বের হয়ে বাতাসে মিশে যায় ঐ আগুনটুকু বাতাসে মিশতে না দিয়ে কোন কাজে লাগান যেতে পারে এমন উপায় আপনাদের কিছু মনে হয় কি?

আমি আজ একটী নতুন উপায় দেখিয়ে দেবে যাতে আপনাদের ঐ উত্তাপটুকু দিয়ে আরও কিছু রান্না করবার সাহায্য হবে, এতে শুধু ঐ তাপটুকু কাজে লাগবেই—আরও সুবিধার কথা এই যে রান্নার সময়ও অনেকটা বেঁচে যাবে। দু ঘণ্টার কাজ দেড় ঘণ্টায় হবে।

আপনার উনুনের যে ফাঁক দিয়ে ঐ আগুনের শিখা বের হয় ঐ ফাঁক যদি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়, যদি রান্নার পাত্রের তলাটী একেবারে উনুনের মুখে মুখে লাগিয়ে সমস্ত ফাঁকটুকু বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করা যায় তবে কেমন হয়? আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন উনুনের আগুন নিভে যায়। কেন নিভে যায় জানেন কি? কাঠে বা কয়লায় আগুন জ্বালাবার যে জিনিসটুকু আছে শুধু তাতে আগুন জ্বলে না, বাতাসে অক্সিজেন বলে একটি দাহ্য পদার্থ আছে, কাঠে বা কয়লায় ঐ অক্সিজেন না পেলে আগুন জ্বলতে পারে না, কাজেই আবদ্ধ যায়গায় আগুন টেঁকে না, আগুনে একটু বাতাস ঢোকা চাই।

এখন ঐ ছবিটি দেখুন। দুটি উনুন এক সঙ্গে মাটি দিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছে। বাঁ দিকের ঐ উনুনটিতে কয়লার আগুন রয়েছে। উনুনটিতে ঝিঁক দেওয়া হয় নাই, রান্নার হাড়ীটি উনুনের উপর চাপিয়ে দেওয়াতে একটুও উত্তাপ বাইরে যেতে পারছে না। এ অবস্থায় ঐ উনুনের আগুন নিভে যাবারই কথা কিন্তু ঐ উনুনে একটু নতুন কায়দা করা হয়েছে—উনুনের খানিকটা উপরের দিকে
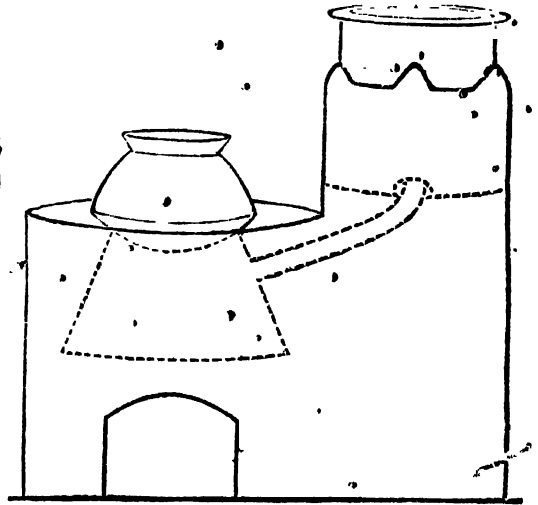
অর্থাৎ হাড়ীর তলা থেকে দুই তিন আঙুল নিচে উনুনের গা থেকে একটি গর্ত্ত করে চোঙ বসিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু উচু ডাইনের উনুনের তলায় নিয়ে সেই চোঙের অপর মুখ বের করা হয়েছে। এতে উনুনের আগুনের ঐ আবদ্ধ আঁচ ঐ চোঙের ফাঁক দিয়ে গিয়ে অপর উনুনটি দিয়ে বের হচ্ছে, এই চোঙের ভিতর দিয়ে বাতাসের সঙ্গে যোগ থাকায় কয়লার উনুনের আগুন রক্ষা করছে, আর চোঙের ভিতর দিয়ে ডাইন দিকের উচু উনুনটীতে যে আগুনের আঁচ আসছে ঐ আঁচটিকে আর একটি কাজে লাগান হচ্ছে। ঐ উনুনের উপর মৃদু উত্তাপে জ্বাল দিবার উপযোগী জিনিস রান্না করা হচ্ছে।

আপনারা যখন এই উনুন তৈরী করবেন তখন মনে রাখবেন প্রথম উনুনটীর উপরের সঙ্গে পাত্রের তলা একেবারে মিলে যাওয়া চাই, একথা আগেই

বলা হয়েছে কিন্তু শেষের উনুনের ঝিঁক বসিয়ে পাত্রের তলা একটু ফাঁক রাখতে হবে নৈলে প্রথম উনুনের কয়লার আগুনে জোর আঁচ হবে না, এমন কি নিভে যেতেও পারে।

এখন প্রথম উনুনটীতে জোর আঁচ আর শেষেরটীতে মৃদু আঁচ হল। ডাল, ভাত, মাছ, মাংসাদি রান্না করতে প্রথমে একটু জোর আঁচের দরকার হয়, পরে জল উথলালে আর বেশী জ্বালের দরকার হয় না এইটা বুঝে, যে উনুনে যখন যেটা রাখা দরকার তেমন করতে হবে। পাত্রে বেশ ভাল ঢাকনা দিয়ে ঢাকা থাকলে অল্প আঁচেই বেশ সিদ্ধ হতে থাকবে।

আর একটি কথা এই যে, যখন মৃদু আঁচের উনুনটী ব্যবহার না করা হবে তখন ঐ উনুনে জল চড়িয়ে রাখা ভাল। গরম জল অনেক কাজে প্রায় সময়ই দরকার হয়। আপনারা বোধ হয় জানেন রান্নায় ব্যঞ্জন প্রভৃতিতে যে জল দিতে হয় ঐটা কাঁচা জল না দিয়ে গরম জল দিলে ভাল হয়, ব্যঞ্জনের স্বাদ বৃদ্ধি হয়।

হালুয়ার সুজী ভাজবার পর যে জল দেওয়া হয় ঐ জল গরম জল হওয়া চাই নৈলে হালুয়া সুস্বাদ হয় না। এইমত ভাত, ডাল বা যা কিছু রান্না করতে যদি শেষে একটু জল দেবার দরকার হয় তবে ঐটী কাঁচা জল দিলে স্বাদের লাঘব হয় আর গরম জল দিলে স্বাদ বৃদ্ধি হয়। এই রকম অনেক কাজে গরম জল দরকার হয়। তাই দ্বিতীয় উনুনটী কাজে ব্যবহৃত না হলে জলপূর্ণ পাত্র ঐ উনুনে রাখা উচিত।

দ্বিতীয় উনুনটীতে যদি জল ফুটবার মত আঁচ উৎপন্ন না হয় তবে আপনি দেখবেন যে প্রথম উনুন হতে আঁচ আসবার মত পথ পরিষ্কার আছে কি না, প্রথম উনুনের ছিদ্র পথটী দ্বিতীয় উনুনের দিকে ক্রমে উঁচু হয়ে চলেছে কি না। দ্বিতীয় উনুনের মধ্যে যথেষ্ট যায়গা রাখবার দরকার নাই কারণ এতে কাঠ কয়লা কিছুই দিতে হয় না—সামান্য একটু ফাঁক তলায় থাকলেই চলবে। প্রথম উনুনের আঁচ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় উনুনের পাত্রের তলার সামান্য স্থানের বাতাস টুকু আগুনের মত গরম হয়ে পাত্রের তলার ফাঁকের চারি পাশ দিয়ে বের হওয়া চাই।

সিদ্ধের কাজটা মৃদু আঁচেই ভাল হয় আর মৃদু আঁচের সিদ্ধ রান্না পাকস্থলীতে গিয়া সহজে পরিপাক হয়। ডাল, মাংস প্রভৃতি মৃদু আঁচে অতি সুন্দর রূপ সিদ্ধ হয়।

বেগুন, আলু, পটোল, কাঁচকলা প্রভৃতি পুড়িয়ে খাবার জন্য এই দ্বিতীয় উনুনটীর ভিতরে রাখলে অতি চমৎকার সিদ্ধ হবে। অথচ একটুও পুড়ে যাবার ভয় নাই। উনুনের মধ্যে তরকারীগুলি রেখে উপরে একটা ঢাকা দিতে হবে। এই মত দ্বিতীয় উনুনটি আপনার অনেক সুখাদ্য প্রস্তুতে সহায়তা করবে।

পাঠিকাগণ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে এরূপ একটি উনুন তৈরী করুন, দেখবেন আপনাদের অনেক সুবিধা হবে, অনেক সময় বাঁচবে, কম কয়লা খরচে অনেক ভাল রান্না হবে।

এই রকম উনুনে রন্ধন করে কি সুবিধা হচ্ছে জানলে আমরা সুখী হব। কোন অসুবিধা হলে তাও আমাদের জানাবেন, আমরা প্রতিকারের উপায় বলে দেব। চিঠিপত্র মাতৃ-মন্দির কার্য্যালয়ে দিলেই চলবে।

দোষ ও তাহার শাস্তি

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, এম-এস্-সি।

দোষ কাহাকে বলে—

যাহা করা উচিত তাহা না করা বা তাহার প্রতিকূল আচরণ করার নাম দোষ।

দোষ কয় প্রকার—

সাধারণতঃ দোষ তিন প্রকার, যথা—অপরাধ (crime), পাপ (sin) ও অপকর্ম (vice). রাজা নিজ রাজ্যের সুশাসনের ও প্রজাপালনের জন্য প্রজাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, তাহা পালন না করা বা তাহার ব্যতিক্রম করা crime, ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের ও ভগবানকে উপলব্ধি করিবার জন্য কতকগুলি বিধি নিষেধ লেখা থাকে সেগুলি পালন না করা sin; আর বিবেক যাহা করিতে বলে তাহা পালন না করা বা তদ্বিপরীত আচরণ করাকে vice বলে।

দোষের মূল—

দোষ যত প্রকার শ্রেণীতেই বিভক্ত হউক না সকলের মূলেই বিবেকেরই প্রাধান্য দেখা যায়। রাজা যে সমস্ত বিধিনিষেধ করেন তাহা বিবেকের ভিতর দিয়ে, শাস্ত্র যে সমস্ত বিধিনিষেধ করেন তাহাও বিবেকের সাহায্যে, সুতরাং বিবেকের বাণী লঙ্ঘনই দোষ তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, মানব শৈশব হইতে বিবেকের বাণী প্রথম লঙ্ঘন করিতে শিখে এবং তাহারই ফলে সে ক্রমে শাস্ত্রাদেশ ও রাজাদেশ অবহেলা করিতে সাহস পায় এবং নানা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

দোষের হেতু—

মানব দোষ করে কেন এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায় যে, মানবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অতীব সতেজ, তাহারা চায় ভোগ কিন্তু ভোগে তৃপ্তি কখনও হয় না, একটীর পর আর একটী তারপর আর একটী এইরূপ করিয়া ভোগের বাসনা মানবকে অস্থির করিয়া তুলে। বিবেক ও ভোগবাসনার মধ্যে একটা বিষম সমর বাধিয়া যায়। যাহাদের বিবেকের স্ফূরণ হয় নাই তাহারা বাসনার দাস হইয়া পড়ে এবং হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া নানা অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলে যখন সে বুঝিতে পারে বিবেকের বিধি নিষেধ কি তখন আর প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না।

দোষের মাত্রা—

বিবেকের বাণী লঙ্ঘন করা দোষ এবং প্রতিকূল আচরণও দোষ কিন্তু লঙ্ঘনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইহার গুরুত্ব ও মাত্রা ঠিক করিতে হয়, নচেৎ শাস্তি দিবার সময় লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইয়া পড়ে। যখন মানবের দোষ লইয়া বিচার করিতে হয় তখন দেখা উচিত—

(১) তাহার বিবেকের স্ফূরণ হইয়াছে কি না অর্থাৎ দোষটিকে দোষ বলিয়া সে জানে কি না?

(২) দোষ বলিয়া জানিয়াও সে ইচ্ছা করিয়া করিয়াছে কি না?

(৩) ইচ্ছা করিয়া করিলেও দেখিতে হইবে যে সেই ইচ্ছাকৃত দোষ অভ্যাসজনিত, না, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করা।

(৪) তার পর দেখিতে হইবে যে দোষটী করিবার সময় হঠাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, না, ভিতরে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি লইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছে।

(৫) তার পর দেখিতে হইবে যে দোষ সে করিল তাহাতে তাহার নিজের ক্ষতি কত দূর

এবং তাহার তুলনায় অপরের ও সর্ব্বসাধারণের ক্ষতি কতদূর।

(৬) তার পর দেখিতে হইবে এই দোষের জন্য পূর্ব্বে তাহাকে শাসন বা নিবারণ করা হইয়াছে কি না এবং তাহা তাহার অভ্যাস নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট কি না।

(৭) তার পর দেখিতে হইবে যে তাহাকে ক্ষমা করা যায় কি না। ক্ষমা করিলে তাহা সাধারণের ক্ষতিকর হইবে কি না।

(৮) তার পর দেখিতে হইবে যে তাহাকে ক্ষমা করিলে পরে আবার সেই দোষ সে করিবে কি না। অনুতপ্ত দোষী ভিন্ন অপরকেও ক্ষমা করিলে তাহার সেই দোষ আবার করিবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং সে অনুতপ্ত কি না তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৯) দণ্ড যাহা দেওয়া হইবে তাহা তাহার দোষ সংশোধনের পক্ষে যথেষ্ট কিনা।

শাস্তি কি ও তাহার প্রয়োজনীতা—

প্রবৃত্তি হইতে দোষের উদ্ভব সুতরাং মন সংযত করিতে না পারিলে দোষ দূর হয় না। মনের বায়ু ক্ষিপ্র গতিতে চলে এবং তাহা রোধ করিয়া অন্যদিকে ফিরান দুরূহ ব্যাপার। যতক্ষণ না দোষকে দোষ বলিয়া বুঝা যায়, যতক্ষণ না কৃতদোষের জন্য মনে অনুতাপ না আসে ততক্ষণ দোষ দূর হয় না। প্রকৃত অনুতাপই হৃদয় পরিবর্ত্তনের উপায়। সুতরাং যাহা দ্বারা মনে কৃতদোষের জন্য অনুতাপ আনিতে পারা যায় তাহাই শাস্তি। শাস্তি দিবার সময় দেখিতে হইবে কতটুকু শাস্তি দিলে তাহার অনুতাপ আসিতে পারে।

শাস্তি কয় প্রকার—

শাস্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। শরীরের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে যখন মানসিক শাস্তি দ্বারা কিছু হয় না তখন শারীরিক শাস্তি দিলে শরীরের ব্যথা প্রযুক্ত মনের উপর আঘাত অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। শারীরিক শাস্তি একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান হওয়ায় এবং ইহার স্মৃতির সহিত অনেকগুলি বস্তুর ও ব্যাপারের স্মৃতি বিজড়িত থাকায় মনের উপর ভয় ও আঘাত বেশী এবং ভারী হয়, তাই শারীরিক শাস্তির জন্য ভয়ে দোষী দোষ করিতে বিরত হইয়া থাকে এবং কিছুদিন মনকে সংযত করিয়া রাখিলেই আর সে দোষ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, প্রবৃত্তি আপনা হইতেই দমন হইয়া থাকে।

কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত—

স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কিরূপ শাস্তি কাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ঠিক করিতে না পারিলে ফল বিষময় হইয়া উঠে। ছোট ছেলেদের মন চঞ্চল সুতরাং তাহাদের শাস্তি লঘু গুরু যেরূপই হউক তাহারা শীঘ্রই তাহা ভুলিয়া যায় কিন্তু যেমন সে বড় হইতে থাকে বা বুদ্ধিতে প্রখর হইতে থাকে তেমনি অভিমান মনের কোণে বসিয়া বসিয়া তাহাকে শাস্তির গুরুত্ব বুঝাইয়া দেয় এবং অবাধ্য হইতে উত্তেজিত করে। শাস্তির উদ্দেশ্য যখন দোষীর দোষ দূর করা এবং অনুতপ্ত করিয়া তাহাকে সংশোধন করা তখন 'দোষের মাত্রা' বুঝিয়া প্রথমে লঘু শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত। তাহাতে যদি না হয় তখন বেশী শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু গুরুতর শাস্তি দিবার সময় পরামর্শ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মানুষ মাত্রেই ভ্রান্ত, সুতরাং বিচারের ভুলে লঘু পাপ গুরু বলিয়া জ্ঞান হইয়া যেন একজনের জীবন বিফল হইয়া না যায়, তদ্দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মানসিক শাস্তির ভিতরও গুরুতর শাস্তি অনেক আছে এবং শারীরিক শাস্তিরও গুরুতর অনেক আছে সুতরাং বিচার পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় তাহাই করা বাঞ্ছনীয়। বিচারকের মত দোষ দেখিলেই যমদণ্ড হাতে লইলে চলিবে না, পাত্রবিশেষে তাহার ব্যবহারের পার্থক্য

রাখিতে হইবে এবং গুরুতর ভাবে নিক্ষেপের সময় বিচার ও পরামর্শ করিতে হইবে।

শাস্তি দিবার অধিকারী—

অধিকারী তিনিই যিনি প্রশান্ত চিত্তে শাস্তি দিতে পারেন। অপরাধীর মঙ্গলকামনায় ক্রোধের বশীভূত না হইয়া যিনি শাস্তি দিতে পারেন তিনিই শাস্তি দানে অধিকারী। মানুষ মাত্রেরই ক্রোধ হয়। সুতরাং যে সময় ক্রোধ হয় সে সময় শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। শাস্তি দানের অধিকারী তিনিই যিনি শাস্তি দানের পরমুহূর্ত্তেই অপরাধীকে বুকে টানিয়া লইতে পারেন। মানুষ মাত্রেই অল্প বিস্তর দোষী, দোষকে ঘৃণা করিতে পারি কিন্তু দোষীকে আমরা ঘৃণা করিতে যেন না শিখি—দোষীকে দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজন বোধে কি যথাসময়ে তাহকে শাস্তি দিতে হইবে কিন্তু সে কথা যেন আমরা পরমুহূর্ত্তেই ভুলিয়া যাই এবং আবার আমরা পরস্পরে আনন্দে দিন কাটাইতে পারি। যদি দোষীর দোষের কথা মনে রাখিয়া তাহার উপর চির বিদ্বেষের ভাব পোষণ করা যায় তাহাতে মঙ্গল হইতে পারে না। বিদ্বেষ বিদ্বেষই সৃষ্টি করে, মঙ্গলের সৃষ্টি করে না। যিনি দোষ শোধন করিবার জন্য কঠোর ভাব দেখাইতে পারেন কিন্তু হৃদয়ে স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ণ রাখিতে পারেন, কল্যাণ হইতেছে কি না সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারেন, তিনিই শাস্তি দিবার অধিকারী।

—আশ্রম

সার্থকতা

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কবিগুণাকর, বি-এ।

ভেঙ্গে গেছে মোর পুষ্পপাত্র
মঙ্গল ঘট চূর্ণ,
শূন্য আমার পূজা-মন্দির
আবর্জ্জনায় পূর্ণ!
একটুকু শুচি ঠাঁই নাই নাই,
তোর মা প্রতিমা কোথায় বসাই?
উদাস নয়নে চাহি চারিদিতে
বল্ কি করিব, জননি?
অয়ি দীন-হীন-জন-শরণি!

কোথা খুই বল্ ও পদকমল
ভাবিয়া পাইনা পন্থ
কি আছে আমার? করিয়াছি সার
মাত্র জীর্ণ কঁথা।

তবে ভক্তের বাঞ্ছা বুঝিয়া
যদি ঠাঁইটুকু নিস্ মা খুঁজিয়া,—
দীনের দেউলে হ'স মা উদয়
ধন্য হব গো জননি!
অয়ি দীন-হীন-জন-শরণি!

না, না মহামায়া ভ্রান্তি আমার
ঘুচাইয়া দে মা তূর্ণ,
কে বলে শূন্য মন্দির মোর
তোর ও রূপেতে পূর্ণ!
তুই যে আছিস্ সকল ঘটেতে
মঠেতে মাঠেতে অথবা বটেতে—
শুচি ও অশুচি সব ঠাঁইটিতে
জুড়িয়া নিখিল ধরণী,
অয়ি দীন-হীন-জন-শরণি!

বীর নারী

শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।

নর্দাম্বার্ল্যাণ্ডের নিকট ফার্ণি-দ্বীপে একটি আলোকমঞ্চ ছিল। ডার্লিং নামক একজন প্রবীণ নাবিক ঐই আলোকমঞ্চের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী ও গ্রেস্ নাম্নী বীর-হৃদয়া কিশোরী কন্যার সহিত তথায় বাস করিতেন।

১৮৩৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে ভীষণ ঝড় উঠে। এই ঝড়ে পড়িয়া ফর্ফার্সায়ার নামক একখানি জাহাজ ফার্ণিদ্বীপের আলোকমঞ্চ হইতে মাইলখানেক দূরে জলমগ্ন হয়। অধিকাংশ আরোহীই প্রাণত্যাগ করে; মাত্র নয় জন নরনারী ভগ্ন জাহাজের একাংশ আঁকড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত রাত্রি মৃত্যুর কালগ্রাসের মধ্যে থাকিয়া কোনওক্রমে বাঁচিয়াছিল। প্রভাতে অন্ধকারের অবসানে গ্রেস্ একটি দূরবীক্ষণ লইয়া আলোকমঞ্চে আরোহণ করিয়া ইহাদের দেখিতে পাইল। তখনও ঝড় থামে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। আর কিছু সময় থাকিলে যে এই নয়টি প্রাণীও ইহলীলা সংবরণ করিবে তাহা বুঝিতে গ্রেসের বাকী থাকিল না। বালিকা হইলেও গ্রেস্ যেমন করুণহৃদয়া তেমনি সাহসিকা ছিল। সে নিজের প্রাণবিনিময়ে এই হতভাগ্য নরনারী কয়টীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে সঙ্কল্প করিল। পিতামাতার নিকট প্রস্তাব করিলে তাঁহারা কিছুতেই সম্মতি দিতে চাহিলেন না, কারণ সে এরূপ ভীষণ ঝড়ে নৌকা ছাড়িলেই তাহা জলমগ্ন হওয়া প্রায় নিশ্চিত। পিতামাতার সম্মতি না পাওয়ায় বীর্য্যবতী কিশোরী বলিল "পিতা যদি আমার সঙ্গে না যান্ আমি একা যাইব, তবু এই হতভাগ্যদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না।" বালিকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তাহার পিতা অবশেষে যাইতে সম্মত হইলেন। তখন মাতার সাহায্যে আলোক-মঞ্চের নৌকাখানি সমুদ্রে ভাসাইয়া গ্রেস্ পিতাকে লইয়া অগ্রসর হইল। ভীষণ ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গের সহিত কঠোর পরিশ্রমে যুঝিয়া অবশেষে তাহারা জাহাজের ধ্বংসাবশেষের নিকট পৌঁছিল এবং পুনরায় সেইরূপ করিয়া যুঝিতে যুঝিতে নয়টি মৃতকল্প নরনারীকে লইয়া ভগবানের বিশেষ কৃপায় আলোকমঞ্চে ফিরিয়া আসিল।

ফরাসী-ট্রেণে দুইদিন

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

সৈয়দ বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে ক্রমাগত ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়ে সাতদিনের দিন সকালে আমরা মার্সেলস বন্দরে পৌঁছলাম। মার্সেলস ফরাসীদেশের অন্তর্গত ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন বন্দর। ধীরে ধীরে ডকের মধ্যে আমাদের জাহাজখানি প্রবেশ করছিল, চারদিকে জাহাজ, বোট, মালের আফিস প্রভৃতির বিশালতা দেখে সত্যিই আমার একেবারে তাক লেগে গেল। ডকের ভিতর ছোট বড় অনেক মাল-বোঝাই বোট এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল, মানুষে তার একখানিও বাইছিল না, সবই ছোট ছোট কলের বোটে টানাটানি করছিল। মুটে-মজুরে কাজ করছে—সেও কলের মত, এত দ্রুত যেন বায়স্কোপের ছবি দেখছি। তাদের কলকৌশল গুলিও চমৎকার। তারা একটা কলের মুখে পিঠ রাখামাত্র উপর থেকে এক একটা বস্তা পিছনে এসে তাদের পিঠে পড়ছে, তখনি তারা সেগুলো নিয়ে দৌড়ে গিয়ে রেখে আসছে। এই রকম শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তারা খুব দ্রুত মাল টানাটানি করছে। তাদের সেই তাড়াতাড়ি ফেলবার মুখেই মালগুলো চমৎকার সাজান হয়ে যাচ্ছে। উপরে ছোটবড় দু-রকম রেলগাড়ী, সদর রাস্তায় ট্রাম গাড়ী—এসবই জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছিল। খুব ছোট ছোট এক রকম কলের গাড়ী যে কোন জমীর উপর দিয়ে মাল নিয়ে যাতায়াত করছিল। চারদিকেই যেন এক কর্ম্মব্যস্ততার পুরী।

জাহাজ ডকে ভিড়বামাত্র জাহাজের এজেন্ট কুক কোম্পানী, কক্স কোম্পানী প্রভৃতির কর্ম্মচারী-গণ আপন আপন পার্টির প্যাসেঞ্জারদের সাহায্য করবার জন্য জাহাজে এল। আমরা দশ-বার জন মার্সেলস পর্য্যন্ত টিকিট কিনেছিলাম, তাদের সাহায্যে এখান থেকে আমরা রেলপথে লণ্ডন যাবার বন্দোবস্ত করলাম। বেলা ৩টার সময় ট্রেণ ছাড়বে, এই অবকাশে বেলা এগারটার সময় আমরা মার্সেলস সহরটি দেখতে বের হলাম। প্রথমেই আমরা ডাকঘরে গেলাম। ডাকঘরের একটি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে ইংরাজী জানা কে আছেন? আফিসের একটি মেয়ে-কর্ম্মচারী অতি কষ্টে জানাল যে ইংরাজী-জানা বর্ত্তমানে এখানে কেউ নেই। মেয়েপুরুষে প্রায় সাত-আট জন ফরাসী কর্ম্মচারী তখন ডাকঘরে কাজ করছিল কিন্তু তাদের একজনও ইংরাজী জানে না শুনে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হলাম। আমার ধারণা ছিল ইংরাজীটা ইউরোপের সকল জাতিই ভালভাবে জানে; পরে জানলাম যারা বিদ্যা-ব্যবসায়ী অথবা যাদের ব্যবসায় সম্পর্কে ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা তাদের কেউ কেউ মাত্র ইংরাজী শেখে। ফরাসীদের ভাষার উচ্চারণ অনেকটা মিশরীদের মত। মিশরীদের উচ্চারণের সঙ্গে আবার কাবুলী উচ্চারণের আভাষ পাওয়া যায়, যেমন আমাদের বাংলা থেকে যত উত্তর-পশ্চিম ততই মানুষের আকৃতি প্রকৃতি ভাষা প্রভৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে অবশেষে ইংরাজীভাবে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সময় সংক্ষেপ বলে এখান থেকে কোন চিঠিপত্র না দিয়েই আমরা সহর দেখতে চললাম। কলিকাতা হাওড়া পোলের দক্ষিণে Strand Road এর পশ্চিম ধার দিয়ে কয়েকটা বড় বড় মালগুদাম দেখা যায়, ঐ ধরণের গঠনে পাথরের ইটে তৈরী পাঁচতলা, ছয়তলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালগুদাম সব রাস্তার দুধারে দণ্ডায়মান—এক একটা বোধ হয় আধ মাইল লম্বা হবে। যতদূর নজর চলে এই

ভাবেই চলেছে। এটা পাহাড়ে দেশ, তাই কোন-কোন খানে সহর খুব উঁচুনিচু। উঁচু আমাদের বাড়ীগুলো অপেক্ষাকৃত লম্বায় কম। সমুদ্রের তীরে এক স্থানে যুদ্ধের গোলাগুলি প্রভৃতি সাজান রয়েছে। একঘণ্টা সহর দেখে আহারাদি করে প্যারিস-লাইনে ট্রেণ ধরবার জন্য ষ্টেশনে যাত্রা করলাম। আড়াই মন ওজনের দুটি বড় ষ্টিল ট্রাঙ্ক আর ত্রিশ সের ওজনের একটা বিছানাপত্রের মোট আমার সঙ্গে ছিল। একটি ফরাসী মুটে কোন কথা না বলে একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে ট্রাঙ্ক দুটোর হাণ্ডল বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, বিছানা মোট দুটি দুহাতে নিয়ে অনায়াসে জাহাজের উপর থেকে নিচেয় নাবিয়ে দিল। তার জন্য সে এক শিলিং নিল। এখানে ফরাসী মুটের ভদ্রতার কথা একটু বলি। ষ্টীল ট্রাঙ্ক দুটিতে জুয়েলারী অলঙ্কার ছিল বলে রেলকোম্পানী উহা নিতে অস্বীকার করল। সে দুটিকে আবার জাহাজে তুলবার জন্য সেই মুটেকে খুঁজে আনলাম। সে উহা পুনরায় জাহাজে তুলে দিয়ে এল কিন্তু তার জন্য কি দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই নিল না। সে মনে করল যে, মালটা নাবান যখন কাজের হলনা তখন বিনামূল্যেই আবার তুলে দেওয়া তার উচিত। আমাদের দেশের মুটে হলে প্রত্যেক বারেই একটু-না-একটু ঝগড়া করতে হত। যে দেশের মুটেরাও এত উন্নত প্রকৃতির সে দেশ উন্নত হবে না কেন?

এখানকার ট্রেণে 1st, 2nd, 3rd—তিন রকম Classএর গাড়ী আছে। আমার যদিও 3rd Classএ গেলে কম খরচে হত কিন্তু সঙ্গী সাহেবদের সঙ্গে মিলে 2nd Classএর টিকিটই কিনতে হল। মার্সেলস থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড ভাড়া লাগল। ফ্রান্স দেশের প্রচলিত মুদ্রার নাম ফ্রাঙ্ক, ৭০ ফ্রাঙ্কে ১ পাউণ্ড (১৫ টাকা)। 2nd Classএও বড় কম ভীড় নয় দেখলাম। এখানকার গাড়ীগুলো খুব সুন্দর। দেওয়াল গুলো সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত পরদায় ঢাকা, বসবার গদিগুলো কার্পেটে ঢাকা। চারদিকের দেওয়ালে রেল কোম্পানীর প্রধান প্রধান স্থানের, উল্লেখযোগ্য দৃশ্যাবলীর চমৎকার ছবি দিয়ে সাজান। আমাদের ট্রেণখানার নাম P. L. M. Mail অর্থাৎ প্যারিস-লিয়ন-মেডিটারনিয়ান মেল। ঠিক দুটার সময় ট্রেণ ছাড়ল। অনেকখানি পথ সহরের উপর দিয়ে ট্রেণ চলল বলে সহরটার শেষ অংশ পর্য্যন্ত আমরা বেশ ভাল করে দেখতে পেলাম। কয়েকটা ষ্টেশন গিয়েই যখন ট্রেণ পল্লীর ভিতর দিয়ে চলল তখন পল্লীবাসীদের অবস্থান, বাড়ী ঘর, বাগান প্রভৃতি দেখে বাস্তবিকই খুব আনন্দিত হলাম। আনন্দ—তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ দেখে। ভাল করে দেখবার জন্য আমি গাড়ীর ভিতরে না থেকে বাইরে যে এক ধারে চলবার পথ আছে সেখানে বসলাম। সে পথ বেশ প্রশস্ত, এক ধারে একজন লোক বসলেও লোকের গতিবিধির কোন ব্যাঘাত হয় না। সমস্ত গাড়ীই কাঁচের আবরণে ঢাকা কারণ ঠাণ্ডা দেশ, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

পাহাড়িয়া দেশ, দূরে নিকটে কেবলই পাহাড়। মাঝে মাঝে গাড়ী পাহাড়ের এমন সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে অন্ধকার হয়ে থাকছিল। এই রকমে কখন পাহাড়ের নিচে দিয়ে, কখন পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখন শস্যক্ষেত্র দুধারে রেখে আমরা চলছিলাম। সারা পথেই কোথাও ফাঁক ফাঁক, কোথাও ঘন সন্নিবেশিত গৃহস্থ-ভবন। সব বাড়ীই ছোট ছোট এবং এক ভাবের। সমস্ত বাড়ীর দেওয়ালই পাথরের বা পাথুরে মাটীর, উপরে চারিদিকে ভাঁজ করা ঢালু পাথরের টালির ছাদ। ফাঁকা জমীতে শস্য-ক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়ীগুলো অবস্থিত। কোন বাড়ীর কোনখানেই একটুও অপরিষ্কার নয়, একেবারে ছবিটার মত সাজান।

স্ত্রী পুরুষ সবাই জমীতে কাজ করছে। সেই পাথরের জমীতে মেয়েরাই কোদাল ধরে কোপাচ্ছে। বড় বড় জমীগুলিতে পুরুষরা ঘোড়ায় টানা এক রকম বড় লাঙলে চাষ করছে। এক টুকরো জমীও পতিত নেই, কোনগুলি শস্যে ভরা, কোনগুলিতে চাষ হচ্ছে। শস্যের গাছগুলি খুব ছোট, আমাদের দেশের ছোলা মশুর প্রভৃতি গাছের মত। ট্রেণে সাহেবদের কাছে এত ছোট শস্যের গাছের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, শস্যের গাছ বড় করলে জমীর উর্ব্বরতা-শক্তি অনেক নষ্ট করে, কাজেই কম ফসল পাওয়া যায়। এইজন্যই এরা কৌশল করে গাছ ছোট রেখে ফসল বেশী পাবার ব্যবস্থা করেছে। কোন কোন ফসলের গাছের খুব ছোট অবস্থায়ই মাথা কেটে দেয়, তাতে গাছ আর উঁচু হতে পাবে না, এবং তার ফসল খুব বেশী পরিমাণে হয়। কোন কোন শস্যক্ষেত্রের মাঝে শস্যের গাছের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় ফলের গাছ দেখা গেল। এত পথ চলে কোথাও একটি অকেজো গাছ দেখলাম না। এক রকম সরু লম্বা ঝাউ গাছের মত গাছ দেখলাম, সেগুলোকে অকেজো গাছ বলেই মনে হল, পরে জানলাম আমাদের দেশের বাঁশের মত কাজ এই গাছ দ্বারা করা হয়। প্রত্যেক গাছ, চারা, এমন কি ফসলের গাছটি পর্য্যন্ত সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ করে সাজান। এতে জমীর মনোহর সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। মনে হয় এদের প্রত্যেক চারাটিও গোণা-গাঁথা, নম্বর দেওয়া। পুরুষ চাষীদের পোষাক অত্যন্ত সাদাসিধে কিন্তু মেয়েদের পোষাক খুব উচ্চ শ্রেণীর। আমরা জানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে কেবল বাবুগিরি করা চলে কিন্তু কেমন করে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে শ্রমসাধ্য কাজ করা যায় তা এদেশের মেয়েদের কাজ দেখলে বোঝা যায়। আমাদের দেশে এটা নিতান্তই দুর্লভ কারণ ভদ্রঘরের মেয়েরা সাফ কাপড় পরে বসে কাটায় আর ছোট ঘরের মেয়েরা ময়লা কাপড় পরে শ্রমসাধ্য কাজ করে।

কি কঠোর পরিশ্রম করে যে এরা এই পাথরের উপর চাষ ক'রে সোনা ফলাচ্ছে তা দেখলে অবাক্ হতে হয়। পাথুরে জমীতে চাষ করছেই, আবার উপরের পাহাড় কেটে জমী সমান করে ধাপ ধাপ সিঁড়ির মত করে তাতে চাষ দিয়ে ফসল জন্মাচ্ছে। নীচে থেকে জল তুলে সেখানে দিতে হয়। কেবল পরিশ্রমের গুণেই এরা মানুষের মত মানুষ হয়ে টিকে রয়েছে। দেশের ভদ্র, চাষা সকলেই পরিশ্রম করে। ষ্টেশনে প্রায় স্ত্রীপুরুষ সকল লোকেরই হাতে কাঁধে, জিনিসের মোট। ষ্টেশনে মুটের হাঁকাহাঁকি নাই। স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকেই নিজের মোট নিজেই বহন করে নিয়ে চলেছে। যেগুলি অত্যন্ত ভারী মোট সেগুলি ছোট কলের গাড়ীতে করে ষ্টেশনের বাইরে এনে দিচ্ছে। শুনেছিলাম ফরাসী-মেয়েরা নাকি খুব বিলাসী. কিন্তু বিলাসিতার লক্ষণ বেশী কিছু দেখলাম না, তবে পারিপাট্য বড় চমৎকার।

ট্রেণের দুধারে চাষের জমী, তার মধ্যে মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপনের বোর্ড টাঙ্গান রয়েছে Liptons Tea, Dewars Whisky প্রভৃতির বিজ্ঞাপন সারা জগৎ জুড়ে রয়েছে। এখানকার বড় বড় ষ্টেশনগুলো যেন এক-একটি বড় বড় সহর। মাঝে মাঝে দুধারে নির্জ্জন গ্রামপথ দেখা যাচ্ছিল, সেগুলো বড়ই মনোহর। পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝরঝরে—যেন এখনি তৈরী হল। খানিকটা যাবার পর দেখলাম রেলের ধার দিয়ে একটি সুন্দর ছোট নদী সেই পাহাড়-পথে এঁকে বেঁকে চলেছে, নদীটির উপর মাইলে অন্ততঃ দু-তিনটি করে সুন্দর পোল। ট্রেণ প্রায়ই পল্লীর ভিতর দিয়ে চলছিল তবু পল্লী-পথে মটরগাড়ী, মটর সাইকেল প্রভৃতির অভাব দেখলাম না। বড় বড় পল্লীর ভিতর এক-একটি উঁচু চূড়াওয়ালা গির্জ্জা ঘর দেখা গেল।

সন্ধ্যার আগেই ট্রেণ লিয়ন সহরে প্রবেশ করল। লিয়ন ফ্রান্সের একটি প্রধান সহর। সহরের

মাঝখানে যেখানে আমাদের ট্রেণ একটু পোলের উপর দিয়ে নদী পার হল সেখানকার ও সেই নদীর সৌন্দর্য্যের কথা ভুলবার নয়। যেন হঠাৎ একটা কল্পনার অতীত 'স্বর্গধামের' মধ্য দিয়ে আমরা চলছিলাম। সেখানকার নদী, জাহাজ, দুরস্থ পৃথক পোলের উপরের জনতার শ্রেণী আর ট্রামের গতি, সহরের সুদীর্ঘ রাজপথ-পার্শ্বে অট্টালিকা সমূহ একেবারে আমাকে মুগ্ধ করে তুলল। অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ লিয়নের একটি ষ্টেশনে ধরল। এখানে ট্রেণ পনর মিনিট দাঁড়িয়েছিল। লোকজন এই অবকাশে প্লাটফরমে নেমে বিকালের জলযোগ শেষ করে নিল। আমি মাত্র পাঁউরুটি ও দুটো কমলা লেবু খেলাম। এই লেবুগুলি সম্ভবতঃ আফ্রিকা থেকে আনা। আমাদের দেশের শ্রীহট্টের লেবুর মত মিষ্টি নয় বটে কিন্তু বেশ তৃপ্তিকর খাদ্য। এক একটি লেবুর দাম দেড় ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় পাঁচ আনা। এর পর ট্রেণ লিয়নের বড় ষ্টেশনটিতে গিয়ে ধরল। লিয়ন আমাদের কলিকাতার মত প্রসারিত না হলেও চার-পাঁচ মাইলের ভিতর খুবই আঁটা সহর। এটি খুব সুন্দর সহর। যেমন আমাদের দেশের তাজমহলের ছবি মনের পরদায় ফটো হয়ে রয়েছে, যেমন পরেশনাথ পাহাড়ের উপরের দৃশ্যটি মনে আঁকা রয়েছে, এই লিয়ন সহরের দৃশ্যও তেমনি মনের মধ্যে ছবি হয়ে রইল। আমাদের গাড়ীখানির দেওয়ালেও লিয়ন সহরের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা ছিল।

সন্ধ্যার পর আমাদের প্রত্যেকের শোবার জন্য 'সিট' Reserve করা হল অর্থাৎ প্রতি বেঞ্চে দু-জন করে শোবার বন্দোবস্তে প্রত্যেকের স্থানের উপরে একটা কল ঘুরিয়ে Reserved মার্কা বের করা হল, তাতে প্রত্যেকের নাম ও টিকিটের নম্বর লিখে দেওয়া হল। সারারাত্রি আমরা বেশ আরামেই ঘুমিয়ে কাটালাম। ভোর পাঁচটায় আমরা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরে উপস্থিত হ'লাম।

ট্রেণ ষ্টেশনে আসতেই সাহেবরা চা পান করলে, আমি সামান্য কিছু খাবার খেলাম। নানা ধরণের খাবার জিনিস থরে থরে সাজান, আমার কাছে সবই নতুন; আমি দু-চার রকমের কেক খেলাম। জিনিসগুলির দাম কলকাতার চার গুণ হবে—তবু একে বড় দুর্ম্মূল্য বলব না।

এরপরে আমরা সহর ভ্রমণে বার হলাম। কলকাতায় যেমন লোকে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে সহরের ভিতর দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যায়, আমরাও তেমনি সহযাত্রী ১২।১৪ জন মোটর-বাসে করে প্যারিসের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে সহরের ঠিক মাঝখানের প্রধান কয়েকটি রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। প্যারিস পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর সহর, এর সৌন্দর্য্য ও বিশালতা আমি আর কতটুকু বর্ণনা করতে পারব? যে দিকে তাকাই একেবারে সোজা রাস্তা আর দুধারে ঠিক একই ধরণের বাড়ী। রাস্তাগুলি খুবই প্রশস্ত—বাড়ীগুলি পাঁচতলা, ছয়তলা, খুব উঁচু। বড় বড় রাস্তার চৌমাথায় খুব খানিকটা ফাঁকা জায়গায় কোথাও একটা অপূর্ব্ব ধরণের সজ্জিত স্তম্ভ, কোথাও ফোয়ারা, কোথাও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্যারিস সহরে চলতে চলতে আমি সহরের অনেক বিবরণ আমার 'নোটবুকে' টুকেছিলাম কিন্তু সেগুলির বর্ণনা করতে আমার সময় হবে না। যাঁদের ঔৎসুক্য আছে তাঁরা Paris Guide কিনে পড়ুন। আমাদের কলকাতার কারবারী আফিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বাড়ীগুলিই দেখবার মত বাড়ী কিন্তু প্যারিসে হোটেল গুলিই যেন বেশী প্রাধান্য প্রকাশ করছে মনে হল।

প্রায় একঘণ্টা ঘুরে সহর দেখে আমরা লণ্ডন যাবার জন্য সহরের উত্তর সীমানার রেল-ষ্টেশনে ট্রেণ ধরলাম। পথে খুব বড় বড় মাঠ, তার কোনটায় চাষবাস হচ্ছে, কোনটা কেবল গবাদি পশু চরবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। পথে একস্থানে যুদ্ধের সময়ের প্রস্তুত সেনানিবাস নির্জ্জন অবস্থায়

পড়ে রয়েছে দেখা গেল, আর একস্থান সৈন্যদের গোরস্থান দেখলাম। সেনানিবাস আর কিছুই নয়, ফাঁকা মাঠের মধ্যে অনেকগুলি টিনের চালার ঘর মাত্র। গোরস্থানটিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে খুব ঘন ঘন ছোট টোটার আকারে স্তম্ভ। পথে কয়েকটা কাঠের কারখানা দেখলাম—কাঠ, তক্তা, নানা প্রকার বাক্স প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে। পথে যত বাড়ী ঘর, জিনিষপত্র, গাছপালা দেখলাম, তার কোনটাই এলোমেলো নয়, সবই সুন্দর ভাবে সাজান।

বেলা ১-৩৫ মিনিটের সময় ট্রেণ ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রকূলে Boulogne নামক ফ্রান্সের আর একটি সহরে এসে থামল। এখানে নেবে আমরা ডোবর প্রণালী পার হবার জন্য জাহাজে উঠলাম। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ডোবর প্রণালী পার হয়ে আমাদের জাহাজ ইংলণ্ডে পৌছল।

নানা কথা

মেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা—

পুনা সহরে গত আগষ্ট মাসে নিখিলভারত মোস্‌লেম-মহিলা কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মিঃ আবদুল কাদিরের সহধর্ম্মিণী বেগম আবদুল কাদির সাহেবা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মুসলমান মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হউক।

বঙ্গমহিলার কৃতিত্ব—

শ্রীমতী প্রভাবতী দাশ গুপ্ত জার্ম্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রভাবতী ঢাকা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিচারক বাবু তারকচন্দ্র দাশ গুপ্তের কন্যা। তিনি কলিকাতা সায়েন্স কলেজ হইতে এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়া আমেরিকাতে গমন করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জার্ম্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। বোধ হয় বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পি-এচ ডি উপাধি লাভ করিলেন।

ডাঃ পি, কে রায়ের দৌহিত্রী, মিঃ এস, সি মুখার্জীর কন্যা শ্রীমতী রেণুকাবালা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি শাস্ত্রে বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ত্রীশিক্ষা—

কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, অতঃপর কোন কলেজে ছাত্রগণের সহিত ছাত্রীদিগকে এক সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হইবে না। যুবক ছাত্র ও যুবতী ছাত্রীরা একই শ্রেণীতে একত্র বসিয়া অধ্যয়ন করে, ইহা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রক্ষণশীলদলের মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া যাহাতে অবিলম্বে ঐ বিধান অনুসারে কার্য্য হয়, তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা—

নিম্নলিখিত বালিকাগণ ১৩৩২ সালের বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের পুরাণ শাস্ত্রের উপাধি, মধ্য ও আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

উপাধি-

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী—২য় বিভাগ

মধ্য-

শ্রীমতী আশা দেবী—১ম বিভাগ
" কিরণময়ী দেবী—১ম বিভাগ
" কুমুদিনী দাসী—২য় বিভাগ

আদ্য—

শ্রীমতী নর্ম্মদাসুন্দরী দাসী—১ম বিভাগ
„ কুমুদিনী দাসী— ২য় বিভাগ
„ ইন্দুরেখা ভাওয়াল— „
„ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী— „
„ যোগমায়া দেবী— „
„ বিদ্যাবতী দেবী— „
„ কুসুমকুমারী দাসী— „
„ সুধাপ্রভা দেবী— „
„ মাতঙ্গিনীসুন্দরী দেবী— „
„ চারুবালা দাসী— „
„ চারুশীলা দাসী— „
„ হরিপ্রিয়া দাসী— „
„ রাধারাণী দাসী— „
„ কিরণকলা দেবী— „
„ লীলাবতি দেবী— „
„ শৈবলিনী দাসী— „
„ কমলাবালা দেবী— „
„ কিরণবালা দাসী— „

ইহাদের মধ্যে উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, মধ্য পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী আশা দেবী এবং আদ্য পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী নর্ম্মদাসুন্দরী দাসী ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবী রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নারীর কার্য্য—

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে স্যার জগদীশচন্দ্রের (জে, সি, বসু) সহধর্ম্মিণী স্ত্রীশিক্ষাকল্পে এক সমিতি গঠন করেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত সমিতি আপনাদের কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়া জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন।

সম্প্রতি ব্রাহ্মবালিকা-বিদ্যালয়ে এই নারীশিক্ষা সমিতির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের বালিকা ও নারীদিগকে সুগৃহিণী ও আদর্শ জননীরূপে গঠিত করিয়া তোলাই এই সমিতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তদুদ্দেশ্যে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে আজ পর্য্যন্ত ২৪টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইটি বিদ্যালয়ে শুধু মুসলমান বালিকাদিগকেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই দুইটি বিদ্যালয় হাওড়ায় অবস্থিত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সেলাই, বয়ন, ফল রক্ষা করিবার উপায় প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। বাণীভবন নামক বিদ্যালয়ে শিল্পকার্য্য শিক্ষার সহিত কলিকাতার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের তত্ত্বাবধানে অলঙ্কার প্রস্তুতপ্রণালীও সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শীঘ্রই শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটী ক্লাস খোলা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সমিতি বিগত ১৯২৩—২৪ সনে 'মাতৃত্ব' প্রভৃতি সম্বন্ধে ছয়টী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সমিতির কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১২,২৩০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত সাহায্যগুলিও পাওয়া গিয়াছে :—"ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন"—২০০৲, "ক্যালকাটা ফুটবল লীগ"—১০০৲, "ন্যাশনাল ফণ্ড সোসাইটি"—৬০০৲।

টাঙ্গাইলে মহিলা সভা—

কিছুদিন পূর্ব্বে টাঙ্গাইল ছাত্র-সম্মিলনীর উদ্যোগে টাঙ্গাইল কালীবাড়ীতে ২টি মহিলা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে প্রায় তিনশত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে "মা ও জাতি" এবং "মা ও দেশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা, দারিদ্র ও শিশুমৃত্যুর কারণ প্রভৃতি তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। মহিলাদের নানাবিধ অজ্ঞতা প্রভৃতিই যে জাতিগঠনের অন্তরায় তাহা তিনি দৃঢ়ভাবে সকলের মনে অঙ্কিত করিয়া দেন। মহিলাগণ তাঁহার কথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। দেশের চারিদিকে এরূপ সভাসমিতির অধিবেশন হওয়া খুবই আবশ্যক।

মৈমনসিংহে মহিলা সমিতি—

শ্রীমতী সুধীরা মজুমদারের সভাপতিত্বে মৈমনসিংহে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। নগরের বহু স্ত্রীলোক উক্ত সভার সদস্য হইয়াছেন।

খদ্দরের প্রতি মহারাণীর শ্রদ্ধা—

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নরসিংগড়ের মহারাণী সাহেবা খদ্দরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না। তিনি স্বয়ং স্বহস্তে চরকা কাটেন এবং খদ্দর পরিধান করেন। ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের রাণীরাও ইচ্ছা করিলে বিলাসিতায় সময় নষ্ট না করিয়া এইরূপ করিতে পারেন। প্রাচীনকালে হিন্দু-রাণীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে শত্রুর সম্মুখীন হইতেন। চরকা তো তাঁহার

তুলনায় অতি সরল জিনিস। তাঁহারা যদি চরক ধরেন, প্রজারাও ধরিবে। সংসারে মানুষ উচ্চ শক্তিরই অনুসরণ করিয়া থাকে।—"হিন্দী বেঙ্কটেশ্বর"।

বালবিধবা ও বিবাহের বয়স—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে যে লোক গণনা হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ বৎসরে ভারতবর্ষে ৬১২ জন এক বৎসরের অনধিক বয়স্কা, ২০২৪ জন পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্কা ৯৭৮৫৭ জন দশ বৎসরের অনধিক বয়স্কা এবং ৩৩৭০২৪ জন পনর বৎসরের অনধিক বয়স্কা বিধবা ছিল। এইরূপ অল্পবয়স্ক বিধবাগণের সংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর বড় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত হরবিলাস সরদা মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা এইরূপ একটা আইন পাশ করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে পাত্রের বয়স ১৫ বৎসরের অনধিক ও পাত্রীর বয়স ১২ বৎসরের অনধিক হইলে তাহাদের বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

সার হরি সিং গৌড় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে বালিকা রক্ষা বিল উপস্থাপিত করিবেন, মাদ্রাজের ১৯২১ ক্লাব সেই বিলটির সমর্থন করিয়াছেন। এই বিলের মর্ম্ম এই যে, চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন না।

বিবাহিতা বালিকা—

বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে কোন বৎসরের কত জন বালিকা কত বয়সে বিবাহিত অবস্থায় ছিল তাহার তালিকা—

বৎসর	বঙ্গদেশে ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বিবাহিত হিন্দু বালিকা প্রতি সহস্রে	ব্রহ্মে ১০ হইতে ১৫ বৎসরের বিবাহিত বৌদ্ধ বালিকা প্রতি সহস্রে
১৮৮১	৬৬৬	×
১৮৯১	৬২০	৬২
১৯০১	৬০০	১৪১
১৯১১	৫৮৭	১৫১
১৯২১	৫১০	৪৪

ব্রাহ্মণকুমারীর পাঞ্জাবী বরে বিবাহ—

পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া নিবাসী পূর্ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের উনবিংশতি বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যার সম্প্রতি এক পাঞ্জাবী যুবকের সহিত বিবাহ হইয়াছে। পূর্ণবাবু স্কুলের শিক্ষকতা করেন। তাঁহার পাঁচটি অবিবাহিত কন্যা আছে। সমগ্র বাংলা দেশে বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়া বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে মূল্য দিয়া উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া কন্যাকে কলিকাতার মহিলা-কর্ম্মী-সংসদে পাঠাইয়া দেন। তথায় নাকালিয়ার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতার আর্য্য সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত অযোধ্যানাথের চেষ্টায় এক পাঞ্জাবী যুবকের সহিত পূর্ণবাবুর কন্যার বিবাহ হয়। বর ১৫০৲ টাকা মাহিয়ানায় রেলে চাকুরী করেন, এবং কন্যার নামে ২০০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন। বর আর্য্যসমাজভুক্ত পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ।

পরলোকে বৃন্দাদেবী—

সম্প্রতি কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতালে পণ্ডিত শ্যামশঙ্করের বিবাহিতা ইংরেজপত্নী বৃন্দাদেবী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। লণ্ডনের শ্লোন-স্কোয়ারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ণ নাম ভাণ্ডাকনষ্টান্স মরেল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিস্ মরেল এক প্রীতিভোজে পণ্ডিত শ্যামশঙ্করকে প্রথম দেখিতে পান। কলাবিদ্যার পারদর্শিতায় মুগ্ধ হইয়া সেখানে উঁহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর মিস্ মরেল পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থানে সঙ্গীত করিয়াছেন। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্যামশঙ্কর ও বৃন্দাদেবী নানা স্থানে গান গাহিয়া অনেকানেক আহত সৈন্যের প্রাণে শান্তি দান করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর ঝালোর রাজ্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর এক বৎসরের মধ্যেই মিস্ মরেল অসংখ্য বিঘ্ন বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ঝালোর রাজ্যে আসিয়া উপনীত হন। প্রায় তিন বৎসর কাল তাঁহাকে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইয়াছিল। অতঃপর গুঢ়া রাজপুত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং ঝালোর-রাজ নিজ কন্যা জ্ঞানে মিস্ মরেলকে পণ্ডিত শ্যামশঙ্করের হস্তে সমর্পন করেন। এই বিবাহে হিন্দু রীতিনীতি পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর মিস্ মরেলের নাম হয় বৃন্দাদেবী। কৃতকার্য্যের জন্য ইনি কখনও অনুতাপ করেন নাই এবং হিন্দুরাও তাঁহাকে সাদরে সমাজে স্থান দিয়াছিল। বৃন্দাদেবীর মৃতদেহ ব্রাহ্মণেরা বহন করিয়া শ্মশানঘাটে লইয়া

গিয়াছিলেন। যে সম্মান বৃন্দাদেবীকে প্রদর্শন করা হইয়াছে তিনি যে তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাহা বলা বাহুল্য। পরলোকে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

মুস্তাফা কামালপাশার কথা—

৩০শে আগষ্ট তারিখের কনষ্টাটিনোপলের সংবাদে প্রকাশ—ইনাবেলির এক সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া মুস্তাফা কামালপাশা বলিয়াছেন যে, জাতীয় সভ্যতার উন্নতির জন্ম ইউরোপীয়ান পোষাক অপরিহার্য্য। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

বাংলা দেশের মৃত্যু সংখ্যা—

বিগত ১৯২৩-২৪ সালের রিপোর্টে বাংলা দেশে কোন্ রোগে কত লোক মরিয়াছে তাহার যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

জ্বরে—৯০৯৭৯৫; কলেরায়—৪১৪৮৩, বসন্তে—৪০৩৬; প্লেগে—৯৮; শ্বাসরোগে ২৬৭৪৫; রক্তামাশয়ে—১৩৪২৫; উদরাময়ে—৮৩৯৪; সর্পাঘাতে—৪৭৬৫; কুকুর দংশনে—২৪৫; মোট ১৭,০৮,৯৮৬ জন। জ্বর রোগে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ায়—৫৩৯৮৯৯; আন্ত্রিক জ্বরে—৬১৮০; কালাজ্বরে—৩৫৬৫ জন এবং অবশিষ্ট ৩৫৮৬৫১ জন অন্যান্য জ্বর রোগে মরিয়াছে। শ্বাস রোগে যাহারা মরিয়াছে তন্মধ্যে নিউমোনিয়ায়—১০৭৬৭; ইনফ্লুয়েঞ্জায়—১৯৯৬; ক্ষয়কাশে—৪৯৪২ ও অন্যান্য শ্বাসরোগে ৯.৪০ জন মরিয়াছে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দশ কথা—

স্বাস্থ্যলাভের দশটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি তাহা লইয়া আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে একটী সভা হয়। এই সভাতে ডাঃ ডিকোয়ন্টে নামক একজন চিকিৎসক নিম্নলিখিত দশটী বিষয় বিবৃত করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন:—

সাধারণ স্বাস্থ্য—প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, সকাল সকাল ঘুম ও সারাদিন পরিশ্রম।

শ্বাসপ্রশ্বাস—জল ও রুটী জীবনীশক্তি বাড়ায় কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যের কিরণ অপরিহার্য্য।

উদর—দীর্ঘজীবন লাভের পক্ষে মিতাচার ও অল্পাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চামড়া—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যের উপায়—যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যন্ত্র বহুদিন টিকে।

নিদ্রা—নিদ্রা শরীরের সংস্কার ও শক্তিশালী করে। বেশী বিশ্রামে শরীরে দৌর্ব্বল্য আসে।

পোষাক—যে পোষাকে শরীরকে উপযুক্তমত শীত তাপ হইতে রক্ষা করে অথচ চলাফেরার ব্যাঘাত হয় না তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বাসগৃহ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ সুখের আলয়।

নৈতিক স্বাস্থ্য—আমোদপ্রমোদে মন প্রফুল্ল হয় কিন্তু অত্যধিক আমোদপ্রমোদে রিপু উত্তেজিত করিয়া মানুষকে পাপে নিমগ্ন করে।

মানসিক অবস্থা—প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যপ্রদ, মানসিক আমোদ স্বাস্থ্যের জনক কিন্তু বিষন্নতা বার্দ্ধক্য আনয়ন করে।

শ্রম—মস্তিষ্ক মানুষকে খাওয়াইতে পারে না। পরিশ্রম দ্বারা নিজের খাদ্য যোগাইতে হইবে।
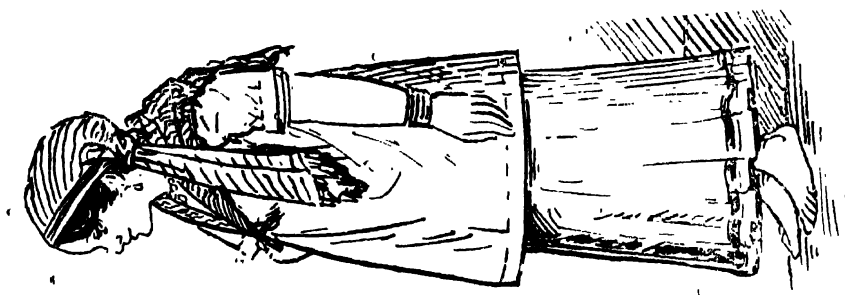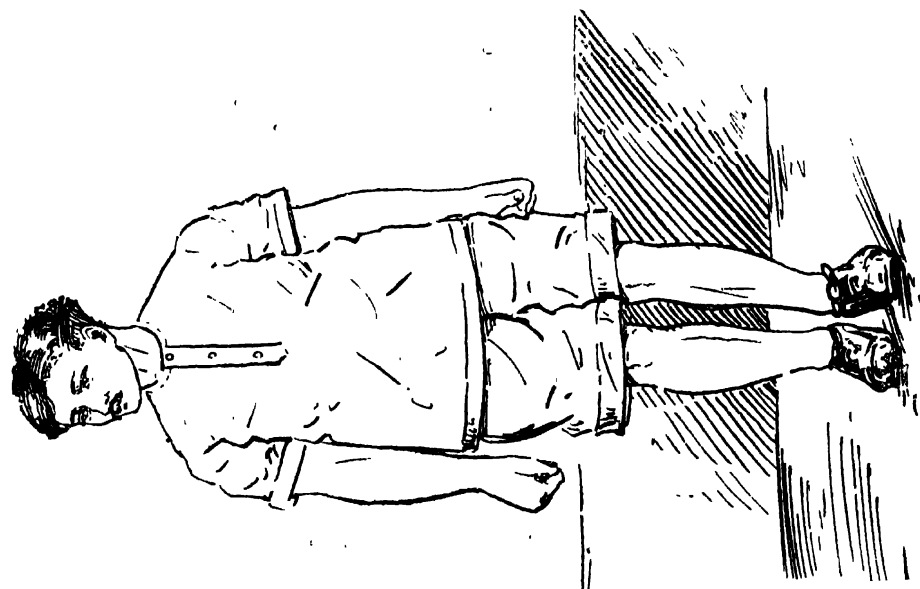
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৩য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৩২ | ৮ম সংখ্যা

খদ্দর ও পরিচ্ছদ সমস্যা

দেশের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বড় কঠিন। তথাপি আমি বাঙ্গলার প্রচলিত পোষাক পরিচ্ছদের বিরুদ্ধে কিছু না বলেই পারছি নে। সূক্ষ্ম বস্ত্রের পরিবর্ত্তে মোটা খদ্দর আজকাল প্রচলিত হয়েছে, এই মোটা খদ্দরের ব্যবহারে যে সব প্রতিবন্ধক আছে, সেই সকলের আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনেকদিন থেকেই আমি বাঙ্গলার পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ রকম ত্রুটী দেখতে পাচ্ছি, এ সম্বন্ধে দেশের পণ্ডিতগণের মত জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বাঙ্গালীর পোষাককে দেশের উপযোগী বলেই প্রমাণ করতে চেষ্টা পান। কেউ কেউ বাঙ্গালীর জাতীয়তার বৈশিষ্ট এই পোষাকে দেখতে পান। এই দুটী কথারই যে কিছু মূল্য আছে তা আমি স্বীকার করি কিন্তু ঐ যুক্তিকেও পরাস্ত করে—যখন আমি চিন্তা করি যে, মানুষকে তার শরীরের আকারের অনুযায়ী পরিচ্ছদ তৈরী করে ব্যবহার করতে হবে, চলাফেরা ও কাজকর্ম্মের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে পোষাক করতে হবে, জাতীয়তাকেও কেটেছেটে, জুড়ে-গেঁথে মার্জ্জিত করে তুলতে হবে।

আগে পুরুষের পোষাকের কথাই হ'ক—এই যে দশহাতি-চুয়াল্লিস ইঞ্চি বহরের লম্বা কোঁচা-কাছা—এ আমাদের কতদিনের জাতীয়তা, একি এই বিলাতের মাঞ্চেষ্টরের সঙ্গে সম্বন্ধের পর থেকে নয়? আমাদের ঠাকুরদাদার আমলে পুরা মানুষের কাপড় ছিল পাঁচ হাত লম্বা, দেড় হাত বহর। কোঁচা ত ছিলই না, কাছারও একটি কোণ মাত্র গোঁজা হত। সে কাপড়ে হাঁটু ঢাকা পড়ত না। শীতের দিনে গায়ে একটা মোটা চাদর, এই ছিল এক শো বছর আগেকার বাঙ্গলার জাতীয় পরিচ্ছদ। দু একটি রাজা-জমিদারের মধ্যে চোগা চাপকানের ব্যবহারের কথা শোনা যায়, সেটিও সম্ভবতঃ বিদেশী মুসলমান রাজার অনুকরণে।

একজন প্রবীন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে শুনেছি যে, প্রস্রাবের সময় যে কাছা খোলার রীতি এখনও সাবেকী মানুষের মধ্যে দেখা যায় এর কারণ এই

যে, তখনকার দিনে কাছার একটি কোণ মাত্র কোনমতে টেনে গোঁজা হত; কাছা না খুলে প্রস্রাবে বসলে কাছা খুলে গিয়ে অনর্থ ঘটবার আশঙ্কা ছিল তাই আগে থেকে কাছা খুলে হাতে রাখার নিয়ম ছিল। কথাটা খুব ঠিক কি না জানি না, তবে কারণটা মোটেই অযুক্তির নয়।

এই সাবেক কালের বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ তবু ছিল ভাল কারণ এতে কাজকর্ম্ম করবার কোন অসুবিধা হতনা, কিন্তু এখনকার এই সম্মুখে লম্বা দোদুল্যমান কোঁচা, যাহা অন্যূন ৬ হাত লম্বা কাপড়ের ভাঁজে তৈরী, এই কোঁচাটার সার্থকতা কি? এই কোঁচা ঝুলিয়ে আপিসের চেয়ারে বসে কেরাণী-গিরির কলম চালান যেতে পারে বটে কিন্তু চলবার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য। বহুদিনের অভ্যাসে ক্রমবর্দ্ধিত এই কোঁচার অসুবিধাটা ভোগে আমরা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। প্রতি পদবিক্ষেপে দুই পায়ে কোঁচার আঘাত খেতে খেতে কোনমতে চলতে থাকি বটে, কিন্তু অপর কোন জাতিকে এই কোঁচা-কাছা দেওয়া ধুতি পরিয়ে দিলে সে একটুও পথ হাঁটতে পারে না। চলবার সময় কোঁচা আমাদের যে ভাবে হাঁটবার বাধা দেয় তা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে কেউ কোঁচার নিচের অংশটা ফিরিয়ে কোমরে গোঁজেন, কেউ কোঁচার মাথা হাতে ধরে চলেন, কেউ বা পকেটে গোঁজেন; এ সব আর কিছুই নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে ভ্রম সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

পরিচ্ছদের কথা ভাবতে গেলেই আগে শরীরের গঠনের কথা মনে পড়ে। সারা জগতের মানুষের গঠন একই রকমের, তাই তার পরিচ্ছদও একই ধরণের হবে, তবে শীত-গ্রীষ্ম, রৌদ-বর্ষা, পাহাড়িয়া-সমতল প্রভৃতি দেশের প্রকৃতি ভেদে সামান্য পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। মুস্তাফা কামালপাশা বলেছেন —জাতীয় সভ্যতার উন্নতির জন্য ইউরোপীয়ান পোষাক অপরিহার্য্য। আমরা কিন্তু ঐ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে গ্রাহ্য করতে পারবো না, কারণ সভ্যতার আধিক্য অনেক সময়ে আবশ্যকতাকেও ডিঙ্গিয়ে বাহুল্যের সীমানায় গিয়ে পড়ে। ইউরোপীয় পোষাকে অনেক বাহুল্য ফ্যাসন ঢুকেছে।

আমাদের দেশের পরিচ্ছদ কেমন হবে এটা ভাবতে গেলে যদি সারা সভ্য জগতের পরিচ্ছদের কোন ধারা এসে পড়ে তাতে অনুকরণের দোষ-দুষ্টজ্ঞানে আশঙ্কা করবার কারণ নেই। কারণ ঐ সমস্ত সভ্য জগতের পোষাক বহুদিনের চিন্তার ফলে অনেক সংস্কৃত অবস্থায় পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ সভ্য জগতই শীতপ্রধান দেশ, তাই আমাদের কেবল ঐ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হবে শীত গ্রীষ্মের পার্থক্য হিসাবে।

আমরা যে ধুতি পরিধান করি এই অকর্ত্তিত এক সিট্ (তা) বস্ত্র কখনও পরিচ্ছদের উপযোগী হতে পারে না। এতে উলঙ্গতাও সম্পূর্ণ ঢাকে না। আমাদের মত গ্রীষ্ম দেশবাসী কোন সভ্য জাতিই এই রকম সিট্ পরিধান করে না। এই বাঙ্গালীর ধুতিকে যদি কেউ আদিমকালের অসভ্য যুগের প্রথম আবিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডের ব্যবহারের অনুকরণ বলে গালি দেয় তার জন্য বোধ হয় আমাদের কোন কিছু বলবার থাকে না, কারণ এতে কোন চিন্তাশক্তির ব্যবহার হয় নাই। বিশেষতঃ একখানি ধুতিতে যতখানি কাপড় ব্যবহৃত হয় ঐ পরিমাণ কাপড়ে, দুইটা পা-জামা আর একটা গায়ের জামা হতে পারে।

সিংহল, মাদ্রাজ, বর্ম্মা প্রভৃতি অঞ্চলে লুঙ্গির ব্যবহার দেখা যায়। ওদেশের লোকের পরণে লুঙ্গি, গায়ে ঢিলে জামা। এই লুঙ্গি বেশ মার্জ্জিত পরিচ্ছদ না হলেও চলবার ও কাজ করবার অসুবিধাটা এতে নাই। চীনদেশে ঢিলে জামা আর ঢিলে পা-জামার ব্যবহার, আমার মনে হয় আমাদের পরিচ্ছদ অনেকটা চীনদের মত হলে ভাল হয়।

বাঙ্গালীর কোঁচা-কাছা দেওয়া ধুতি পরে কাজ কর্ম্মের যত অসুবিধা, বোধ হয় এত অসুবিধা পৃথিবীর কোন দেশের পরিচ্ছদে নাই, এমন কি

কেউ যদি এক ঘা মারে তবে তাকে প্রতিশোধ দেওয়া দূরে থাক, পালাবার সুযোগটুকুও নাই। এই বাঙ্গলা দেশ থেকে পূর্ব্বে পশ্চিমে যতদূর যাওয়া যায় ক্রমেই মার্জ্জিত পরিচ্ছদ দেখতে পাওয়া যায়, লম্বা কোঁচার বালাই নাই। পশ্চিম দিকে —বাঙ্গালা অপেক্ষা মধ্যপ্রদেশের পরিচ্ছদ একটু আঁট-সাঁট, পাঞ্জাব তার চেয়ে ভাল, তারপর ক্রমে পারসিক, তুর্কি, ক্রমেই উন্নত ধরণের পরিচ্ছদ হয়ে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে পরিণত হয়েছে। আবার পূর্ব্বেও তেমনি বাংলা ছেড়ে ব্রহ্মদেশের লুঙ্গি একটু কাজ কর্ম্মের পক্ষে সুবিধাজনক, তারপর চীন জাপানে ক্রমে সংস্কৃত হয়ে আবার আমেরিকায় ইউরোপীয় ধরণের পোষাক প্রচলিত।

পরিচ্ছদ যত আঁটসাট হবে ততই বেশী ছুটাছুটীর সুযোগ হবে, তার জন্যে গায়ে বল বাড়বে, কাজের সুবিধা হবে। আমরা যখন ছোট ছেলেদের কোঁচা ঝুলিয়ে কাপড় পরিয়ে দিই তখন তারা ধীরে ধীরে দুলে দুলে চলতে থাকে, আর যখন হাপ্-প্যাণ্ট পরিয়ে দিই তখন বেশ ছুটাছুটী করে বেড়ায়। অভিভাবকগণকে মনে রাখতে হবে ছেলেপিলেদের যথেষ্ট ছুটাছুটী করবার সুযোগ দেওয়া চাই।

আমার মনে হয় খুব ঢিলে রকমের হাপ্-প্যাণ্ট বা থ্রিকোয়াটার প্যাণ্ট আর ঢিলে হাপ্ বা থ্রিকোয়াটার হাতা জামা এদেশের উপযোগী হতে পারে। চীনদেশে ঢিলে জামা আর ঢিলে পা-জামার ব্যবহার আছে, আমাদের পরিচ্ছদ তার চেয়েও একটু বেশী ঢিলে হওয়া দরকার।

এইবার মেয়েদের পরিচ্ছদের কথা, বাঙ্গলার পুরুষের পরিচ্ছদে যত ত্রুটী দেখা যায় মেয়েদের পরিচ্ছদে যদিও তত ত্রুটী নাই তথাপি মনে হয় এর অনেক সংস্কার করা আবশ্যক। বাঙ্গলার মেয়েদের জাতীয় পোষাক বলতে গেলে যে একখানি মাত্র সাড়ী বা ধুতির ব্যবহার বোঝায় তার সম্বন্ধেই বলছি। একখানি বস্ত্রে আপাদ-মস্তক সর্ব্বত্র আবৃত করে চলাফেরা করা বাস্তবিকই অত্যন্ত অসুবিধার কথা। প্রথমেই বলেছি মানুষের গঠনের অনুকূল করে, কাজকর্ম্মের সুবিধা, চলা ফেরার সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে পরিচ্ছদ গড়তে হবে। ভারতের উন্নত অনুন্নত সমুদয় প্রদেশের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সকল স্ত্রীলোকেই গায়ে একটা জামা পরিয়া থাকেন, বাংলাদেশে বর্ত্তমানে শিক্ষিত মহলে জামার ব্যবহার হয়েছে বটে তথাপি পল্লীগ্রামে সাধারণের মধ্যে এখনও একখানি মাত্র বস্ত্রের ব্যবহার হয়।

মেয়েদের সাড়ীর বিরুদ্ধে নূতন কিছু বলতে হলে আমাকে সাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হতেই হবে, নূতন কিছু বলতে গেলে হাস্যাস্পদ হওয়া এদেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

প্রধান কথা—একখণ্ড বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক, বিশেষতঃ এই চরকার সুতার খদ্দরের যুগে একেবারে অসাধ্য। পঁচিশ বৎসর আগে মোটা কাপড় পরা অসম্মানজনক বলে গণ্য হত, ভগবানের অনুগ্রহে বাঙ্গলার এ ভুল ভেঙেছে, মোটা খদ্দরই এখন অধিকতর সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদের আকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

বিলাতে বহুকাল পূর্ব্বে মেয়েরা প্রকাণ্ড ঢোলের মত একটা বেড়ের উপর কাপড়ে ঘিরে পরতেন। পঞ্চাশ বছর আগে অত্যন্ত বেশী কাপড়ে ভাঁজ ভাঁজ করা গাউনের ব্যবহার ছিল, এখন বিলাতের মেয়েরা কাপড়ের অনেকটা সংক্ষেপ সংস্করণ করেছেন, পরণের গাউনটা খুব কম কাপড়ে আঁটো-খাটো করে নিয়েছেন। জাপানের মেয়েরা আঁটা গাউন, আঁটা জামা ব্যবহার করেন। তার উপর পিঠের দিকে একটা খাটো মোটা চাদরে মোড়া। চীনে মেয়েরা ঢিলে পা-জামা, ঢিলে জামা ব্যবহার করেন। ব্রহ্মদেশে মেয়েরা লুঙ্গি পরেন, গায়ে খাটো জামা, মাথায় একখানা রুমাল জড়িয়ে বাঁধা। সিংহলে মেয়েরা চার হাত একখানা কাপড় পরেন আর একটা খাটো জামা গায়ে ব্যবহার করেন

বাঙ্গলার মুসলমান মেয়েরা দুই খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করেন, দশ হাত কাপড় পাঁচ হাতি দুখানা করে একখানা পরণে আর একখানা গায়ে ব্যবহার করেন। মোট একখানা সাড়ীর চেয়ে ঐ দুখানার ব্যবহার অনেক বিষয়েই সুবিধাজনক।

আমাদের বাঙ্গলার মেয়েদের প্রচলিত সাড়ীর দোষ দেখান সহজ বটে কিন্তু এই আটপৌরে পোষাক কেমন হবে তার আদর্শ গড়া বড় কঠিন। ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে একটা আদর্শের সৃষ্টি হয়, আমাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত নানা রকম নূতন পোষাক তৈরী করে ব্যবহার করে দেখতে হবে।

নিম্নে একটা নমুনা দেখান গেল, খুব হাস্যজনক বলে উপেক্ষিত হবে কিনা জানি নে। চার হাত লম্বা ধুতি লুঙ্গির মত করে অথবা খুব ঢিলে সায়ার মত জুড়ে শেলাই করে পরা হবে। গায়ে হাপ্ হাতা ঢিলে জামা, মাজার নীচে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ঝুল হবে। মাথায় বড় রুমালের মত কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া, তার নীচের ভাগ কাঁধ ও বুক বেয়ে পড়বে। দু হাত বা.ন-পোয়া চৌকা কাপড়ে পিঠ ও বুক ঢেকে গলায় জড়ান হবে। এই চৌকা কাপড়খানা বিপরীত দুটি কোণ ধরে দু ভাঁজ করে পিঠের উপর দিয়ে বুকের কাছে এনে সেপ্‌টিপিন্ বা বোতামে আঁটা হবে। মোট কথা মেয়েদের পরিচ্ছদ এক খণ্ড গোটা সাড়ী না হয়ে ভিন্ন কয়েকটি টুকরা কাপড়ে হবে। এতে সর্ব্বদা কাজকর্ম্মের সুবিধা হবে। আর ধোয়া ও শুকান'র পক্ষে ছোট কাপড়ই সুবিধাজনক।

এই রকম পরিচ্ছদ প্রথমে অন্দরমহলে ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে, কোন রকমে কতটা সুবিধা বা অসুবিধা হয়। কোন নূতন বিষয়ের পরীক্ষায় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমাদের অনুরোধ মেয়েরা ঘরে ছাটকাট করে যেন পরীক্ষা করে দেখেন।

আজকাল বেশীর ভাগ লোকে ছোট ছেলেদের হাপ্-প্যাণ্ট, খাটো ঢিলে হাতা জামা আর ছোট মেয়েদের ইজার, ফ্রক, সেমিজ পরাতে ভালবাসেন। ছোট ছেলেমেয়েদের ধুতী সাড়ীর পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার সুবিধাজনক।

আমরা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এমন পরিবর্ত্তনের কথা তুলছি তার প্রধান কারণ এই যে, খদ্দরই যখন আমাদের একমাত্র ব্যবহার্য্য বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তখন খদ্দর পরতেই হবে। বর্ত্তমানে খদ্দরের যে নানারকম সাড়ী বার হয়েছে এর যে গুলিতে মিলের সূতার ভাঁজ আছে সেগুলি কোন রকমে পরা যায় বটে কিন্তু চর্কার সূতার খাঁটি খদ্দরের একখানা পুরা সাড়ী মেয়েদের পরিধান করা দুঃসাধ্য। এখন কেটে ছেঁটে পরিধেয় বস্ত্রের বন্দোবস্ত না করলে আর চলছে না।

পরিধেয় বস্ত্র পাতলা করবার কোন আবশ্যক নাই, মোটাই সুবিধাজনক। তবে মোটা কাপড়ে পুরুষের মত লম্বা কাছা-কোঁচা সুবিধা হবে না। মেয়েদেরও একখণ্ড সাড়ীতে আপাদমস্তক ঢাকা চলবে না। দেশের লোকের যত পরিমাণে পরিধেয় বস্ত্রের আবশ্যক ততটা উৎপন্ন হওয়া খুব সহজ নয়। এজন্য এখন আমাদের বস্ত্রের ব্যবহার খুবই সংক্ষেপ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী যে অতি ক্ষুদ্র একখানি কৌপীন মাত্র পরিধান করে থাকেন, তার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখাতে চান যত পরিমাণে কাপড় আমরা দেশে তৈরী করতে পারি গড়ে তার বেশী পরা উচিত নয়। বস্ত্র ব্যবহারের সংক্ষেপ করা আমাদের বর্ত্তমানে নিতান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পরিধেয় বস্ত্রের সংস্কারও উহারই অনুকূল। জাতীয় শক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য পরিচ্ছদের সংস্কার আমাদের বাঙ্গলার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

গান্ধারীর উপদেশ

পণ্ডিত শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

পৃথিবীর ইতিহাসে গান্ধারীর ন্যায় দ্বিতীয় স্ত্রী-রত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিবাহের পর যখন গান্ধারী শুনিলেন যে, পতি ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, তখন তিনিও চক্ষুতে বস্ত্র বন্ধন করিয়া চিরজীবনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শনশক্তির রোধ করিলেন। এরূপ পতি-অনুরাগ পৃথিবীর কোন দেশে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ভারতবর্ষ সকল বিষয়েই তুলনা-রহিত। এই মহিয়সী বরনারী দুর্য্যোধনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বিচারশক্তি, দীর্ঘদর্শিতা ও ন্যায়-পরায়ণতার যথেষ্ট পরিমাণে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্য্যোধন যখন কাহারও কথা গ্রহণ করিলেন না, সে সময় সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, গান্ধারী আসিয়া উপদেশ প্রদান করিলে সম্ভবতঃ তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। এই ঘটনায় গান্ধারীর উপর কুরুকুল-বৃদ্ধ ও অন্যান্য ব্যক্তির কিরূপ ধারণা ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি বিফলপ্রযত্ন হইলেও বর্ত্তমান কালের মাতারা গান্ধারীর ন্যায় দীর্ঘদর্শিনী হইলে অনেক সময় পারিবারিক অশান্তি দূর করিতে সমর্থা হইবেন। বর্ত্তমান কালের মাতাদিগের মধ্যে ইহা আনন্দের সহিত আলোচিত হউক।

তিনি দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন—"দুর্য্যোধন! একবার আমার এই হিতকথা বোধগম্য কর। ইহা উত্তরকালে বন্ধুগণের সহিত সুখোদয়ের মূল হইবে। তোমার পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিদুর প্রভৃতি সুহৃদগণ তোমাকে যে আদেশ করিয়াছেন তাহা পালন কর। তুমি শান্ত হইলেই ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের, আমার ও দ্রোণাদি সুহৃদবর্গের সম্যক্ অর্চ্চনা করা হয়। হে পুত্র! নিজের কামনা অনুসারে কখন রাজ্য প্রাপ্তি, রক্ষা বা ভোগ হইতে পারে না। অবশেন্দ্রিয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজ্যভোগে কদাপি সমর্থ হয় না। বিজিতাত্মা মেধাবীই রাজ্যপালনে উপযুক্ত। কাম ও ক্রোধ পুরুষকে অর্থ সকল হইতে নিয়ত আকর্ষণ করিতে থাকে। যে ভাগ্যবান্ রাজা এই দুই বিষম শত্রুকে জয় করিতে পারেন তিনি এই বসুন্ধরা বিজয়ে অধিকারী হইয়া থাকেন। লোকের ঈশ্বর হইয়া প্রভুত্ব করা অতীব মহৎ ব্যাপার। দুরাত্মারা সহজেই রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতে পারে, কিন্তু উহা রক্ষা করা তাহাদিগের অসাধ্য। যে ব্যক্তি এই উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা করে তাহার ইন্দ্রিয় সকল অগ্রে সংযত করা কর্ত্তব্য। রাজলক্ষ্মী জিতেন্দ্রিয় ও ধীরকে দৃঢ়তার সহিত ভজনা করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি রিপুবর্গকে যে মহীপতি সম্যকপ্রকারে দমন করিতে সমর্থ হন তিনিই এই মহীমণ্ডল বিজয় করিতে সমর্থ হন।

"হে পুত্র! একীভূত, মহাপ্রাজ্ঞ, শৌর্য্যশালী, শত্রুনাশন পাণ্ডবদিগের সহিত তুমি মিলিত হইলে সুখে পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণাচার্য্য তোমাকে যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য—কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারে না। অতএব অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও, কেশব প্রসন্ন হইলে উভয় পক্ষেরই সুখ সম্পাদক হইবেন। যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, কৃতবিদ্য ও হিতকামী সুহৃদগণের শাসনে অবস্থান করে না সে শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

"হে পুত্র! যুদ্ধে কিছুমাত্র কল্যাণ নাই

তাহাতে ধর্ম্ম নাই; অর্থ নাই, সুখের আশাই বা কোথায়? নিত্য জয়লাভও তাহাতে হয় না, এরূপ অবস্থায় তাহাতে মনোনিবেশ করিও না। পাছে পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া তোমার পিতা, ভীষ্ম প্রভৃতি তাহাদিগের ন্যায্য অংশ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ শূরগণ কর্ত্তৃক নিহত-কণ্টকা সমগ্র বসুন্ধরা সম্ভোগ করতঃ তুমি সেই প্রদানের ফল অনুভব করিতেছ। যদি অমাত্যাদির সহিত অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিবার বাসনা থাকে তবে পাণ্ডবদিগের অংশ প্রদান কর। অর্দ্ধ পৃথিবী তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সুহৃদের বাক্য পালন করিলে যশোলাভে সমর্থ হইবে।

"হে পুত্র! শ্রীমন্ত, ধৃতিমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে, উহা তোমাকে মহৎ সুখ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। পাণ্ডুপুত্রদিগের নিজের অংশ প্রদান করিয়া এবং সুহৃদবর্গের ক্রোধ দূর করিয়া রাজ্য শাসন কর। বৎস, তুমি পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহাদিগের যে অপকার করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কাম ক্রোধ সম্বর্দ্ধিত সেই অপকারের উপশম কর। তুমি কুন্তি-পুত্রগণের অর্থ অপহরণে অভিলাষী হইয়াছ কিন্তু কখনই তুমি এ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে না। কেবল তুমি নহ, দৃঢ়ক্রোধী সূতপুত্র অথবা তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন, কেহ তাহা লাভে সমর্থ হইবে না। হইবার মধ্যে এই হইবে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবীর প্রজা আর থাকিবে না।

"হে বৎস! ক্রোধের বশীভূত হইয়া কুরুবংশের ধ্বংস করিও না। এই সমগ্র পৃথিবী যেন তোমার নিমিত্ত সংহার দশা প্রাপ্ত না হয়। তুমি যে মনে কর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি সকলেই সমস্ত শক্তির সহিত যুদ্ধ করিবেন তাহা হইতে পারে না। কেননা তোমাদের তাঁরা যে চক্ষে দেখেন পাণ্ডবগণকেও সেই চক্ষে দেখেন। উভয় দলের প্রতিই ঐ মহারথগণের স্নেহ ও সম্বন্ধ সমান। বিশেষতঃ ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। যদিও রাজপিণ্ড ভয়ে ইঁহারা জীবন পরিত্যাগে সম্মত হন, তাহা হইলেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোপদৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন না। লোভ হইতে কোথাও অর্থ সম্পত্তি মনুষ্য প্রাপ্ত হয় না। অতএব হে পুত্র! লোভ হইতে বিরত হইয়া শান্ত হও। ইহাতে তোমার মঙ্গলই হইবে।"

গান্ধারী দেবীর এই অমূল্য উপদেশ বিষয়-নিমগ্ন মানবগণের শান্তির পথ পরিদর্শক হউক।

লক্ষ্মীর দান

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আনিয়াছি ভিক্ষা করি একমুষ্টি তণ্ডুলের কণা,
দীনা গৃহবধূ মোরে দেছে করি কত না করুণা।
ধনীর দুয়ারে গেলে ভৃত্যবর দিল খেদাইয়া,
হাসিলা কুবের পতি বাতায়ন হইতে দেখিয়া।
কুটীর-দুয়ারে লক্ষ্মী করুণার প্রতিমূর্ত্তি সম—
স্নেহভরে ডাকি মোরে দিলা মুষ্টি মুছাইয়া মম।
কয় মুষ্টি চাল-কণা পড়িয়া যা ছিল ভাণ্ডে তার
চাহিল সে সবকটী বেঁধে দিতে অঞ্চলে আমার।
মুষ্টি মাত্র দাও মাগো তার বেশী চাহিনাক আর
পাতিতে হইবে হাত তব দ্বারে হয়ত আবার;
দুঃসময় এলে তবু আমারে মা ডেকো মনে মনে
উৎসর্গ করিব মোর ভিক্ষা পাত্র তোমারি স্মরণে।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৭)

বিনীতার হাতে আজকাল অনেক কাজ পড়িয়াছে। সে কাজ লইয়া এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে নিয়মিত সেবিকার সহিত দেখা করিবার অবকাশও পায় না।

সরিত তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য যত রাজ্যের কাজের বোঝা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়াছে।

কুসুমের ব্যারামটা সারাইয়া তুলিয়া দুই ভাই-বোন কিছুকালের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। সুদীর্ঘ পাঁচ ছয় মাস ভ্রমণের পর তাহারা মাত্র এক সপ্তাহ বাড়ী ফিরিয়াছে।

দুপুর বেলা। বিনীতা গম্ভীর মুখে টেবিলের ধারে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কতকগুলা পত্র লিখিতেছিল, সেই সময়ে তাহার দাসী মানদা দুইখানি পত্র তাহার সম্মুখে টেবিলে রাখিল।

লিখিতে লিখিতেই মুখ না তুলিয়া বিনীতা বলিল "কোথা হতে আসছে চিঠি গুলো?"

মানদা বলিল "একখানা ও বাড়ীর বৌদির, আর একখানা সুধীর বাবুর চাকর নিয়ে এসেছে।"

"আচ্ছা রাখ" বলিয়া বিনীতা তাড়াতাড়ি পত্র লিখিতে লাগিল। সেবিকা যে কি লিখিয়াছে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। বিনীতার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এখন তাঁহার সেখানে অনুপস্থিত হইবার জবাবদিহী দিতে হইবে। সাত আটদিন সে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনও সে সেবিকার নিকটে যাইতে পারিল না, ইহাতে তাহার রাগ হইবার কথাই বটে।

কিন্তু সুধীর বাবু পত্র লিখিলেন কেন? বিনীতা প্রত্যহই সংবাদ লইত সুধীর বাবু আসিয়াছেন কিনা। তাহারা এখানে আসিয়াছে অথচ সুধীর বাবু ঐ কয়দিনের মধ্যে একবারও আসেন নাই কেন? আগে তিনি সকালে দুপুরে বৈকালে যখন পারিয়াছেন আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য একবারও অনুরোধ করিতে হয় নাই।

হইতে পারে তাঁহারও মাথায় অনেক ভার পড়িয়াছে। তিনি পুরুষ, কাজ তো তাঁহার চারিদিকেই পড়িয়া আছে; এতো আর বিনীতা নয় যে, কেহ কাজ না আনিয়া দিলে পাইবে না।

হাতের পত্রখানা লেখা শেষ করিয়া সে আগেই যে এনভেলাপ খানা ছিঁড়িয়া ফেলিল সেখানা সেবিকার। সেবিকা খুব রাগ করিয়াই পত্র দিয়াছে। বিনীতা যেমন তাহাকে জব্দ করিতেছে সেও যে তেমনি করিয়া বিনীতাকে জব্দ করিবে তাহা বলিয়া শাসাইয়াছে।

পত্রখানা পড়িয়া বিনীতা হাসিতেছিল। দাদা যদি কাছে থাকিত, তাহা হইলে সেবিকার এই পত্রখানা দেখাইয়া যে প্রচুর আমোদ পাওয়া যাইত

সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, পত্রখানা সে সযত্নে ড্রয়ারের মধ্যে রাখিল, দাদা ঘুম হইতে উঠিলে দেখাইতে হইবে।

তাহার পর আর একখানা এনভেলাপ ছিঁড়িয়া ফেলিল। সুধীরের হস্ত-লিখিত পত্র সেখানা।

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে বিনীতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে পত্রখানা খসিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

মানুষ যে এত কপট, এত খল হইতে পারে তাহা আজ সে এই প্রথম জানিতে পারিল। সুধীরকে সে বরাবর ভাইয়ের মতই দেখিয়া আসিয়াছে, প্রকৃত দেশের সুসন্তান জানিয়া অন্তরের সহিত পূজা করিয়াছে। এত উচ্চে যাহাকে সে আদর্শ স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছিল, সে হঠাৎ নিজেই নিজের দীনতা বাহির করিয়া ফেলিয়া নিজেকে ধূলার মধ্যে লুটাইয়া ফেলিল।

বিনীতা আজ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল সুধীরের বিশেষত্ব কিছুই নাই, সকলে যেমন, সেও তেমনি। বাহিরে সে একটা ছদ্ম আবরণ পরিয়া এতদিন বেড়াইতেছিল; সংসার তাহাকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহাকে উপদেষ্টারূপেই বরণ করিয়া লইয়াছিল। আজ অলক্ষ্যের একটি আঘাতে তাহার সে ছদ্মবেশটা খসিয়া পড়িল, আজ সুস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, সে সাধারণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। বাসনা কামনা প্রভৃতি রিপুগুলার আক্রমণ হইতে সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

বিনীতা ভাবিতে লাগিল কেন এমন হয়? রূপ দেখিলে লোকে উন্মাদ হয় কেন? অগ্নি আর রূপ এ দুইটীর দাহিকা সমান। অগ্নি যাহা স্পর্শ করে তাহা ভস্মে পরিণত করে, রূপ যাহা স্পর্শ করে, তাহাও ভস্মে পরিণত করে; তবু জানিয়া শুনিয়া কেন লোকে এই রূপকে বক্ষে ধরিতে চায়? তাহারা এটা কেন ভাবিয়া দেখেনা তাহাদের শেষ যেখানে, রূপেরও শেষ সেইখানে। সেই রাজ্যের অপার পারে কুৎসিত যে সেও যেমন, রূপবান যে সেও তেমনই। যে রূপ অনন্ত, সে রাজ্যের এদিকেও যেমন ওদিকেও তেমনই, তাহাকে কেন লোকে বরণ করেনা? সে রূপের মলিনতা নাই, উজ্জ্বলতা আছে; সে রূপের ধ্বংস নাই, বৃদ্ধি আছে। কেন লোকে তাহা ভুলিয়া যায়, কেন এই তুচ্ছ রূপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া শেষে পুড়িয়া মরে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে পতিত পত্রখানা আবার কুড়াইয়া লইল। এই যে সুধীরেরই হস্তাক্ষর, এই যে সুধীরেরই প্রাণের কথা। এই যে সে তাহাকে বরণ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া যাইতে চায়, তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে চায়। সে জানাইতেছে, সে বিনীতাকে তাহার জীবনের সহকারিণীরূপে পাইলে অনেক কাজ করিতে পারিবে। বিনীতাকে না পাইলে তাহার হৃদয় শ্মশান হইয়া যাইবে, দেশ তাহার নিকট হইতে একটী কাজও পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারিবে না।

বিনীতার সুন্দর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইয়া গেল, "কি ছেলেমানুষি এ সব? জীবনটা কি খেলার জিনিস যে, ইচ্ছা করলেই শ্মশান করা যাবে আবার ইচ্ছা করলেই স্বর্গ করা যাবে? ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে, আর সে কাজটা আমারই।"

মানদাকে ডাকিয়া সে আদেশ দিল "গাড়ী ঠিক করতে বলগে, আমি বউদির বাড়ী যাব।"

মানদা চলিয়া গেল। বিনীতা সে পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল।

খানিক পরে মানদা আসিয়া জানাইল গাড়ী ঠিক হইয়াছে।

বিনীতা পত্রখানা হাতে লইয়াই বাহির হইতে গেল। মানদা বলিল, "মাথাটাও বাঁধলেন না, কাপড়ও ছাড়লেন না, শুধু একটা আধ-ময়লা সেমিজ কাপড় পরেই যাবেন?"

বিনীতা বলিল "দরকার নেই। তোকে আজ বাড়ী থাকতে হবে। দাদা উঠলে বলিস আমি ঠিক পাঁচটায় সময় ফিরব।"

তাহার হাতে একটা রিষ্ট ওয়াচ ছিল, সেটার দিকে চাহিয়া বিনীতা দেখিল একটা বাজিয়াছে মাত্র।

গাড়ীর পা-দানে একটা পা তুলিয়া দিয়া কোচম্যানের পানে চাহিয়া সে বলিল "আগাড়ি, সুধীর বাবুকা বাড়ীমে যানে হোগা, পিছারি উকিল বাবুকা বাড়ী।"

"যো হুকুম" বলিয়া কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইল।

সুধীরের বাসায় সুধীর আজকাল একাই ছিল, মেয়েরা দেশে গিয়াছিলেন।

দরজার কাছে সুধীরের পশ্চিম দেশীয় ভৃত্য রঘুয়া বসিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত খইনি তৈয়ারী করিতেছিল. বিনীতা গাড়ী হইতে নামিয়া হুকুমের স্বরে বলিল "বাবু কাঁহা?"

রঘুয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের খইনি পড়িয়া গেল, সেদিকে না চাহিয়া সে বলিল "উপরমে।"

বিনীতা বলিল "মায়ীলোক সব কাঁহা গিয়া?"

রঘুয়া উত্তর করিল "বাড়ী সব চলা গিয়া।"

বিনীতা একটু দাঁড়াইয়া ভাবিল। তাহার পর সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া সে দর্পিত পদে উঠিয়া গেল।

নিজের গৃহে সুধীর চুপ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। পত্রখানা যতক্ষণ লিখিয়া সে না পাঠাইয়াছিল ততক্ষণ কে যেন তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল। পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। বিনীতাকে সে বেশ চিনিয়াছিল তথাপি নিজের হৃদয়ের ভাব সে দমন করিয়া রাখিতে পারে নাই। এ পত্র পাইয়া বিনীতা তাহাকে কি ভাবিবে? নরকের সন্তানের পার্শ্বে তাহার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিবেনা কি? আর হয়তো জীবনে সে তাহার সহিত কথা কহিবে না, দেখা হইলেও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। আর সরিত?

সুধীরের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চলিয়া গেল। এ পত্র নিশ্চয়ই বিনীতা সরিতকে দেখাইবে। যে ভগিনীকে সরিত দেবীর মত গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাকে ভুলাইবার জন্য সুধীরের বাসনা শুনিয়া সে কি বলিবে? সে যে ভগিনীর সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছে, তাহাকে বড় বিশ্বাস করিয়াছে, সে কি এই জন্য? বিনীতার নিকট হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিবে, কিন্তু সরিতের কাছে তো পারিবে না। এখানে থাকিলেই যে তাহাকে সরিতের সামনে পড়িতে হইবে, তখন সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

নিজের ক্ষণিক উত্তেজনার বসে সে যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার জন্য অনুতপ্তও হইতেছে বড় কম নয়। এখন কিছুকালের জন্য তাহাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে।

প্রতিবিধানের উপায়টা সে যখন ঠিক করিয়া লইতেছে, সেই সময় বারাণ্ডা হইতে গম্ভীর কণ্ঠে বিনীতা ডাকিল "সুধীর দা।"

একি? বিনীতা পত্র পাইয়া নিজেই যে চলিয়া আসিয়াছে। সে কেন আসিয়াছে? সুধীর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, তখনই দুইখানা হাত মুখের উপর চাপা দিয়া বালিশের আড়ালে মাথাটা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। না না, সাড়া দেওয়া হইবে না। সে ফিরিয়া যাক, মনে ভাবুক সুধীর নাই।

কিন্তু বিনীতা ফিরিল না। দরজা ঠেলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সুধীর একবার মুখ তুলিল, তখনই আবার মুখ লুকাইল।

বিনীতা ধীরস্বরে বলিল "উঠে বসুন আপনি, অত সঙ্কুচিত হবার কোনও কারণ নেই। আমি আপনাকে শাস্তি দিতে আসি নি, শাস্তি দিতে এসেছি।"

"শাস্তি দিতে এসেছ আমায়? কি শাস্তি দিতে এসেছ বিনীতা?"

সুধীর উঠিয়া বসিল, বিস্ফারিত নেত্রে বিনীতার মুখ পানে চাহিল।

বিনীতা একখানা টুল টানিয়া আনিয়া ঠিক তাহার সম্মুখে বসিল। পত্রখানা তাহার সম্মুখে

খুলিয়া দিয়া বলিল "পত্রখানা বোধ হয় আপনিই লিখেছেন আমাকে ?"

"আর লজ্জা দিও না বিনীতা। আমার যথেষ্ট শাস্তি হচ্ছে, আর শাস্তি দিও না আমাকে"—সুধীর কাতর দৃষ্টিতে বিনীতার পানে চাহিল।

বিনীতা বলিল "প্রথম আপনার পত্র পেয়ে আপনাকে শাস্তি দেবারই ইচ্ছা হয়েছিল, উপস্থিত আপনার এ অবস্থা দেখে আপনাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা হয়েছে। আমি প্রথম একটা কথা জানতে চাই, আমার মধ্যে এমন কি দেখেছেন যাতে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন, যাতে আপনার জ্ঞান পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়ে গেছে ?"

সুধীর দুই হাতে মাথা টিপিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না। বিনীতা একটু নীরব থাকিয়া বলিল "এই তো ধ্বংসশীল দেহ যার শেষ শুধু ভস্ম, কি আছে প্রলোভনের জিনিস এতে ? রূপ বলে ভিন্ন জিনিস কিছু নেই যে সংসারে। যাঁর, অসীম রূপের কণিকা মাত্র এসে জগৎকে সৌন্দর্য্য দান করেছে তাঁকে ভালবাসুন না কেন, তাঁকে ডাকুন না কেন, কোনও অভাব বোধ হবে না। ক্ষুদ্র এ নশ্বর দেহটাকে ভালবাসবেন কেন ? ভালবাসুন ভগবানকে। আপনি জ্ঞানবান সুধীরদা, আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। আপনার কাছেই কোথায় আমি এ সব শিখব, তা না হয়ে আপনাকে যে আমার এ কথা বলতে হচ্ছে, এ বড়ই দুঃখের কথা।"

সুধীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বিনীতা, ভুল সবারই আছে। তোমারও তো ঢের ভুল হয়, আবার সেটা শুধরিয়েও নাও তো; আমাকে শুধরোবার সময় দাও, দেখ আমি এ ভুল শুধরাতে পারি কিনা।"

বিনীতা বলিল "আমি সময় দিচ্ছি।"

সুধীর বলিল "দেখবে বিনীতা আমি এগুতে পারি কিনা। যথার্থ কথা বলছি, আমি আমার স্থান হতে নেমে পড়েছিলুম। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারিনি। আমার অদৃষ্ট শুভ যে তোমাকেই আমি ভালবেসেছিলুম, তাই আমার পতন হল না। তুমিই আমার কষ্টে বিচলিত হয়ে আমার হাত ধরে আবার উপরে টেনে নিলে। আমি আর কুহকে মজব না বিনীতা, এবার আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

বিনীতা প্রফুল্ল মুখে বলিল "ঠিক ?"

সুধীর বলিল "নিশ্চয়ই। তুমি কি এ পত্রের কথা সরিতকে বলেছ, তাকে কি দেখিয়েছিলে ?

বিনীতা উঠিয়া বলিল "না, কেউ জানতে পারে নি। আপনার পত্র আপনার কাছেই দিয়ে গেলুম, যা খুসী করুন।"

সুধীর পত্রখানা ছিঁড়িয়া জানালাপথে নীচে ফেলিয়া দিল। বিনীতা বলিল "বিকেলে যাবেন আমাদের বাড়ী। এ সব কথা ভুলে যান। আমাকে বোন বলে জানবেন এই আমি চাই। আমি এখন বউদির কাছে যাচ্ছি, পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরব।"

সুধীরের বুক হইতে পাষাণ সম ভারটা নামিয়া গেল। প্রফুল্ল মুখে সে বিনীতার সঙ্গে আসিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী মহিলা

আমাদের প্রধান কষ্ট যে, আমাদের স্ত্রীলোকগণ আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝিতে পারেন না। বাহিরে আমরা জগৎজোড়া কল্পনা করি, কিন্তু ঘরে ফিরিয়া উহা নিমেষেই উড়িয়া যায়। নিজেকে আর বড় ভাবিতে পারি না। নিমিষেই অতি ছোট হইয়া পড়ি। ভগবান নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের নারী-সমাজ হইতে আমরা কোনই সহানুভূতি লাভ করিতেছি না। অধিকন্তু তাঁহারা আমাদের ঘাড়ের বোঝা ও পথের বাধা হইয়া পড়িয়াছেন।

যে সময়ে তাঁহাদের সহযোগিতার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেই সুদুর্লভ সময়ে তাঁহারা আমাদের পথের বোঝাই হইয়া রহিলেন। নারীর সহযোগিতার অভাবে আমাদের জাতীয় জীবন আজ পরিপূর্ণ রূপে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইয়াছে জাতি গড়িয়া তোলা। নারী সমাজকে বাদ দিয়া জাতি গড়িয়া তুলিতে পারা যায় না। ভারতের কোন্ প্রদেশের নারীরা দেশের কোন্ কোন্ কার্য্যে কিরূপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা দেখিয়াই তাঁহাদের ক্রমশঃ বুঝা যায়।

মান্দ্রাজের নারী সমাজই এ বিষয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যালিটী ও তালুক-বোর্ডে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। মিসেস দেবদাস মান্দ্রাজ কর্পোরেশনের সর্ব্বপ্রথম মহিলা কমিশনার। তিনি বিচারপতি এম্, ডি, দেবদাসের সহধর্ম্মিণী। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী চেলারী তালুক-বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। সালেমের নারী সমাজ একটা সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীমতী মাগরেট্ই কজিন্স, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি জাতিতে আইরিশ হইলেও নারীর নির্ব্বাচন অধিকার আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মান্দ্রাজের অসহযোগী কর্ম্মী শ্রীমতী গঙ্গা ভাগীরথী সুব্রহ্ম দেবী এবং তুবরাম সাবাকারের এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন-অধিকার লাভ, ব্যাঙ্ক পরিচালনা ও স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে নিযুক্তি সমগ্র ভারতের নারী সমাজে এই প্রথম। ভারতে নারী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক আর আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালটীতে চারিজন মহিলা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীমতী গোখেলও ছিলেন। বোম্বাইর শ্রীমতী এম, এ টাটা সমগ্র ভারতে প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় মহিলা এম, এস, সি।

মহারাষ্ট্রের পণ্ডিতা রামবাঈ সরস্বতী ভারতের একজন প্রধান বিদুষী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং জনহিত সাধিকা মহিলা ছিলেন। তিনি কেদগাঁওয়ের নিকট "মুক্তি" নামক পল্লীর প্রতিষ্ঠা করতঃ তথায় প্রায় দেড়হাজার বিধবা নারী ও অনাথা বালিকাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ধর্ম্ম ও সাধারণ শিক্ষা দিতেন।

গুজরাটে শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধী গৃহে ও বাহিরে বহুদিন হইতেই স্বামীর সহকর্ম্মিণী। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বামীর সহিত কারাবরণ করেন। ১৩২৯ সালে তিনি গুজরাটের প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভানেত্রী হন। করাচী মিউনিসিপ্যালিটীতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ভোটাধিকার আছে।

পাঞ্জাবের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী

দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। রাজনৈতিক কারণে আর কোনও ভারতীয় মহিলা এত দীর্ঘকাল কারা-ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নাহি।

যুক্ত প্রদেশে মহিলাদের জন্য আগ্রায় মেডিকেল স্কুল এবং কাশীতে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইয়াছে।

১৩২৯ সালে আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক পরীক্ষায় শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী, শ্রীমতী শিবানী দেবী, শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী, শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী এবং শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী উত্তীর্ণা হন। আলীভ্রাতাদের শ্রদ্ধেয়া জননী বার্দ্ধক্যসত্ত্বেও অসীম উৎসাহ, সাহস ও দক্ষতার সহিত অক্লান্তভাবে দেশের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে গয়া কংগ্রেসের সভানেত্রী করারও প্রস্তাব হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় এত বৃদ্ধ বয়সে আর কোনও ভারতীয় মহিলা এরূপভাবে দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন নাই।

বেহারের আদালতে উকীল বা মোক্তার হইতে মেয়েদের কোন বাধা নাই।

ব্রহ্মদেশ শিক্ষায় সমগ্র ভারতে প্রথম স্থানীয়। ইহার অধিবাসীদের শতকরা ৩১ জন শিক্ষিত। নারী-কুলীরাও কাগজে পেন্সিল দিয়া টুকিয়া নিজেদের হিসাব রক্ষা করেন। ব্রহ্মের পরই ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন। এই দুই রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা ২৮ জন শিক্ষিত। ব্রহ্মী মহিলা শ্রীমতী মা, স, সা ভাবলিকের Royal college of Physicians & Surgeon হইতে পাস করিয়া রেঙ্গুন ডাফরিন হাঁসপাতালের পরিচালিকা নিযুক্ত হন। ব্রহ্মদেশের মেয়েরা বহুদিন হইতেই সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিয়া ব্যবস্থা-কার্য্যে নিজেদের অধিকার পরিচালন করিতে সমগ্র এসিয়া মহাদেশের মধ্যে ইহারাই অগ্রসর হইয়াছেন। ইহারা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার এবং নিজেরা সভ্য মনোনীত হইবার অধিকার ত লাভ করিয়াছেনই অধিকন্তু ইহাও ধার্য্য হইয়াছে যে, নারীকে কাউন্সিলের 'নির্ব্বাচিত' সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার অনুকূলে বিধি-প্রণয়ণ করিবার অধিকারও কাউন্সিলের রহিল।

বাঙ্গালার নারী সমাজ ব্যবস্থাপক সভা বা জেলাবোর্ডে সভ্য নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী নহেন। আদালতে তাঁহারা ব্যারিষ্টার, উকীল বা মোক্তার হইতে পারেন না। কলিকাতা কর্পোরেশনে তাঁহারা ভোট দিবার অধিকার লাভ করিলেও ঢাকা বা চট্টগ্রাম প্রভৃতি অন্য কোন মিউনিসিপ্যালিটীতেই তাঁহাদিগের সে অধিকার নাই। কর্পোরেশনে মহিলা কৌন্সিলর আছেন একমাত্র শ্রীমতী * * তিনিও জাতিতে বৃটিশ। বাঙ্গালায় দেশের কাজে কোন নারী দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীর মত একাধারে বিদুষী, কর্ম্মিষ্ঠা ও জনহিত সাধিকা মহিলাও বাঙ্গালার নারী সমাজে খুঁজিয়া পাই না। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের চট্টগ্রাম অধিবেশনের সভানেত্রী হইয়া থাকিলেও শ্রীমতি কস্তুরীবাঈ গান্ধীর মত এত দীর্ঘকাল দেশহিতব্রতে আত্ম-উদ্‌যাপন করেন নাই। বাঙ্গালায় নারীদের জন্য পৃথক কোন মেডিকেল স্কুল, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বাঙ্গালী কোন মহিলা কর্তৃক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নের বা কোন নারী ডাক্তার কর্তৃক হাঁসপাতাল পরিচালনারও খবর পাই নাই।

তারকেশ্বরে স্বামী সচ্চিদানন্দকে পুলিস যখন গ্রেপ্তার করিতে আসে তখন কতকগুলি নারী তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকেন। অনেক চেষ্টার পরও তাঁহাদিগের ব্যূহ ভঙ্গ করিতে না পারিয়া অবশেষে স্বামীজির গ্রেপ্তার ব্যতিতই পুলিসকে চলিয়া যাইতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের দৃঢ়তা সূচিত হয়।

কিন্তু মেবারের বেজোলিয়া নামক স্থানে শ্রীমতী অণা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশত নারী ইহা অপেক্ষাও দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। ঐ

স্থানে গদ্দর লইয়া পুলিসের সহিত কতকগুলি লোকের গোলমাল বাধে। পুলিস্ পাঁচজন পুরুষ ও এগার জন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে। ইহাতে জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ঘটনা স্থলে অনেক নর-নারী আসিয়া জমা হয়। রাজস্থান সেনাসঙ্ঘের সেক্রেটারী এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষদিগকে বুঝাইয়া সেখান হইতে সরাইয়া দেন, কিন্তু নারীরা তাঁহার কথা না শুনিয়া সেখানে জড় হইতে থাকে। অবশেষে পুলিস যত লোক্ গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

অসহযোগের দিনে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী সরযূবালা গুপ্তা প্রভৃতি কয়েকজন নারী কর্ম্মীকে আমরা বাঙ্গালায় দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে পশ্চাৎপদ আসামও তখন নীরব ছিল না। ডিব্রুগড়ের শ্রীমতী রাজবালা বড়ুয়া, শ্রীমতী প্রভা ভূঞা দেবী, শ্রীমতী স্বর্ণবালা বড়ুয়া ও শ্রীমতী নিত্রাবতী বড়ুয়া এবং শিলচরের শ্রীমতী সুরবালা দেবী প্রভৃতিও তখন দেশের কাজে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

দুনিয়ার নারী-হৃদয়ে গত মহাযুদ্ধ একটা নাড়া দিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে দুনিয়ার সবরকম কর্ম্ম কেন্দ্রেই তাঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন।

যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস ওয়ালাদেরও নারীসঙ্ঘকে ভয় করিয়াই চলিতে হয়, কারণ ভোটদাতারা তাঁহাদেরই বাধ্য। একজন রমণী রাষ্ট্রীয় সভার সভানেত্রীর পদও লাভ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে লেডি এ্যাষ্টর, শ্রীমতী উইন্‌ট্রিংহাম এবং ভাইকাউন্টেস্ রোণ্ডা প্রভৃতি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমানে মন্ত্রী-সভায়ও নারী স্থান লাভ করিয়াছেন।

জাপানে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে নারীদের যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। নারীরা বহুদিন ধরিয়া বহুবার সে নিষেধ লঙ্ঘন করার পর এখন সে নিষেধ উঠিয়া গিয়াছে।

ফ্রান্সের নারীরা স্থির করেন যে, যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদের ভোটের অধিকার মঞ্জুর করা হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহারা ট্যাক্স্ দিবেন না।

স্পেনে সেনোরিতা কারমেন লিঅন্ নামক মহিলা পার্লামেণ্টের সভ্য পদ প্রার্থী হন।

গ্রীসে নারীরা নির্ব্বাচন অধিকার লাভ করেন।

অষ্ট্রিয়ার গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নারীদের আইন অধ্যয়ন সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হয়। প্রথম নারী ব্যারিষ্টার ফ্রাউলিন মূর্‌জ্ সেইয়ার ডবলিঙ্গ ফৌজদারী আদালতে প্রবিষ্ট হন।

ক্যানাডায় ৩১ বৎসর বয়সে প্রথম নারী সভ্য কুমারী এগ্‌নিস ম্যাকফেল পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন।

চীনা নারীরাও এতদিনকার পুরুষ-প্রাধান্য ছিঁড়িবার জন্য হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। চারিদিকে নারী শিক্ষার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া ভোট দিবার এবং অন্যান্য ন্যায়-সঙ্গত দাবী করিতেছেন। অনেক সরকারী কর্ম্মচারীকেও নারীদের কাছে যুক্তিতে হটিতে হইয়াছে। সবচেয়ে শিক্ষিত প্রদেশ হুনানে নারীরা ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। ক্যাণ্টনে এক নারী নাগরিক আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আফ্‌গানিস্থানের মেয়েরাও সময়ের সঙ্গে পা ফেলিয়া দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছেন। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে শত শত নারী চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে পশ্‌তু, উর্দ্দু, পার্সী এবং রুস ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশের নারীগণ জাগিয়া উঠিলেও বাঙ্গালার নারী হৃদয়ে তাহার উল্লেখযোগ্য কোনই সাড়া জাগে নাই। বাঙ্গালার নারী সমাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।　　—তরুণ পত্র।

বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা

শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা

ন ভারতের—আত্মারাম সাধনার ভারতের অবস্থা আজ বহির্মুখীন। আত্মার বলে, সাধনার বলে, আত্মসাক্ষাৎকারে যত্নশীল না হইয়া আজ আমরা 'কৃপা' ভিখারী, 'প্রেরণা' আকাঙ্ক্ষী।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আজ আমরা এই হীন অবস্থায় উপনীত। বাক্য ও মনের অগোচর অন্তর্য্যামী ভগবানকে পাইবার জন্য আজ আমরা মানুষ গুরুর দারস্থ। শারীরিক উন্নতি বিধানের জন্য আজ আমরা খেলার দল গঠনে ব্যস্ত। আনন্দ পাইবার জন্য, শ্রম অন্তে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য আজ আমরা গৃহে সুযোগ পাই না, ক্লাবে গমন করি, সিনেমা থিয়েটারের আশ্রয় গ্রহণে ব্যস্ত। স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ এবং জলযোগের জন্য আজ আমরা হোটেল, রেস্তরাণ্টে ধাবমান। যেদিকে তাকাও, সর্ব্বত্রই এক দীন, কাঙ্গাল, লক্ষ্যহীন, পরমুখাপেক্ষার অস্বাভাবিক অবস্থা।

এক আত্মশক্তি অনুভূতির অভাবে আজ এই দুর্দ্দশা। সেদিনও মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আমি ভারতের কল্যাণে সর্ব্বদা বিশ্বাসী, কারণ আমি আমার নিজ হইতে অনেক আশা করি।" ইহাতে আত্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ এখন এই হীন অবস্থার বিষয় কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে এবং সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে ত্যাগী কর্ম্মী দেখা যাইতেছে। দেশবন্ধুর আত্মশক্তিতে কত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহা না হইলে কি বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, এত নিন্দা গ্লানি সহ্য করিয়া স্বীয় লক্ষ্যের দিকে তিনি ধাবিত হইতে পারিতেন? প্রকৃতপক্ষে যাঁহার লক্ষ্য স্বার্থশূন্য এবং পবিত্র হইবে, তিনিই দৃঢ়ব্রতী এবং অত্যাচার অপমান সহনে সক্ষম হইবেন।

লক্ষ্য বিষয়ে সন্দেহ আসিলেই লোকের সত্বগুণ কম হয়, সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, আর হয় কিসে,—যখন দুর্দ্দমনীয় ভোগপিপাসা, বিষয়-বাসনা মানবের পবিত্র হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসে। জ্ঞানের অভাবেই ইহা সম্ভব। জ্ঞানীর মনে যে দুর্ব্বলতা না আসে তাহা নহে, কিন্তু তাহা সূর্য্যের উপর মেঘ আসার মত। জ্ঞানী দুর্ব্বলতা বশতঃ ভোগে লিপ্ত হইলেও, সতত সজাগ এবং নিজের দুর্ব্বল অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত; সুতরাং তাঁহার পক্ষে চিরতরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব। ভারতের সাধকজীবনে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আজ সাধনাও নাই, সংগ্রামও নাই, কেন না ছোটকাল হইতেই আমরা সেইরূপ শিক্ষায় বঞ্চিত। এখন জ্ঞানবিকাশ-যজ্ঞে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ভাই কর্ম্মী, নীরবে শিশির বিন্দু পড়িয়া সংসারে কত কল্যাণ করিতেছে। বিনা ওজরে সূর্য্যদেব কি চমৎকার সেবাতেই ব্যস্ত; বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই, তিনি সদাই সমান তেজে বিধাতার হুকুম শিরে বহন করিয়া আনন্দে খাটিয়া যাইতেছেন। কখনও কি আকাশ, বাতাস, সূর্য্যদেব ইত্যাদি সেবককে কাহারও উপর অনুযোগ দিতে শুনিয়াছ? পরের উপর দোষ দিতে দেখিয়াছ? একবার ভাব কি আনন্দের সেবাকার্য্যে ইঁহারা সদাই বিভোর—চির উৎসাহী।

নির্য্যাতিতা

শ্রীমতী সুনীতিপ্রভা দত্ত।

আমি অবলা নারী, তাই এতকাল মূকের মত নীরবে সব সহ্য করিয়াছি—বধিরের মত সহ্য করিয়াছি—কোন বিষয়ে কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু আজ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছি, নারীজাতির চির অভ্যস্ত সহনশীলতা আজ আমাকে অতিক্রম করিয়াছে আজ আমি জগতের কাছে আমার উপর এই অন্যায় নির্য্যাতনের বিচার প্রার্থিনী।

আমি নাকি খুব সুন্দরী ছিলাম কিন্তু আমার দরিদ্র পিতা যখন আমার দশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশবৎসর পর্য্যন্ত কোন যোগ্য পাত্রের সন্ধান পাইলেন না, তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন জানিতে পারিলাম আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। এক কুসীদজীবি প্রৌঢ় নিঃসন্তান মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ সন্তান এক স্ত্রী থাকা সত্বেও দয়া করিয়া আমার পাণিপ্রার্থী হইয়া আমার নারীত্বকে সফল করিতে চাহিয়াছেন। বুঝিলাম অর্থাভাবে এই সৌন্দর্য্য পপাসু জগতেও আমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত স্থান নাই। সমস্ত অন্তর আমার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভগবান যদিও দরিদ্রগৃহে জন্ম দিয়াছেন কিন্তু হৃদয়বৃত্তি গুলিকে ত আর ধনীকন্যার মত উচ্চ করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু উপায় নাই, দরিদ্রকে যে সমাজের কাছে এইরূপেই সমস্ত সুখ সাধ বলিদান করিতে হয়! পিতাকে আমার দোষ দিতে পারি না। তিনি হয়ত জীবনপণ করিয়াও এর চেয়ে ভাল পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেন না, কারণ আজকাল দেশের সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দ যে কন্যার পিতার নিকট অর্থের ভিখারী!

বিবাহের দিন শুভদৃষ্টির সময় অনিচ্ছাসত্বেও যখন চক্ষু মেলিলাম তখন শিহরিয়া উঠিলাম। মনে মনে কহিলাম "হায় বিধাতা, আমার কৈশোরের আরাধ্য কল্পিত দেবতার এ কোন অভিশপ্ত মূরতি!" বিবাহের মঙ্গলবাদ্য, হুলুধ্বনি আমার কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় বাজিতে লাগিল। স্ত্রীআচারের সময় অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে পাইলাম "আহা এমন মেয়েটার অদৃষ্টে এই ছিল!" শৈশবাধি আমি মাতৃহারা, তাই অভাগীর বুকের বেদনা কেহ বুঝিল না।

স্বামীগৃহে পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম পরের মেয়ের জন্য অনাবশ্যক আদর যত্ন এখানে নাই। সপত্নীর খিটখিটে মেজাজ এবং বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি সদা সতর্কিত দৃষ্টি আমাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। দাসীর ন্যায় সংসারের যাবতীয় কাজ করিতাম। পুরস্কার স্বরূপ আমার প্রাপ্য ছিল শুধু অবহেলা, তাচ্ছিল্য, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। পিতার অর্থাভাবই আমার সব অপরাধের মূল। তাঁহাদের ব্যবহারে মনে হইত ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাইলেই যেন তাঁহারা আমার দায় হইতে মুক্ত হন। স্বামী আমার বড় খোঁজখবর লইতেন না। সমস্ত দিনের পর যখন অর্থচিন্তা সমাচ্ছন্ন কুঞ্চিত ললাট, ভ্রুকুটী যুক্ত চক্ষু লইয়া কৃপণের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বামী আমার গৃহে প্রবেশ করিতেন তখন আমি শিহরিয়া উঠিতাম আমার সমস্ত হৃদয় জীবনব্যাপি ব্যর্থতায় আলোড়িত হইয়া উঠিত। তখনই আবার মনে হইয়াছে "ছি, হিন্দুর ঘরের মেয়ে আমি, বিশুদ্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাঁহাকে আমার জীবন মরণের স্বামী করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহার প্রতি কেন এ অন্যায় বিরুদ্ধ ভাব?" অন্তরের বিবেক গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে "ওরে নারী, কতকাল এরূপ বুককাটা মুখবোজা হইয়া থাকিবি? এর চেয়ে যে

মরণও ভাল, সংসার হইতে নারীনাম লুপ্ত হইয়া যাওয়াও শ্রেয়।" যাক্, দিন কাহারও অপেক্ষা করে না। আমারও দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কোন কারণবশতঃ আলাদা ঘরে শয়ন করিয়া আছি। হঠাৎ মধ্যরাত্রে আমার ঘরের পাশ দিয়া কতকগুলি লোকের যাতায়াত শব্দে জাগিয়া উঠিলাম। একটা অজানিত আশঙ্কায় বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। শুনিয়াছিলাম এখানে মাঝে মাঝে গুণ্ডার উপদ্রব হয়। দেখিতে দেখিতে চার পাঁচজন লোক আমার ঘরের দরজা ভাজিয়া প্রবেশ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। চিৎকার করিয়া বলিলাম "ওগো, কে আছ রক্ষা কর।" বাড়ীর সকলের জাগিবার সাড়া পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই সব নীরব। কাহারও সাহস হইল না যে এই দুরাত্মাদের হাত হইতে আমার রক্ষা করে। তারপর পুলিশের বহু তদন্তের পর, সহস্র লোকচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝ দিয়া যখন উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া স্বামীর গৃহে আশ্রয় প্রার্থিনী হইলাম তখন জানিলাম আমি পতিতা, সমাজে আমার স্থান নাই। তখন কি করিব? বেদনাহতা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য, স্বামী আমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, সমাজ আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না, সে দোষ কি আমার? নারী জাতির আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা অপহরণ করিয়াছে কে? সে কি সমাজ নহে? যে নারীর বীরত্ব একদিন দেশের গৌরব বলিয়া মনে করা হইত, সমাজ আজ তাহাকে জড়ত্বে পরিণত করে নাই কি?

পল্লীমায়ের ডাক

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

শ্যামল মাতা ডাক্‌ছে তোরে, আয়রে ওরে আয়!
পল্লীমায়ের কোলের দুলাল, বল্লী-বটের ছায়!
আজকে ডাকেন তিনি, তোমায়
ধনের মেলাতে,
ডাকেন রাতে, ডাকেন প্রাতে,
বিকাল বেলাতে;
দুপুর বেলায়, রৌদ্র-অলস
দিঘীর কালো জলে,
ঐ যে তিনি ডাকেন তোমায়
ঢেউয়ের ছলছলে!
ধানের ক্ষেতের শীষগুলি অই দুল্‌ছে অবেলায়,
বল্‌ছে "ওরে পল্লী-দুলাল, মায়ের কোলে আয়!"

জননী আজ নতুন ধানে পায়েস-পিঠা করে—
খেজুর রসের ভিয়ান বসে আজকে তাঁহার ঘরে।
ক্ষেত-খামারে ধানের ধূলা
উড়ায় চাষীরা—
আয় চলে আয় লক্ষ্মীছাড়া,
উপবাসীরা!
তোমরা এস, নওকো যা'রা
দুঃখী, গরীব ছেলে,
মায়ের পায়ে দাওসে সোণা-
রূপার রাশি ঢেলে!
গরীব, ধনী, আজ জননী সব ছেলেরেই চায়—
পল্লীমাতা ডাক দিয়াছেন, আয়রে ওরে আয়!

হায়দ্রাবাদি কালিয়া—

উপাদান—মাংস এক সের, ঘৃত দেড় পোয়া, আনারস আধ সের, দই এক পোয়া, ক্ষীর আধ পোয়া, আলু আধ সের, পিঁয়াজ আধ পোয়া, পেস্তা ধনে বাদাম আদা প্রত্যেকটি এক তোলা, জাফরাণ আধ তোলা, লঙ্কা আধ তোলা, জিরা আধ তোলা, লবঙ্গ আধ তোলা, ছোটএলাচ আধ তোলা, তেজপাতা আটখানি, লবণ চারি তোলা, জল পরিমাণ মত।

রন্ধন-প্রণালী—প্রথমে মশলাগুলি বেশ মিহি করিয়া গুঁড়াইয়া লও, আলুগুলি ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া লও; পেস্তা, ধনে, বাদাম, ছোটএলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ও আদা বাটিয়া লও এবং পিঁয়াজগুলি কুচাইয়া রাখ। এইবার কড়ায় ঘি চাপাইয়া আলুগুলি বেশ করিয়া কসিয়া পিঁয়াজগুলি অল্প পরিমাণে ভাজিয়া পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া একটি ডেকচিতে ঘৈ ঢালিয়া মাংস সিদ্ধ করিতে দাও। সিদ্ধ করিবার সময় ডেকচির মুখ ঢাকা দেওয়া দরকার। মাংস বেশ সিদ্ধ হইয়া আসিলে গরম জলের সহিত মশলাগুলি মিশাইয়া উহাতে ঢালিয়া দাও। একটু ফুটিলে কসা আলু, পিঁয়াজ, আনারস টুকরা ও পেস্তা, ধনে, বাদাম, আদা বাটা উহাতে ঢালিয়া দাও। এইবার আর একটু সিদ্ধ হইয়া রস মরিয়া আসিলে ছোটএলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ বাটা ক্ষীরের সহিত গুলিয়া মাংসে ঢালিয়া দিয়া নামাইয়া লও। নামাইয়া কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়া রাখা দরকার। ইহাই হায়দ্রাবাদি কালিয়া।

শ্রীমতী সরযূবালা রায়।

ছোলার ডালের ধোঁকা—

উপাদান—ছোলার ডাল, আলু, তেল, ঘি, ধনে, জিরামরিচ, হলুদ, লঙ্কা, তেজপাতা, গরমমসলা, লবণ।

রন্ধন-প্রণালী—প্রথমে ছোলার ডালগুলি ভিজাইয়া বেশ করিয়া বাটিতে হইবে, বাটায় যেন একটুও খিচ না থাকে। তারপর আলুগুলি বেশ ডুমো ডুমো করিয়া কুটিয়া রাখিতে হইবে। এইবার কড়ায় জল চাপাইয়া ডালবাটাগুলি বড় বড় নেচির আকারে কাটিতে হইবে। জল বেশ ফুটিয়া উঠিলে ডালের ঐ নেচিগুলি উহাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যখন সেগুলি শক্ত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইবে তখন নামাইয়া ডুমো ডুমো করিয়া কুটিয়া পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হইবে। তারপর কড়ায় তেল চাপাইয়া ঐ নেচিগুলি ভাজিয়া আলুগুলি ভাজিতে হইবে। ভাজার কার্য্য শেষ হইলে কড়ায় ধনে জিরামরিচ প্রভৃতি মশলার সহিত গরম জল চড়াইয়া আলুগুলি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং অল্প একটু ফুটিয়া উঠিলে কর্ত্তিত ডালগুলি তাহাতে ছাড়িতে হইবে। বেশ সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া কড়ায় ঘি, পাঁচফোরণ, লঙ্কা এবং তেজপাত ঘিয়ে ভাজিয়া ডালনাটি উহাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। একটু রস থাকিতে নামাইয়া আর একটু ঘি ও গরমমসলা দিয়া ভাল ঢাকনা দিয়া ঢাকিলেই ছোলার ডালের ধোঁকা তৈয়ারী হইল।

শ্রীমতী পরিমল ঘোষ।

অপচয় দ্রব্য রন্ধন—

এটি হইতেছে কচি ডাবের খোলা রান্না। নেয়াপাতি খোলাই রন্ধনের উপযুক্ত। ডাব চিরিয়া ভিতরের শাঁসটুকু চাঁচিয়া লইলে, উপরে যে একটা শক্ত খোল থাকে, যাহা পরিপক্ব হইলে মালা হয়, সেটা আস্তে আস্তে বাদ দিবেন। ঠিক খোলার নীচেই ছোবড়ার উপরের অংশটুকু এক আঙুলেরও কম পুরু আস্তে আস্তে কাটারী দিয়া ছাড়িয়ে কলন, পরে ইহাকে এঁচড়ের মত কুচি কুচি করিয়া কাটুন এবং এঁচড়ের মতন সিদ্ধ করিয়া লউন। সুসিদ্ধ হইলে তৈলে ভাজিয়া লইয়া গোটা তিন-চার আলু (একটি ডাবের পক্ষে যথেষ্ট) পছন্দ মত ডুমো ডুমো করিয়া কাটিয়া ভাজিয়া লউন। পরে সেগুলি একটি পাত্রে রাখিয়া, কড়ায় অল্প তৈল দিয়া জীরে, তেজপাতা, দুটি লবঙ্গ, একটি ছোট এলাচ, এক টুকরা দারুচিনি অল্প অল্প থেতো করিয়া ফোড়ং দিন। ফোড়ং দেওয়া হইলে, পরিমাণমত ধনে বাটা, হলুদ বাটা, গোলমরিচ বাটা, আদাবাটা, দই একটু গুলিয়া সর্ব্বসমেত মশলা বেশ করিয়া কসিয়া লউন এবং সব তরকারী তাহাতে ফেলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পরিমাণ মত জল দিন; এইবার লবণও একটু মিষ্টি দিন। এঁচড়ের ডালনার মত এতে ছোলা ভিজা দিলেও বেশ হয়। পিঁয়াজ কুচাইয়া ফোড়ঙের সময় দিতে পারেন। যাঁরা পিঁয়াজ পছন্দ করেন না, অল্প হিং আদার রসে ভিজাইয়া গুলিয়া ফোড়ং দিতে পারেন। সুসিদ্ধ হইলে অল্প ময়দা গুলিয়া দিবেন এবং ঘি দিয়া একবার ফুটিলেই নামাইয়া গরম মসলা দিয়া চাপা দিবেন। এই ডালনা এঁচড়ের

ভালদা অপেক্ষা রুচিকর। যখন বাজারে এঁচড় পাওয়া যায় না সেই সময় সুখাদ্য ডাবের খোলা হইতে সকলে এঁচড়ের আস্বাদ পাইতে পারেন। আশা করি সবাই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী।

মাছের মিঠাই—

রুই, কাতলা বা মিরগেল মাছ বেশ করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া সমস্ত কাঁটা ফেলিয়া দিন। এইবার কিছু আলু সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া উক্ত সিদ্ধ মাছের সহিত মিশান। একপোয়া সিদ্ধ মাছে দুইটি বড় নৈনীতাল আলু দিলেই যথেষ্ট হইবে। এইবার সামান্য মাখন, অল্প একটু দুধ, একটি ডিম (তিনটিতে একপোয়া ওজনের হইলেই ঠিক হইবে), দুই চামচ চিনি, একমুঠা ময়দা ঐ আলুমিশ্রিত মাছের সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া গোল গোল করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লউন। ইহাই মাছের মিঠাই। ইহা খুব মুখরোচক খাদ্য।

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী।

মাংসের রোষ্ট—

ডেকচি কিংবা কড়ায় মাংস বেশ সুসিদ্ধ হইবে এরূপ পরিমাণে জল বসাও, ঐ জলে পরিমাণমত লবণ, কিছু লঙ্কাবাটা, সাত-আটটি খোসা ছাড়ান' আস্ত পিঁয়াজ এবং কয়েকটা তেজ পাতা দাও। জল যখন বেশ ফুটিতে থাকিবে তখন মাংস তাঁহাতে ছাড়িয়া দাও এবং ঢাকা দিয়া রাখ। মাংস সিদ্ধ করিতে দিবার মিনিট পনের পূর্ব্বে তাহার সহিত একটু লবণ মাখা দরকার। মাংস বেশ সিদ্ধ হইলে বাকী জলটুকু সমেত থালায় ঢাল। এইবার কড়ায় মাংস ভাজিবার উপযোগী ঘি দিয়া তাহাতে কয়েকটা তেজপাত, কিছু আদাবাটা, পনের-ষোলটী পিঁয়াজবাটা ভাজিয়া লও। ভাজা হইয়া গেলে থালার সেই ঝোল-সমেত মাংস কড়ায় ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া ভাজ। যখন মাংসের রঙ বেশ লাল হইবে তখন একটু গরমমসলা মিশাইয়া ভাল করিয়া ঢাক। ইহাই মাংসের রোষ্ট। এই প্রণালীতে আস্ত মুরগী, হাঁস, পায়রা প্রভৃতির পাখা ফেলিয়া ছুরীর দ্বারা পেট চিরিয়া নাড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া রোষ্ট প্রস্তুত করা যায়।

শ্রীমতী সুনীতি সেনগুপ্তা।

অশনি

শ্রীমতী এ, এম সৈয়েদা খাতুন।

[১৯২৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর কুমিল্লা স্কুলের সামনে একটি মোসলেম ছাত্র সহসা বজ্রপাতে মারা যায়। সেই উপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত।]

কার বুকচেরা ধন আজি যম হরিল,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কেন আজি পড়িল!
এসেছিল পাঠশালে কত আশা করিয়া,
কে জানিত মার কোলে যাবেনারে ফিরিয়া।
পাঠায়ে অসুস্থ ছেলে কোন্ ঘরে না জানি—
বসে আছে পথ চেয়ে অভাগিনী জননী!
হায়! কে সংবাদ দিবে পুত্রহারা মায়েরে—
'আসিবেনা বাছা আর তব স্নেহ-ছায়ে রে!'

নিয়ে গেছে যম তারে বজ্ররূপে আসিয়া,
কার পথ চেয়ে মাগো রয়েছিস্ বসিয়া?
ভগবান! কোন্ হাতে হানিলে এ অশনি—
জান না কি পথ চেয়ে বসে আছে জননী?
কাঁপিল না হাত তব পাইনা যে ভাবিয়া,
অচল হল না দৃষ্টি মার মুখ চাহিয়া?
পূর্ণ হোক্ দয়াময় তব শুভ বাসনা,
মার বুকে শান্তি দাও—এই শেষ কামনা।

স্কচ পরিবারে কয়েক দিন

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

গত বৎসর বিলাত-যাত্রা কালে জাহাজে Rev. Dr. Robert Morison নামক একজন স্কটলণ্ডবাসী ইংরেজের সহিত আমার পরিচয় হয়। মরিসন সাহেব রাজসাহীর মিশনারী এম, ডি ডাক্তার। তিনি ভারতবর্ষ হইতে সস্ত্রীক দেশে যাইতেছিলেন, সঙ্গে চারি বৎসরের একটি ছেলে। জাহাজে বহু-সংখ্যক ইংরেজ যাত্রী—একজন ইহুদী ছিল সেও ইংরেজের দলে, কেবল একা আমি একটি বাঙ্গালী। জাহাজে ডাক্তার মরিসনের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তিনি হাঁসিয়া আমাকে বলিলেন, আমার ছেলে আপনার সঙ্গে বাংলা কথা বলতে পারবে। জাহাজে সর্ব্বদা ইংরাজী বলার মধ্যে মরিসন সাহেবের ও তাঁর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমার একটু বাংলা বলিবার সুযোগ হইবে বলিয়া আনন্দিত হইলাম। তিন সপ্তাহ কাল জাহাজে একত্র বাসের পর এই পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। লণ্ডনে পৌঁছিয়া তাঁহারা স্কটলণ্ডে গেলেন, আমি লণ্ডনে থাকিলাম।

একদিন ডাক্তার মরিসন লণ্ডনে এম্পায়ার একজিবিশন দেখিতে আসিয়া আমাদের ষ্টলে আমার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং একজিবিশন শেষ হইবার পর এডিনবরা গিয়া তাঁহার বাড়ীতে দুই সপ্তাহ থাকিয়া আসিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অক্টোবরের শেষ ভাগে একজিবিশন ভঙ্গ হইল, নবেম্বরের প্রথম তিন সপ্তাহ আমি লণ্ডন সহরের নানা দর্শনীয় বিষয় গুলির অধিকাংশ দেখিয়া লইয়া মরিসন সাহেবের আহ্বান-পত্র পাইয়া ২৪শে নবেম্বর (১৯২৪) তারিখে ট্রেণে স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা রওনা হইলাম। লণ্ডন হইতে এডিনবরা রেলপথে চারিশত মাইল উত্তরে। ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে আড়াই পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা। ওদেশে প্রায় সকল লোকই তৃতীয় শ্রেণীতে চলে।

সকালে ১০ টায় ট্রেণে চাপিলাম। পথে সহর, পল্লী, পাহাড়, ক্ষেত্র, নদীর সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। লিভরপুল হইতে মাঞ্চেষ্টর পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড কৃত্রিম ক্যানেল, ট্রেণে ক্যানেল পার হইবার সময় তাহার মধ্যে জাহাজ চলিতে দেখিলাম। এই পথেই আমাদের ভারতবর্ষের তুলা সমস্ত জাহাজ বোঝাই হইয়া মাঞ্চেষ্টর যায় এবং বস্ত্র তৈরী হইয়া ভারতে আসে। ল্যাঙ্কাসায়ার অঞ্চলের মধ্য দিয়া যখন ট্রেণ চলিল তখন চারিদিকে অনেক কাপড়ের কল আমাদের নয়নপথে পড়িতে লাগিল।

বিকাল তিনটায় ইংলণ্ড অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে চলিয়া স্কটলণ্ডের সীমানায় পৌঁছিলাম। স্কটলণ্ড দেশ বহু বহু পাহাড় পর্ব্বতে পূর্ণ। ক্রমে উত্তরাভিমুখে যাওয়ায় অধিকতর শীত বোধ করিতেছিলাম। চারি দিকেই ছোট বড় পাহাড়ে ভরা, পাহাড় গুলি প্রায়ই ঘাসে ঢাকা, তার উপর গরু, ভেড়া চরিবার স্থান। নিচের জমিগুলি প্রকাণ্ড খণ্ড খণ্ড পাথরের উঁচু বেড়ায় ঘেরা, তার মধ্যে নানাবিধ শস্যের চাষ, কোনটিতে শুকর কোনটিতে মুরগীর চাষ। বহু নূতন দৃশ্যের মধ্যে চলিতে চলিতে পাঁচটায় সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘিরিল।

রাত্রি আটটায় ট্রেণ এডিনবরার রমণীয় প্রিন্সেস ষ্ট্রীট ষ্টেসনে পৌঁছিল। দেখিলাম মরিসন সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছেন, আমার গাড়ীর দ্বারেই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—আমার ব্যাগটি তিনি কিছুতেই আমাকে বহন

করিতে দিলেন না—নিজে হাতে বহন করিয়া আমাকে লইয়া ট্রামে চাপিলেন। দুই মাইল ট্রামে চলিয়া আমরা 33. Craiglea Drive ঠিকানায় মরিসন সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

বাড়ীর ছেলেরা ভারতীয় নূতন অতিথির দর্শন আশায় উৎসুক রহিয়াছিল। মরিসন সাহেবের স্ত্রী আমাকে আপ্যায়িত করিয়া ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। দেখিলাম তাঁহাদের মস্ত বড় চারিতল পাথরের তৈরী বাড়ী। সকলের উপর তলায় সুন্দর একটি বড় কামরায় আমার থাকিবার স্থান হইল। রাত্রির আহারান্তে মিসেস মরিসন আমাকে লইয়া আমার ঘরে-আবশ্যক দ্রব্যাদি দেখাইয়া দিলেন। ভয়ানক শীত-শয্যা-মধ্যে গরম জলের ব্যাগ ব্যবহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই মত গরম জলের ব্যাগ বিছানার মধ্যে রাখিবার সার্থকতা জিজ্ঞাসা করায় মিসেস মরিসন হাসিয়া আমাকে বলিলেন, ইহা ব্যবহার না করিলে আপনার শরীরের উত্তাপটুকুও ঐ শীতল বিছানায় হরণ করিয়া লইয়া আপনাকে হিম করিয়া ফেলিবে। মিসেস মরিসন আরও আবশ্যক উপদেশাদি দিয়া রাত্রির জন্য বিদায় লইলেন। বাস্তবিক ঐ গরম ব্যাগ বিছানার মধ্যে রাখিবার জন্য দেখা গেল বিছানার মধ্যে বেশ গরম হইল, রাত্রি বেশ আরামে নিদ্রা গেলাম।

ডাক্তার রবার্ট মরিসনের পরিবারে বর্ত্তমানে তিনটী ছোট ছেলে মাত্র। বড় ছেলে Maxwell ১২ বছরের, মধ্যম Jan ৭ বছরের, ছোট Archi ৪ বছরের। ইহারা সকালে হাত-মুখ ধুইয়াই আমার সঙ্গে গল্প করিতে বসিল, Archi পূর্ব্বেই জাহাজে আমাকে জানিত। তিন ভাইয়ে মিলিয়া তাহাদের ঘরের নূতন নূতন দ্রব্যসম্ভার আমাকে দেখাইয়া গৃহমধ্যে বাজার করিয়া তুলিল। ঘরের মধ্যে নানা স্থানের দ্রষ্টব্যগুলি একে একে দেখাইল। তাদের একটা ঘড়ীতে ঘণ্টা বাজিবার সময়ে ঘড়ীর যন্ত্র মধ্য হইতে একটা কৃত্রিম কাল কোকিল আসিয়া কুহু কুহু করিয়া যখন ঘড়ীতে যতটা বাজে ততটা ডাক দিয়া আবার ঘড়ীর কলের মধ্যে গিয়া লুকায়, সুন্দর ছোট একখানি ঘর আছে, তার ছোট্ট দুটি দরজা—বৃষ্টি হবার দিনে পাঁচ-সাত ঘণ্টা আগেই একটা ছাতা মাথায় পুরুষ পুতুল একটা দরজা হইতে বাহির হইয়া আসে, যেদিন রোদ হবে, আগে থেকেই সেদিন অপর এক দরজা দিয়া একটা বেশভূষায় সজ্জিত মেয়ে পুতুল বাহিরে আসে। এটি আর কিছুই নয় একটা ব্যারোমিটার বা বায়ুমান. যন্ত্র—কলের সংযোগে এইমত ক্রিয়াশীল আপনা আপনিই হয়। একটা ছোট কপিকল আছে, হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ছেলেরা ছোট ছোট জিনিসপত্র নিচে-তল থেকে চৌতল পর্য্যন্ত যে কোন তলে দরকার মত তোলাপাড়া করে। বালক তিনটী এইমত আমাকে নানারকম চিত্তাকর্ষক বিষয় দেখাইয়া সকালটা কাটাইল।

মিঃ মরিসন এডিনবরায় আসিয়া ডাক্তারী একটা বিশেষ বিভাগের বিষয় অধ্যয়নার্থ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, আমার আগমন উপলক্ষে এক সপ্তাহের ছুটী লইয়াছেন। প্রথম দিনেই প্রাত-র্ভোজনের পর তিনি আমাকে সহরের এক প্রান্তে একটা রমণীয় পাহাড়ের উপর বেড়াইতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে এডিনবরা সহরের সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। এডিনবরা সহরটী এতই সুন্দর যে প্রাচীন ভিনিস্ নগরের সহিত ইহার উপমা দেওয়া হয়—তাই ইহা উত্তর ভিনিস (North Venece) বলিয়া বহুকাল হইতে কথিত হইয়া আসিতেছে।

সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, সহরের বহুদূরের দৃশ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। প্রিন্সেস ষ্ট্রীট, ইউনিভার্সিটি, ক্যাসেল, আর্টগ্যালারী, স্কট্ মেমোরিয়াল, অবজারভেটরী প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান দর্শনীয় বিষয় গুলির সহিত দূর হইতেই কিঞ্চিৎ পরিচিত হইলাম। তারপর আমরা পাহাড়ের নানাস্থান ঘুরিয়া Golf খেলা দেখিলাম।

গল্‌ফ খেলাটি যে স্কটলণ্ডেই সৃষ্টি হইয়া সারা সভ্যদেশ জুড়িয়াছে তাহার ইতিহাস শুনিলাম।

পরে আমরা একটী পাহাড়ের উপর একটী জলাশয়ে ঐ দেশীয় নূতন রকমের নানাপ্রকার মৃণাল, শৈবাল ও ক্ষুদ্র মৎস্য কীটাদি দেখিলাম। খরগোসের গর্ত্ত দেখা গেল—ওদেশের পাহাড় গুলিতে বহু খরগোস বাস করে, লোকে বন্দুক দিয়া শিকার করে, কিন্তু এই পাহাড়ের খরগোস ধরিবার নিয়ম নাই, ইহারা পাহাড়ের শোভা বর্দ্ধন করে।

চলিতে চলিতে আমরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতেছিলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, পাহাড়ের উপর শীতল বাতাসে ভয়ানক শীতে ধরে—পরিশ্রমের সহিত হাঁটিলে শীতে কষ্ট দিতে পারে না। পাহাড়ে ভ্রমণে অনভ্যস্ততা বশতঃ আমি পরিশ্রম ও শীতে ক্লান্ত হইতেছিলাম বটে কিন্তু প্রাণে এতই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, যে সব কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনেই হইতেছিল না।

পরে আমরা পাহাড়ের একপ্রান্তে জমি চাষ করা দেখিলাম। কলের লাঙ্গল ঘোড়ায় টানে,—দেখিলাম জমিগুলি একফুট গভীর হইয়া উপরের মাটী নিচেয় আর নিচের মাটী উপরে ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। ক্রমাগত চারি ঘণ্টা ভ্রমণের পর বারটায় আমরা বাড়ীতে ফিরিলাম।

বিকালে আমরা সহরের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি দেখিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী পাথরে তৈরী, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। কোনখানে একটু আবর্জ্জনা নাই, লোকে কোন পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা, ফলের খোসা প্রভৃতি রাস্তায় ফেলে না, ছেঁড়া কাগজটুকু পর্য্যন্তও না; আবর্জ্জনা ফেলবার পাত্রেই ওসব ফেলে। ট্রামে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত টিকেটগুলি ট্রাম পরিত্যাগের সময় ট্রামের গায়ে একটী বাক্সে ফেলিয়া যায়, কখনও রাস্তায় ফেলিয়া রাস্তা আবর্জ্জনা করে না। মুখের থুথু কাশী প্রভৃতি পথে না ফেলিয়া ড্রেনে ফেলে।

এডিনবরা নানাবিধ জ্ঞানচর্চ্চার স্থান, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত লোকেই সুশিক্ষিত। শিল্প বাণিজ্যে কিন্তু স্কটলণ্ডে গ্লাসগো সহরের কাছে রাজধানী এই এডিনবরাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটীর পরিচালিত একটী দোকান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীতে বিরাট কারবার। গৃহস্থের আবশ্যক সমুদয় দ্রব্য পৃথক পৃথক বিভাগে সাজান রহিয়াছে। এই মত খাদ্য পোষাক পুস্তক ষ্টেসনারী গৃহস্থালীর আসবাব, খেলনা প্রভৃতি প্রায় পঁচিশ ত্রিশ রকম বিভাগ রহিয়াছে। এক এক বিভাগে স্ত্রী পুরুষে তিন চারিজন করিয়া কর্ম্মচারী কাজ করিতেছে। শুনিলাম সত্তর হাজার গৃহস্থ এই কো-অপারেটিভের দোকানের মেম্বর। ইহাদের প্রত্যেকের টাকাকড়ি এখানকার ব্যাঙ্ক বিভাগে জমা থাকে, তাহার দ্বারাই এই কারবারটী চলিতেছে, ইহারা অধিকাংশ দ্রব্য এই দোকান হইতেই খরিদ করেন। আবশ্যক দ্রব্যটী এখানে পাইলে আর অপর স্থানে খরিদ করেন না। জিনিষ কিনিতে নগদ টাকা দিতে হয় না, হিসাবে খরচ লেখা হয়। অপর সাধারণে এই দোকানে ন্যায্য দামে জিনিষ কিনিতে পারেন, কিন্তু মেম্বরগণ কমিশন পাইয়া থাকেন, সাধারণে তাহা পান না। এই বিরাট দোকানটীকে প্রত্যেক মেম্বর নিজের দোকান বলিয়া মনে করেন, এর সংস্থষ্ট ব্যাঙ্কটিকে নিজের ধনাগার মনে করেন। সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবার ইহার শাখা কার্য্যালয় ঠিক এই ভাবেই পরিচালিত হইতেছে। এই কারবার-টিতে কো-অপারেটিভ অর্থাৎ সম্মিলিত শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম।

সন্ধ্যায় আমাদের ফিরিবার কালে মিঃ মরিসন আমার নিকট জানিতে চাহিলেন—ফিরিবার দুইটী পথ আছে, একটী ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আর একটী নিতান্ত গরীবদের বাসভবন পূর্ণ, ইহার কোন পথে যাইতে আমার ইচ্ছা। আমি গরীবদের পথ মনোনীত করায় সেই পথেই ফিরিলাম। পথে নানাবিধ

পুরাতন জিনিষের দোকান, শুটকী মাছ, ঝিনুক, সামুক গুগ্‌লী প্রভৃতির দোকান দেখিলাম। গরীব গৃহস্থদের ঘরগুলিও ছোট বা নোংরা নয়, তবে এক খামরায় একাধিক লোককে কষ্টে বাস করিতে হয় বলিয়া মিঃ মরিসন দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

এইরূপে পর পর তিনটি দিন সকাল বিকাল মিঃ মরিসন আমাকে সঙ্গে লইয়া এডিনবরার দর্শনীয় বিষয়গুলি দেখাইলেন। ক্যাসেলের উপর ও সার ওয়াল্টার স্কটের স্মৃতি-মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়ার উপর লইয়াও সহরের সৌন্দর্য্য দেখাইতে ছাড়িলেন না।

ধাতুশিল্প সম্বন্ধীয় কারখানা কিছু দেখিবার জন্য মরিশন সাহেবকে বলায় তিনি সহরের এক প্রান্তে একটা পিতলের ঢালাই কারখানায় আমাকে লইয়া গেলেন। কারখানার অধ্যক্ষ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সমুদয় আগ্রহের সহিত দেখাইলেন। আমরা ইলেকট্রিক সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার ছোট বড় যন্ত্র পিতল গলাইয়া বালির ছাঁচে প্রস্তুত করিতে দেখিলাম। সেগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকার উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট জানিলাম গ্লাসগো এবং বার্ম্মিংহাম গেলে ধাতুশিল্প সম্বন্ধীয় বহু বহু আবশ্যক বিষয় দেখিতে পাইব। সেগুলির অনেক ঠিকানা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গাইড বই দেখিয়া এখানে সংগ্রহ করিলাম।

আমাকে এই সকল স্থান দেখাইবার জন্য ট্রাম ভাড়া প্রভৃতি সমস্তই মিঃ মরিসন নিজে দিতেন, আমাকে দিতে দিতেন না। সন্ধ্যার পর প্রায়দিনই কোন না কোন সভা সমিতিতে লইয়া যাইতেন। রবিবারে এডিনবরা একেবারে কোলাহলশূন্য, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, খাবারের দোকানটি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, সমস্ত লোকেই নিয়মিত গির্জ্জায় যায়। ঐ দিন বাকী সময়টা কেহ ঘরে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করে, কেহ সহরের বাহিরে বেড়াইতে যায়।

একদিন আমি সহরের বাহিরে সাতমাইল দূরে ফোর্থ নদীর বিখ্যাত পোল দেখিয়া আসিলাম, দুই মাইল প্রশস্ত নদীর উপর অত্যুচ্চ পোল, তাহার নিচে দিয়া জাহাজ গতিবিধি করিতে পারে। এডিনবরার নিকটবর্ত্তী লিথ সহর Firth of Forth অর্থাৎ ফোর্থ নদীর মোহনায় অবস্থিত, নদীতীরে বড় বড় ডক গুলিতে জাহাজ পূর্ণ রহিয়াছে।

একদিন আমি এডিনবরার ভারতীয় ছাত্রাবাসে গিয়া তাহাদের সহিত বড়ই আনন্দে কাটাইলাম। ইঁহাদের অনেকে লণ্ডনে একজিবিশন দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে আমার সহিত পরিচয় ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় অতি বিখ্যাত।

একদিন আমি মরিসন সাহেবের তিন ছেলেকে সঙ্গে লইয়া ফোর্থ নদীর মোহনায় বেড়াইতে গেলাম। আমরা এডিনবরা ও লিথ সহর অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত ফোর্থএর তীর দিয়া ট্রামে বহুদূর গিয়া সমুদ্র তীরে নামিলাম। একটা ছোট জাহাজ মেরামতের ডকের ভিতর গিয়া তাহার অনেক কাজকর্ম্ম দেখিলাম। ছেলে তিনটি এ জাহাজ ও জাহাজ ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটী লবণ তৈরীর কারখানা দেখিলাম। পরে একটা ছোট দোকানে কিছু খাবার খাইয়া লইয়া নির্জ্জন সমুদ্র তটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া আমোদের আনন্দের সীমা রহিল না। বড় বড় তুফানগুলি তীরে আসিয়া পাথরিয়া জমিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। উপরে বিস্তীর্ণ বালির চড়া। ছেলেরা ভিজে বালি ও প্রচুর পাথর টুকরা পাইয়া অল্প সময় মধ্যে সুন্দর সুন্দর খেলনা, ঘর বাড়ী তৈরী করিয়া তাদের বাল্য শিক্ষার অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়া আমাকে মুগ্ধ করিল। নির্জ্জন স্থান, আমিও তাহাদের সঙ্গে বালক সাজিতে লজ্জাবোধ করিলাম না। বিলাতে ছেলে বুড়োয় খেলার প্রচলন আছে। সেই সুপ্রশস্ত ভিজে বালির চড়ার উপর আমরা বালি খুঁড়িয়া মোটা অক্ষরে কত কথা লিখিয়া রাখিলাম। ছোট ছেলে আর্চ্চি বড় দুরন্ত, সে জুতা, জামা কাদা মাখা করিতে ছাড়িল না।

এইরূপ অনেক আনন্দ ভোগের পর আমরা

১১টার ট্রামে রওনা হইয়া ১২টায় বাড়ী ফিরিলাম।

মিঃ মরিসনের আড়ম্বরশূন্য সংসারটীতে আমি সর্ব্বদা প্রীতি মাখা দেখিতাম। তিনটী ছোট ছেলে লইয়া মিসেস মরিসন সর্ব্বদা সংসারের কাজে লিপ্ত থাকিতেন। খুব সাদাসিদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ সজ্জা, অতি সাধারণ স্বাস্থ্যকর খাদ্য, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, কোন অপচয় নাই, অপব্যয় নাই। একটি ঝি আসিয়া কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যায়। বাজার করা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি যে সকল কাজ আমাদের দেশে চাকর দ্বারা না করাইলে অসম্মানের বলিয়া গণ্য হয়—মিসেস মরিসন সেগুলি নিজ হাতে করেন। আমি তাঁহাদের অতিথি ছিলাম, আমার প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। গজি প্রভৃতি দু তিন দিন অন্তর কাচা আবশ্যক, মিসেস মরিসন আমার সেগুলি নিজে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেন। আমার জন্য কত নূতন রকম খাবার তৈরী করিয়া খাওয়াইয়া স্কটলণ্ডের অতিথিসেবার নিদর্শন দেখাইতেন। স্কটলণ্ডের ওটের তৈরী রুটী নানাপ্রকার ও পিষ্টক অতি উপাদেয় খাদ্য, ওট্ আমাদের দেশের যব ও যইএর মত এক প্রকার শস্য।

ছেলেদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি পিতামাতা সর্ব্বদা যেভাবে দৃষ্টি রাখিতেন যে সকল আমাদের শিখিবার বিষয়। ছেলেরা কোন রকম একটু ভুল করিলে বা অসভ্যতা করিলে, তাহা মধুর ভাষায় বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতে দেখিতাম। বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া ছেলেরা আনন্দের সহিত ছুটাছুটী করিয়া ঘর অস্থির করিয়া তুলিত—ইহাতে কিন্তু তাহাদের পিতামাতা একটুকুও বাধা দিতেন না। একদিন আমি মিসেস মরিসনকে বলিলাম, আমাদের দেশে ছেলেদের একটু অস্থিরপনা দেখিলে বাপ মা বড় তিরস্কার করেন, মারধর করেন, আপনারা এদের দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করেন দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হয়। তিনি বলিলেন এদের এই রকম ছুটাছুটী করিতে না দিলে এরা মারা পড়ে—অর্থাৎ এদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

একদিন দেখিলাম ছোট ছেলেটী মধ্যমটীকে লাঠি দিয়া ভয়ানক প্রহার করিল, মার পাইয়া ছেলেটী চিৎকার করিয়া কাঁদিতেই তাহাদের মাতা উপর হইতে আসিয়া বিচারের জন্য দুইজনকেই উপরে লইয়া গেলেন। পরে এক সময় আমি মিসেস মরিসনকে জিজ্ঞাসা করিলাম বিচারে আর্চ্চির কি শাস্তি দিলেন? তিনি হাসিয়া বলিলেন আর্চ্চিকে বলিলাম—শনিবারে তোমাকে যে পেনিটি দেওয়া হয়, পুনরায় এমন অন্যায় করিলে আর তাহা দেওয়া হইবে না। কি সুন্দর শাস্তির ব্যবস্থা! শুধু এইটুকু শাস্তির লজ্জা পাইয়াই নাকি ছেলেটীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল।

তিনটী ছেলেকে আমি কিছু উপহার (Present) দিবার জন্য একদিন মিসেস মরিসনের কাছে অনুমতি চাইতেই তিনি বলিলেন, এমন সামান্য কিছু দিবেন, যেন তারা কোন দামী জিনিষের প্রলোভনে না পড়ে যেন, সচরাচর তেমন জিনিষ দিতে আমাদের সাধ্য হয়। এই রকম ছেলেদের বিলাস-বর্জ্জন শিক্ষা দিবার জন্যও বাপমায়ের কত সতর্কতা।

এই পরিবারে আমি নিত্য নূতন আনন্দ ভোগ করিতাম। অতিথির আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ইঁহাদের নানারূপ ব্যবস্থা দেখিয়া আমি স্কটলণ্ডের আতিথেয়তার কথা কখনও ভুলিতে পারিব না।

দুই সপ্তাহ কাল এখানে এইরূপ আনন্দে কাটাইয়া আমি গ্লাসগো রওনা হইলাম। মিঃ মরিসন আমাকে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

বর্ম্মানারীর বিবরণ

শ্রীসত্যব্রত রুদ্র বি, এ।

বর্ম্মা ভারতের ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী দেশ; কিন্তু বর্ম্মা ও ভারতের সীমানায় দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত থাকায় বর্ম্মাদেশের নরনারীর জীবন সম্বন্ধে আমরা বাঙ্গালীরাও অল্পাধিক অজ্ঞ। বঙ্গদেশে আজকাল সকল প্রকার সাময়িক কাগজে সমাজে নারীর স্থান ও নারীর অধিকার সম্বন্ধে নানা ভাবে আলোচনা চলিতেছে। এই সময় আমাদেরই প্রতিবেশী বর্ম্মা সমাজের নারী সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিবার ইচ্ছা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে এবং এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বর্ম্মানারী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

ব্রহ্মবাসীরা প্রাচীন মঙ্গোলীয় জাতির বংশোদ্ভব। তজ্জন্য ইহাদের শরীরের বর্ণ পীত, মুখ ও নাক চ্যাপ্টা, দেহ খর্ব্বাকৃতি। রমণীদের শরীর নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব, দেহ কমনীয়, সুগঠিত ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। বর্ম্মা রমণী অঙ্গসৌষ্ঠবে অবশ্যই সুন্দরী, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ এবং সৌন্দর্য্যসাধন এদেশীয় রমণীর একটি বিশেষত্ব।

বর্ম্মাসমাজে নারীজাতির স্থান অতি উচ্চে। ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই বর্ম্মানারী অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন; কোন সৎকার্য্য হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার কোন শাস্ত্রবিধি এদেশে নাই। বর্ম্মানারীর সর্ব্ববিধ অধিকার স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকার বা স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহাদিগকে পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সংগ্রাম করিতে হয় নাই। জাতির মাতা হিসাবে, সুনিপুণা গৃহিণীর মত সমস্ত অধিকার ইহারা সহজে হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছেন। রমণীরাই অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী।

ব্রহ্মদেশে নারী উচ্চ সম্মান ভোগ করেন এবং ঐ সম্মান তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবেই পাইয়া আসিতেছেন। এদেশের নারীর দাবী নিরূপণের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং রমণীরাও যুক্তি-তর্ক দ্বারা চুল চেরা হিসাব করিয়া সম্মান ও অধিকারের মাত্রা নির্দ্ধারণে ব্যস্ত নহেন। স্বাধীনতা বর্ম্মারমণীর জন্মগত অধিকার।

বালিকা অবস্থায় বর্ম্মারমণীরা মাতাপিতাদি অভিভাবকের অধীনে থাকেন; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যুবতীদের উপর অভিভাবকের একান্ত কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তখন তাঁহারা অভিপ্রায় মত জীবন-পথ নির্ব্বাচন করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, বঙ্গবালার মত পদে পদে নিষেধের ডোরে বাঁধা পড়েন না। তাঁহারা তখন নিজেদের মনোমত প্রিয়জন নির্ব্বাচিত করিয়া বিবাহিত হন, অথবা ইচ্ছানুসারে অবিবাহিত থাকিয়া চিরকুমারী জীবন যাপন করেন। বিধবা হইলে তাঁহারা স্বেচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু পিতামাতা বা আত্মীয় বন্ধুদের অনুরোধ বা শাসনেও তাঁহারা অপরিণত বয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য নহেন। যুবতীরা অনেক সময় বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষকেও বিবাহ করিতে পারেন। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বিবাহের পরও রমণীরা শ্বশুরবাড়ীর পদবী গ্রহণ করেন না, পিত্রালয়ের প্রদত্ত সম্পূর্ণ নাম আজীবন রক্ষা করিয়া থাকেন।

পরিবারে নারীর স্থান সর্ব্বোপরি। গৃহিণী, জননী, ভগিনী, সখী ও সেবিকারূপে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া রমণী পরিবারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

তাঁহারাই পরিবারের যাবতীয় খরচ-পত্র ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা ঘরে বসিয়া সেলাইয়ের কায, জরির কায প্রভৃতি সূচীশিল্প দ্বারা অথবা বাজারে কিম্বা রাস্তায় দোকানপাট খুলিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন এবং বহু অকর্ম্মণ্য উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির পুরুষের ভরণপোষণ করেন। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীর কার্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে বিমুখ নহেন। অর্থ ও ভূসম্পত্তি বিষয়ক এবং সমাজ, ধর্ম্ম ও পরিবার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই নারীর অধিকার পুরুষের সমান। প্রত্যেক রমণীরই নিজস্ব সম্পত্তি থাকিতে পারে এবং স্বামীর সম্পত্তিতেও তাঁহাদের সমান অধিকার। পুত্র বর্ত্তমানেও কন্যারা পিতামাতার সম্পত্তির অংশ পায়। ব্রহ্মদেশের যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও বৃহৎ কারবারাদি রমণীদের হাতে।

কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ম্মারমণীরা অতিশয় সুনিপুণা, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মশীলা। হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে সর্ব্বত্রই রমণীদের অবাধ গতিবিধি আছে। গৃহস্থালীর অধিকাংশ কার্য্যই ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে রমণীরা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া থাকেন। রমণীরা শুধু পুরুষের বিলাস সামগ্রী নহেন, কেবল আসবাব-পত্রের মত গৃহের শোভা নহেন। শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে কোনও বর্ম্মারমণী লজ্জিতা নহেন, ভদ্র পরিবারের মহিলারা ট্রেণের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াও নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে বহন করিতে অপমান বোধ করেন না। প্রায় সকল রমণীই নিজেদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে অভ্যস্ত এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারা পিতামাতা স্বামী পুত্রাদির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেও কাতর নহেন।

ধর্ম্মবিষয়েও বর্ম্মারমণীরা পুরুষের সমান-সমান অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন, রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক ভক্তিমতী ও ধর্ম্মশীলা। বৌদ্ধ বর্ম্মা-পুরুষেরা যেরূপ ধর্ম্মার্থে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন এবং আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন, রমণীরাও তদ্রূপ দলে দলে কুমারী অবস্থাতেই ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের সকল অঙ্গেই রমণীদের পূর্ণ অধিকার আছে। সভাসমিতি, উৎসব অনুষ্ঠান সর্ব্বত্রই রমণীরা যোগ দিয়া থাকেন। গ্রাম্য সালিসি-পঞ্চায়েৎ, মাম্‌লা-মোকদ্দমাদি মীমাংসা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদের স্থান আছে। মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনেও তাঁহারা পূর্ণ অধিকার ভোগ করেন।

বর্ম্মারমণীদের স্বাস্থ্য অতিশয় প্রশংসনীয়। বাল্যকাল হইতে সকলকেই শারীরিক পরিশ্রম ও নৃত্যগীতাদিতে অভ্যস্ত হইতে হয় বলিয়া পরিণত বয়সে তাঁহারা অতুলনীয় স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারেন। বর্ম্মাদেশে স্বাস্থ্যহীন রমণী খুবই অল্প। সকলেরই শরীর সুডৌল, সুগঠিত। শিক্ষাবিষয়ে ব্রহ্মরমণীরা ভারতের সকল প্রদেশের অগ্রণী; মেয়েদের মধ্যে শতকড়া ৯০ জনেরও অধিক অল্পাধিক শিক্ষিতা, অন্ততঃ বর্ম্মাভাষায়। কন্যা-সন্তানের জন্ম এদেশে বাংলা দেশের মত পিতামাতার উপর বিধাতার অভিশাপ নহে; বরং কন্যাসন্তানের দ্বারাই পিতামাতার গৌরব বর্দ্ধিত হয়।

বর্ম্মারমণীরা কোনও ক্ষেত্রে পুরুষের মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহাদের শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে, প্রাণে তেজ আছে, আর আছে মনে দুর্জ্জয় সাহস। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া তাঁহারা আত্মসম্মান রক্ষার্থে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। তাই কেহই কোন রমণীকে অপমানিত করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, ট্রেণে-ষ্টীমারে, সর্ব্বত্রই তাঁহারা দুর্ব্বিনীতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। চিরবন্দিনী কুসুমকোমল লজ্জাবিধুরা বঙ্গবালার মত তাঁহারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছিতা হন না। দুশ্চরিত্র

স্বামীর চরিত্র সংশোধনের জন্যও, তাঁহারা বঙ্গবধূর মত ঘোমটার আড়ালে, 'চোখের জলে দেবতা মানৎ' করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, প্রয়োজন হইলে স্বামীর চরিত্র সংশোধনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন; এবং অনুরোধ, উপরোধ, প্রয়োজন হইলে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাও তাঁহারা প্রিয়জনকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করেন। বর্ম্মারমণী নিজেদের প্রিয়জনকে ভালবাসেন, প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহাদের দাম্পত্যপ্রেমে যথেষ্ট দায়ীত্বজ্ঞান আছে। রমণীদের এত অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও যুবকযুবতীরা গোপনে দেখা সাক্ষাৎ, যথেচ্ছ আলাপ ও হাস্য-পরিহাসাদি করিতে পারে না, এবং এত প্রকার উচ্চ অধিকার ভোগ করিলেও, পুরুষদিগকে স্নেহ ও সেবাদ্বারা সুখী করিবার অধিকারও তাঁহাদের আছে এই জ্ঞানে, সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামী পুত্রাদির সেবাযত্ন করিয়া রমণীরা পরিতৃপ্ত হন।

বর্ম্মা যুবকযুবতীরা যৌবন পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে, সে সময়ে তাহারা প্রবীনোচিত গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। এই সময়ে তাহারা নানাবর্ণের নানা ফ্যাসনের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, হাসির উচ্ছ্বাসে নৃত্যগীতবাদ্যে দলে দলে বিচরণ করে; উৎসবে নাচে, জল ক্রীড়ায়, কানন ভ্রমণে, থিয়েটার বায়োস্কোপে যোগদান করে এবং স্ব স্ব প্রিয়জনকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। যুবতীরা সাধারণতঃ গৃহে রান্নাবান্না, জামাকাপড় সেলাই, কাপড়ে জরির কাজ ফুলতোলা কিংবা বাজারে ক্রয় বিক্রয় দোকানপাট রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পিতামাতাকে সাহায্য করে। পুষ্পাভরণ বর্ম্মাযুবতীদের অতি প্রিয় অলঙ্কার। দলে দলে পুষ্পাহরণ, মন্দিরে গিয়া বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে পুষ্পোপহার ও বাতিদান এবং সলজ্জ অন্তঃকরণে মনে প্রাণে অভিপ্রেত প্রিয়জনকে প্রার্থনা,—ইহাই যুবকযুবতীর ধর্ম্মকার্য্য।

বর্ম্মাদেশে অপরিণত বয়সে বিবাহের প্রচলন নাই। যুবক যুবতীর শারীরিক ও মানসিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বৃত্তিসকল যখন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহারা বিবাহিত হয়। ব্রহ্মদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলন নাই। আরাকানে ইহার প্রচলন আছে,—সাধারণতঃ চৌদ্দ বৎসরের বালিকার সঙ্গে আঠার বৎসরের যুবকের বিবাহ হইতে পারে; ইহাকে বর্ম্মারা বাল্যবিবাহ বলে।

এদেশে জাতিভেদের দৌরাত্ম্য নাই। যুবক যুবতীর প্রাণের আকর্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে বিবাহার্থী যুবক সুন্দরী যুবতী কন্যার সন্ধান লইয়া যুবতীর অভিভাবকের মধ্যস্থতায় যুবতীর সহিত পরিচিত হয় এবং গুরুজনের সম্মুখেই গল্পগুজবাদি করিয়া মন বুঝিতে চেষ্টা করে। পরস্পরের মধ্যে যদি প্রণয় জন্মে তবে দুই পক্ষেরই অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহা প্রাচীন প্রথা এবং এখনও প্রচলিত আছে। আজকাল বহুস্থলে পিতামাতা বর ও কনে ঠিক করিয়া তাহাদের সম্মতির জন্য পরস্পরকে মেলামেশা করিতে দেন, উভয়ে উভয়কে পছন্দ করিলে বিবাহ হয়, নতুবা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। বিবাহের পর নবদম্পতী অনেকে কনের বাড়ীতে থাকিয়া যায় এবং উভয়ে উপার্জ্জন করিয়া কনের পিতামাতার ভরণপোষণ করে। আজকাল অধিকাংশ লোকই অবস্থা স্বচ্ছল হইলে সম্পূর্ণ পৃথক গৃহস্থালী স্থাপন করে অথবা নিজ আলয়ে চলিয়া যায়। কেবল যতদিন নবদম্পতী গৃহস্থালীর কার্য্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ না করে, ততদিন কনের বাড়ীতে থাকে মাত্র। কন্যা দ্বারা পিতামাতার ভবিষ্যৎ সংস্থান হয় বলিয়া বর্ম্মাদের নিকট কন্যাসন্তানের আদর বেশী। যার যত অধিক কন্যা আছে সে ততই সৌভাগ্যশালী বলিয়া পরিগণিত হয়। হায় বাঙ্গলা দেশ!

বর্ম্মা যুবতীরা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিদেশীকে বিবাহ করিতে পারে। বিদেশীকে বিবাহ করিলে

কাহাকেও সমাজে হেয় হইতে হয় না। অনেকে অলস উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বর্ম্মাপুরুষকে বিবাহ করিয়া আজীবন তাহার ব্যয়ভার বহন করা অপেক্ষা বিদেশীকে বিবাহ করিয়া নিরুদ্বেগে থাকিতে পছন্দ করে। ইউরোপীয়, চীনা, ভারতীয় এমন কি অনেক বাঙ্গালীও বর্ম্মারমণী বিবাহ করিয়া এখানে গৃহস্থালী পাতিয়াছেন। বর্ম্মাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত আছে, কিন্তু ক্রমে ইহার সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে।

সৌন্দর্য্যসাধন বর্ম্মাসুন্দরীদের একটি বিশেষত্ব। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারা দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যত্ন করেন। তজ্জন্য বর্ম্মারমণীদের পোষাকের বাহার অত্যন্ত বেশী। বাল্যকাল হইতে বিশেষ যত্ন নেন বলিয়া তাঁহাদের কেশদাম ভ্রমর কৃষ্ণ ও আগুল্ফলম্বিত হইতে দেখা যায়। এই সুদীর্ঘ কেশরাশি সুবাসিত তৈলে মার্জ্জিত করিয়া মস্তকের ঠিক উপরিভাগে কেশগুচ্ছের সহিত জড়াইয়া কাল ভেল্‌ভেটের টুপির আকারে গোল মসৃণ খোঁপা করেন এবং চুলের ভাঁজে ভাঁজে নানারঙের ছোট ছোট ফুলের গোছা গুঁজিয়া দেন। মুখশ্রী মসৃণ ও অঙ্গের গৌরপ্রভা উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তাঁহারা মুখমণ্ডলে ও হস্তপদাদির অনাবৃত স্থানে তানে-খা নামক এক প্রকার চন্দনজাতীয় কাষ্ঠ ঘষিয়া প্রলেপ ব্যবহার করেন। ভ্রূযুগল অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্য বিলাসিনীরা তাহাতে কলপ দেন এবং চক্ষুর সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য অঞ্জন ব্যবহার করেন। অনেক সময় বিলাসী রমণীরা কেশদামের প্রাচুর্য্যের অভাব পরিপূরণের জন্য আলগা কেশগুচ্ছ ব্যবহার করেন। চুলের খোঁপার মধ্যে অনেককে হীরা অথবা মুক্তা খচিত চিরুণী এবং কৃত্রিম ফুল পরিতে দেখা যায়।

রেশমী বস্ত্রই এদেশে অত্যধিক প্রচলিত। রমণীরা পরিধানে লৌঙ্গি বা থামি ব্যবহার করেন—ইহা অতি সুন্দর খুব পুরু রেশমী বস্ত্র। ময়ূরকণ্ঠি লৌঙ্গির (লুঙ্গী ?) ব্যবহারই অধিক। উজ্জ্বল লাল বা নীলাদি বর্ণের বস্ত্রের ভূমির উপর জরির কার্য্য খচিত, লতাপাতাদি অঙ্কিত ঢেউ খেলান লৌঙ্গি বর্ম্মাসুন্দরীদের প্রধান ব্যবহার্য্য। ছয় বা সাত হাত দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ডের দুই প্রান্ত সেলাই করিয়া লৌঙ্গি তৈয়ারী হয়। মেয়েদের লৌঙ্গির উর্দ্ধভাগে যে অংশে কোমরে বাঁধা থাকে, তাহাতে অন্ততঃ দশ ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড লাল বা নীল বস্ত্র জুড়িয়া দেওয়া হয় এবং পরিবার সময় এই বস্ত্রখণ্ডকে দুই বা ততোধিক ভাঁজ করিয়া কোমরে বাঁধা হয়; লৌঙ্গির বাড়ন্ত অংশ দোভাঁজ করিয়া কোঁচার মত সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এই লৌঙ্গি দ্বারা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত আবৃত হয়। অভ্যন্তরে প্রত্যেকেরই সেমিজ বা আঙ্‌রাখা থাকে।

রমণীদের গাত্রাবরণ এঞ্জি—ইহা মসৃণ চিক্কণ বস্ত্রনির্ম্মিত, কটিদেশ ও হাতের কব্জী পর্য্যন্ত লম্বমান। বুকের দক্ষিণ পার্শের আস্তরণের উপর অধিকতর প্রশস্ত বাম আস্তরণ স্থাপিত করিয়া হীরা পান্না অথবা রঙীন কাঁচের বোতাম দ্বারা আট্‌কাইয়া ইহা পরা হয়। মেয়েদের এঞ্জি সাধারণতঃ খুব সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্রে নির্ম্মিত হয়। ইহা দ্বারা বক্ষদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর উত্তমরূপে আবৃত থাকে। এঞ্জির নীচে সেমিজ থাকে। বর্ম্মারমণীরা একখণ্ড দীর্ঘ সূক্ষ্ম রঙীন রেশমী বস্ত্র উত্তরীয় রূপে স্কন্ধের দুই পাশ হইতে সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখেন, ইহাকে 'পাওয়া' (Paoa) বলে। স্থানভেদে বর্ম্মারমণীদের পোষাকের তারতম্য আছে। বর্ম্মারমণীর পোষাক সম্পূর্ণ সুরুচি সম্মত, ইহাতে শরীরের কোন অংশ অনাবৃত থাকে না।

এদেশের সকল শ্রেণীর রমণীরাই পাদুকা না পরিয়া সাধারণতঃ বাহিরে যান না। বর্ম্মারমণীরা 'ফানা' বা বর্ম্মাচটি ভিন্ন অন্য জুতা ব্যবহার করেন না। রমণীরা জাতীয় ভাব ও জাতীয় পোষাক ত্যাগ করিতে কোনও কারণেই রাজি নন। অনেকে ইউরোপীয়ান বিবাহ করিয়াও বর্ম্মা পোষাক ছাড়েন

নাই। ধনী দরিদ্র সকলেই অবশ্য ভ্রমে 'চামড়ার অথবা কাঠের কারুকার্য্যখচিত জানা ব্যবহার করেন। রমণীরা সকলেই দেশীয় ছাতা বা 'ঠি' ব্যবহার করেন। ইহার বাঁট বাঁশের, প্রায় ৪ ফিট লম্বা এবং আবরণটি পুরু তৈলাক্ত কাপড়ের, শিক্‌গুলিও বাঁশের তৈয়ারী। ইহা লোহার সিকের ছাতার মত গম্বুজাকার নহে,—সম্পূর্ণ গোল ও চ্যাপ্টা। ছাতার রঙের বাহারও অল্প নয়। ইহার আবরণ কাপড়টি সাধারণতঃ লাল বা গোলাপী রঙের, তাহার উপর অতি সুন্দর নানাপ্রকার লতাপাতা ফুলাদি চিত্রিত। উজ্জ্বল রৌদ্রের মধ্যে ইহার বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া ছত্রধারিণীকে অধিকতর রূপ-লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। বর্ম্মারমণীদের মধ্যে অলঙ্কারের তেমন বাহুল্য নাই, কর্ণফুল, মুক্তা বসান পদকযুক্ত কণ্ঠহার, খাঁটি সোণার সরু চুড়ি ও কঙ্কণ এবং চুনি বসান অঙ্গুরী —ইহাই প্রধান অলঙ্কার। উৎসব ও নিমন্ত্রণাদিতে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, সকল সময়ে কেহই অলঙ্কার পরিয়া থাকেন না।

বাঙ্গলার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলা অতিক্রম করিলেই ব্রহ্মদেশের আরম্ভ। এত নিকটবর্ত্তী হইয়াও বর্ম্মানারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, রীতিনীতি প্রভৃতি বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক উন্নত। এদেশের আদর্শ অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য।

রেখে দিও ব্যথাভরা প্রাণ

(কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের লেখনী প্রসূত)

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত স্বনামধন্য, স্বদেশবৎসল ও আতিথ্যপ্রিয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের পত্নী-বিয়োগ হয়। হেমবাবু তখন যুবাপুরুষ, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও খুব উন্নত। বন্ধুগণ তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার পরামর্শ দেন কিন্তু হেমবাবু বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পুণ্যশীলা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সুহৃদ্বর্গ হেমচন্দ্রকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন এ সংবাদ শৈলকানন-কুন্তলা চট্টলভূমির প্রিয়কবি, "পলাশীর যুদ্ধ" প্রণেতা নবীনচন্দ্র সেনের কর্ণগোচর হইলে, কবিবর তদীয় প্রিয়বন্ধু হেমচন্দ্রকে এই কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী বিপত্নীক জীবন বহন করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহাত্মা হেমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

(১)

যেদিন শুনিনু, হায় 'ফিরে গেছে অমরায়
জ্যোতির্ম্ময়ী পুণ্যের প্রতিমা ;
বুঝিয়াছি সেই দিন, দীন হ'তে তুমি দীন,
অঙ্গে মাখা চিতার কালিমা !

(২)

সতীর চরণ স্পর্শে কত সুখ কত হর্ষে,
বিকশিত ছিল চারি ধার ;
হা অদৃষ্ট ! কে জানিত এত শীঘ্র অপহৃত
হবে সেই কুবের ভাণ্ডার !

(৩)

তোমার যা' কিছু আছে, রেখেছিলে তার কাছে,
সে তোমার—বিশ্ব চরাচর।
থাকিতে থাকিতে বেলা, ভাঙ্গিল সাধের খেলা,
পড়িয়া রহিল "খেলা ঘর"।

(৪)

পৃথিবীর পদধূলি, সমাদরে শিরে তুলি'
ল'য়েছিলে যা'র সাধনায়,
কি সম্পদ পায়ে ঠেলে, গেল সে তোমারে ফেলে,
আজ তুমি একা অসহায় !

(৫, ৩)

সে যে ছিল জগদ্ধাত্রী স্বর্ণ সীতা শুভদাত্রী,
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী অলকার ;
তাহার নিকটে, হেম ! নীরবে শিখেছ প্রেম,
'পরে' জ্ঞান করি 'আপনার'।

(৬)

তোমায় চিনে না নরে ; তাই কাণাকাণি করে,
বিধাতার দয়ার সম্মুখে—
মধুর মিলনে মাতি' নূতন সংসার পাতি'
অন্তে তুমি তুলে লবে বুকে !

(৭)

নহ তুমি অর্থহীন— কর্ম্মশূন্য—উদাসীন—
কথা শুনে তবু হাসি পায় !
তোমার "নিষ্কাম ব্রত" সামান্য নরের মত
কলুষিত হবে কামনায় ?

(৮)

তুমি এত স্বার্থপর ? তাহারে ভাবিবে পর ?
মানবের এই কৃতজ্ঞতা !
ছিঁড়িয়া কনক পট, ভাঙ্গিয়া মঙ্গল ঘট,
কাষ্ঠ লোষ্ট্রে ভাবিবে দেবতা ?

(৯)

সবটুকু প্রাণ ঢালি' আতিথ্যের ব্রত পালি'
তুমি যে শিখেছ—"আত্মজয়,"
কি বুঝিবে মর্ত্ত্যভূমি ? ভূতলে দেবতা তুমি,
স্বর্গ ? সে ত' তোমারি আলয় !

(১০)

কে বলে তোমাতে তা'র অধিকার নাহি আর,
প্রেমে কেন এত অবিশ্বাস ?
উৎসবের গণ্ডগোলে বিষাদের আর্ত্তরোলে
আছে তা'র অন্তিম নিশ্বাস !

(১১)

বিবাহ'—কথন নয়— রঙ্গমঞ্চে অভিনয়,
ইহ-পরকালের বন্ধন ;
পতি, পত্নী—এ দোঁহার বিনাশ নাহিক কার,
আত্মায় আত্মায় এ মিলন।

(১২)

নগরের কোলাহলে দেবীর আসন টলে,
তাই সে যে ল'য়েছে বিদায় ;
প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সাঁঝে, আসিবে সে নানা সাজে,
দেখা দিতে আবার তোমায় !

(১৩)

হৃদয় সিন্ধুর কূলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলে
দেব দৈত্যে বাধে যদি রণ,
তা'র সে স্মৃতিটী এসে দাঁড়া'য়ে "মোহিনী" বেশে,
মহাশান্তি করিবে স্থাপন !

(১৪)

মৃতা জননীরে স্মরি' পুত্র-কন্যা-মুখ ভরি
রয়েছে কি অব্যক্ত বেদনা !
ও নহে শোকের ছায়া, ও নহে অনিত্য মায়া,
সতীর ও শেষের প্রার্থনা !

(১৫)

তপ্তবক্ষে অবিরল ঢালো পুণ্য অশ্রুজল,
পার' যদি—ঋণ শোধ' তার।
দীপ্ত শোকানলে দহি' কঠোর আঘাত সহি'
এ যে, হেম ! পরীক্ষা তোমার !

(১৬)

সসীমে অসীমে যবে, আবার মিলন হবে,
নরলীলা হ'লে অবসান ;
শুধু, সে দিনের তরে সংসারের অগোচরে,
রেখে দিও ব্যথাভরা প্রাণ !!

মহিলা সাহিত্য সমালোচনা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

কার্ত্তিকের "বঙ্গবাণীতে" শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার "প্রাচীন রোমে নারী স্বাধীনতার ক্রম বিকাশ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে—হিন্দুসমাজে আজ নারীর যেরূপ অবস্থা, আড়াই হাজার বৎসর পুর্ব্বে রোমের সমাজে নারীর অনেকটা সেইরূপ অবস্থা ছিল। রোমের নারী প্রথমে হিন্দুনারীর মতন অবস্থায় থাকিয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে ঘটনার মধ্যে কি কারণে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাইল তাহাই এই প্রবন্ধে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—নারী কখনও স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে, ইহাই ছিল রোমের প্রথম যুগের সামাজিক মূলমন্ত্র। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন হইয়া রোমের নারীকে সে যুগে বাস করিতে হইত।

প্রাচীন রোমের বিবাহপ্রথাও কতকটা আমাদের দেশের মতন ছিল। উভয়পক্ষের মাতা পিতা বা অভিভাবকেরা বর কন্যা স্থির করিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেন। বিবাহের পুর্ব্বে বাগদান হইত। তখনকার সময় রোমে বিবাহের পুর্ব্বে দেখাশুনাই হইত না। অনেক সময় শিশুকালেই বাগদান হইত কিন্তু তের বৎসরের কমে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইত না। পরবর্ত্তী কালে নিয়ম করা হইয়াছিল যে, কুড়ি বৎসরের বেশী বয়স হইলে মেয়েদের বিবাহ না করার দরুণ জরিমানা দিতে হইবে। প্রথম যুগে রোমের নারীর সত্তা বা স্বাধীনতা অতি অল্পই ছিল। রোমে ভোজ বা উৎসবের সময় মেয়েরা যোগ দিতে পারিতেন। রোমের স্বামীরা স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তথায় নারী স্বাধীনতার প্রথম বিকাশ কোরিওলানাসের জন্যই হইয়াছিল। এক সময় তিনি রোমের জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভলসিয়ানদের দেশে যাইতে বাধ্য হন সেই কারণে রোমের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁহার প্রবল ছিল। তিনি অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ভলসিয়ান সৈন্যদলের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া রোম আক্রমণ করিলে রোমের সমস্ত সৈন্য তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। সেই সময় দেশের নারীশক্তি তখন একবার সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়াসী হন। রোমের প্রথম যুগে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল রোমের জন্য সুসন্তান উৎপাদন করা কিন্তু নারীর সতীত্ব না থাকিলে সে কখনই বীর সন্তান প্রসব করিতে পারে না। আর কোন রমণী যদি তাহার নিজ কুল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সংস্রবে আসিয়া গর্ভবতী হইত—তবে সে সন্তান রোমান বলিয়াই গণ্য হইত না। এই জন্যই রোমের নারীকে গৃহ মধ্যে সাধারণতঃ রাখা হইত। পুরুষ যখনই অত্যাচারী হইয়া নারীর সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই রোমে বিপ্লব বাধিয়াছে। নব নব রাজ্য জয়ের ফলে রোমের ঐশ্বর্য্য বিপুল হইতে বিপুলতর যখন হইতে লাগিল তখনই প্রকারান্তরে নারী স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। রোমে আগে রমণীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবার অধিকার ছিল না। পরে রোমের নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবার ক্ষমতা পান। পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে পুত্রদের ন্যায় ধন দিয়া যাইতেন, স্বামী তাঁহার স্ত্রীর জন্য ধন রাখিয়া যাইতেন। এইরূপে রোমের রমণীরা ধনশালিনী হইলেন। অর্থবলে কি না হয়? অর্থের বলেই রোমের নারী অনেক স্বাধীনতা লাভে

সমর্থ হইলেন। রোমের প্রথম যুগে নারী কোন কাজই নিজের নামে করিতে পারিতেন না। কিন্তু সে আইন উঠিয়া গেল, নারী স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য মোকর্দ্দমা প্রভৃতি করিবার অধিকারিণী হইলেন।

রোমে যে যে কারণে বিবাহ প্রথার নূতন প্রচলন হয় শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। এ সময় কারণে, অকারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে লাগিল। সে যুগের সকল প্রসিদ্ধ নরনারীই একাধিক বার বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন। ওভিড ও ছোটপ্লিনি তিনবার, সিজার ও অ্যাণ্টনি চারিবার, মুলা ও পম্পে পাঁচবার স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। নারীদের মধ্যে একজন পাঁচ বৎসরে আটটী স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এইরূপ নারীর ইচ্ছাক্রমে যেখানে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করা যাইত, সেখানে নারীর যে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীযুত বিমানবিহারী বাবুর এইরূপ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যত বাহির হয় ততই আমাদের নারীজাতির মঙ্গলের কারণ বলিতে হইবে। তিনি পরবর্ত্তী প্রবন্ধে কিরূপে নানা কারণে, নানা উপায়ে রোমে নারী যে স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহাতে কিরূপ ফল হইল, সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

নানা কথা

কংগ্রেসের সভানেত্রী—

আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা, বাঙ্গালা নারী সমাজের গৌরব শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এইবার নাগপুরে কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সরোজিনী নাইডুর নাম শুনেন নাই এমন শিক্ষিত লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। তিনি আজীবন দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাকে কংগ্রেসের সভানেত্রীর আসন প্রদান করায় ভারতবাসী তাঁহার যোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন। ভারতের এই নব জাগরণের দিনে ভারতবাসী যে মাতৃচরণে তাঁহাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে চলিয়াছেন—তাহার পুরোভাগে তাঁহারা সেই মাতৃমূর্ত্তিকেই সিংহাসনে বসাইয়াছেন।

বাঙ্গালার নারী, আর তো, তোমরা অবলা দুর্ব্বলা নও। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের পদে ভারতবাসী আজ বাঙ্গালার নারীকেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

স্বদেশ প্রত্যাগমন—

"মাতৃ-মন্দিরের" প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ও ইকনামক জুয়েলারীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র নন্দী মহাশয় গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে ওরিয়েন্ট লাইনের Orama জাহাজে লণ্ডন হইতে রওনা হইয়াছেন। ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি কলিকাতায় পৌঁছিবেন। গত বৎসর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া দেশীয় অলঙ্কার শিল্পের যেমন উৎকর্ষ সাধন দেখাইয়াছেন, তাঁহার সহোদর অতুলবাবুর দ্বারা তেমন আরও অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ সাধিত হইবে আশা করা যায়। আশা করা যায়, ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের এই উদ্যম দেখিয়া দেশবাসী আনন্দিত হইবেন।

রাসযাত্রীর নৌকাডুবি—

কলিকাতার উত্তরে খড়দহে রাসযাত্রার সময় গোষ্ঠ উৎসব মেলা হইয়া থাকে। বহু নরনারী ঐ উৎসবে যোগদান করেন।

গত ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে ঐ মেলা হইতে ফিরিবার কালে স্ত্রী পুত্র কন্তাসহ ৪০।৫০ জন যাত্রীপূর্ণ একখানি নৌকা ষ্টিমারের তুফানে জলমগ্ন হয়। খড়দহের সেচ্ছাসেবকদল ও জল-পুলিসকে গিয়া সংবাদ দেওয়ায় তাহারা আসিয়া ১২।১৩ জনকে উদ্ধার করিয়াছে, বাকী সমুদয়ই গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাই অধিক সংখ্যায় মরিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

তীর্থের উৎসব প্রভৃতিতে স্ত্রীলোকেরাই বেশীর ভাগ যাইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাই অধিকতর ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা, আরও কথা এই যে, স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন স্থান দর্শনের আর কোন সুযোগ বাংলায় নাই বলিয়াই তীর্থের মেলায় স্ত্রীলোকদিগের গমনের স্পৃহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইরূপ উৎসবাদির স্থলে পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় ভলেন্টিয়ারগণের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে যদি ভলেন্টিয়ারগণ নৌকায় যাহাতে অধিক লোক না উঠিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন তবে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

বাঙ্গলার যুবকসঙ্ঘকে আমরা তৃবিষয়ের জন্য এ সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি।

মেয়ে গৌরাঙ্গ—

কলিকাতা ২৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দের বাড়ীতে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের উপর শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া জনরব প্রচারিত হইয়াছে। প্রতিদিন রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সাধারণের সহিত তিনি দেখা করেন। ঐ সময় বহু নরনারী তাঁহাকে দেখিতে আইসেন এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন। ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে গৌরাঙ্গ দেবের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনান্তে তিনি হরির লুট প্রসাদ বিতরণ করেন। আমরা বিশ্বাস করি তাঁহার এই ধর্ম্মাচরণে অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট আছে।

বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ—

গত ২৭শে ভাদ্র শিলচর দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রায় তিনশত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। পুরস্কারে পুস্তক বা বিলাস দ্রব্যের পরিবর্ত্তে মেয়েদের নিত্য প্রয়োজনীয় তামা ও কাঁসার থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ মামুলী পুস্তক প্রদানের পরিবর্ত্তে এই সব দ্রব্য দিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—

"পূর্ণিয়ায় একটি নারী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠার জন্য রায় বাহাদুর পি, সি, লাল চৌধুরী এম্ এল্ সি মহাশয় ৫০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বাংলার নারীদের জন্য এমন দানবীর আমরা শীঘ্রই আশা করিতে পারি কি?

বাংলায় মুক্তা সংগ্রহ—

বাংলার অনেক বিল ও পুকুরে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক জন্মে। ইহার মধ্যে অনেক ঝিনুকে বর্ত্তমানে মুক্তা পাওয়া যাইতেছে। ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারীর নিকটবর্ত্তী বিলসমূহ হইতে তথাকার অধিবাসীরা কিছু কিছু মুক্তা সংগ্রহ করিতেছেন। ঐ সমস্ত মুক্তা ব্যবসায়ী-বণিকেরা কলিকাতার বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু পয়সা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতার ৫১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্ হইতে তিনটী শিক্ষিত যুবক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তা সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণার্থ বাহির হইয়াছিলেন। যশোহর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের কেশবপুর এবং খুলনা জেলার ডুমরিয়ার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী বিল হইতে তাঁহারা মুক্তার সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল অঞ্চলের লোকসমূহকে মুক্তা সংগ্রহের প্রণালীও শিখাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। কি প্রকারের ঝিনুকে সাধারণতঃ মুক্তা থাকে তাহা জানা একটু শিক্ষাসাপেক্ষ। এই সকল বিষয়ে গ্রামবাসীদিগকে তাঁহারা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। বাংলার ঝিনুকে বড় মুক্তা জন্মে না, ঐ অঞ্চল হইতে তাঁহারা যেরূপ মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, শ্রমজীবিগণ এই সকল কার্য্য করিয়া তাহাদের কাজকর্ম্মের অবকাশের ভিতর দিয়াও মাসে আট দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। শীতকালে খালবিলের জল কমিয়া যায়, এই সময় মুক্তার জন্য ঝিনুক সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। আমরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। মুক্তার সন্ধান জানিতে পারিলে কি উপায়ে উহা সংগ্রহ করিতে হয় এ বিষয়ে ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্ পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন।

মাতৃ-মন্দির —

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৩য় বর্ষ | পৌষ—১৩৩২ | ৯ম সংখ্যা।

ভাবিবার বিষয়

আইনের বাঁধন—

কালের পরিবর্ত্তনে দেশের অনেক সাবেক রীতি পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়; সমস্ত দেশেই এই মত পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক উন্নত প্রথা গ্রহণ করা হইতেছে। আমাদের দেশের পূর্ব্বের সব রীতি-নীতিই ভাল ছিল, এই বিশ্বাসে আমাদের সমাজ, সংস্কার সম্বন্ধে একেবারেই নিশ্চেষ্ট; ফলে গবর্ণমেণ্টকে অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে—সহমরণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ প্রভৃতি আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাল্য-বিবাহ নিবারণকল্পে আইন করিবার কথা উঠিতেছে। এই প্রকারে দেশীয় সমাজকে বিদেশীয় আইনের বন্ধনে বাঁধা দেশের পক্ষে অনিষ্টকারক। গবর্ণমেণ্টের আইনের হাতে যাইবার পূর্ব্বে দেশীয় সমাজেরই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। ভগবান জানেন কত দিনে আমাদের সমাজের চৈতন্যোদয় হইবে।

নারী হরণ—

বাংলার নারীহরণ দিন দিন ভীষণতররূপে বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছি। অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু যুবতী বিশেষতঃ হিন্দু বিধবা হরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত ঘটনায় হিন্দুর শারীরিক বলের অভাব ত প্রমাণিত হইতেছে বটেই—তার চেয়ে অধিক প্রমাণিত হইতেছে—হিন্দু-সমাজের নিয়মের দুর্ব্বলতা। স্ত্রীজাতির প্রতি সমাজের নিশ্চেষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ। আমরা এমন অনেক ঘটনা জানি যেখানে হিন্দু নারী স্বেচ্ছায় মুসলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন অনেক ঘটনা জানি যেখানে মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া

সেই নারী আর হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সে সব কি নারীর প্রতি হিন্দু সমাজের অবিচারের নিদর্শন নহে? মুসলমানের উপর বিদ্বেষভাব দেখাইয়া ফল কি?—আগে আপন ঘর সামলাও।

আশ্চর্য্য দেশ—

আমেরিকায় এক ব্যক্তি একটি সভায় বলিয়াছিলেন—আমি এক আশ্চর্য্য দেশ দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে একই সংসারের মানুষের মধ্যে এমন সম্বন্ধ আছে যে আজীবন পরস্পরের কথা কওয়া নিষেধ। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই জানেন, সেটা আমাদেরই দেশের ভাসুর-ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধের কথা। ভাসুর এবং ভ্রাতৃবধূ উভয়ের এই অদ্ভুত নিয়মের বাঁধনে যে সংসারে প্রতিদিন কত অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগীরাই জানেন। আচ্ছা, এই সব ভীষণ রীতি একটু চলনসই করা যাইতে পারে না কি?

কৃষ্ণলীলায় কুরুচি—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার চর্চ্চা হিন্দুর পরম ধর্ম্মকর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়া বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলার সর্ব্বসাধারণ হিন্দুর ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ধর্ম্মে যে ভাবে কৃষ্ণলীলা প্রচারিত হয় তাহা অনেক স্থলেই কুরুচি পূর্ণ। শ্রীচৈতন্য দেব যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার রসাস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করা কর্ত্তব্য। রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব বর্ত্তমান শাস্ত্রকারগণ আদিরস-সর্ব্বস্ব করিয়া গড়িতেছেন। সঙ্গীতে কৃষ্ণলীলার বহু বহু গান বর্ত্তমানে অবৈধ প্রণয়ের গানে পরিণত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের পবিত্র যুগল মূর্ত্তির ছবি পরিবর্ত্তিত হইয়া বাজারে নায়ক নায়িকার রঙ্গরসের ছবিতে পরিণত হইয়াছে—কথকতায় কৃষ্ণলীলায় আদি রসের ছড়াছড়ি। কৃষ্ণলীলার দোহাই দিয়া অনেক বিভৎস ক্রিয়া পর্য্যন্ত গৃহী ও ভেকধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে চলিতেছে। মহিলারাই অধিক ধর্ম্মবিশ্বাসী, তাই বড়ই ক্ষোভে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, এই সকল বিকৃত ভাব মহিলাগণেরই অধিক অনিষ্ট করিতেছে। সমাজ যখন নষ্ট হইতে থাকে তখন তার ধর্ম্মও তাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান, তুমি এখন আবার নূতন মূর্ত্তিতে ধরাধামে এস—আমাদিগকে নূতন করিয়া তোল।

আহারে পরিবেশন—

আমাদের দেশে নারীগণ পরিবেশনের সময় ভোক্তাকে যথাসম্ভব বেশী করিয়া খাওয়াইতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। বাস্তবিক এটা ভোক্তার প্রতি পরিবেশনকারিণীর একটি প্রীতির লক্ষণই বটে। আমরা কিন্তু পরিবেশনকারিণীকে পরিমিত ভোজন বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। পরিমাণের অতিরিক্ত খাইলে আহারের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হয়। অতিথি সৎকারের বেলায় বা নিমন্ত্রণের পরিবেশনে আমরা আমাদের মা-বোনদিগকে পরিমিত আহার করাইতে উপদেশ দিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইব জানি না, তবে গৃহের নিত্যের আহার্য্যে তাঁহারা যেন ভোক্তাকে পরিমিত আহার করাইতে সচেষ্ট হন। আহারের কি কি উপকরণ আছে ভোক্তাকে সে বিষয়ে জানিতে দেওয়া হয় না, এটা অতি মাত্রায় ভোজন করাইবার একটি কৌশল। আমরা অনুরোধ করি, আহার্য্য দ্রব্যের জিনিসগুলি যেন পূর্ব্বেই ভোক্তাকে জানিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

ডাক্তারী ও কবিরাজী—

দিন দিন দেশের লোকে ডাক্তারী চিকিৎসার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজ শাসনে লোককে ডাক্তারী শিখিবার অধিক সুযোগ দেওয়া হইতেছে, চকচকে রং-বেরংএর শিশি পোরা নানাভাবের ঔষধ পরাক্রমী ইংরেজ বণিকের বাণিজ্য কৌশলে দেশের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত

হইতেছে—ডাক্তারী চিকিৎসার পক্ষপাতী হইবার ইহাও বিশেষ কারণ। আমরা ডাক্তারী চিকিৎসার নিন্দা-প্রশংসা এখানে করিব না। কিন্তু দেশের লোকের বোঝা উচিত নিজের অজানিত কোন কৌশলে অন্যের চেষ্টায় রোগ নিবারণ করা অপেক্ষা ঔষধ এবং রোগের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হইয়া চিকিৎসা করা অধিকতর কল্যাণকর। এ বিষয়ে কবিরাজী চিকিৎসা দেশের পক্ষে বহু গুণে উপযোগী। পরিবারে গৃহিণীদিগকে অনেক সময় পরিবারের ছোটখাট চিকিৎসার ভার লইতেই হয়। সামান্য স্বর্ণসিন্দূর, লক্ষ্মীবিলাস বড়ী প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা গৃহিণীরাই অনেক চিকিৎসা করিতে পারেন। তারপর টোট্‌কা গাছ গাছড়া, পাচন প্রভৃতি পল্লী মহিলাদের বহু বহু জানা আছে—অজ্ঞাতগুণ ডাক্তারী ঔষধের পরিবর্ত্তে এই সকল ঔষধের ব্যবহার অতীব কল্যাণকর। ভবিষ্যতের জন্য মহিলাদের পক্ষে মোটামুটী চিকিৎসা শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা ইহাতে হইয়া থাকে। ক্রমিক চর্চ্চার ফলে এইরূপ পারিবারিক চিকিৎসার উন্নতি সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলার পরিচ্ছদ—

অগ্রহায়ণের মাতৃ-মন্দিরে বাঙ্গলার পরিচ্ছদের অনেক ত্রুটীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মেয়েদের একবস্ত্রে আপাদমস্তক ঢাকা শাড়ী এবং পুরুষদের কোঁচা-কাছা দেওয়া ধুতির ব্যবহার কাজ কর্ম্ম করিবার পক্ষে অসুবিধাজনক। ইহাতে মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে। আমরা পাঠক পাঠিকাদিগকে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। মেয়েরা সন্তানদিগকে ধুতি শাড়ী না পরাইয়া যদি বরাবরই কাটা কাপড় পরাইতে থাকেন তবেই কালে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। বিশেষতঃ মোটা খদ্দর পরিতে হইলে প্রচলিত লম্বা-চৌড়া ধুতি শাড়ী কখনই চলিবে না, কাট ছাট করিয়াই পরিতে হইবে। খদ্দর কিনিয়া ঘরে প্রস্তুত করিয়া দিলেই এই উদ্দেশ্য অধিকতর কার্য্যকরী হইতে পারে। বিলাতী অনুকরণে কাট-ছাট অনাবশ্যক।

উপন্যাস ও কবিতা লেখা—

উপন্যাস ও কবিতা লিখিয়া দু-একটি মহিলা যশোলাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই মেয়েদের ইহা একটি সখের খেলা। এদিকে বেশী মাথা না ঘামাইয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় চিন্তা করা এবং কি ভাবে তাঁহারা অর্থকরী কোন শিল্পকর্ম্ম করিতে পারেন সেই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয়। মহিলাদের নিকট হইতে আমরা এ বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ পাইতে আশা করি।

শীত

শ্রীমতী প্রিয়দম্বা দেবী, বি-এ।

এলো শীত কুয়াশায় ঘিরে চারিদিক
সব ফুল গেল চলে, গাঁদা সে নির্ভীক
সুবর্ণের বর্ম্ম পরা [illegible] আগুনায়,
সুনীল অপরাজিতা ভরসা বিলায়;
কুন্দ ফুল বন্ধুহীনা বিধবার মত
স্নেহ চোখে চেয়ে সবে দেখে অবিরত

বাহিরে তিমির ঘেরে আসে ভোরে সাঁজে,
তাই বলে মনের আলোক মনোমাঝে
নিভিতে দিয়োনা কোন মতে মমতায়
বেঁধে রাখ কাছে কাছে, যে আছে যেথায়
অনাথ আতুর জন, মনের দুয়ার
খুলে রাখ, আঁধার মানিবে তবে হার।

বাৎস্যায়নের আমলে হিন্দুমহিলা

অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল এম-এ. বি-এল।

বৌদ্ধযুগের বহু পরে যে সময় বাৎস্যায়ন তাঁর "কামসূত্র" প্রচার করেন তখন হিন্দুসমাজ বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। সে আজ অন্ততঃ চোদ্দ শ' বছর আগেকার কথা। সেই অতিপ্রাচীন যুগে মহিলাগণের জীবন কি রকম ছিল তার একটা সুন্দর চিত্র বাৎস্যায়ন দিয়ে গিয়াছেন। নারীর অধিকার সম্বন্ধে ইউরোপ যখন স্বপ্নও দেখেন নি সে সময় ভারতের হিন্দুমহিলা সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা' আমরা বাৎস্যায়ন পড়লে বুঝতে পারি।

প্রাচীন ঋষিরা বলেছিলেন যে, শাস্ত্রপাঠে নারীর কোনো অধিকার নেই। বাৎস্যায়ন তাঁদের ছেড়ে কথা কন নি। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক নারীর চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হতে হবে। তাঁর এই মতের পোষকতায় তিনি দুটি অকাট্য যুক্তি দেখিয়েছেন—প্রথম হচ্ছে এই যে, যদি কোনো মহিলার বৈধব্য বা অন্য কোনো কারণে স্বামী সংসর্গ-চ্যুতি ঘটে আর তার দরুণ তাঁকে কষ্ট পেতে হয় তাহ'লে এই সব বিদ্যা জানা থাকলে তিনি যেমন করে হোক সৎপথে থেকে নিজের জীবিকা সংস্থান কর্ত্তে পারেন; আর একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, কলাবিদ্যা নারীর একটি প্রধান অলঙ্কারবিশেষ এবং এই সব বিদ্যা প্রত্যেক মহিলাকেই অশেষ গুণান্বিতা করে তোলে। ঠিক এই রকমের যুক্তিই কি এখনো চলছে না?

বাৎস্যায়নের আমলে সতীসাধ্বী মহিলাদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল স্বামীসেবা। স্বামীকে তাঁরা দেবতার মতো ভক্তি করতেন আর স্বামীর ইচ্ছা অনুসারেই যথাসাধ্য চলতেন। স্বামী কি খেতে ভালোবাসেন, কি খেতে তাঁর ভালো লাগে না, কোন্ পথ্য তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, কোন্‌টি অপকারী, প্রত্যেক স্ত্রীর কর্ত্তব্য ছিল সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ঘরের বাইরে স্বামীর পদশব্দ শুনলেই সাধ্বী স্ত্রী উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করতেন, আর নিজে পা ধুইয়ে না দিলে চাকরদের হুকুম কর্ত্তেন পরিষ্কার জল দিয়ে স্বামীর পা ধুইয়ে দিতে। স্বামীর বিনা অনুমতিতে সাধ্বী স্ত্রী কাউকে নিমন্ত্রণ করতেন না বা কারো নিমন্ত্রণ নিতেন না, কোনো বিবাহ বা যাগযজ্ঞে সাহায্য করতেন না, কিম্বা কোনো দেবমন্দিরে যেতেন না। কোনো আমোদ প্রমোদ বা খেলাধুলায় যোগ দিতে যখন ইচ্ছা হোত, আগে স্বামীর মন বুঝে দেখে তবে যোগ দিতেন। কিন্তু এটা আশা করা যেতে পারে যে, তখনকার স্বামীদেবতারাও স্ত্রীর কোনো সদিচ্ছায় বাধাপ্রধান করতেন না আজকালকার মতো। স্বামী উপবেশন করবার পর স্ত্রী বসতেন, স্বামী উঠবার আগে গাত্রোত্থান করতেন, আর ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে কখনো জাগাতেন না। স্বামীর সঙ্গে যদি কোথাও যেতে হোত, কেন না, ঘরের বার হওয়া তখনো সমাজের এত অনুশাসনের মধ্যে এসে পড়েনি, সে সময় স্ত্রী তাঁর সব চেয়ে ভালো গহনাগুলি পরে বেরুতেন। স্বামী কুব্যবহার করলে স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন বটে, কিন্তু যাতে স্বামীর মনে ব্যথা লাগে এরকম কোনো তীব্র কথা স্বামীকে বলা স্ত্রীর শোভন হোত না। স্বামী একলাই থাকুন বা বন্ধুবান্ধবের মজলিসে থাকুন, সর্ব্বদা মধুর বাক্যে তাঁর দোষ তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়াই স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলে সে সময় গণ্য হোত, অবশ্য, সে সব কথার মধ্যে তিক্ততা যে একেবারে থাকতো না তাও নয়। কুঁদুলে স্বভাব স্ত্রীজাতির পক্ষে তখন একটা প্রধান দোষের বিষয় ছিল। স্ত্রী যখন স্বামীর কাছে আসতেন নেয়ে তাঁর

পরিধানে নানান্ রকমের ফুল-কাটা কাপড় থাক্‌তো আর সে কাপড় একরঙা না হ'য়ে প্রায়ই তা থেকে নানান্ রঙ ফুটে উঠ্‌তো। শুধু তাই নয়, স্বামী সম্ভাষণের আগে সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ-লেপন সে যুগের নিয়ম ছিল।

তখনকার গৃহিণীপনা ছিল অতি সুন্দর। আর সে চিত্র বাৎস্যায়নের লেখনীর ইঙ্গিতে আরো সুন্দরতর-রূপে ফুটে উঠেছে। শ্বশুর, শাশুরী, স্বামীর আত্মীয়স্বজন, ননদ দেওর সকলকেই যে যার প্রাপ্য সম্মান দেখানো তখনকার প্রত্যেক বিবাহিতা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। এমন কি, চাকরবাকরেরাও সে আদর থেকে বঞ্চিত হত না। ঘরের গৃহিণী যিনি, তাঁর উচিত ছিল ঘরদোর সর্ব্বদাই তকতকে ঝরঝরে রাখা। ঘরের মধ্যে স্থানে স্থানে পুষ্পপাত্রে নানান্ রকমের ফুল রোজ সাজানো থাক্‌তো, আর সে সাজাবার ভার ছিল গৃহিণীর উপর। বাড়ীর চারিদিকে গৃহিণী একটি বাগান তৈরী করাতেন,—তার ভিতর নিত্যকার সকাল সন্ধ্যা ও দুপুরবেলার দেবপূজার জন্যে যে সব ফুল ফল ও পাতার প্রয়োজন সেগুলির রীতিমত ব্যবস্থা থাকতো। শুধু তাই নয়, গৃহিণী নিজে সেই বাগানে হরেক রকমের শাকসব্জীর গাছ বসাতেন, আকের ক্ষেত করতেন, যুঁই বেল মল্লিকা মালতী ও আরো অনেক রকম ফুলের গাছ বসাতেন, নানাবিধ ফলের গাছও যাতে লাগানো হয় তারও বন্দোবস্ত করতেন। বাগানটি একদিকে সংসারের প্রয়োজনীয় ও বিলাসের জিনিস যোগান দিত, আর একদিকে সেটি ছিল প্রমোদ-উদ্যান। কাজেই বড় বড় গাছের সার, মাঝে মাঝে কুঞ্জবন ও বসবার জায়গা আর ঠিক মাঝখানে একটা চৌবাচ্চা বা বাঁধানো পুকুর কিম্বা ফোয়ারা—এই সব সেই উদ্যানের শোভা সম্পদ বাড়িয়ে তুল্‌তো।

যখন বাজারে যে জিনিস সস্তা প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্য ছিল সেই সময় সে সব জিনিস কিনে মজুত করে রাখা। তেল, নুন, বাঁশ, জ্বালানী কাঠ, বাসনকোসন,—সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য অথচ নষ্ট হবার নয় এমন জিনিস সস্তা পেলে গৃহিণী তাই কিনে রেখে সংসারের সচ্ছলতা বাড়িয়ে তুলতেন। সুগন্ধি দ্রব্য, ওষুধ-বিষুধ,—এক কথায় প্রায় সব জিনিসের বেলাই এই নিয়ম চলতো। কিন্তু তিনি যা কিনতেন সেগুলো নিজের তত্ত্বাবধানে কোনো গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখতেন। যে ঋতুতে যে সব তরীতরকারীর আমদানী সেই ঋতুতে সেই সব তরীতরকারী নিপুণ গৃহিণী সস্তাদরে বেশী করে কিনে রাখতেন—সংসারের সুবিধার জন্যে।

বছরের আয়ের উপর সে বছরের খরচ নির্ভর করতো, আর যাতে খরচের দিকটা আয়ের চেয়ে বেশী না হয় সেদিকে সু-গৃহিণীর সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাক্‌তো। বাড়ীর সকলের খাওয়াদাওয়া সারা হ'লে যে দুধ বেশী থাকতো তাতে গৃহিণী আজকালেরই মতন দই পাততেন। তেল আর চিনি ঘরেই তৈরী হোত, গাছের ছাল থেকে দড়ি তৈরী করে ঘরে মজুত রাখা হোত। চাকর-বাকরদের বেতন গৃহিণী নিজহাতেই দিতেন, ক্ষেতের চাষী আর পোষা জন্তু ও পাখীদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান তিনিই করতেন। সংসারের যা' কিছু কেনাবেচা, তার দেখাশোনার ভার ছিল গৃহিণীর উপর। মাঝে মাঝে গৃহিণী স্বামীর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে স্বহস্তে তাঁদের ফুল, চন্দন, গন্ধদ্রব্য ও পানসুপারী দিতেন।

চাকরবাকরদের উপর গৃহিণীর ব্যবহার খুবই ভালো ছিল। ভালো কাজের দরুণ পুরাণো কাপড় গৃহিণী প্রায়ই চাকর দাসীদের বখ্‌শিস্ দিতেন। তা' ছাড়া উৎসবের সময় চাকর দাসীদের টাকাকড়ি দেওয়াও তখনকার একটা প্রথা ছিল। কিন্তু স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করে তিনি কাউকে কিছু দিতেন না।

স্বামী তাঁর যা' কিছু রোজগার সবই স্ত্রীর হাতে ধরে দিতেন, আর স্ত্রী তাই থেকে সংসারের খরচপত্র চালাতেন।

'শ্বশুর-শাশুড়ীর আদেশ সর্ব্বদা পালন করা

প্রত্যেক বিবাহিতা স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা, কিম্বা তাঁদের সামনে বেশী হাসা নিষিদ্ধ ছিল। পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে বেশী কথা কইতেন না, কিন্তু তা' বলে যতটুকু কইতেন তাঁর মধ্যে শুষ্কতা বা রুঢ়তা আদৌ থাকতো না।

কারো সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলা, পিছন ফিরে দেখা, লুকিয়ে আলাপ করা, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পথের লোকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা, সাধারণে যেখানে ঘুরে বেড়ায় সেই সব জায়গায় জাঁকজমক দেখা, নির্জ্জন স্থানে অনেকক্ষণ থাকা—স্বামী-সোহাগিনীর পক্ষে এ সব একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ভিখারী, বৌদ্ধভিক্ষু, কুচরিত্রা নারী, যাদুকরী প্রভৃতির সঙ্গ পরিহার করা সকল সধবারই কর্ত্তব্য বলে পরিগণিত হোত। কোন বিবাহিতা স্ত্রী অপরিচিত ব্যক্তির কাছে নিজের সম্পদ কীর্ত্তন বা স্বামীর গুপ্তকথা প্রকাশ করতেন না, করলে তিনি সমাজে বড়ই নিন্দনীয়া হ'তেন। যে স্ত্রী রূপ বা ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করতেন বা নিজের সুখ নিয়েই মত্ত থাকতেন তাঁকে কেউ ভালো বলতো না। বরং যিনি সকলের সঙ্গে মিশতেন আর সবাইকে সুমধুরভাবে আপ্যায়িত করতেন তাঁর খাতির সর্ব্বত্রই ছিল।

প্রোষিতভর্ত্তিকা আয়তির লক্ষণ ছাড়া অন্য কোনো অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করতেন না, আর পুরুষজাতিকে তিনি দেবতার মত দেখতেন। স্বামীর সংবাদের জন্যে আকুলতা যতই বেশী হোক না কেন, সংসারের কাজে তাঁর অবহেলা কখনো দেখা যেত না। যুবতীদের সঙ্গে শয়ন তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; তিনি বরাবর শয়ন করতেন প্রবীণাদের সঙ্গে এক বিছানায়। স্বামীর অন্দরের জিনিস যা কিছু সে সব তিনি খুবই যত্ন করতেন আর স্বামীর আরব্ধ কাজ সাধ্যমতো করে যেতেন। বাপের বাড়ীতে বা কোনো সখীর বাড়ীতে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন বটে কিন্তু সে সময় তিনি কোথাও যাবার উপযোগী অথচ আটপৌরে কাপড় চোপড়ই পরতেন আর স্বামীর ভৃত্যদের সঙ্গে নিতেন। এ সব কাজে কিন্তু তিনি বেশীদিন কোথাও থাকতেন না। স্বামীর প্রবাস-অবস্থায় স্ত্রীকে তীক্ষ্ণ ব্যবসা বুদ্ধি দেখিয়ে সাধু চাকরদাসীর সাহায্যে কেনাবেচা করতে হোত, আর তাঁর চেষ্টা হোত কোনো মতে আয় বাড়ানো এবং খরচ কমানোর দিকে। স্বামী যখন বিদেশ থেকে ফিরতেন সে সময় প্রোষিতভর্ত্তিকা সাধারণ কাপড় চোপড় পরেই তাঁকে অভ্যর্থনা কর্ত্তেন, যা'তে স্বামী বুঝতে পারেন কি আচারে তাঁর স্ত্রী এতকাল দিন যাপন করেছেন। বহুদিন পরে এই স্বামিসন্দর্শনের সময় সাধ্বী স্ত্রী দেবতার মতো স্বামীকে অর্ঘ্য-উপচার দিতেন।

* * * * *

বাৎস্যায়নের এই আদর্শ-গৃহিণী-চরিত আজকালকার দিনে অনেকের কাছে হয়ত ভাল লাগবে না; কিন্তু এই অতি প্রাচীন বিষয়ের অবতারণা করার উদ্দেশ্য আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, গৃহই যে নারীর প্রশস্ত ক্ষেত্র আর গৃহের ভিতরকার যা' কিছু পুরুষের চেয়ে নারীরই তাতে বেশী অধিকার, অন্ততঃ নারী-স্বাধীনতার দিক থেকে এটুকু জ্ঞান হিন্দুসমাজে বহু শতাব্দী আগে ছিল, আর সে জ্ঞান ছিল বলেই হিন্দু জাতি সে সময় নিজের মহত্ব হারায় নি। আজ ভারতবর্ষের নারী-জাগরণ মহিলার কার্য্য-ক্ষেত্রটাকে বহুবিস্তৃত করে দিচ্ছে—এ যুগের পক্ষে সেটা সুলক্ষণ বটে; কিন্তু তা' বলে অতীতে যেটুকু ভালো ছিল সেটুকুর জন্যে অতীতকে তার ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা তো উচিত নয়। বাৎস্যায়নের চিত্রের ভিতর তখনকার মহিলা-সমাজের আর একটা দিক আমরা লক্ষ্য করি। সে যুগের হিন্দুমহিলা অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন না বরং তাঁরা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেন আর স্বামীর বন্ধুদের সামনে বেরুতে তাঁদের মাথা কাটা যেত না;

পৌষ-পার্ব্বণ

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ।

শীতের জড়তা ঠেলি' এ উল্লাস কোথা পেলি
অয়ি! বিষাদিনী বঙ্গ জননী আমার,
কিসের এ আয়োজন? পূজা আজি কা'র?
চির অভিশপ্ত দেশে সাক্ষাৎ কমলা এসে
সহসা কি খুলে দিলে "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার?"
কোথা গেল ক্ষীণকণ্ঠে দীন-হাহাকার?

বল কোন মহোৎসবে মাতিয়াছে আজ সবে,
ঘরে ঘরে কেন হেরি আনন্দ তুফান?
কি প্রাসাদ—কি কুটীর সকলই সমান।
গৃহিণীরা ভোরে উঠে এনেছে চাউল কুটে,
কোন্ মহাব্রত আজ হ'বে উদ্‌যাপন?
অতীতের স্মৃতি এ যে! প্রেমের তর্পণ!

গৃহ-কোণে বঙ্গবধূ বুকে স্নেহ, মুখে মধু,
"নবান্নে"—নূতন শস্য দেবতারে দিয়া
রেখেছিল শেষ ভাগ যতনে তুলিয়া।
বাহান্ন সপ্তাহ তরে, কতই আগ্রহ ভরে,
সে সম্বলে "রত্নঝাঁপি" ভরিয়া যতনে,
"বাউনী" বাঁধিল বালা খড়ের বন্ধনে।

তিন দিন গৃহ ছাড়ি' যেওনা কাহারো বাড়ী
মমতায় সুমধুর—বধূর শপথ,—
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য দেখ্‌রে জগৎ।

পতি-পুত্র-পরিজনে তুষিতে প্রফুল্লমনে
অন্তঃপুরে অবতীর্ণা "অন্নপূর্ণেশ্বরী",
রাঁধিয়াছে কত খাদ্য বঙ্গের সুন্দরী।

মধুর 'মোচার ঘণ্ট' সুধারসে সিক্তকণ্ঠ,
কোমল 'পালমশাকে' মটরের বড়ী;
রসাল ক'রেছ তারে—মিশাল চিঙ্গড়ী।
বিবিধ মসলাযুক্ত মূলার 'মোহন শুক্ত'
ঘন অরহর ডালে 'জীরার ফোড়ন',
কপি সহ 'কই মৎস্য'—বিশ্বে অতুলন।

'তিল-পিটুলীর' বড়া ছাঁকা তেলে ভাজা কড়া,
'আমড়ার গুড়াম্বল' সুস্বাদু সরস,
ভেট্‌কী মাছের ঝোলে কে না হয় বশ!
ঘৃতে ভাজা তপ্ত লুচী সদ্য অরুচির রুচি,
'আস্কে' 'চুষী' 'পাটী-সাপ্টা' পাঁপর কচুরি
নূতন 'ন'লেন গুড়ে' মণ্ডার মাধুরী।

রসে মোলায়েম মিঠা গোলাপী 'গোকুল পিঠা',
মুগের মগধ লাড্ডু, কৃষ্ণতিলে ছাঁই,
পুস্তুয়া, নিখুঁতি, বোঁদে, মালপো, মিঠাই।
পায়স কামিনী-চেলে, দেবরাজ খান পেলে,
পূর্ণিমার পূর্ণশশী—সে 'সরু-চিকুলী';
দেশী মেওয়া, পুর দেওয়া নানাবিধ 'পুলি'

* বাহান্ন (৫২) সপ্তাহে বর্ষ গণনা করিয়া, সম্বৎসরের জন্য পুরাকালের গৃহিণীগণ শস্য সঞ্চয় করিয়া গোলায় বাঁধিয়া রাখিতেন। ইহার নাম ছিল "বাহান্নী", তাহাই অপভ্রংশে "বাউনী বাঁধা" নাম পাইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য পড়িলে পাঠক সবিস্তারে জানিতে পারিবেন। লেখক।

প্রত্যাবৃত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৪)

হঠাৎ যেদিন কোর্ট হইতে ফিরিয়া অসীমের উপর্য্যুপরি দাস্ত ও বমন আরম্ভ হইল, সেদিন হেমলতা ও দীপালি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। হেমলতা উন্মত্তার ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, দীপালি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিল।

আজ পাঁচমাস হইল তাহার একটী পুত্র হইয়াছে। সে আজ মায়ের কোলে যাইতে পারিল না, দাসীর কোলে বাহিরে বাহিরে বেড়াইতে লাগিল।

দীপালি আগেই সেবিকার কথা ভাবিয়াছিল, সরিতের কথা ভাবিয়াছিল। তাহাদের একবার সংবাদ দিলে তাহারা এখনি আসিয়া পড়িবে। কিন্তু সবই কি তাহার করিতে হইবে? তাহার মনের মধ্যে তীব্র অভিমান জাগিয়া উঠিল, স্বামীও কোন কথা বলিতেছেন না, শাশুড়ি সম্মুখে যাহাকে পাইতেছেন আকুলভাবে তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। যথার্থ সাহায্য করিবার লোক যে আছে তাহা কি তাঁহারও মনে হইতেছে না?

দীপালি সংবাদ লইয়াছিল সেবিকা বিনীতার সহিত কাশী গিয়া কয়েকমাস কাটাইয়া কয়েকদিন হইল ফিরিয়াছে। সাহস করিয়া সে একদিন অসীমের সম্মুখে সেবিকার কথা তুলিয়াছিল।

অসীম বোধ হয় নিজের ভুল বুঝিয়াছিল, তাই সে পূর্ব্বেকার মত সেবিকার নাম শুনিয়াই জলিয়া উঠে নাই, শুধু হাসিয়াছিল। তাহার হাসি দেখিয়া সাহস পাইয়া দীপালি বলিয়াছিল "আমায় ক্ষমা কর, আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে বাড়ীতে গিয়েছিলুম। তোমায় বলি বলি করে বলতে পারিনি, পাছে তুমি রাগ করে আমার মুখদর্শন না কর।"

অসীম বলিয়াছিল "এতে রাগ করবার মত কি আছে দীপালি? তুমি তাকে ভালবেসেছ তাই গিয়েছিলে। তার অদৃষ্টক্রমে সে আমারই কাছে আদর পায় নি, নইলে জগতের সকলেই আদর করছে তাকে।"

তাহার মনের আর্দ্রতা অনুভব করিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া দীপালি বলিয়াছিল "আদেশ কর আমায় আমি তাকে একবার নিয়ে আসি। সরিত ঠাকুরপোকেও খবর পাঠাই।"

শ্রান্ত ভাবে অসীম বলিয়াছিল "এখন নয় দীপালি, এখন নয়। খোকার অন্নপ্রাশনের সময় দেখা যাবে।"

আসল কথা সে নিজে বড় গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাই সে আবার তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে বড় লজ্জা অনুভব করে।

জগতে সত্য কখনই গোপন থাকে না, কখনও না কখনও প্রকাশ হইয়া পড়েই। ললিতবাবুর অন্তিম-কালীন আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় নাই। সরিত যে অসীমের অকৃত্রিম বন্ধু তা সে আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে, সেবিকার অসাধারণ স্বামীভক্তিও তাহার

চিত্তকে দ্রব করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন তাহাদের কাছে নিজেকে ধরা দিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়, কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়াছে। সে কতদিন অগ্রসর হইয়াও আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যে পুণ্যরাজ্য, তাহারা যে দেব দেবী, সে মানুষ হইয়া কেমন করিয়া সে রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবে, কেমন করিয়া সে দেব দেবীর সান্নিধ্য লাভ করিবে?

আজ দীপালি অভিমান করিল, কিন্তু সে অভিমান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সে ভাবিয়া দেখিল ক্ষতি যে তাহারই বেশী। অসীমের কি? সে নিজেই চলিবার পথে দণ্ডায়মান যে।

আকুল হইয়া স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দীপালি বলিল "দিদিকে ডাকতে পাঠাব কি?"

অসীম চমকাইয়া উঠিল। নিমীলিতপ্রায় নয়ন দুটী যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া সে বলিয়া উঠিল "কাকে?"

দীপালি বলিল "দিদিকে।"

অসীম নীরব হইয়া পড়িয়া রহিল, আর একটাও কথা কহিল না। দীপালি তাহার মনের কথা বুঝিয়া হেমলতার নিকট গেল। হেমলতা তখন হতাশভাবে ভাবিতেছিলেন "এখন কি করা যায়।"

দীপালি বলিল "মা, দিদিকে একবার খবর দিলেই তো সে এসে পড়বেখন। দিদি এলে আমাদের কিছুই ভাবতে হবে না। ঠাকুরপোও এসে পড়বেখন, তাঁরা বুক দিয়ে পড়ে যেমন করে দেখবেন—"

"ঠিক বলেছ বউমা।"

হেমলতা যেন অকূলে কূল পাইলেন, তিনি তখনই উঠিয়া পড়িলেন। একপদ অগ্রসর হইয়া কি মনে করিয়া ফিরিয়া বলিলেন "আমি নিজেই যাচ্ছি বউমাকে আনতে, কিন্তু যদি সে না আসে? আমরা যে তার উপর অনেক অত্যাচার করেছি?"

আজ সেই সব কথা মনে করিয়া তাঁহার চক্ষু দুটী সজল হইয়া উঠিল। দীপালি দাসীর ক্রোড় হইতে খোকাকে লইয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিয়া বলিল একে নিয়ে যান মা। যদিও আমি জানি সে আসবেই, তবু আপনার মনের সন্দেহ মিটাতে খোকাকে দিলুম। খোকার মুখখানা দেখলে সে নিজে আসবে। আর মা, স্বামীর বিপদে কোনও স্ত্রী কি উদাসীনা হয়ে থাকতে পারে? দিদির মত মেয়ে যে কখনও পারবে না, তা আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। আপনি এতকাল একসঙ্গে বাস করেও দিদিকে চিনতে পারেন-নি মা?"

হেমলতা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি যেমন করে পারি তাকে টেনে আনবই। তুমি বসগে অসীমের কাছে, আমি হেঁটে ঝিকে নিয়ে যাচ্ছি তার বাড়ী।"

দীপালি উপরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। অসীম দীপালির পানে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "খবর দেছ কি দীপালি?"

দীপালি কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ অসীমের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কি? খবর দেবার কথা বলছ তো? মা নিজে গেছেন দিদিকে আনতে।"

অসীম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিল, একটু পরে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "সরিত?"

ব্যগ্রভাবে দীপালি বলিল "তিনিও আসবেন।"

অসীমের দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে তেমনই ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "অনেক অত্যাচার করেছি তাঁদের উপরে, ক্ষমা না নিয়ে কোনও মতে যাওয়া হবে না।"

দীপালি বলিয়া উঠিল "ওকি কথা বলছ? না—ওকথা তুমি মুখে আনতে পাবে না, তোমার পায়ে পড়ি—"

বলিতে বলিতে স্বামীর বক্ষে মুখখানা রাখিয়া সে সামান্য বালিকার মত কাঁদিয়া উঠিল।

হঠাৎ দরজার উপর শব্দ শুনিয়া সে চাহিয়া দেখিল মলিন মুখে সেবিকা দণ্ডায়মানা।

"এসেছ দিদি, এসেছ? তোমার জিনি

তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি আজ। আমার বিষাক্ত নিশ্বাসে এ জিনিষ মলিন হয়ে খসে পড়েছে, তোমার সিন্দুরবিন্দুর জোরে তুমি আবার উজ্জ্বল কর, বাঁচিয়ে তোল। আমি তোমায় সব ছেড়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পাই।"

সেবিকার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িয়া দীপালি কাঁদিয়া উঠিল। সেবিকা তাহাকে টানিয়া বুকে তুলিয়া নিজের অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে ভগ্ন কণ্ঠে বলিল "ভয় কি বোন, সেরে উঠবেন বই কি। কত লোকের কলেরা হচ্ছে, আবার সেরেও তো উঠছে। তোমায় আমি এ ঘরেই থাকবার অধিকার দিতুম, কিন্তু খোকার জন্মে তা পারলুম না। আমি, ঠাকুরপো আর বিনীতা, আমরা তিনজনে এ ভার নিচ্ছি, তুমি তফাতে যাও।" তাহার চোখ দিয়া নীরবে কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল, তাড়াতাড়ি সে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

দীপালি একটু থামিয়া বলিল "কই ঠাকুরপো?"

সেবিকা বলিল "ঠাকুরপো একেবারে ডাক্তার, ঔষধ সব আনতে গেছে। বিনীতাকে খবর পাঠিয়ে এসেছি, সেও এলো বলে।"

সকলে আসিয়া স্বামীর ভার লইলে দীপালি এখন বাঁচিয়া যায়। নিচে খোকা খুব কাঁদিতেছিল, সেবিকা বলিল "তুমি যাও বোন, খোকা কাঁদছে।"

দীপালি ব্যস্তভাবে নিচে চলিয়া গেল।

অসীম চাহিয়া দেখিতেছিল। দুই সপত্নীর প্রণয় দেখিয়া সে হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিতেছিল। সেবিকা আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অসীমের মুদ্রিত চোখের কোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইতেছিল। সেবিকা সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে আবার জলধারা ছুটিল।

কম্পিত কণ্ঠে সেবিকা বলিল "তুমি কাঁদছ?"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জলধারা অসীমের ললাট ভাসাইয়া দিল।

অসীম চাহিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "তুমি এসেছ সেবিকা? আমি যে কত অন্যায়—"

সেবিকা তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল "কিছু অন্যায় করনি তুমি। কেন সে সব কথা ভেবে সঙ্কুচিত হচ্ছ? তুমি আমায় প্রকৃত মানুষ হবার সুযোগ দিয়েছ, দুঃখ করছ কেন? তোমার কোনও কথাই তো আমার গায়ে লাগে নি, আমি তো সব ভুলে গেছি; তুমি কেন সে সব কথা মনে জাগিয়ে রাখছ?"

অসীমের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। আবার তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধকণ্ঠে সেবিকা বলিল "সত্যি যদি তুমি এ রকম চঞ্চল হও, তা হ'লে আমাকে চলে যেতে হবে। আমায় তাড়াবার জন্মেই কি এমন করছ তুমি?"

অসীম নিজেকে সামলাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

খানিক পরেই সরিত ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল। বিনীতাও আসিয়া পড়িল। বাড়ীটা জমজমাট হইয়া উঠিল।

বাস্তবিক হেমলতা রোগীর সেবা কিছুতেই করিতে পারিতেন না। কাছে একবারও তিনি আসিতে পারেন নাই।

যখন দেখিলেন অসীমের সেবা করিবার লোকের অভাব হইল না, তখন তিনি আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন সেবিকা অসীমের ভেদ বমন পরিষ্কার করিতেছে, বিনীতা ঔষধ ঢালিয়া অসীমকে খাওয়াইতেছে।

আনন্দে তাঁহার চোখে জল আসিল, এই সেবিকাকে তিনি চিনিতে পারেন নাই। অভাবে না পড়িলে কোন বস্তুর আবশ্যকতা বোধ হয় না। হেমলতা কিছুতেই সেবিকার অভাব অনুভব করেন নাই, কিন্তু এটাতে তাহার অভাবটাই খুব বেশী বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

বিনীতা অসীমকে ঔষধ খাওয়াইয়া ফিরিতে গিয়া দেখিল হেমলতা দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছেন। সে বলিল "আসুন মা।"

হেমলতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "মিছে কেবল তেজ গর্ব্ব নিয়েই জগতে এসেছিলুম মা, কোনও কাজে লাগলুম না। কারও উপকার করতে পারি নি, অনুপকার ঢের করেছি। ভগবান, অসীমকে ভাল রেখে আমায় কেন এ ব্যারামটা দিলেনা, আমি যে বাঁচি তা হলে!"

অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেবিকা বলিল "অমন কথা বলবেন না মা। বাবা গেছেন, কিন্তু আপনি আছেন। আমরা এখনও বলতে পারি আমাদের মা আছে। আপনাকে মা বলে ডাকলে আমাদের ব্যথা জুড়িয়ে যায়। আপনি যে আমাদের মা নন একথা কখনও ভাবিনি মা।"

হেমলতার চোখ দিয়া আবার জলধারা ঝরিয়া পড়িল। আত্ম সংবরণ করিয়া বলিলেন "অসীমও বুঝেছে সে কত বড় ভুল করেছিল। ভাল হয়ে উঠে সে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে মা? ডাক্তার কি বলে গেল?"

বিনীতা বলিল "ডাক্তার বলে গেল কোনও ভয় নেই। ভয়ানক হয়ে উঠেছিল বটে, অনেকটা ভাল বলে আশা করেছেন তিনি। দু চার দিনেই অসীমদা ভাল হয়ে উঠবেন।"

হেমলতার হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হইল।

* * * *

অসীম যখন বেশ ভাল হইয়া উঠিল, তখন সেবিকা সকলকে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিল।

দীপালি খোকাকে কোলে লইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল, একটু হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল "কি জানি, ভীষ্মের মত কোন প্রতিজ্ঞা করে বসেন নি তো যে, ও বাড়ীতে আর যাব না, আমি তাই ভাবছি।"

অসীমও হাসিল, বলিল "সে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম বটে, কিন্তু আমায় আবার জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়েছে, কাজেই সে প্রতিজ্ঞাও আমার মাটি হয়ে গেছে।"

দীপালি সেবিকার পানে চাহিয়া বলিল "দিদি শুনলে?"

সেবিকা তাহার পৃষ্ঠে আদরের একটা চড় মারিয়া বলিল "তোমার জালায়।"

দীপালি ছেলেটীকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিয়া রাগের ভাব দেখাইয়া মুখের হাসি চাপিতে চাপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "বটে? আমার নামে এ মিথ্যা অপবাদ কেন? নিজে এলেন সেধে, উনি পাঠালেন ডাকতে, মাঝখানে দোষী হলুম কিনা আমি? আচ্ছা আসুক ঠাকুরপো, আসুক ঠাকুরঝি, এর নালিশ আমি করবই।"

বলিতে বলিতে সে ছুটিল। সেবিকা হাসিতে হাসিতে ডাকিতে লাগিল "দীপালি, লক্ষ্মী দিদি, একটা কথা শুনে যাও।"

দীপালি সে-কথা কানেও তুলিল না, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

খোকা সেবিকার কোলে খেলা করিতেছিল, সেবিকা তাহার সুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিল।

অসীম চাহিয়াছিল তাহার সুন্দর মুখখানার পানে। নিজে আগে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিল সেইগুলি মনে করিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে বলিল "সত্যই তুমি আমায় ক্ষমা করেছ সেবিকা?"

সেবিকা শান্ত নয়ন দুটি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া হাসিয়া বলিল "তুমি তো দোষ কর নি। তুমি আমার গুরুর কাজ করেছ, কেন না আমার প্রেম শুধু একের উপর ন্যস্ত ছিল, সেটা জগতের উপরে ছড়িয়ে দিতে শিখিয়েছ।"

হতাশ ভাবে অসীম বলিল "তবে আমি আর তোমার নাগাল পাব না সেবিকা? তুমি আমার কাছে আর কি আসবে না?"

সেবিকা তাহার পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিয়া বলিল "আমি সব সময়েই তোমার দাসী। আমি তোমার কাছে এইটুকু মাত্র অনুমতি চাচ্ছি

আমায় বন্ধ না করে মুক্ত রেখে দাও। তোমার অনুমতি ব্যতীত আমি কোনও কাজ করতে পারব না। সদা সর্ব্বদা তোমায় দেখবার জন্যে দীপালিকে রাখছি; তার ঘারে তোমার ভার ফেলে দিয়ে তোমার আদেশে নিশ্চিন্ত ভাবে আমি কাজ করে যাব। দয়া করে এই অনুমতিটা আমাকে দিতে হবে তোমায়।"

অসীম আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তুমি যে মহাব্রত গ্রহণ করেছ সেবিকা, আমি তা হতে তোমাকে কখনও বঞ্চিত করতে পারব না। তোমরা অনেক উপরে উঠে গেছ, আমায় তোমার যোগ্য করে তোমার পাশে নিতে পারবে না কি?"

সেবিকা আবার স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল "আমি উপরে যাই নি, তোমার কাছেই আছি। আমায় আর লজ্জা দিয়ো না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে এ ব্রত বিসর্জ্জন দিতেই হবে।"

অসীম আবেগের সহিত বলিল "না সেবিকা, সে ইচ্ছা যেন আমার মন হতে চিরতরে মিলিয়ে যায়। তুমি মুক্ত, আমি তোমায় বন্ধনে জড়াব না।"

দীপালি সরিতের পিছনে পিছনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল "ঠাকুরপোর কাছে নালিশ করেছি, এবার বিচার হয়ে যার যা দণ্ড তাই ভোগ করতে হবে কিন্তু।"

সরিত গম্ভীর ভাবে হাসি চাপিয়া বলিল "বিচার হয়ে গেছে, এবার দণ্ডটা নেওয়াই বাকি।"

অসীম বলিয়া উঠিল "বাঃ, একতরফা বিচার হল নাকি? এ কিরকম বিচারের পদ্ধতি?"

সরিত একটু হাসিয়া বলিল "আজকাল এমনিই বিচার পদ্ধতি হয়েছে। তোমায় আবার নতুন করে ক্রিমিনাল ল-খানা পড়তে হবে। যাও, আগে দণ্ডটা ভোগ কর—তার পরে যা হয় কোর।"

সে অসীমের কান দুইটা আকর্ষণ করিল, অসীম বলিয়া উঠিল "থাম থাম, যথেষ্ট হয়েছে; এবার সেবিকার পালা।"

"আমরা মেয়েদের গায়ে হাত তুলি নে। তবে দণ্ড হতে বঞ্চিত করব না" বলিয়া সরিত সেবিকার ক্রোড় হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইল।

সেবিকা হাসিয়া বলিল "এইটেই শ্রেষ্ঠ দণ্ড।"

দীপালি সরিতের আড়ালে থাকিয়া একটা ছোট কিল উঠাইয়া বলিল "এখনও সতীনের হাতের কিল খেতে বাকি আছে।"

সেবিকা হাসিতে লাগিল।

(সমাপ্ত).

সুখ ও দুঃখ

শ্রীমতী শোভনারাণী দাস।

সুখ যে আমার নেইক কিছু,
দুখ যে আমার বুকটি জোড়া,
চাইনে আমি সুখের সাগর
দুখই আমার সুখের বাড়া।
সুখের মাঝে যাই যে ভুলে
ডাকতে তোমায় সকাল সাঁঝে,
দুখের মাঝে মুখটি তোমার
আঁকা থাকে হৃদয় মাঝে॥

সুখ যে আমায় দেয় ভুলিয়ে
যে কাজ আমার সবার বাড়া,
দুখ যে আমার পরশমণি,
তাই তো মিলে তোমার সাড়া।
নামটি তোমার থাকে যদি
বুকের মাঝে দিন রজনী,
সেইত আমার দুখের মাঝে
জগৎ জোড়া সুখের খনি।

স্ত্রীশিক্ষা ও প্যারীচাঁদ মিত্র

শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র।

নারীকুলের শিক্ষার্থে আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় যে সকল সাময়িক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমাদিগের বোধ হয় 'মাসিকপত্রিকা' খানি আদি। এই পত্রিকা ১২৬১ সালের ভাদ্রমাস (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট) হইতে তিন বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছিল ও ইহার প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় :—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞপণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক তাহার মুল্য এক আনা মাত্র।"

কি উদ্দেশ্যে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কি প্রণালীতে পরিচালিত হইত তাহা উপরোক্ত কয় ছত্র পাঠ করিয়া পাঠকবৃন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধে মহিলাকুলের জ্ঞানবৃদ্ধি, গৃহকার্য্যে পারিপাট্য, সন্তানপালন ও তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষায় জননীদের সহকারিতা প্রভৃতি বিষয়ক নানারূপ আখ্যায়িকা থাকিত। এতৎব্যতীত এদেশের ও অপরাপর দেশের নারীদিগের বীর্য্যবত্তা, সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নানা কথা থাকিত। এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন প্রাচীন হিন্দুকলেজের শিক্ষিত দুইজন যুবক—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। তবে তাবৎ প্রবন্ধ প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখনী প্রসূত।

এই পত্রিকাখানি কেবলমাত্র তিন বৎসরকাল স্থায়ী ছিল, ইহার স্থায়িত্ব দীর্ঘকালের জন্য হইলেই মণিমুক্তার মিলন হইত।

মাসিকপত্রিকা প্রচার বন্ধ হইবার ছয় বৎসর পরে ১২৭০ সালের ভাদ্রমাস হইতে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। যে সকল উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিদের নিকট হইতে সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উৎসাহ পাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র অন্যতম ছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকার ১২৭০ ভাদ্র হইতে ১২৭৪ চৈত্র পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা উপযোগী প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া ১২৭৫ সালে মাঘ মাসে "নারী শিক্ষা" নামে দুই ভাগ পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল। এই পুস্তকের অবতরণিকা পাঠে আমরা অবগত হই যে, পুস্তক মুদ্রণের তাবৎ ব্যয় প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যমে ডেভিড হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ডেভিড হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড পূর্ব্বে নারীকুলের শিক্ষার্থ পুস্তকসংকলনে ব্যয় হইত। রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিমোহন সেন প্রভৃতি মহোদয়েরা ইহার কমিটির সভ্য ছিলেন ও প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। উমেশবাবু প্যারীচাঁদকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতেন এবং যখন তাঁহার গ্রন্থাবলী ১২৮৯ সালে প্রকাশ হইয়াছিল তখন সেই বৎসরের মাঘ মাসে বামাবোধিনী পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্যারা প্রকাশ হইয়াছিল :—

"সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন এবং তাহাতে দেখাইয়াছেন 'বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে চলিতেছে প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ' এবং তাঁহার প্রণীত আলালের ঘরের দুলাল 'আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি'। আমরাও বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল আমরা যখন বামাবোধিনী

প্রচারে প্রবৃত্ত হই, প্যারীবাবুর প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার লিখন প্রণালী সাধারণের—বিশেষতঃ বামাগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া আদর্শ স্থলে গ্রহণ করি। প্যারীবাবুর লেখা যেমন সরল তেমনই হৃদয়গ্রাহী এবং তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি সুসংস্কার সুজ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভাণ্ডার। তাঁহার অধিকাংশ লেখায় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।"

কিরূপ প্রবন্ধ মাসিকপত্রিকায় স্থান পাইত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা নিম্নে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে কোন ও বর্ণাশুদ্ধি বা ছেদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, তবে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদগুলি (Proper Nouns) বড় হরপে ছিল এক্ষণে তাহা প্রচলিত নহে বলিয়া আমরা সব একই রকম অক্ষরে দিয়াছি।

"বিপদকালে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্নেহ প্রকাশ পায়।

(১২৭৮ সাল কার্ত্তিক সংখ্যা)

পূর্ব্বে বরাহনগর ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ছিল, তৎকালে তাহারা যুদ্ধ ও বাণিজ্য বিষয়ে বড় ক্ষমতাপন্ন ছিল, এক্ষণে তাহাদিগের সেরূপ ক্ষমতা নাই। ওলন্দাজদিগের দেশে ওস্টেণ্ড্ নামে সমুদ্র তীরস্থ এক সহর আছে, সে সহর স্পেন্ বাসিরা তিন বৎসর, তিন মাস তিন দিন সৈন্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখে। ইতোমধ্যে কোন সময়ে বেষ্টন করিয়া ওলন্দাজদিগের মধ্যে ছোট বড় অনেক লোক ধরিয়া কয়েদ করে। পরে তাহারা কয়েদিদিগকে এই দণ্ড দিবার আজ্ঞা দেয়, যে তাহারা গালির দাঁড় টানিবেক। ছোট জাহাজকে গালি বলা যায়, সে নৌকার মতন দাঁড়ের দ্বারা চলে, বড় জাহাজে দাঁড় নাই, সে কেবল পালের দ্বারা যায়। আরো, এদেশে যেমন কয়েদিকে রাস্তায় মাটি কাটিতে হয়, কিম্বা হরিন্‌বাড়িতে সুরকি কুটিতে হয়, তেমনি স্পেন্ দেশে কয়েদিকে গালির দাঁড় টানিতে হইত। সে রাস্তার মাটি কাটিবার অপেক্ষা বড় পরিশ্রমি ও জঘন্য কর্ম্ম।

ওলন্দাজদিগের মধ্যে যে যে ভদ্রলোক কয়েদ হয়, তাহাদিগের মধ্যে একজনের নাম হর্‌মান্। এই হর্‌মানের বিবী আপনার স্বামীর কারাবদ্ধ হওনের সমাচার পাইয়া তাঁহাকে ঐ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। এই নিমিত্তে আপনকার চুল কাটিয়া ফেলেন, এবং পুরুষের পোষাক পরিয়া ওস্টেণ্ড্ সহরে যাইবার জন্য যাত্রা করেন। পথে অনেক ক্লেশ ও দুঃখ পান, তাহাতে কিছুমাত্র বিষাদচিত্ত হন নাই। পরে ওস্টেণ্ড সহরে স্পেন্‌বাসিদিগের কাম্পুতে পৌছিলে, সকলেই তাঁহার সুগঠন এবং সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। প্রতিবার পরিচয় জিজ্ঞাসা কালে বিবী হেরমানের মনে এই আশঙ্কা হয়, বুঝি আমি এবার ধরা পড়িলাম। কিন্তু স্পেন্‌বাসিরা তাঁহাকে স্ত্রী জ্ঞান করে নাই, তাহারা বোধ করে এ যে শত্রু পক্ষের গএন্দা, আমাদিগের কত সৈন্য, আর আমরা কি করিতেছি এই সকল কথা জানিবার জন্যে এই স্থানে আসিয়াছে। ইহা বলিয়া স্পেন্‌বাসিরা বিবী হর্‌মান্‌কে কয়েদ করে, আর তাঁহার হাতে পায়ে বেড়ি দেয়। কারাগারে বদ্ধ হইয়া বিবী হর্‌মান্ মনে ভাবেন, যে ঘরে আমার স্বামী কয়েদ আছেন, তাহাতে রাখিলে আমার কত না কত সুখ হইত, হায় কপাল ইহাও আমার হইল না। পরে বিবী হর্‌মান্ শুনেন, যে পরদিবস কয়েদি দিগের মধ্যে সাত জনের প্রাণদণ্ড হইবেক। এই সমাচার পাইয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হন, মনে করেন, হয়তো উহাদিগের মধ্যে আমার স্বামীও হত্যা হইবেক। সেই সময়ে তিনি যে কারাগারে বদ্ধ ছিলেন, তাহাতে একজন পাদরি উপস্থিত হন। পাদরি আসিবার কারণ এই, তিনি সকল কয়েদিদিগের কর্ম্মাকর্ম্ম শুনিয়া দোষের মার্জ্জনা পরমেশ্বর হইতে প্রার্থনা করিতেন। তিনি প্রত্যেক কয়েদির কথা গোপনে শুনিতেন, সে রূপে আর

কাহাকে বলিতেন না, শুনিলে তাঁহার বড় দোষ হইত। বিবী হরমান্ পাদরিকে আপন পরিচয় দিয়া আপনকার সকল কথা কহেন। পাদ্রি উত্তর দেন,—মা, স্বামিকে কারাগার হইতে খালাস করিবার জন্যে তুমি যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, আমার সাধ্য হইতে তোমার যত উপকার হয়, তাহা সকলি করিব। পরে পাদ্রি প্রধান সেনাপতির আজ্ঞা লইয়া, যে ঘরে হরমান্ কয়েদ ছিলেন, সে স্থানে তাঁহার বিবীকে রাখিয়া দেন। স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বিবী হরমান দেখেন, যে তিনি বিষণ্ণভাবে আছেন, পরদিবস তাহার কি হইবেক তিনি নিশ্চয় শুনেন নাই, কখন মনে করিতেছিলেন আমার হত্যা হইবেক, কখনও বা ভাবিতে ছিলেন, না, আমার প্রাণদণ্ড হইবেক না, হয়তো জন্ম ভোর গালির দাঁড় টানিতে হইবেক। স্বামির বিষণ্ণ দশা দেখিয়া বিবী হরমান্ প্রথমে মূর্চ্ছা যান। পরে চৈতন্য হইলে, তিনি তাঁহাকে বলেন, "প্রাণনাথ, আমি আমাদিগের সকল জিনিস্ পত্র বেচিয়াছি, তাহাতে সে অর্থ পাই, তাহা সঙ্গে আছে, এই অর্থ দিয়া তোমাকে খালাস করিব, এই মানসে আমি পুরুষের পোষাক পরিয়া ওস্টেণ্ড সহরে আসিয়াছি, যদি তোমাকে খালাস করিতে পারি, তবে তো সকলি ভাল হইবেক, তাহা যদি না হয়, তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেখানে যাইব, যদ্যপি তোমাকে গালির দাঁড় টানিতে হয়, আমিও তোমার সঙ্গে দাঁড় টানিব। এই প্রতিজ্ঞা বিবী হরমান্ অবলম্বন করেন, সে কথা প্রধান সেনাপতির কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি বড় দয়া জন্মে। তিনি ঐ স্ত্রীলোককে অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বামিকে কারাগার হইতে খালাস করিবার আজ্ঞা দেন।"

নতুন বউ

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব'কোনাকো ওকে আহা নতুন বৌটী ওযে!
রান্নাবাড়ার বল দেখি কতটুকুন বোঝে।
শেখেনিক এখনও ধরতে হাঁড়ির কাণা,
কিসে কিবা মসলা দেবে নাইত ভাল জানা।
রাঁধত আগে কাদার সুক্তো, মাটীর ঝোল ও ডাল
খেলাঘরের পাট ফুরোলো এই যে সবে কাল।
নখের কোণে জমে আছে এখনো তার ধূলা
ঘরের কোণে আছে পড়ে মাটীর হাঁড়িগুলা।
মনে পড়ে রান্নাঘরে আজকে খণে খণে—
পাড়ার যত ছেলেরা সব আস্‌ত নিমন্ত্রণে;
কচুপাতায় দিত ধরে কাদা-ধূলার রাশি,
আঙনখানি মুখর করে' উঠ্‌ত চপল হাসি।
এ সব কথা ভাব্‌তে গিয়ে অন্য মনে থেকে
চোখের জলে ভাজছে বেগুন, নামায় রুটী সেঁকে।
সইদের সব মুখগুলি তার উঠ্‌ছে জেগে মনে
কাজের ফাঁকে মুছছে ধারা কালো আঁখির কোণে।
জিনিষপাতি নষ্ট করে রেঁধেছে ভুল ক'রে;
রাঁধতে নাহি জানে ব'লে লাজ দিওনা ওরে।
তোমার কড়া কথায় কেঁদে মরেই যাবে ওযে,
এইত সেদিন ধরল হাঁড়ি, বল কি আর বোঝে!

বাঙ্গালী মহিলা কর্ম্মী

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, এম্-আর্-এ-এস্।

বাঙ্গালী নারীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মিস্ বসু ও মিস্ কাদম্বিনী বসু বি, এ, পাশ করেন। মিস্ চন্দ্রমুখী (পরে মিসেস্ মম্‌গাইন) বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। মিস্ কাদম্বিনী বসু মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া তৎকালীন "অবলা-বান্ধব" সম্পাদক দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে বহুবিধ লোকহিতকর কার্য্য করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করেন। ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ইডেন হাঁসপাতালের ভার পাইয়াছিলেন; এবং বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর দুইবার ভারপ্রাপ্তা হইয়া ডাফ্‌রিণ হাঁসপাতাল পরিচালনা করেন। ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তার। ইহার কার্য্যকলাপ কেবল চিকিৎসা-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনে ইনি ভারত মহিলাদিগের পক্ষ হইতে তীব্র আন্দোলন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যেবার নারীদিগের প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা প্রদান করেন, সেইবারেই ইনি প্রতিনিধি হইয়া বোম্বাই কংগ্রেসে যোগদান করেন; কলিকাতা কংগ্রেসে ইনি বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহিলাসমিতি গঠন করেন এবং ইহার সহকারী সভানেত্রী রূপে বাঙ্গালীপল্টনের জন্য নানারূপ ব্যাজ, মোজা, খাবার ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া যুদ্ধরত বাঙ্গালী যুবকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। অনেক বাঙ্গালী সৈনিক তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত

শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দাসের নাম অনেকের নিকটেই পরিচিত। ইনি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। ইনি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী; একটী বিধবাশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী বালীগঞ্জ গড়িয়াহাটায় মহিলা-শিল্পাশ্রম স্থাপন করিয়া দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এখানে অসহায়া অনেক হিন্দু বিধবাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষাবিভাগে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া অনেক বঙ্গরমণীই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী খাস্তগির মহীশূর বালিকাবিদ্যালয়ের এবং পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল রূপে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাসের নামও উল্লেখযোগ্য। কুমারী হৃদয়বালা বসু এম, এ শিক্ষাবিভাগে স্কুল-ইনস্‌পেক্‌ট্রেসের কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সকলেরই সুপরিচিত। ইনি শিক্ষাকার্য্যের সহিত অবসর সময় দেশসেবায় ব্যয়িত করিয়া স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বেথুন কলেজ ও কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করিয়া ইনি সিংহলের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে ১৯১৮ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ইনি Southern Indian Association বা দক্ষিণ ভারতীয় সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। তারপর সিংহল জাতীয় কংগ্রেস্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিশুশ্রমিক-কমিটির সদস্যরূপে ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া শিশু-শ্রমিকের ন্যূনতম বয়স ৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া

দেন এবং প্রত্যেক শ্রমিক উপনিবেশে বিদ্যালয় ও শ্রমিক রমণীদিগের প্রসাবাগার স্থাপন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৯২০ সালের কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসে ইনি মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকাদের পরিচালনা করিয়া বিশেষ যশঃ লাভ করেন; পরে জলন্ধর বালিকা বিদ্যালয় ও কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপ্যালরূপে যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছেন। বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের সময় ইনি মিসেস্ বি, এল্ চৌধুরী ও মিসেস্ পি, কে, রায়ের সহযোগে মহিলা ভোটারদিগের নির্ব্বাচন-কেন্দ্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং নারীশিক্ষা-সমিতি ও বঙ্গীয় নারীসমাজের সহকারী সম্পাদিকা। ইঁহার নেতৃত্বে 'কলিকাতা ছাত্রসঙ্ঘ' নামক ছাত্রহিতকর একটী সমিতিও চালিত হইতেছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অবলা বসু বর্ত্তমান বাঙ্গালী নারীকর্ম্মী-দিগের মধ্যে বিশেষ অগ্রণীয়া। ইনি নারীশিক্ষা-সমিতি, বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা; এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ইনিই প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার কর্তৃত্বাধীনে বাংলার সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

পরলোকগতা সরোজনলিনী দত্ত কয়েকটি জেলায় মহিলাসমিতি স্থাপন করেন এবং হাঁস-পাতালে রোগিণীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় সামরিক কার্য্যে সাহায্য করার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ও, বি, ই, (O. B. E.) উপাধিতে ভূষিতা করেন।

মহিলা কর্ম্মীদিগের মধ্যে গোখেল মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা মিসেস্ পি, কে, রায়, সঙ্গীতসম্মিলনীর সম্পাদিকা মিসেস্ বি, এল্, চৌধুরী, পাবনার শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, পাবনার শ্রীযুক্তা শ্যাম-মোহিনী দেবী প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। সুকবি শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকারূপে স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসের প্রারব্ধ কার্য্য চালনা করিতেছেন। শ্রীমতী কামিনী রায় ও শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতা বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র (বসু) বি, এ, বহুদিন যাবৎ সুপ্রভাত নামক একখানি মাসিক পত্রিকা যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আইন ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় মহিলা উকিল হইয়াছেন পাটনার শ্রীযুক্তা সুধাংশু হাজরা। (ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের প্রথম মহিলা ফেলো, fellow.) কিন্তু সর্ব্বপ্রথম বঙ্গরমণী শ্রীযুক্তা রেজানা গুহ আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া উকিল হইবার জন্য আবেদন করেন; কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহার সে আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী দাস সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এম্, এ, এবং জর্ম্মণী হইতে পি, এচ, ডি উপাধি ভূষিতা হইয়া আসিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলনের দিনে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী স্বামী চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেশের কাজে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম প্রাদেশিক সভায় তাঁহার সভানেত্রীর কার্য্য পরিচালন কম গৌরবের কথা নহে। শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারের প্রভাব সমগ্র বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তাও বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রমিক-দিগের মধ্যে যথেষ্ট হিতকর কার্য্য করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে "শ্রমিক" নামক একখানি পত্র সম্পাদন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বীরাষ্টমী ব্রতের প্রবর্ত্তন করিয়া বাংলার যুবকদিগের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া ইনি এ বৎসর হইতে এই ব্রত পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর

অধিকাংশ জীবন পাঞ্জাবে তাঁহার স্বামীর সহিত ব্যয়িত হইয়াছে। প্রবাসে অবস্থান কালে ইনি সুকর্ম্মী বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এখন ইনি "ভারতীর" সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এবারকার কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী হইবেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। রাজকার্য্য উপলক্ষে ইহাঁর পিতা হায়দ্রাবাদে ছিলেন; পরে ইহার বিবাহও দক্ষিণ ভারতে হইয়াছে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালী মহিলা; বাংলাই ইহার মাতৃভূমি। সুকবি বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে রাজনীতি ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া ইনি সমগ্র সভ্যজগতকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ভারতীয়দিগের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সুদূর আফ্রিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা নাইডু অতি দীর্ঘকাল দেশের সেবায় আত্ম-উদ্যাপন করিয়াছেন। ইহার বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্যের কথা সকলেরই জানা আছে। কর্ম্মী হিসাবে ইহার স্থান বিলাতের 'লেডী অ্যাষ্টর, মিস্ মার্গারেট্ বণ্ডফিল্ড্, কাউন্টেস্ মারকেভিজ' প্রভৃতির নিম্নে কোনক্রমেই নহে। অনেক বিশেষ বিশেষ মহিলাকর্ম্মীর উল্লেখ বাদ পড়িল, বিশেষতঃ বাংলার সমস্ত মহিলা কর্ম্মীর সংবাদ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে।

জগতের সর্ব্বত্রই নারীগণ জাগিয়া উঠিতেছে। তুলনায় বাংলা পশ্চাদ্‌পদ হইলেও, তাহার অবস্থা শোচনীয় নহে। আজ এই বিশ্বজাগরণের সাড়া বঙ্গরমণীর হৃদয়স্পন্দনে অনুভূত হইতেছে। দেশ-মাতৃকার পুণ্যমন্দিরে বিজয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে; বঙ্গরমণীগণও আজ মহাপূজার জন্য আয়োজন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রজ্জ্বলিত দীপবর্ত্তিকা সমগ্র বঙ্গরমণীমণ্ডলীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ সঞ্চার করিবে, অচিরে বঙ্গললনার গৌরবকাহিনীতে জগত ব্যাপ্ত হইবে।

[গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া লেখক এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বপ্রবন্ধের আলোচিত মহিলাদের নাম এখানে উল্লেখ আবশ্যক হয় নাই। আমরা পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিভিন্ন স্থানের আরও বাঙ্গালী মহিলাকর্ম্মীদের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ সম্বলিত সংবাদ পাইলে প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিব ইচ্ছা রহিল।—সম্পাদক।]

খৃষ্ট

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

এসিয়া মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত জেরুশালেম নগরীর নিকটে খৃষ্টের জন্ম হয়। খৃষ্টের জন্মদিন হইতে ইংরাজী বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আজ সে ১৯২৫ বৎসরের কথা।

খৃষ্ট যীহুদী জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। এই জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাদের বংশে ইম্মানুয়েল অর্থাৎ নর-নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের পাপভার লাঘব করিবেন, খৃষ্টের শিষ্যগণ তাঁহাকে এই নর-নারায়ণ বলিয়া মনে করেন।

প্রাচীন ধর্ম্মপদ্ধতি গুলি বহুকাল পরে সমাজে বিকৃতভাব ধারণ করে, তখন তথায় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে; এইরূপ সামাজিক দুর্দ্দশার সময়ে ভগবান মানবরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই সত্য অনাদিকাল হইতেই জগতে সাক্ষ্য দিতেছে। যীহুদীদের সমাজ ঐ সময়ে প্রাচীন ধর্ম্মপদ্ধতি বিকৃতভাবে পরিণত করিয়া সমাজকে উৎচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের পর প্রাচীন শাস্ত্র বর্ণিত কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া এবং তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ দেখিয়া বহুলোক তাঁহাকে ভগবানের প্রেরিত পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিল। খৃষ্টের মাতা মরিয়ম ভগবদ্ভক্ত লোক ছিলেন, তিনিও বিশ্বাস করিলেন ঈশ্বরের আত্মার আবির্ভাবে তাঁহার গর্ভে এই পুত্রের জন্ম হইয়াছে।

বাল্যের পাঁচ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যের বিশেষ সংবাদ কোন শাস্ত্রে লেখা নাই। কেহ বলেন ঐ সময় কাল তিনি তাঁহার পিতা যোসেফের সঙ্গে সূত্রধরের কার্য্য করিতেন। প্রাচ্য পণ্ডিতদের অনেকে বলেন ঐ দীর্ঘকাল তিনি তাতার চীন তিব্বত ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করতঃ জ্ঞানান্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে তিনি একদিন সাধু যোহনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে পবিত্র আত্মা তাঁহাতে আবির্ভূত হইলেন ইহা অনুভব করিলেন। খৃষ্টের আগমনের কিছু পূর্ব্বে এই যোহন ভবিষ্যৎবাণী ঘোষণা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমরা মন ফিরাও, স্বর্গরাজ্য আমাদের করতলগত হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র জগতে আসিতেছেন।" খৃষ্টকে দেখিয়াই যোহন বুঝিলেন—এই সেই ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র।

দীক্ষা গ্রহণের পর খৃষ্ট একটি নির্জ্জন পর্ব্বতে গিয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া ধ্যান করিলেন। লিখিত আছে এই সময়ে "সয়তান" তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জগতের অধীশ্বর করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিল। তিনি সয়তানকে ভৎসনা করিয়া দূর করিয়া দিলেন—পরীক্ষায় সিদ্ধ হইলেন। তখন ঈশ্বরের দূতগণ আসিয়া তাঁহারা সেবা করিল।

সেই হইতে তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার উপদেশ শুনিতে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। একদিন একটি পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া বহুজনসমাগমের মধ্যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জগৎকে সত্যই মুক্তির বার্ত্তা দিয়াছে। সে অমূল্য উপদেশাবলী বাস্তবিকই ধরাধামে স্বর্গের সুষমা ফুটাইয়াছে। বাইবেলে মথিলিখিত গ্রন্থে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম অধ্যায়ের ঐ উপদেশাবলী পাঠ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি উপকৃত হইবেন।

তিনি প্রচার করিলেন—দীনাত্মা লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য। শোকার্ত্ত, মৃদুশীল, দয়াশীল, নির্ম্মল-চিত্ত, মিলনকারী, ধর্ম্ম পিপাসু ইহারা সকলেই ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র। তিনি বলিলেন, আমি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র লোপ করিতে আসি নাই, উহা পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি। তোমরা শাস্ত্রে শুনিয়াছ, দুর্জ্জনের দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ দেওয়া উচিত; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি—তোমরা দুর্জ্জনের প্রতিরোধ করিও না, কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে বাম গালটিও তাহাকে পাতিয়া দাও। তোমরা শত্রুদিগকেও ভালবাসিও, যাহারা শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিও। যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তোমাদের প্রতি অসদাচরণ করে, তাহাদের সুমতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও। তোমরা মানুষের কাছে যেমন ব্যবহার পাইতে চাও মানুষের প্রতি তোমরা তেমনই ব্যবহার করিও। তোমরা ইহজগতে ধন সঞ্চয় করিও না, স্বর্গের ধনে ধনী হইতে যত্নবান্ হও,—সে ধন কীটে কাটে না, মর্চ্চায় ক্ষয় পায় না, চোরে চুরি করে না। কি খাইব, কি পরিব বলিয়া উদ্বিগ্ন হইও না, আকাশের পাখীদের দেখ—তাহারা বোনে না, কাটে না, ভগবান তাঁহাদেরও আহার জোগান। তোমরা পরিচ্ছদের ভাবনাও ভাবিও না, গাছের ফুলগুলি দেখ—তাহারা সুতা কাটে না, তথাপি তাহারা কেমন সুন্দর সাজে সজ্জিত রহিয়াছে।

খৃষ্ট শিশুদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহাকে পাছে বিরক্ত করে, এই ভয়ে শিষ্যেরা শিশুদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিলে তিনি বলিতেন—শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও, বারণ করিও না। ধর্ম্মরাজ্যের সন্তান হইবার জন্য ঐ শিশুদের মত সরল-চিত্ত হওয়া চাই।

মানুষকে ভালবাসা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেন—সমস্ত মানুষকে আত্মতুল্য প্রেম কর, সমস্ত মন প্রাণ ভগবানে সমর্পণ কর। দীনদুঃখী, রুগ্ন, পাপী, বিপন্ন প্রভৃতিদের প্রতি তাঁহার প্রেম অপরিসীম ছিল।

খৃষ্টের দোষ ধরিবার জন্য একদিন কয়েকজন লোক এক স্ত্রীলোককে আনিয়া বিচারপ্রার্থী হইল। তাহারা বলিল—এই স্ত্রীলোক ব্যাভিচারে ধরা পড়িয়াছে, শাস্ত্রে লেখা আছে এরূপ স্ত্রীলোককে পাথর ছুঁড়িয়া বধ করিতে হইবে। এক্ষণে আপনি কি বলেন? তিনি বলিলেন—তোমাদের মধ্যে কে আছ নিষ্পাপ? যদি থাক তবে সে-ই আগে ইহার গায়ে পাথর নিক্ষেপ কর। কিন্তু কেহই তাহা করিল না দেখিয়া তিনি স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—আর পাপ করিও না। সত্যই সেইদিন সে অনুতপ্ত হইয়া পাপ পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে পাপীকে পুণ্যের আলোক দান, অন্ধ, খঞ্জ, মূলা, কুষ্ঠরোগী, আতুর, ভূতগ্রস্থ প্রভৃতিকে আরোগ্য দান ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। লোকে এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত।

খৃষ্টের নবধর্ম্মের তেজ পুরোহিত, যাজক প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র-পন্থীদের কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা খৃষ্টকে শাস্ত্র-অমান্যকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। হিংসা করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে গিয়া তাঁহার সত্যের কাছে পরাস্ত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি তিনি অন্ধের মত অনুসরণ না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া চলিতেন। প্রাচীনেরা দেখিল পাপীদের সঙ্গে একত্র ভোজন শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অথচ পাপীদের লইয়াই তাঁহার আহার বিহার ছিল; নিকৃষ্ট জাতির হাতের জল খাইতে নিষেধ, অথচ নিকৃষ্ট সমরীয়া জাতির কন্যার দেওয়া জল সর্ব্বসমক্ষে তিনি খাইতেন; বিশ্রামবারে (শনি বা রবিবারে) কোন কর্ম্ম করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অথচ তিনি সেদিন রোগীর সেবা প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষান্ত থাকিতেন না।

এই সমস্ত দেখিয়া প্রাচীনপন্থীরা খৃষ্টকে বধ

করিবার পরামর্শ করিল। প্যালেষ্টাইন দেশ তখন রোমের অধিকারে; তাহারা রোমরাজের স্থানীয় প্রতিনিধি পীলাতের নিকটে খৃষ্টকে রাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

এই সমস্ত লোকের হাতে তাঁহার পার্থিব দেহের অবসান হইবে তাহা জানিয়াও তিনি তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বুঝিলেন তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার অবশ্যকতা নাই বরং মরণ বরণ করিয়া অমর রাজ্যের সত্য বার্ত্তা ঘোষণা করাই তাঁহার শেষ জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

খৃষ্টের দ্বাদশজন প্রিয় শিষ্য ছিল,—দেহাবসানের দিন সন্নিকট বুঝিয়া তিনি শিষ্যগণ সহ বিদায়-ভোজের আয়োজন করিলেন এবং আবশ্যক উপদেশাদি তাহাদিগকে দিয়া চিরবিদায়ের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

বিপক্ষেরা পরদিন রোমীয় রাজপ্রতিনিধির নির্দ্ধারিত সৈন্য ও লোকজন সহ আসিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল। খৃষ্টকে ক্রুশ-কাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া বধ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহারা বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

বিচারস্থানে সকলে সমবেত হইলে রোমীয় রাজপ্রতিনিধি পীলাত তাঁহার অপরাধের বিষয় ধৃতকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, এ ব্যক্তি যীহুদীদের রাজা বলিয়া নিজকে ঘোষণা করে, ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নিজকে প্রচার করে এবং জেরুশালেমের অহস্ত-নির্ম্মিত পবিত্র মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় তিনদিনের মধ্যে গড়িয়া দিতে পারে,—এইরূপ স্পর্দ্ধার কথা বলে। বিচারক এবিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এ সকল কথা অস্বীকার করিলেন না। তিনি জানিতেন ঐ সকলই তাঁহার জীবনের পরম সত্য বিষয়। ঐ সকল কথার মূল তাৎপর্য্য মাত্র তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই জ্ঞাত ছিল।

বিচারক খৃষ্টের অপূর্ব্ব তেজোময় নিরুদ্বেগ সম্মতির ভিতরে তাঁহার সত্যবাণীর উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া ছাড়িয়া দিতে মনন করিলেন, কিন্তু তখন বিরুদ্ধ পক্ষের জনতা এতই অধিক হইয়াছিল যে, "ইহাকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও" এই রবের চিৎকারের বিরুদ্ধে বিচারকের কোন কথা বলিবার সামর্থ রহিল না। বিচারক বলিলেন—এই নির্দ্দোষ রক্তপাতে জন্য আমি দায়ী নহি। লোকসমূহ কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে ক্রুশের কাছে টানিয়া লইয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিল, পদাঘাত করিল, পরে ক্রুশকাষ্ঠে আরোহণ করাইল এবং হস্ত, পদ একে একে লোহের প্রেক দ্বারা ক্রুশকাষ্ঠের সহিত বিদ্ধ করিয়া দিল। কুক্ষিদেশে বর্ষার আঘাত করিল; ক্ষত স্থান হইতে দরদর রক্তধারা বহিতে লাগিল। শুধু কি ইহাই করিল? তাহারা খৃষ্টের মাথায় কাঁটার মুকুট দিয়া তাঁহাকে 'যীহুদীদের রাজা' বলিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিল। প্রাচীনা মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতে লাগিল—কেন বাছা এত শাস্তি ভোগ কর? 'যীহুদীদের রাজা' 'ঈশ্বরের পুত্র' এই সকল কথা কেন নিজের উপর বর্ত্তাইতেছ? ঐ সকল অস্বীকার কর; আমরা বিচারককে বলিয়া তোমার মুক্তি দিই। তিনি এসকল কথার কোন উত্তরই দিলেন না।

পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি জল চাহিলেন, শত্রুরা তাঁহাকে দুর্গন্ধ কটুরস দিল, তিনি তাহা মুখে স্পর্শ করিয়াই বলিলেন—হইয়াছে, আর নহে। তিনি উর্দ্ধের পানে চাহিয়া ঈশ্বরের প্রতি কহিলেন—পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা করিও, ইহারা জানে না যে কি করিতেছে। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। আবার উর্দ্ধের পানে চাহিলেন, বলিলেন— পিতঃ আর কেন! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

খৃষ্টের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁহার শিষ্যগণ নানাদেশে ছুটিয়া গিয়া এই নবধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সেণ্টপল নামক এক ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির অদম্য চেষ্টায় ইউরোপের অধিকাংশ স্থলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালার চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ; জগৎবাসীকে শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে প্রেম করা এবং একমাত্র ভগবানে দেহ-মনাদি সর্ব্বস্ব নিয়োগ করা উভয় ধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

প্রাচীন বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা

(১)

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এতদ্দেশে সুদীর্ঘকাল স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা ভাল না থাকাতে অনেকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বঙ্গে কোনকালে এই বিষয়ের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। অবস্থা দৃষ্টে এমন মনে হওয়া বিচিত্র নহে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে—আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য একটু মনযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিলে—এই ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া গণ্য হইবে। সত্য বটে অতি প্রাচীন কালে, হিন্দু আমলে ও তৎপরবর্ত্তীকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোন স্কুল কলেজ ছিল না কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়েই নারীগণ যে শিক্ষা সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ ছিলেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। হিন্দুযুগে তাঁহারা পাঠশালায় ছেলেদের সহিত সমান ভাবে শিক্ষা লাভ করিতেন। দেশীয় গল্প এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তাহার উদাহরণ বিরল নহে। আবার সামাজিক রীতিনীতি এমন ছিল যে, নারীগণ ঘরে বসিয়াই বহু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি তো অতি নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও জানিতেন। চণ্ডীকাব্যের ব্যাধপত্নী ফুল্লরা ইহার প্রমাণ। এদিকে সাধারণ গৃহস্থ এবং উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যে হিন্দুযুগের চিত্র আছে। তাহাতে দেখা যায় খুল্লনা নাম্নী বণিক-পত্নী কিরূপ শিক্ষিতা ছিলেন। চন্দ্রহাসের গল্পে মন্ত্রীকন্যা বিষয়ার বৃত্তান্তেও সেকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার কতটা প্রচলন ছিল তাহা বুঝিতে পারি। বিদ্যাসুন্দরের গল্পের বিস্তার বিদ্যায় পরিচয় বোধ হয় নূতন করিয়া কাহাকেও দিতে হইবে না। এইতো ইতিহাস ছাড়া গল্পের কথা।

ইতিহাসেও আমরা এমন অনেক বিদুষী নারীর খবর পাই যে তাহাতে বুঝিতে পারি সেকালে লেখাপড়া চর্চ্চাটা নারীসমাজে কিরূপ ছিল। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের (১৪শ-১৫শ শতাব্দী) প্রেমপাত্রী রজকিনী রামীর বহু পদ পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাপ্রভুর (১৫শ শতাব্দী) সাড়ে তিন জন কৃপাভাজনের কথা উল্লিখিত আছে। ইঁহাদের মধ্যে শিখিমাইতির ভগ্নী মাধবী আধজন বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই মাধবী অনেক সুন্দর সুন্দর বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভের রাজত্বকালে আনন্দময়ী নাম্নী একটি মহিলার রচিত হরিলীলা কাব্যে যেরূপ কবিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয়। বিক্রমপুরের লালা জয়নারায়ণের ভগ্নী গঙ্গামণি দেবী প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সব মধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার অনেকগুলি এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রীলোকগণ গাহিয়া থাকেন। এইরূপ যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী অপর একটি সঙ্গীত রচয়িত্রী মহিলার নামও পাওয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল রচয়িতা বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী (১৬শ শতাব্দী) অতি বিদুষী নারী ছিলেন। তঁহার প্রণীত রামায়ণ অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। সুদূর য়ুরোপ খণ্ডের বিদ্বজ্জন সমাজে এই শিক্ষিতা মহিলার যশোঘোষণা হইয়া গিয়াছে। ইঁহার রচিত কবিতা নবাবিষ্কৃত ময়মনসিংহ গীতিকায় আছে।

এইস্থানে যে কতিপয় উদাহরণ উল্লিখিত হইল তাহাতেই বুঝা যাইবে এক সময়ে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার কেমন প্রচার ছিল। ইহা ছাড়া দৈহিক বল, শিল্প, নৃত্যগীত, রন্ধন প্রভৃতিতেও প্রাচীনকালে এদেশীয় নারীগণ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

—শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী।

(২)

চৈতন্যদেবের সময়ে সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান দেখান যাইতেছে—মহাপ্রভু তাঁহার উদার প্রেমধর্ম্মে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচারা" নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুরুষের সহিত ধর্ম্মরাজ্যে স্ত্রীজাতির সমান অধিকার, ইহাই বৈষ্ণবগণ প্রচার করেন। "কর্ণানন্দে" শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বহু স্ত্রী-শিষ্যের পরিচয় আছে। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর বৈষ্ণব-সমাজে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা হইতে তৎকালীন বঙ্গসমাজে মহিলার স্থান নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না। এই জাহ্নবাদেবী বঙ্গরমণীকুলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত। বহু বৎসর ধরিয়া তিনিই বৈষ্ণবসমাজের নেত্রী ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও নরোত্তমবিলাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার আজ্ঞাতেই খেতুরীর মহোৎসবে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এই বঙ্গরমণী বৃন্দাবন হইতে বঙ্গের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে উপদেশিকা হইয়া সেবা ও শ্রদ্ধাঞ্জলিই গ্রহণ করিতেন তাহা নহে, বঙ্গরমণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবাও তাঁহার মধ্যে দেখা যায়,—

সে দিবসে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে॥

রন্ধন পরিবেষণ করিয়া বহুবার তিনি ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আমরা যদুনন্দনদাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা॥
সেই দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দন দাস॥

হিন্দুরমণীগণ সাধারণতঃ গৃহকোণে তাঁহাদের মা . . . . . করিতেন না, মুসলমান মহিলাগণের ন্যায় তাঁহারা পর্দ্দার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন না। তাঁহারা সুবিধামত স্বামী বা আত্মীয়ের সহিত তীর্থযাত্রাও করিতেন।

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা অদ্বৈত সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ দাস সঙ্গে তাহার গৃহিণী॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী।
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥—চৈঃ চঃ।

মহিলাগণের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা আমরা শিখিমাইতির ভগিনী শ্রীমাধবী দেবীর রচিত পদাবলী হইতে জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর ৭৮৮, ১৮০৭, ২০৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ তাঁহার লিখিত।

—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

মা

শ্রীমতী মাখনমতী দেবী

যদি অভাগা দীন ব'লে জগৎ পায়ে দলে
চরণতলে মোরে ঠাঁই দিও,
যদি আঘাতে বেদনায় হৃদয় ভেঙ্গে যায়
নূতন করে মোরে গড়ে নিও।
যদি আপন হাতে গড়া বেদনা ব্যথা ভরা
পিছল পথমাঝে যাই ভুলে,
তবে আমার মহীয়সী জননী গরীয়সী
তোমার স্নেহ-কোলে নিও তুলে।

যদি দিনের অবসানে ভকতি-নত প্রাণে
তোমার পদ-পূজা নাহি করি,
যদি বিশাল ধরামাঝে ঘুরিয়া নানাকাজে
তোমার পূত নাম নাহি স্মরি,
যদি আঁধারে ভীতি ভরে চরণ নাহি সরে
অকূলে হয়ে যাই পথহারা—
তুমি উজলি দীপশিখা তখনি দিয়ে দেখা
দেখায়ে দিও মোরে ধ্রুবতারা।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

এই ডিসেম্বর মাসের বড়দিনের বন্ধে কানপুরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। এবারকার অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর পদে বরিত হইয়াছেন। ভারতের সকল প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী নাইডুকে একবাক্যে সভানেত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দেশবাসীর কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাহারই পরিচায়ক।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী নাইডু হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন; বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর। তাঁহার পিতার নাম ডাক্তার ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার অঘোরনাথ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ডাক্তার ছিলেন না, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বিজ্ঞানের ডাক্তার (Doctor of Science) উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি হায়দ্রাবাদে নিজাম-কলেজ স্থাপন করেন। অঘোরনাথ আজীবন শিক্ষাবিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। সরোজিনী অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

অঘোরনাথ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, রসায়নাগারে তিনি সারাদিন অতিবাহিত করিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও পাশ্চাত্য সমাজের নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতা দেখিয়া আপন কন্যাদিগকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার যুগের যে সমাজের বাঁধাবাঁধি ছিল সে নিয়ম তিনি মানেন নাই—গতানুগতিক পথ তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আর তাহা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ শ্রীমতী সরোজিনী ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এরূপ উচ্চাসন লাভ করিতে পারিয়াছেন।

অঘোরনাথ নিজে গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিদ্ ছিলেন, কাজেই শ্রীমতী সরোজিনীকেও একজন বৈজ্ঞানিক কিংবা গণিতজ্ঞ করিবার ইচ্ছা তাঁহার বরাবরই ছিল; এই উদ্দেশ্যে তিনি সরোজিনীকে বীজগণিতের বড় বড় অঙ্ক কষিতে দিতেন। একদিন সরোজিনী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বীজগণিতের একটি অঙ্ক কষিতে না পারিয়া পিতার সমক্ষেই একটি বুকভরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং শ্লেটের উপর একটি প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। পিতা অঘোরনাথ তাহা দেখিয়া তাঁহাকে আর অঙ্ক কষিতে বলিতেন না—তদবধি সরোজিনীর কাব্য জীবনের আরম্ভ হইল।

সরোজিনীর বয়স যখন মাত্র বার বৎসর তখন তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন বয়সের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর তখন তিনি শিক্ষা লাভার্থ ইংলণ্ডে যান এবং তিন বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। ইংলণ্ডে প্রথমে তিনি গির্টন ও পরে কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন। হায়দ্রাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ডাঃ নাইডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ডাক্তার নাইডু বাঙ্গালী নন—মান্দ্রাজী। বাঙ্গালী হিন্দুরমণীর মধ্যে সরোজিনীই প্রথমে অসবর্ণ বিবাহের উদাহরণ দেখান। বিবাহের পর সরোজিনী অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া বাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে তাঁহার দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়। গার্হস্থ্য জীবনে সরোজিনী স্নেহময়ী জননী ও পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

অতঃপর The golden thresh-hold ও The bird of time এই দুইখানি কবিতা গ্রন্থের জন্য সরোজিনী পাশ্চাত্য কবিসমাজে গৌরবের স্থান

পাইয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া ভারতের দুইজন মহিলা বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন তরু দত্ত, অন্য জন শ্রীমতী সরোজিনী; তন্মধ্যে সরোজিনীর কবিতাই আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদমান। তাঁহার কবিতার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ভগবৎ প্রেম উচ্ছ্বাসিত।

প্রায় দশ বৎসর হইল সরোজিনী কবিতা লেখা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুবর্ত্তিনী। অহিংস অসহযোগ ছাড়া যে ভারতের মুক্তি কখনও হইতে পারে না, তিনি প্রাণে প্রাণে এই বিশ্বাস করেন। তিনি গান্ধীকে বুদ্ধ-চৈতন্যের ন্যায় অবতার বলিয়া পূজা করেন এবং সময় পাইলেই আমেদাবাদে মহাত্মা-সকাশে উপস্থিত হন।

চরকা যে ভারতের বস্ত্রসমস্যা দূর করিতে পারিবে এবং চরকা দ্বারা ভারতবাসীর মধ্যে একটা একপ্রাণতা স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে তিনি অন্যকেও যেমন চরকা কাটিতে পরামর্শ দেন, তেমনি নিজেও প্রতিদিন চরকায় সূতা কাটিয়া থাকেন।

শ্রীমতী নাইডু কংগ্রেসের সহিত গত ১০ বৎসর যাবৎ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিজড়িত। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনি স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, স্বরাজ সাধনায় ভারতের পুরুষ জাতি ব্রতী হইলে স্বরাজ লাভ হইবে না, স্বরাজ লাভ করিতে গেলে ভারতের নারী সমাজকেও অবতীর্ণ হইতে হইবে।

শ্রীমতী সরোজিনী সর্ব্ব ধর্ম্মে সমদর্শিনী। তিনি কোন ধর্ম্মকেই হীন চক্ষে দেখেন না। সব ধর্ম্মেই যে সত্য আছে, এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করেন। তিনি মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ ও মুসলমান সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি অনেক সময় অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্রদিগকেও তাহা পাঠ করিতে দিয়া থাকেন। তাঁহার এই মুসলমানী প্রীতি বর্ত্তমানে ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের বিশেষ অনুকূল। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদপত্রে একটি মিথ্যা জনরব বাহির হইয়াছিল যে তাহার পুত্র মিঃ মেনর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা কয়েকজন মুসলমান বিদ্বেষীর চক্রান্তে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমতী নাইডু যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেখানে তাঁহার শৈশব ও বালিকা-জীবন অতিবাহিত হয় সেই হায়দ্রাবাদ মুসলমান নিজামের শাসনাধীন হইলেও তথায় হিন্দুমুসলমানে বিশেষ সম্প্রীতির সহিত বাস করে—হিন্দুর ছেলে তথায় মুসলমান মেয়েদের সহিত একত্রে ক্রীড়া করে। এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনীর জীবন এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহার সমগ্র জীবনটি হিন্দুমুসলমান মিলনের প্রতীক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খুব আশা করা যায় এবার কংগ্রেসে শ্রীমতী নাইডু হিন্দুমুসলমানের সমস্যার অনেক সমাধান করিতে পারিবেন।

শ্রীমতী নাইডুর চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন তাহা অকপটে প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। তাই লর্ড লিটন যখন ঢাকা নগরীতে নিতান্ত অতর্কিত ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, "ভারতীয় রমণীরা মিথ্যা মিথ্যা পুলিশের নামে ইজ্জত নাশের অভিযোগ করে, তখন এই বিদুষী মহিলার দুই চক্ষু ক্রোধে রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং তিনি জলদগম্ভীর নির্ঘোষে কলিকাতা টাউন হলের সোপানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতের নারী জলন্ত হুতাশনে পুড়িয়া মরিতে পারে, তথাচ তাহারা ইজ্জত নাশের কথা বলিতে পারে না"। সেদিন স্বর্গীয় দেশবন্ধু শীর্ণ দেহে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বীরাঙ্গনার বীরবাণী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী নাইডু বেশভূষায় আপন পিতৃমাতৃকুলের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। সেই নীলাম্বরী

সাড়ী, হিন্দুকুলবধূর গৌরব অবগুণ্ঠন এখনও তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি এই সেবিকা, দেশগতপ্রাণা, বিদুষী মহিলাকে সভানেত্রীর বেদীতে বসাইয়া গৌরবান্বিত হইবে।

সমালোচনা

বঙ্গলক্ষ্মী—সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মুখ পত্র স্বরূপ মহিলা-মাসিক। অগ্রহায়ণে প্রথম বাহির হইয়াছে। সামাত যেমন সমগ্র বঙ্গের নারীসমাজ লইয়া একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন তৎপক্ষে এরূপ মাসিক একখানির আরম্ভ বিশেষ উপযুক্ত হইয়াছে। এই সংখ্যায় সমিতির উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী এবং কয়েক স্থানের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর নাম শিক্ষিত সমাজের সকলেই জানেন—আশা করা যায় তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া বাঙ্গলার নারীসমাজের কল্যাণ সাধন করিবে। শুভক্ষণে "বঙ্গলক্ষ্মী" জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গলার নারীসমাজ এই পত্রিকা হইতে অনেক আশা করিতে পারে। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। কার্য্যালয়—৮ নং জ্যাক্‌সন লেন, কলিকাতা।

সুচিকিৎসা—চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সচিত্র মাসিক পত্র। আশ্বিনে নূতন আরম্ভ হইয়াছে। বহু বিখ্যাত ডাক্তার এই পত্রিকার সহিত যুক্ত আছেন। সাধারণ লোকেও এই পত্রিকাখানি পাঠে উপকৃত হইবেনই, অধিকন্তু চিকিৎসকগণও ইহাতে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিবেন। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।৵০, প্রতি সংখ্যা।৵০ আনা। কার্য্যালয়—৮৭ নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তরুণ-পত্র—উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পক্ষে এই পত্রিকায় চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলী দেখিয়া আমরা সুখী হইয়া থাকি। কার্য্যালয়—বেগম বাজার, ঢাকা।

উত্তরা—মাসিক পত্র। গত আশ্বিন হইতে নূতন আরম্ভ হইয়াছে। "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন" লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অন্যতম সম্পাদক, সুতরাং আশা যায় পত্রিকাখানি বিষয়গৌরবে ক্রমবর্দ্ধিত হইবে। ছাপা কাগজ প্রথম শ্রেণীর। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।০ আনা।

কংসবণিক পত্রিকা—নিখিল বঙ্গ কংসবণিক সম্মিলনীর মুখপত্র। কার্য্যালয়—রাণাঘাট। তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। জাতীয় কল্যাণের জন্য সাময়িক পত্রিকা যে কত কার্য্যকরী তাহা আমরা এই পত্রিকাখানি হইতে দেখিতে পাইতেছি। তিন বৎসর পূর্ব্বে কংসবণিক সমাজ শিক্ষিত মহলে অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়াই মনে হয়, এমন কি ইঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বের ভিতর কে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিলেন তাহারও খবর কেহই রাখিতেন না—আর আজ এই পত্রিকার ভিতর দিয়া তাঁহাদের সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ লইয়া বিরাট কনফারেন্সের, তাঁহাদের বিরাট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পত্রিকাখানিতে নব্যবঙ্গের সমাজ গঠন বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি দেখিয়া আমরা সুখী হইতেছি। আমাদের মনে হয়, জাতীয় পত্রিকার ছাপা কাগজের এত পারিপাট্য না দেখাইয়া স্বজাতির ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহুল প্রচারের চেষ্টা করাই অধিক কল্যাণকর।

স্নেহলতা—শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল লিখিত সামাজিক উপন্যাস। মূল্য পাঁচসিকা। প্রাপ্তিস্থান—ভূদেব পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। একটি সত্যঘটনা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বরপণের বিষময় ফল ও সামাজিক বিধিনিষেধের চাপে বাংলার কন্যাদায়গ্রস্থ নিরীহ পিতা কিরূপ নির্য্যাতিত হয় তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রন্থকার বেশ নিপুণভাবে এই পুস্তকখানির মধ্যে দেখাইয়াছেন। হতভাগ্য পিতার কন্যা স্নেহলতার জীবনের শেষ অংশটুকু বড় করুণ, বড় মর্ম্মবিদারক। হায়, এইরূপ বাংলার কত নিরীহ পিতা, কত নিরীহ কন্যা যে প্রতিদিন সমাজের নৃশংস আচরণে বুকফাটা আর্ত্তনাদ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করে? পুস্তকখানি দেশবাসীর প্রাণে বেশ একটু সাড়া দিবে।

ভারতের বীরাঙ্গনা—লেখক শ্রীবিজয় কুমার ভৌমিক, খুলনা। পদ্মিনী, তারাবাই, কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি ভারতের কয়েকজন বীরনারীর চরিতগাথা মার্জ্জিত ভাষায় গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান নারীজাগরণের যুগে এরূপ পুস্তকের যে খুবই প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সব আদর্শ চরিতাবলীর আলোচনা করা আমাদের দেশের মা-বোনদের বর্ত্তমানে অবশ্য কর্ত্তব্য। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর, মূল্যও বেশী নহে, ৸৹ আনা মাত্র। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

মশার যুদ্ধ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্য ভূষণ প্রণীত। মূল্য চার আনা। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, পোঃ নর্ত্তন, শ্রীহট্ট। প্রাপ্তিস্থান—সন্দেশ কার্য্যালয়, ৭২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গল্প ও রহস্যছলে ম্যালেরিয়া-বাহিনী মশককুলের ধ্বংসের সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মশক ও ম্যালেরিয়ারাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বাঙালী দিনের পর দিন কেমন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে, দক্ষ গ্রন্থকার তাহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বহু মূল্যবান ও কাজের কথায় পূর্ণ। আমরা সকলকেই এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পরীর দৃষ্টি—শ্রীঅখিল নিয়োগী লিখিত একখানি ছেলেমেয়েদের গল্পের বই। প্রকাশক—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, পোঃ নর্ত্তন, শ্রীহট্ট। প্রাপ্তিস্থান—সন্দেশ কার্য্যালয়, ৭২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵৹ আনা। শিশুসাহিত্য রচনায় লেখক যে বেশ নিপুণ, এই পুস্তকখানি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাপা, কাগজ, কভার, ছবি সবই সুন্দর। বাংলার ছেলেমেয়েরা এই পুস্তকখানি হাতে পাইলে খুবই খুসী হইবে।

আসাম প্রসঙ্গ—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী প্রণীত আসামের সামাজিক, পারিবারিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। লেখক সমগ্র আসামদেশ বিশেষভাবে পরিভ্রমণ করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। আসামদেশের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত, সুতরাং অনুসন্ধিৎসুর নিকট মূল্যবান। মূল্য ৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—বি, বি, ঘোষ চৌধুরী, ঘাটেশ্বর—২৪ পরগণা।

মালসাভোগ, ভাঁড়ুরে—লেখক শ্রীনৃপেন্দ্র-কুমার বসু। প্রাপ্তিস্থান—নির্ম্মলা সাহিত্যাশ্রম, ১০২।এ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে সওয়া পাঁচ আনা ও তিন আনা। দুইখানি হাস্যরসপূর্ণ রুচিকর 'গদ্য-পদ্য-রচনার অপূর্ব্ব সমাবেশ। প্রত্যেক পুস্তকেই কয়েকখানি করিয়া কার্টুন ছবি থাকায় আরও মনোরম হইয়াছে। সাহিত্যরস-পিপাসু ব্যক্তিগণ এই পুস্তক দুইখানি পাঠে নিশ্চয়ই খানিকটা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবেন। নৃপেন বাবুর পুস্তকগুলিতে আমরা বহুল গার্হস্থ্য-নীতি-পূর্ণ বিষয় পাইয়া বড়ই প্রীতি লাভ করি।

কুসুমিকা—পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম প্রণীত খণ্ড-কবিতা পুস্তক। খুঁটিনাটি পল্লীর বিষয় অবলম্বনে লিখিত। উজানি, ব্রজবেণু প্রভৃতির কবি যে কুসুমে বাণীপূজা করিয়াছেন এ কবিতা-কুসুম গুলিও সেই জাতীয়। কবি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে বহুকাল বাসের ফলে কাব্য-চর্চ্চার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন—কবিতাগুলি প্রাণস্পর্শী। কবি ইতিপূর্ব্বে গীতিপুষ্পাঞ্জলি লিখিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই কুসুমিকাই ইহার রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত "কবিকুসুম" উপাধি সার্থক করিয়াছে। নড়াইল, (যশোহর) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নিত্যব্রত—শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত নিত্যকরণীয় ব্রত-পুস্তক। প্রকাশক—শ্রীতারাচাঁদ দাস, ৮৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫০ আনা। পুস্তকখানিতে প্রাতঃকৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান, পূজা-অর্চ্চনা, আহার-বিহার, শয়ন-নিদ্রা ইত্যাদি সকল কার্য্যের শৃঙ্খলিত ধারার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বাদের যুগে নিষ্ঠাবান হিন্দুর গৃহে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে।

বাঙ্গালীর খাদ্য

ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, এম-বি।

অধিকাংশ বাঙ্গালীরাই দুই বেলা ভাত, এক কাঁচ্চা মাছের টুকরা ও খানকয়েক তরকারী দেওয়া মশলা মিশ্রিত জল (যাহাকে মাছের ঝোল বলা হয়) এক বাটি, এক বাটি ডাল—যাহাতে পাঁচ সাতটী ডালের দানা বাটির তলায় থাকে, বাকিটুকু হড়হড়ে জল এবং দু'একটা ভাজা খাইয়া থাকে। খাদ্য হিসাবে (চাল) শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ছাড়া ছানা জাতীয় ও তৈল জাতীয় উপাদান উহাতে অতি অল্পই পাওয়া যায়। উপরি উক্ত মাছের ঝোল বা ডালের সাহায্যে ভাত মাখিয়া মুখে দিলেই চিবানর দরকার হয় না, ভাত আপনিই পিছলাইয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়। সেই জন্য ভাত ভালরূপ লালার সহিত মিশিতে পারে না, ইহার জন্য পাকস্থলীতে হজমের অনেক অসুবিধা হয়। Dispepsia (অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য) রোগের প্রধান লক্ষণই আমাদের জলবৎ মাছের ঝোল ও ডাল। ছানা জাতীয় খাদ্যের অভাবে (১) দেহ যথোপযুক্ত বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না, (২) জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়, (৩) রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া যায়। আমরা বাঙ্গালী জাতি যে দুর্ব্বল, পুরুষকারহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিঃস্তেজ, নিরুৎসাহ, আলস্য-পরায়ণ হইয়া পড়িতেছি ও জীবনসংগ্রামে ক্রমশঃই পশ্চাৎপদ হইয়া যাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ আমার মনে হয়, এই ছানা জাতীয় উপাদানের অভাব।

আমার মতে ছানা জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ খুব বেশী বাড়ান এবং তৈল জাতীয় খাদ্য ও Vita-nineএর পরিমাণও কিছু বাড়ান উচিত। শর্করা জাতীয় খাদ্যের Quality উন্নত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আমরা সকলকেই মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, ছানা, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি খাইতে বলি না, কিন্তু আমাদের গরীব জাতির পক্ষে খাদ্যের অল্প মূল্য ও রুচিকর হওয়া যে একটি প্রধান প্রয়োজনীয় তাহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আমরা যাহা খাই বা আমাদের এখনকার খাদ্যের জন্য যে পয়সা খরচ করি, তাহার চেয়ে বেশী ব্যয় করিতে আমরা বলি না—আমরা চাই খাদ্যের quality ও quantityর দিকে প্রধানতঃ নজর

রাখিয়া তাহার ব্যবহারের প্রচলন করা। দেশ-কাল, পাত্র ভেদে যেমন অন্যান্য জিনিষের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতেছে—আহারের ও রাঁধিবার বা খাইবার ব্যবস্থাও সেইরূপ পরিবর্তিত করা উচিত। ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য—আমরা আর যতো মাছ, ব্যঞ্জনাদি খাই, সেইগুলি প্রধানতঃ ভাতকে গলাধঃকরণের জন্য। আমাদের এখনকার রাঁধিবার প্রণালী যে কবে আরম্ভ হইয়াছিল জানি না কিন্তু ইহা যে আমাদের জাতীয় অবনতির জন্য প্রধান দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ আমরা সিদ্ধ চাউল খাইয়া থাকি,—এই সিদ্ধ চাউল প্রস্তুতের জন্য ধানকে সিদ্ধ করিয়া লইয়া শুকাইয়া তাহার তুষ ছাড়ান হয়। ধান সিদ্ধ করার সময় চাউলের পুষ্টিকর অংশ কিছু কিছু বাহির হইয়া যায়। আমরা Pearl বার্লির জল, chicken broth বা vegitable ব্রথ রুচিকর ও বিশেষ পুষ্টিকর বলিয়া রোগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি, ধানেরও সিদ্ধ করা জলে যে পার্লবার্লির জলের ন্যায় কিছু পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, তাহা একটু ভাবিলেই বুঝিবেন। সিদ্ধ হইবার সময় ধানের ভিতরের শস্যের কতক অংশ অর্থাৎ লবণ ও শ্বেতসার জাতীয় দ্রবণীয় অংশ যে কিয়ৎ পরিমাণে বাহির হইয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। ধান সিদ্ধের সময় খোসা যত নরম হয়, ভিতরের সিদ্ধ ভাতও তত ফুলিয়া উঠিয়া খোসাকে ঠেলিতে থাকে ও তাহাতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু মাত্রায় চাউলের পুষ্টিকর দ্রব্যও বাহির হইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা যে সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করি, তাহা হইতে চাউলের কতক পরিমাণ পুষ্টিকর অংশ যে বাহির হইয়া যায়, তাহা নিশ্চিত। চীন, জাপান, বর্ম্মা, মালয় প্রভৃতি বহু স্থানের লোকের প্রধান খাদ্যই হইতেছে ভাত, কিন্তু কোথাও তো সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার নাই। অভাগা বাঙ্গালী ইহার ব্যবহার কোথা হইতে শিখিল জানি না।

ভাতের ফ্যান না বাহির করিয়া খাওয়া উচিত—ইহাও সকলের বুঝা উচিত, কারণ ফ্যান বা মাড়ে চাউলের কতক পুষ্টিকর অংশ বাহির হইয়া যায়। Major ধর্ম্মদাস বসু দেখাইয়াছেন যে, ভাতের মাড়ে ½ এর উপর starch (বা শ্বেতসার) বাহির হইয়া যায়। Parks বলেন যে, অনেকটা (অর্দ্ধেকের বেশী) Gluten ও বাহির হইয়া যায়।—অতএব ফ্যানের সঙ্গে ভাতের ছয় ভাগের এক ভাগ পুষ্টিকর অংশ বাহির হইয়া যায়। আমাদের এই গরীব দেশে শুধু এক বদ অভ্যাসের জন্য আমরা এই ফ্যান ফেলার ব্যবস্থায় যেমন অপব্যয় করিতেছি তেমনি ভাত খাওয়ার ফলে যতটা শরীর পুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতেছি।

গড়ে ছেলেমেয়েদের যদি আধ পোয়া ও পূর্ণ বয়স্কেরা যদি প্রতি বেলায় এক পোয়া হইতে আধ সের চালের ভাত খান, তা হলে বাঙ্গলা দেশে প্রতি লক্ষে প্রতি বেলায় গড়ে ১ পোয়া চালের ভাত খায় ধরা যাইতে পারে, তা হলে ১০০ জন লোক ২ বেলায় ৫০ সের চাউল খান—এই হিসাবে ৮ কোটী লোক ২ বেলায় ১০ লক্ষ মণ চাউলের ভাত খায়, বলা যাইতে পারে। চাউলের মণ আজকাল ৬ টাকার কম আর হয় না—তা হলে ৬০ লক্ষ টাকার চাউল প্রত্যহ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ফ্যানের ভিতরে ⅙ ভাগও যদি নষ্ট হয়, যাহা বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তা হলে শুধু ফ্যান ফেলিয়া আমরা প্রত্যহ ১০ লক্ষ টাকা নষ্ট করিতেছি—দেখিবেন! আমরা যদি ইহা না ফেলিতাম, তা হলে প্রতি বৎসর বাঙ্গালী ৩৬॥ কোটী টাকার বেশী মূল্যের খাদ্য ব্যবহার করিয়া লাভবান হইত,—আমরা চীন, জাপানবাসীদের ন্যায় বলবান হইতাম। অতএব আমাদের উচিত, আতপ চাউলের ভাত ব্যবহার করা ও ফ্যান না গালিয়া ভাত প্রস্তুত করাইয়া শর্করা জাতীয় খাদ্যের quality উন্নত করা।

ছানা জাতীয় উপাদানের মধ্যে মাছ, মাংস ও

ডালই প্রধান। মাছের মূল্য আজকাল বড়ই অধিক। এক সের মাছের সাধারণতঃ মূল্য ।০, সিকা। কাঁটা আঁস প্রভৃতির ওজনও প্রায় অর্দ্ধেক। তাহা হইলে খাদ্য হিসাবে মাছের দাম ২৷৷০ টাকা সের। মাংসের প্রায় ১৲ টাকা সের। তাহা হইলে কেবল মাছ বা মাংস ব্যবহার করিয়া ঐ উপাদান (Protied) সংগ্রহ করিতে হইলে প্রত্যেককে ।০ আনা হইতে ।৵০ মূল্যের জিনিষ ব্যবহার করা ভিন্ন গতি নাই। খুব ধনী ব্যক্তি ছাড়া কেহই উহা করিতে পারেন না। কিন্তু ডালের দাম ৵০ আনা সের। আমাদের খাদ্যে ডালের পরিমাণ খুব অধিক করিলে আমরা সস্তায় ছানা জাতীয় উপাদানের অভাব পূরণ করিতে পারি। প্রত্যহ প্রত্যেকের তিন ছটাক ডাল ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। অনেকের ধারণা যে, ডাল হজম করা বড় কঠিন। ডাল করিয়া বাঁধিলে ডাল সুপাচ্য হয়। ডাল ক্ষীরের ন্যায় 'থকথকে' হওয়া উচিত। ডালের দানাগুলি আলাদা থাকা উচিত নহে। অল্প জ্বালে উত্তমরূপ নাড়িয়া ডাল রাঁধিলে ঐরূপ হইয়া থাকে। এবিষয় আমরা ডাল-রুটিভোজী হিন্দুস্থানীদের নিকট সুশিক্ষা লইতে পারি।

অনেকে বলেন যে, ডালে তৈল জাতীয় উপাদানের অভাব হয় ও প্রত্যহ ডাল ব্যবহারে ডালের প্রতি রুচি থাকে না। ভাল ডাল রাঁধিতে হইলে ঘৃত বা তৈল ব্যবহার করা অপরিহার্য্য, কিন্তু ডাল এত রকমের আছে যে, (অর্থাৎ অরহর, মুগ, মসুর, কলাই, ছোলা, মটর ইত্যাদি) প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন ডাল ভিন্ন ভিন্ন রকমে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে লোভনীয় খাদ্য প্রস্তুত হইবে। তাহা ছাড়া ডালের ধোঁকা, বড়ি, বড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তরকারীতে ব্যবহার করিলে ও ডালপুরি, সরুচাকলী, মুগের লাড়ু, জিলাপী, বঁধে, মতিচুর, রসবড়া প্রভৃতি জলখাবার রূপে ব্যবহার করিলে তিনছটাক ডাল প্রত্যহ ব্যবহার সহজেই করা যায়।

ছোলা বা মুগের ডাল ভিজাইয়া অঙ্কুরিত অবস্থায় প্রাতঃকালে খাইলে শুধু ছানা জাতীয় উপকরণ খাওয়াই হয় না, প্রচুর পরিমাণ ও অতি উৎকৃষ্ট Vitanineও ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য কতকগুলি জিনিষ আমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারি, ইহার মূল্যও বেশী পড়ে না। যথা, কাঁটাল বিচি—ইহাতে শতকরা তের ভাগ ছানা জাতীয় উপাদান থাকে। ইহা অতি সুস্বাদু এবং প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গলা দেশে পাওয়া যায়। চিনা বাদাম—ইহাতে ছানা জাতীয় উপাদান শতকরা ৩০ ভাগ, তৈল জাতীয় উপাদান শতকরা ৪২ ভাগ এবং শর্করা জাতীয় উপাদান ১৮ ভাগ থাকে। ঝুনা নারিকেলে তৈল জাতীয় উপাদান শতকরা ৫৩ ভাগ, ছানা জাতীয় ৫ ভাগ ও শর্করা জাতীয় ৬৷৷০ ভাগ থাকে। বাদাম ও নারিকেল এই দুইটী জিনিষই আমরা জলখাবাররূপে বা জলখাবারের সহিত ব্যবহার করিতে পারি এবং ইহাদের মূল্যও সুলভ। আমাদের খাদ্যের ভিতর Vitanineএর অভাব দূর করিবার জন্য ফল ও অঙ্কুরিত ছোলাভিজা ব্যবহার করা অতি আবশ্যক।

আহার তিন চার বারে করা উচিত। এক সময় বেশী আহার করিলে পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। আমাশয় (stomach) বড় হইয়া পড়ে ও তাহার পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে। প্রাতে অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগের ডাল ভিজা, আদা ইত্যাদি ব্যবহার করিলে উপকার হয়। আফিস বা বিদ্যালয় যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইবার আগে কিছু পরটা, ডালপুরি খাওয়া ঠিক করিলে অনেক উপকার হইবে। আহার লঘু হওয়ার দরুণ কার্য্যের সময় ঘুম পায় না ও কতক পরিমাণ ভাত অপেক্ষা ডাল খাবার খাওয়া হয়। দ্বিপ্রহরে টিফিনের সময় ঐরূপ পরটা, ডালপুরি, ডালের খাবার বাটী হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। তাহাতে অবসাদ

কমিয়া যাইবে ও কার্য্যকরী-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পরিবর্ত্তে পাঁউরুটি, মাখন, ডিম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই টিফিনের সময় কলা বা অন্যান্য সময়ের ফল ব্যবহার করা বিধেয়। রাত্রে শয়নের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা আগে ভাত, ডাল, তরকারী খাওয়া যাইতে পারে। এ সময় তাড়াতাড়ি হয়না ও তৃপ্তিপূর্ব্বক বেশী পরিমাণ আহার করা চলিতে পারে; কারণ রাত্রে পরিশ্রম করিবার কোন আবশ্যক থাকে না।

যাহাদের মানসিক পরিশ্রম অধিক অথচ শারীরিক পরিশ্রম সামান্য তাহাদিগকে শর্করা ও মাখন জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া মাছ, মাংস, ছানা দুধ, ডিম, ডাল ইত্যাদি ছানা জাতীয় খাদ্য অধিক ব্যবহার করা প্রয়োজন। —স্বাস্থ্য।

নানা কথা

রাজমাতার স্বর্গারোহণ—

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জননী রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ৮০ বৎসর বয়সে বিগত ২০এ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি দেনমার্ক-রাজকন্যা ছিলেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে দেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আলেকজান্দ্রা সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার জননীর উৎসাহে তিনি শৈশব হইতেই আপনাকে জীব-কল্যাণের ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দীন দুঃখীর সেবা করিয়া তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত তিনি নানাভাবে রাজোচিত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছিলেন। আমরা এই সর্ব্বগুণান্বিতা রাজ্ঞীর পরলোকগমনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের শান্তিবিধান করুন।

মানভূম আর্য্যআশ্রমের রচনা প্রতিযোগিতা—

গতবর্ষের বাঙ্গালা রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কুমারী অমলপ্রভা বসু একটী রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বর্দ্ধমান রাজ ম্যানেজার, দার্শনিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা।

১৩৩২ সালের রচনা প্রতিযোগিতায় "বর্ত্তমান ভারতে বঙ্গ নারীর স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথম স্থান অধিকারিণীকে একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক। শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী বাণীবিনোদ। সম্পাদক "আর্য্য আশ্রম", রামচন্দ্রপুর, পোঃ মুরাডি, মানভূম।

বিশেষ মহিলা-বৃত্তি—

বি-এ ও বি-এস্-সি শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে পাঁচটি বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ছাড়া মহীশূর কিংবা বাঙ্গলোরের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী দিগকেও চারটি বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। মহীশূর-সরকার এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

সারদেশ্বরী আশ্রমের নিবেদন—

বর্ত্তমান মাতৃজাতির জাগরণের সাড়া সর্ব্বত্রই পড়িয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরস্পর কার্য্য করিলে বিনা আয়াসে এবং বিনা ব্যয়েও অনেক উন্নতিকর কাজ ঘরে বসিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত মহিলাই করিতে পারেন। এই নিমিত্ত কতকগুলি কার্য্যের নিয়মাবলী ও বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত কাগজ পত্র শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রত্যেক হিন্দু মহিলার নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া আশ্রম সম্পাদিকা প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু মহিলার নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন অসঙ্কোচে নিজ নিজ নামধাম নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইয়া বাধিত করেন। সম্পাদিকা—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী বি, এ ব্যাকরণতীর্থা, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬, রাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

মা—

পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বভাষায় এবং সর্ব্বজাতির ভিতরেই "মা" কথাটি "ম" অক্ষর দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ১৩৩০ শ্রাবণ

"প্রবাসীর" ৫২৬ পৃঃ হইতে নিম্নলিখিত তালিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল—

বাংলা—মা
সংস্কৃত—মাতা
ভারতবর্ষ এবং এসিয়ার কতক অংশে মা, মাতারি, মাতা।
পারস্ত—মাদর
গ্রীক—মেটার
লাটিন—মাতের
ইটালীয়—মাদ্রে
স্পেন—মাদ্রে
ফরাসী—মেয়ার
ইংরাজী—মাদার
হলাণ্ড—মোরেড
আইসল্যাণ্ড—মোথে
ওয়েলস্—ম্যাম
আইরিস্—মাথেয়ার
বুলগেরিয়া—মাটি
পোলাণ্ড—মাট্‌কা
লিথুয়ানিয়া—মোটি
সুইজারল্যাণ্ড—মোডর
জার্মানি—মুটের্

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন—

অধ্যাপক বেরণ কিউভাব প্রচার করিয়াছেন, মানব শরীরের গঠন প্রণালী যেরূপ, তাহাতে ফলমূলাহারের উপযোগিতাই মানবমাত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তার জোসিয়া লর্ড ফিল্ড জীবনব্যাপী অধ্যয়নের পর বলিয়াছেন, মানুষের মাংসাশী জীব নহে, ফলমূলভোজী জীব। শতকরা ৯৯ জন পীড়িত একমাত্র মাংস ভক্ষণের জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকে। বৃক্কট রোগ, ক্ষয় রোগ, দূষিত জ্বর, দদ্রু, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষাশীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডাক্তার হেগ বলিয়াছেন, অর্দ্ধ সের গোমাংসে ১৪ গ্রেণ ও অর্দ্ধসের যকৃতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। এই ইউরিক এসিড হইতেই বায়ুরোগ, বাতব্যাধি, হাপানি, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র প্রভৃতি হয়। অধ্যাপক রবার্ট পার্স বলিয়াছেন, মাংসে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, যাহা ধীরে ধীরে শরীরে সঞ্চিত হইয়া উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

দুগ্ধ রক্ষার নিয়ম—

আমাদের দেশে যে অবস্থায় দুগ্ধ সাধারণতঃ রাখা হয় তাহা স্বাস্থ্য-সম্মত নহে। দুগ্ধ উন্মুক্ত অবস্থায় থাকিলে উহাতে অতি সহজে জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে, এবং সেই দুগ্ধ অপেয় হইয়া যায়। সেই জন্য সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। দুগ্ধ শীতল স্থানে, পরিস্কৃত পাত্রে ঢাকিয়া রাখা উচিত। বায়ু সংস্পর্শে দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হইতে থাকে। ইহা উন্মুক্ত থাকিলে মাছি ইত্যাদি বসিয়া নানাপ্রকার রোগের জীবাণু দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে পারে। বাসি দুগ্ধের সহিত টাটকা দুগ্ধ মিশান উচিত নহে। দুগ্ধ যেখানে রাখা হয় তাহার নিকটে কোন দুর্গন্ধময় পদার্থ থাকিলে দুগ্ধেও সেই গন্ধ হয়, কারণ অতি সহজেই দুগ্ধ গন্ধ আকর্ষণ করে। সেই জন্য দুগ্ধের নিকটে পিঁয়াজ বা মৎস্য রাখা উচিত নহে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণের পথ—

ডাঃ চুণীলাল বসু বলেন, থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতি যে সকল স্থানে লোকের ভিড় হয়, তথায় গমন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইবার খুব সম্ভাবনা। অন্ততঃ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় জনতাপূর্ণ স্থানে যাওয়া একেবারেই উচিত নয়। আমরা এ কথা সকলকে স্মরণ করিয়া রাখিতে বলি।

সাতটি পাপ—

জনৈক ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীর ইয়ংইণ্ডিয়া পত্রিকায় সামাজিক পাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই-

সিদ্ধান্তরহিত	রাজনীতি
কার্য্যরহিত	সম্পত্তি
বিবেকরহিত	আনন্দ
চরিত্র রহিত	জ্ঞান
সদাচার রহিত	ব্যবসায়
মনুষ্যত্বরহিত	বিজ্ঞান
ত্যাগরহিত	পূজা

আশা করি সকলেই এই সাতটি অমূল্য বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

এস ত্রিভুবন-বন্দিত মা,
শ্বেত কমল পরে চরণ সরোজ রাখি
এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দাতা।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৩য় বর্ষ | মাঘ—১৩৩২ | ১০ম সংখ্যা

নারী

কাজি নজরুল ইসলাম।

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাহি।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির কল্যাণ-কর
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী।
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু গন্ধ সুনির্ম্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে—নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটী মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।
স্বর্ণ রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সীঁথির সিন্দুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

পুরুষ হৃদয়-হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরেনাক অমর মহামানব
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা,
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা!
নারী সে শিখা'ল শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরা'ল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরম পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ।
যে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে প্রবল পুরুষে করিল, নারীরে অবলা দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!
শোনো, মর্ত্ত্যের জীব!
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনী, বল কোন্ সে অত্যাচারী?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথায় ঘোম্‌টা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে-ঘোম্‌টা তোমা করিয়াছে ভীরু উড়াও সে আবরণ!
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ।

[লাঙল]

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, এফ্-আর-এইচ্-এস্, এম্-আর-এস্-এ।

জাতক বা বুদ্ধদেবের পুনর্জন্ম সংক্রান্ত আখ্যান ও তৎসংক্রান্ত উপদেশাবলী পাঠ করিলে কোন কোন সময় কাহারও মনে হইতে পারে যে, উহাতে স্ত্রীলোকের কেবল নিন্দাই করা হইয়াছে—উহাতে স্ত্রীধর্ম্মের প্রশংসাসূচক কিছুই নাই; কিন্তু, ঐ সকল উপাখ্যানসমূহে যে বৌদ্ধযুগের নারীদিগের ভূয়সী প্রশংসাও করা হইয়াছে, সে প্রমাণেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধের পূর্ব্বতম কোন জন্মে তাঁহার মাতৃদেবীসংক্রান্ত যে চিত্র প্রকটিত করা হইয়াছে, তাহাতে ঘৃণার উদ্রেকই হয় বটে, কিন্তু অন্যত্র স্ত্রীচরিত্রের যে উজ্জ্বল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে সহজে এ সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে যে, বাস্তবিক পক্ষে বৌদ্ধযুগে স্ত্রীধর্ম্মের অভাব ছিলনা এবং নারীর প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্যেরও অভাব দৃষ্ট হইত না।

অন্যান্য যুগের ন্যায়, বৌদ্ধযুগেও নারীজীবন তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কন্যা, স্ত্রী ও জননী। বৌদ্ধশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই তিনের প্রতিই যে যথাযথ স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করা হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে কন্যার প্রতি নিম্নোক্ত কর্ত্তব্য প্রদর্শন সমীচীন ছিল—

(১) অন্যায় হইতে কন্যাকে রক্ষা করা।
(২) কন্যাকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা করা।
(৩) শিল্প ও বিজ্ঞানে কন্যাকে শিক্ষিত করা।
(৪) কন্যাকে উপযুক্ত স্বামীর হস্তে ন্যস্ত করা।
(৫) কন্যাকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা।

তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, স্ত্রীর প্রতি অভদ্র বাণী প্রয়োগে বিরত থাকা, স্বকীয়

অর্থাদি পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করা, স্ত্রীর পদানুযায়ী অলঙ্কার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা এবং তাঁহাতে অনুরক্ত থাকা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

জননীকে রক্ষা করা, তাঁহার সম্মানোপযোগী কর্ত্তব্য প্রতিপালন, সংসারে তাঁহাকে তাঁহার পদানুযায়ী স্থান দেওয়া এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বৌদ্ধযুগে করণীয় কর্ম্ম ছিল।

উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বৌদ্ধযুগে স্ত্রীলোককে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কন্যা, স্ত্রী, মাতার কথা দূরে থাকুক, দাসীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইত, তাহা পর্য্যালোচনা দ্বারাও উপরুক্ত সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। দাসীর শক্তি অনুযায়ী তাহাকে কর্ম্ম প্রদান করা (অর্থাৎ তাহার শক্তি যেরূপ সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া), নিয়মিত ভাবে আহার্য্য ও বেতন প্রদান, ব্যাধির সময় যথোপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা, উত্তম খাদ্যের অংশ প্রদান ও উপহার প্রদান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং ইহা হইতে আমাদের অনুকূল সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়।

যদিও পূর্ব্বজন্মের এক ঘটনা উল্লেখ ও আলোচনা দ্বারা বুদ্ধ তাঁহার সেই পূর্ব্বজন্মের গর্ভধারিণীর চিত্রাঙ্কন দ্বারা আমাদের মনে ক্ষোভের উদ্রেক করিয়াছেন, তথাপি এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয় না যদ্দারা আমরা তাঁহার মাতৃভক্তির প্রমাণ পাই। সঙ্ঘের অন্যতম ভ্রাতা নিজ মাতার সেবা করিতেছেন জানিয়া বুদ্ধ অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছেন, জাতক পাঠে ইহা আমরা জানিতে পারি। বুদ্ধদেবের নিজ আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই মনে হইবে। যদি তিনি রমণীদিগকে পুরুষের সমান বলিয়া পরিগণিত না করিতেন, তবে তিনি কদাচ তাঁহাদিগকে নিজ ধর্ম্মে এবং স্বয়ং দীক্ষিত করিতেন না। বস্তুতঃ পক্ষে বৌদ্ধযুগে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীলোকের বিন্দুমাত্রও অভাব দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধের মাতা (প্রকৃতপক্ষে বিমাতা) মহাপ্রজাপতি গৌতমী, সহধর্ম্মিণী যশোধরা, অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা, কুন্দলকেশী, বিশাখা, অশোকপত্নী অগণিষমিত্রা প্রভৃতির নাম সহজেই স্মৃতিপথে উদিত হয়। স্বধর্ম্মক্ষেত্রে ইহারা কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

বৌদ্ধযুগে, শাস্ত্র, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সুকুমার কলায় অভিজ্ঞ নারীর অভাব দৃষ্ট হয় না। রাজসভায় উপনীতা হইয়া রাজমাতারূপে রমণী উপদেশ দিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না, সুভদ্রারূপে স্বামীর রথের বল্গা ধারণেও ভীতা হইতেন না, সুখস্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চারণেও দ্বিধা বোধ করিতেন না! এরূপ প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, যাহাতে বৌদ্ধ যুগের স্ত্রীগণকে নিন্দা করা সমীচীন হয় না।

বস্তুতঃ পক্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে স্ত্রীলোকপ্রদত্ত অর্থেই ইহার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত বিশাখাদেবীর আখ্যান পর্য্যালোচনা করিলে উপরুক্ত মন্তব্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। শ্রাবস্তীর বিশাখাদেবীই, বুদ্ধ তথায় উপনীত হইলে সর্ব্বপ্রথমে সশিষ্য বুদ্ধের সেবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণে কোনরূপ অভাব না হয় তজ্জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেন। "হে প্রভো! আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন সঙ্ঘের ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রদান করিব; যে সকল বৈদেশিক যতি এই স্থানে শুভাগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করিব; পীড়িত শ্রমণদিগকে পথ্যদান করিব; ঔষধ দিব; দৈনিক সকলকে অন্ন পরিবেষণ করিব; সন্ন্যাসিনীদিগকে স্নানের বস্ত্র প্রদান করিব" সঙ্ঘপ্রতিপালিকা বিশাখার এই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সকল পূতচরিত্রা স্ত্রীলোকের জন্যই যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না!

মহাবংশে রাজা অগ্রবোধির মাতৃসেবার যে চিত্র

চিত্রিত হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রাজা অগ্রবোধি দিবারাত্র তাঁহার মাতৃদেবীর সেবা করিতেন। প্রত্যহ মাতার কেশে তৈল প্রদান ও তাঁহার অঙ্গ পরিষ্কার করিতেন। মাতার পরিত্যক্ত বস্ত্র নিজ হস্তে প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রধৌতকরণের জল নিজ মস্তকে প্রক্ষেপ করিয়া ধন্য বোধ করিতেন। পূজারী যেরূপ মন্দিরমধ্যস্থ দেবতাকে পুষ্প ও সুগন্ধি প্রদান করেন, নরপতি অগ্রবোধিও তদ্রূপ প্রত্যহ তিনবার মাতার চরণে পুষ্প ও সুগন্ধি দান করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেন। মাতার পরিচারিকাগণ যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ বোধ না করে, তজ্জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট থাকিতেন। স্বহস্তে মাতাকে আহার্য্য প্রদানে সন্তুষ্ট করিতেন এবং মাতার আহারান্তে মাতৃপরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। উচ্ছিষ্টের কিয়দংশ নিজ মস্তকে ধারণ করিতেন। স্বহস্তে মাতার শয়নকক্ষ পরিস্কৃত করিয়া শয্যাবস্ত্র বিন্যস্ত করিতেন। মাতার যতক্ষণ নিদ্রা না আসিত ততক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিতেন।

উপরুক্ত ঘটনা বৌদ্ধযুগে না ঘটিলেও বৌদ্ধযুগের আদর্শানুযায়ী যে সিংহলাধিপতি অগ্রবোধি মাতৃসেবা করিতেন তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বৌদ্ধযুগে শ্রীধর্ম্মের প্রশংসাসূচক প্রমাণের অভাব হয় না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রাত-জাগা

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

সাঁঝে উড়ে এল প্রজাপতি,
কালো দুটি পাখা আল্‌পনা আঁকা
মীনাকরা নীল'পরে হীরা রতি রতি!
নিশীথের নীলিমার ছোট সে মুরতি!

শিয়রেতে, দেয়ালের গায়ে
ডানা দুটি মেলে, কালো ছায়া ফেলে
আলোর আরতি তার রাখিল জাগায়ে
আকাশ যেমন জাগে ডানাটি বিছায়ে!

চারিদিক নিদ্রায় নিঝুম
একেলা এ ঘরে, শয়নের পরে
বিরহীর চোখে শুধু আছিল না ঘুম,
নিশীথে কাননে জাগে যেমন কুসুম!

শিয়রে ছিলনা দীপাবলি,
মালতীর মালা, সুধাগন্ধ ঢালা
আঁধার আঁধার ঘর, আঁধার কেবলি!
কেন এল কি স্বপনে আপনারে ছলি?

কুসুমের বাসরের সাথী,
আঁধার শিয়রে প্রহরে প্রহরে
জাগার দোসর মোর হ'ল এক রাতি,
নিশার গোপন কথা মনে গেল গাঁথি!

এইমত শুদ্ধ নীলাম্বরে
জাগে গ্রহতারা, জাগে নিদ্রাহারা
সুরভি কুসুমপুঞ্জ বনে বনান্তরে—
মিলন স্বপনে জাগে বিরহ বাসরে!

কৃষ্ণকুমারী।

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া।

রাণা ভীমসিংহ মেবার-সিংহাসনে সমাসীন। মেবারের আর সেই পূর্ব্ব গৌরব নাই; বাপ্পা, হামির, সংগ্রাম, প্রতাপের অতি যত্নে গড়া স্বাধীনতার লীলানিকেতন নন্দনতুল্য মেবার আজ শ্মশানের কঙ্কাল-মালা গলায় ধরিয়া নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় দণ্ডায়মান। মেবারের সেই শৌর্য্যবীর্য্য নির্ব্বাপিত, মূর্ত্তিমান বীরত্বের বংশধরগণ আজ নিতান্ত কাপুরুষ। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় দস্যু ও নিষ্ঠুর পাঠানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে মেবার আজ মরুভূমি মেবারে আজ এমন কেহ নাই যে, এই দস্যুদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মাতৃভূমিকে আসন্ন বিপদের গ্রাস হইতে মুক্ত করে। তদুপরি আবার গৃহবিচ্ছেদ, যে গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই গৃহ-বিবাদে মেবারের অবশিষ্ট শান্তিটুকু তিরোহিত হইয়াছে। কাপুরুষ ভীমসিংহ এই অরাজকতাপূর্ণ শ্মশানরাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিয়া প্রতাপের চরণধূলিপূত উদয়পুর-সিংহাসনের কলঙ্ক স্বরূপ উপবিষ্ট।

কৃষ্ণকুমারী রাণা ভীমসিংহের কন্যা। ভীমসিংহ শত্রুর আক্রমণে ও গৃহবিবাদে জীবনের সমস্ত শান্তি হারা হইয়াও কৃষ্ণার স্নেহভালবাসায় একটু সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন। নয়ননানন্দদায়িনী নন্দিনীর স্নেহসিক্ত রসধারায় পিতা তাঁহার বিষতিক্ত জীবনটা কথঞ্চিৎ মধুময় করিয়া সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত অশান্তি সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন।

কৃষ্ণা ষোড়শী। অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার যৌবন-সুষমা উষার অরুণ রাগের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; প্রতি চরণবিক্ষেপে, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে, প্রতি অধরকম্পনে, প্রতি দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণার উচ্ছ্বসিত লাবণ্যধারা মেবার-রাজঅন্তঃপুরকে স্বর্গের শোভায় বিলসিত করিয়া তুলিয়াছে। কৃষ্ণা রূপসী। রূপসীর যাহা সম্পদ কৃষ্ণাতে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। তৎকালে সমস্ত রাজস্থানে কৃষ্ণার তুল্য রূপবতী রমণী একটীও ছিল না। কৃষ্ণার রূপের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কৃষ্ণা 'রাজস্থানের স্থল-কমলিনী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মেবার-রাজউদ্যানের এই দিব্য কুসুমের সৌন্দর্য্য-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে প্রবাদের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রূপ-পদ্মমললোভী মধুকরদল এই কুসুম লাভের উন্মাদনায় মত্ত হইয়া উঠিল। নারীর রূপ যে জগতের ইতিহাসে কত শোচনীয় নৃশংস কাহিনী রাখিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। নারীর রূপের অনলে কতশত রাজ্য যে শ্মশান হইয়া গিয়াছে তাহার সাক্ষী ইতিহাস। কৃষ্ণার এই অলোকসামান্য রূপও সমগ্র মেবার রাজ্যের ও তাঁহার স্বীয় জীবনের অভিসম্পাত স্বরূপ হইল।

রাণা ভীমসিংহ জয়পুররাজ জগৎসিংহের সহিত তনয়া কৃষ্ণার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। এমন সৎকুলসম্ভূতা ললনা-ললাম স্ত্রী-রত্ন লাভ কাহার না অভিপ্রেত? যাহার করলাভে সমগ্র রাজস্থানের রাজন্যবর্গ উদ্‌গ্রীব, জগতসিংহের উপর সেই করুণা অযাচিত ভাবে বর্ষিত হইতে দেখিয়া তিনি সানন্দে এই বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। রাজপুত সমাজের প্রথানুযায়ী জয়পুর-রাজ তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যহারে বিপুল উপহার-দ্রব্য উদয়পুরে রাণা ভীমসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাণা সাদরে উপহার গ্রহণান্তর প্রত্যুপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু এই শুভ উৎসব সূচনার প্রারম্ভেই এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। মারবার-রাজ মানসিংহ যখন শুনিতে পাইলেন যে, রাজস্থানের স্থলকমলিনী

কৃষ্ণা জয়পুররাজ জগৎসিংহের অংকলক্ষ্মী হইতে চলিয়াছেন, তখন তাঁহার অন্তরে হিংসার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সগর্ব্বে রাণা ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমিই একমাত্র কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, আমাকে উপেক্ষা করিয়া রাণা যদি তাঁহার দুহিতাকে জগৎসিংহের করে অর্পণ করেন, তবে আমি এই অবমাননার দারুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বিরত হইব না।" কিন্তু রাণা এই পত্র পাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, জগৎসিংহের করেই তিনি আদরিণী দুহিতারত্ন সম্প্রদান করিবেন,—ইহাই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

এদিকে মহারাষ্ট্র-দস্যু-নেতা সিন্ধিয়া ইতিপূর্ব্বে জয়পুর-রাজ জগৎসিংহের নিকট কিছু অর্থের দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু জগৎসিংহ তৎপ্রদানে অস্বীকৃত হন। সিন্ধিয়া এইবার সেই প্রত্যাখ্যানরূপ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইলেন। তিনি মারবার-রাজ মানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া রাণা ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনি জয়পুররাজের সৈন্যগণকে উদয়পুর হইতে বিদায় দিয়া মারবার-রাজের করে কৃষ্ণকুমারীকে অর্পণ করুন, যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হন তবে আমি সসৈন্যে আপনার রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া দিব।" রাণা এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র পাইয়াও বিচলিত হইলেন না বা জয়পুর-রাজের সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন না। সিন্ধিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার ভীতিপ্রদর্শনে কোনই সুফল ফলিল না, তখন তিনি স্বীয় গোলন্দাজ সৈন্য উদয়পুরাভিমুখে পরিচালন করিলেন। রাণাও জগৎসিংহের সৈন্যদল লইয়া সিন্ধিয়ার গতিরোধ করিবার জন্য আরাবল্লী গিরি-মালার প্রবেশদ্বারে শিবির সংস্থাপন করিলেন। উভয় দলে যুদ্ধ হইল, কিন্তু সিন্ধিয়ার দুর্দ্ধর্ষ বাহিনীর নিকট ভীমসিংহ পরাস্ত হইলেন। ইহাতেও সিন্ধিয়ার জিঘাংসাবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলনা, তিনি ভীমসিংহের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অষ্টসহস্র সৈন্য লইয়া উদয়পুরের অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

দ্বারে শত্রু-সৈন্যের বিজয়-নিনাদ, রাণা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জগৎসিংহের সৈন্যগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

জগৎসিংহ এতদিন যে আশার কুহক-স্বপ্নে মগ্ন ছিলেন, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। রাজস্থানের স্বর্ণ পারিজাত তাঁহার কণ্ঠভূষণ হইবে,—কৃষ্ণার অনুপমেয় লাবণ্যরাশি অহোরাত্র তাঁহার হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিবে,—সমগ্র রাজন্যবর্গের আকাঙ্ক্ষিতা সংসার-ললাম কৃষ্ণা তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে,—রাজস্থানের স্থলকমলিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া তিনি জীবন ধন্য করিবেন—কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশার, ইন্দ্রধনু তাহার হৃদয়-গগন উদ্ভাসিত করিতেছিল। কিন্তু আজ হতভাগ্যের হৃদয় নৈরাশ্যের দারুণ ঝঞ্ঝাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই মর্ম্মাঘাতের দারুণ প্রতিঘাত প্রদানের জন্য তাঁহার হৃদয়ের প্রতিহিংসা বৃত্তি সহস্র শির উত্তোলন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। তিনি মেবারের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী সংগঠন করিয়া তৎরাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। মানসিংহ জগৎসিংহের সমরায়োজন অবগত হইয়া রাণাকে সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ হইল; হতভাগ্য জগৎসিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণালাভের আকাঙ্ক্ষা তিনি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না, মানসী প্রতিমা লাভের আশায় তিনি নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কৃষ্ণার প্রণয়-প্রার্থিযুগলের মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে সমগ্র রাজস্থানে একটা বিভীষিকা ও অশান্তির সৃষ্টি হইল। একটা রমণীর জন্য এত নরহত্যা,—এত শোণিতপাত,—এত অশান্তি,—এত অরাজকতা! বৃদ্ধ রাণা এই অশান্তি প্রশমনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীর খাঁ নামক একজন

দস্যু রাণা ভীমসিংহের সভায় স্থান পাইয়াছিল। অজিতসিংহ নামক একজন রাণার প্রিয়পাত্র রাজপুত ও আমীর খাঁর সহিত ভীমসিংহ এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দান্ত পাঠান কহিল, "হয় রাজকুমারীকে মানসিংহের করে অর্পণ করুন, নতুবা তাহার জীবননাট্যের যবনিকা এইখানে পাত করিয়া রাজ্যের শান্তি বিধান করিতে সচেষ্ট হউন।" কতকগুলি ভীরু পশুপ্রকৃতি রাজপুত এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল। কাপুরুষ রাণা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা অবধারণ করিতে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একদিকে রাজ্য ও রাজসিংহাসন,—অপর দিকে অপত্যস্নেহ ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দুহিতার জীবন। একদিক্ রক্ষা করিতে হইলে অপর দিক হারাইতে হয়। যদি মানসিংহের করে রাজকুমারীকে অর্পণ করেন তবে জগৎসিংহের ক্রোধানল হইতে উদয়পুর রক্ষা সম্ভব হইবে না; আবার যদি মানসিংহকে উপেক্ষা করিয়া জগৎসিংহের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয় তবে মহারাষ্ট্র, পাঠান ও মানসিংহের সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জের ক্রোধানলে মেবার ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। রাণার এমন শক্তি নাই যে, তিনি সে গতি প্রতি-রোধ করিতে পারেন। একবার হৃদয়ানন্দদায়িনী নন্দিনীর প্রফুল্ল মুখখানি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া স্নেহের পীড়নে তাহা ব্যথিত ও মথিত করিতে লাগিল,—আবার মনে পড়িল আমীর খাঁর কঠোর বাক্য,—'মেবার ছারেখারে যাইবে।' অবশেষ রাজপুত-কুল-কলঙ্ক কাপুরুষ রাণা রাজ্য রক্ষার্থে প্রাণপ্রিয়া দুহিতার জীবনাহুতি প্রদানেই সম্মতি দান করিলেন। হায় রাজসম্পদ, কত লোভনীয় তুমি! আজ তোমার মোহপাশ কর্ত্তন করিতে না পারিয়া জন্মদাতা পিতা তাহার বড় আদরের, বড় স্নেহের কন্যা-রত্ন তোমারই রক্ষার্থ বলি স্বরূপ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল! যে ভীমসিংহ কৃষ্ণকুমারীর মুখকমল একটু ম্লান দেখিলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন, তিনিই সিংহাসন রক্ষার জন্য তনয়ার কুসুম-কোমল বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিবার সম্মতি দান করিলেন!

হতভাগিনী কৃষ্ণা রূপের অফুরন্ত ভাণ্ডার লইয়া সংসারে আসিয়াছিলেন, তাঁহার রূপে সমগ্র রাজ-পুতানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বীয় রূপের অনলে আজ তাঁহাকে পুড়িয়া মরিতে হইবে। ঐ রূপই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। রাজস্থানে এমন কেহ নাই যে তাঁহার জীবন রক্ষা করে। হতভাগিনীকে মরিতেই হইবে। রাজস্থানের ফুল্ল-সরোজিনীকে তাহার জীবন-ঊষার প্রথম অরুণ পাতেই ঝরিয়া পড়িতে হইবে। কিরূপে কৃষ্ণার জীবন-বীণার স্বর্ণতার ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, কে এমন পাষণ্ড আছে যে, এই দেবীপ্রতিমার কুসুম-হৃদয়ে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া দিয়া সেই উচ্ছ্বসিত শোণিতধারা দর্শন করিবে?—এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত রাজ-অন্তঃপুরে এক মন্ত্রণা-সভা আহুত হইল। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে, অগ্রে পুরুষের হস্তে কৃষ্ণার বিনাশের ভার অর্পিত হইবে, পুরুষ কর্ত্তৃক তাহা অসাধ্য হইলে তজ্জন্য নারী নিযুক্ত হইবে। দৌলতসিংহ নামক একজন শিশোদীয় কুলোদ্ভব সামন্ত রাজপুতের উপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক কার্য্য সাধনের ভার ন্যস্ত হইল, —উদয়পুরের রাজসম্মান রক্ষার জন্য তাঁহাকেই কুসুমকোমল নিরপরাধা কৃষ্ণকুমারীর হৃদয়-শোণিত পাত করিতে হইবে। কিন্তু এই নারকীয় প্রস্তাব শ্রবণমাত্র দৌলতসিংহ ব্যথিত ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শত ধিক্ তোমাদের রাজপুত নামে, শত ধিক্ তোমাদের আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষায়! বীরেন্দ্রকেশরী বাপ্পারাওএর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কুলমর্য্যাদা ও সিংহাসন রক্ষার জন্য সরলা নিরপরাধা বালিকার হৃদয়-শোণিত পাত করিতে হইবে, আর সেই পৈশাচিক হত্যার ভার অর্পিত আমার উপর! দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়া দানববৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যদি রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে হয় তবে চাইনা সে রাজভক্তি!"

দৌলতসিংহ সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বেশ্যাগর্ব্ভোৎপন্ন যোয়ান দাস নামক এক নীচ রাজপুতের হস্তে কৃষ্ণার বিনাশের ভার অর্পিত হইল। পাপিষ্ঠ সহাস্য-বদনে ছুরিকা তুলিয়া লইল, তাহার হৃদয় হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না।

রাজকুমারী স্বীয় জীবনাহুতি প্রদানের নিমিত্ত ধীর পাদবিক্ষেপে আসিয়া ঘাতুকের উদ্যত খড়্গের নীচে দণ্ডায়মান হইলেন। এই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে সুখের সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে,—তাঁহার অপূর্ণবিকশিত জীবনের সমস্ত সাধ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এই মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে,—ইহা অবগত হইয়াও কৃষ্ণার প্রফুল্ল অধর-পল্লব ভয়ে ঈষৎ কম্পিত হইল না, ললাটে বিন্দুমাত্র বিষাদের রেখা পরিদৃষ্ট হইল না। বর্ষার নব বারিধারাসিক্ত প্রফুল্ল পঙ্কজিনীর মত সস্মিত অধরে কৃষ্ণা আসিয়া স্বীয় জীবনাহুতির নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা মহীয়সী দেবীপ্রতিমা দর্শন করিয়া নিষ্ঠুর যোয়ানদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল। এত রূপ, এত লাবণ্য, এমন সরলতা, এমন কমনীয়তা, একি মানুষে সম্ভব? এই অপার্থিব নারীরত্ন কি ঘাতুকের অস্ত্রাঘাতে ব্যর্থ হইবার সামগ্রী? পাষাণ যোয়ানদাসের কঠিন হৃদয়ে ধীরে ধীরে দয়ার রসধারা সিঞ্চিত হইতে লাগিল, আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। করধৃত শাণিত কৃপাণ হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল; সে আর সে স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, আত্মগ্লানির তীব্র দাহে দহিতে দহিতে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই পৈশাচিক দুরভিসন্ধি সাধনের সংবাদ ক্রমে অন্তঃপুর মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। রাজ্ঞী যখন শুনিলেন, তাঁহার বড় আদরিণী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তনয়া কৃষ্ণা আজ জনকের আদেশে জীবনাহুতি দিতে বসিয়াছে, তখন যেন তাঁহার শিরে সহস্র অশনি সম্পাত হইল, তিনি কেবলমাত্র "হা ভগবন্, কি হইল!" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দাসীবৃন্দের শুশ্রূষায় তিনি কথঞ্চিৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া যাইয়া কৃষ্ণাকে তাঁহার স্নেহসিক্ত নিবিড় বক্ষ-নীড়ে ধরিয়া রাখিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে বিফল প্রয়াস পাইলেন। অভাগিনী জননী তনয়ার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত একবার স্বামীর পদপ্রান্তে, আবার সমাগত সর্দ্দার ও সামন্তবর্গের চরণতলে নিপতিত হইয়া কাতর ভাবে আর্ত্তনাদে করিতে লাগিলেন। কখনও বা তাঁহাদিগকে তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী রাজ্ঞীর আজ লজ্জা, সরম, সঙ্কোচ কিছুই নাই, অপত্যস্নেহের আবরণে সমস্তই আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হায়, কেহই তাঁহার করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিল না। রাণার হৃদয় বিন্দুমাত্রও দ্রবীভূত হইলনা বরং তাহা ক্রমশঃ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইতে লাগিল। রাজ্ঞী যখন দেখিলেন, তনয়ার জীবন রক্ষার কোনও আশা নাই, তখন তিনি নৈরাশ্যের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরস্থ নারীবৃন্দের চোখে জলধারা বহিল। কিন্তু কৃষ্ণাকে মরিতেই হইবে, হতভাগিনীর অদৃষ্টে সুখ ভাগ্যবিধাতা লিখেন নাই, তাই তাঁহার জীবনা-হুতি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

কৃষ্ণকুমারী অবিচলিত, তাঁহার সদানন্দ বদনে তিলমাত্র বিষাদের ছায়া নাই, নয়নকোণে বিন্দুমাত্র অশ্রুকণা নাই, তিনি যেন তাঁহার বাঞ্ছিত মৃত্যু-সখাকে আলিঙ্গন করিবার মানসে প্রফুল্লমুখী। তিনি স্বীয় বসনাঞ্চলে জননীর দর বিগলিত অশ্রুধারা মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? শোক কিসের? দুঃখ কি জন্য? আমি ত মরণে বিন্দুমাত্র ভীত হই নাই, বরং আমার শতগুণে আনন্দ হইতেছে যে, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, পিতার মঙ্গলের জন্য, পিতৃপিতামহের অর্জ্জিত সিংহাসন রক্ষার জন্য আমার এই তুচ্ছ জীবন আজ উৎসৃষ্ট হইতেছে।

নারীর জীবন ত, একটা জীবনই নয়, সেই তুচ্ছ সামগ্রী এত বড় একটা মঙ্গলকার্য্যে ব্যয়িত হওয়া ত আমার পরম সৌভাগ্য। তোমারও এজন্য গর্ব্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত মা যে, তোমার কন্যা, তোমার গর্ভের সন্তান দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইল।"

যখন পুরুষ ঘাতুক নিয়োগ ব্যর্থ হইল তখন একজন রমণীকে এই কার্য্য সাধনের জন্য নিযুক্ত করা হইল। লৌহাস্ত্রে কৃষ্ণার জীবন নাশ নিতান্ত নির্ম্মম ও কঠোর হইবে বিবেচনা করিয়া গরল প্রদানের আদেশ হইল। নবনিযুক্ত এক পিশাচী নারী তীব্র হলাহল প্রস্তুত করিয়া রাণার নামে কৃষ্ণার করে অর্পণ করিল। কৃষ্ণকুমারী সেই বিষপাত্র পিতার দান জ্ঞানে ভক্তিভরে পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেই বিষপাত্র নিঃশেষে পান করিয়াও কৃষ্ণার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতা ও লাবণ্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের তিলমাত্র অপলাপ ঘটিল না; সকলে অতিশয় বিস্মিত হইল। পুনরায় অধিকতর তীব্র গরল প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণাকে দেওয়া হইল, কৃষ্ণা অকম্পিত করে ধীর ভাবে আনন্দোদ্ভাসিত বদনে তাহা গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণা-জননী হাহাকার করিতে করিতে ছুটিয়া যাইয়া তনয়ার হস্ত হইতে বিষপাত্র কাড়িয়া লইয়া নিজে পান করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, কৃষ্ণা তৎপূর্ব্বেই তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। তিনি মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, আমি রাজপুতের মেয়ে, জন্মপরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মৃত্যু বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট।* এতদিন যে পিতা আমাকে দয়া করিয়া স্নেহে লালনপালন করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দাও মা। আমার জীবনকাল পূর্ণ হইয়াছে, ভগবানের রাজ্য হইতে আমার আহ্বান আসিয়াছে, কারো সাধ্য নাই এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও মা, মৃত্যুসময় তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া গেলে হয়ত আমার আত্মা পরলোকে যাইয়াও সুখী হইতে পারিবে না।"

কন্যার বাক্যে জননীর প্রাণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণা বিষপাত্র নিঃশেষ করিলেন বটে, কিন্তু কোনও বিষ-ক্রিয়াই তাঁহার শরীরে পরিলক্ষিত হইল না। তৃতীয়বার আরও তীব্র হলাহল দেওয়া হইল, রাজকুমারী অম্লানবদনে তাহাও পান করিয়া ফেলিলেন। সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, এবারও কৃষ্ণার একগাছ কেশও কম্পিত হইল না, উজ্জ্বল অঙ্গলাবণ্য বিন্দুমাত্র বিবর্ণ হইল না, হাস্যোদ্ভাসিত বিম্বাধারে মৃত্যুর নির্ম্মম হস্তের তিলমাত্র স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে পারিল না। পিশাচগণের দানব-লীলা তৃতীয়বারও ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহাদের প্রতিহিংসা বৃত্তি আরও উগ্রতর হইয়া উঠিল। এ সংসারে কৃষ্ণা বাঁচিয়া থাকিবে ইহা যেন তাহাদের চক্ষুশূল হইল। যেরূপেই হউক, যতবারেই হউক, কৃষ্ণার আনন্দ-বিভাসিত জীবনের রঙ্গমঞ্চে মৃত্যুর তিমিরাচ্ছন্ন যবনিকা পাত করিতেই হইবে। চতুর্থবার একপ্রকার অতিশয় উৎকট গরল প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণাকে প্রদত্ত হইল। কৃষ্ণা বুঝিলেন, এইবার তাঁহার হাসিকান্নার অবসান,—সংসার-খেলার পরিসমাপ্তি, এইবার তাঁহাকে পরপারে যাত্রার জন্য খেয়ানৌকায় উঠিতে হইবে। তিনি শান্ত চিত্তে ভগবানের চরণে পিতার ও রাজ্যের মঙ্গল প্রার্থনা নিবেদন করিয়া সেই কালকূট পান করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণার মুখকমল একটা তৃপ্তির দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বিম্বাধর ঈষৎ কম্পিত হইল; তিনি রৌদ্রতাপ-দগ্ধ লতিকার মত ঢলিয়া পড়িলেন। রাজস্থানের স্বর্ণকমলিনী অকালে শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল। কৃষ্ণা অনন্ত সুখ-নিদ্রার কোলে

* রাজপুতদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহদান বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সময় সময় বিজাতীয়দিগের অত্যাচারে তাহাদিগের কুলমর্য্যাদার হানি ঘটিত। এই জন্য রাজপুতগণ প্রায়ই কন্যা-জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিত। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই নৃশংস প্রথা দমন করেন।

ঘুমাইয়া পড়িলেন, সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না। রাজস্থানের পূর্ণশশী চিরতিমিরে ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না।

'হায় অভাগিনী কৃষ্ণা, রূপের ডালি লইয়া' সংসারে আসিয়াছিলে, সেই রূপ দানবের পাশবিক প্রতিহিংসার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত হইল। যে রূপ স্বর্গে হইলে একটা মর্য্যাদা পাইত, পূজা লাভ করিত, পাপ কলুষিত সংসারে সেই রূপ হইল তোমার মৃত্যুর কারণ। অকৃতজ্ঞ মানুষ জানিল না, কি করিয়া রূপের পূজায় জীবন সার্থক করিতে হয়।

আশান্বিতা

বন্দে আলী।

নাম-না-জানা দিনে করিয়া অভিমান
কোথায় গেছ প্রিয় সুদূরে,
ফিরে কি আসিবে না একেলা ঘরে মোর,
মনে কি পড়ে না এ বধূরে!
চোখের কণ আড়ে সে যে কী ব্যাকুলতা
মিলনে চোখে চোখে কয়েছ কত কথা
আজিকে মনে পড়ি' অতীত স্মৃতি যত
রাঙিয়ে দেয় ব্যথা মধুরে।

নয়নতারা দুটি পথের পানে রেখে
দুয়ারে বসে থাকি একাকী,
খুঁজিয়া ফেরে মন বিছায়ে আঙিনায়
পড়েছে তব পদরেখা কী!
পরশ লাগা তব মোর এ বাসখানি
সাপটি ধরি ক্ষণে আবেগে বুকে আনি—
পুরাণো দিন সম আধেক পথে হবে
চারিটি নয়নের দেখা কি?

একেলা যদি তোমা পেতুম ঘরে আজ
নীরব নিরজন নিশাতে,
কেমনে অভিমান থাকিত দেখিতাম
হাসি ও আঁখিবারি মিশাতে।
জীবনে যত কথা কয়েছি তোমা সনে'
কী যেন বহিনিক তাহাই জাগে মনে
যাবার বেলা তব মনের ভুলচুকে
দিইনি যেন প্রিয় কী সাধে!

এসহে প্রিয়তম সুমুখ পথ বাহি
করোগো এতটুকু করুণা,
চিড়িয়া বুকখানি দেখাবো আমি আজ
পাষাণী দয়াহীনা মরু না।
নিঠুর শিলা যত হেনেছি তোমা' পরে
সয়েছি ব্যথা তার আঘাত বুকে ধরে'
ভেবেছ মোরে যত কঠোর প্রাণহীনা
বহিছে হৃদে তত ঝরণা।

যেখানে থাকো প্রিয় শুনিতে পাও যদি
কাঁদি যে তোমা আজি মাগিয়া
ভাঙিবে অভিমান শপথ টুটে যাবে
ব্যাকুল হবে মোর লাগিয়া।
আমার গেহখানি সুদূরে ছবি এঁকে
পথিক মন তব কাঁদিবে থেকে থেকে
দিনের শেষে প্রিয় আসিও দোর পাশে
থাকিব স্মৃতি লয়ে জাগিয়া।

যদি গো আসিবে না কেমনে থাকি তবে,
একেলা সাথীহারা শয়নে—
আসিবে নিশ্চয় জানিগো জানি তাহা
আসিও ঘুমহারা নয়নে;
দুজনে মুখোমুখি বসিয়া নিরজনে
কহিব কথা কত জমে যা আছে মনে
বুকেতে বুক রাখি পোহাব নিশি মোরা
মিলন হাসি-কণা চয়নে।

স্ত্রী-স্বাস্থ্য

অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

জাতির উন্নতি করিতে হইলে যাহাদের দ্বারা জাতি গঠিত হয়, তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি হওয়া একান্ত আবশ্যক। সকল প্রকার উন্নতির মূলে শারীর বলের উন্নতি বিদ্যমান, নতুবা কোন প্রকার উন্নতি করা সম্ভব নহে। শরীরে বল না থাকিলে মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং কোন প্রকার কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না। এই শারীর বল লাভ করিতে হইলে যদিও অনেকটা নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে, তথাপি বীজের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্য জগতে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, অপুষ্ট বীজ হইতে উৎপন্ন শস্য অপুষ্ট হয়, সেইরূপ দুর্ব্বল পিতামাতার শরীর হইতে যে বীজভাগ সন্তানের দেহ গঠন করে, সে সন্তান দুর্ব্বল হওয়াই স্বাভাবিক। উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিতে হইলে পিতা ও মাতা উভয়েরই অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য থাকা একান্ত আবশ্যক। পিতা অপেক্ষা মাতার স্বাস্থ্য অধিকতর উন্নত হওয়া দরকার, কারণ তাঁহাকেই শরীর হইতে এক দিকে যেমন বীজের অংশ প্রদান করিতে হয়, অন্যদিকে আবার গর্ভাশয়ে ধারণ করিয়া তাহা পোষণ করিতে হয়। মায়ের শরীর নিঃসৃত রস দ্বারা ভ্রূণ-দেহ পুষ্ট হয়। শরীরের রস যদি ভ্রূণ পুষ্টির পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ভ্রূণেরও সর্ব্বাঙ্গ পুষ্টি সাধিত হয় না। বিশেষতঃ অপর একটী জীবের পোষণ করিতে হয় বলিয়া মায়ের শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু মা যদি স্বাস্থ্যবতী হয়েন, তাহা হইলে ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ কাতর করিতে পারে না। প্রসবের পরও মায়ের শরীরস্থ রসের রূপান্তর-প্রাপ্ত দুগ্ধের দ্বারা সন্তানের দেহ পুষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রেও দুগ্ধের ভাল মন্দ সন্তান শরীরে সংক্রামিত হইয়া সন্তানের শুভাশুভ উৎপাদন করে, এবং দুগ্ধ দান জন্য মায়েরও শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে মায়ের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, তৎপ্রতি আমাদের মাতৃগণের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সকলেই চান যে আমার ছেলেটী ভাল হয়। আমাদের মায়েরাও সন্তানটী ভাল চান বটে, কিন্তু যাহা করিলে ভাল সন্তান লাভ করা যায় তৎপ্রতি বড়ই শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। ইহা যে তাঁহাদের অজ্ঞতা বা ঔদাসিন্য জন্য তাহা নহে, ইহা তাঁহাদের মহাপ্রাণতারই জন্য। তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা এ সংসারে পরের মঙ্গলের নিমিত্তই আবির্ভূতা হইয়াছি। পরের জন্যই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে এবং সকলপ্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি একটুও দৃষ্টি না দিয়া দিবারাত্রি কঠিন পরিশ্রমে রতা থাকেন। বিশ্রাম লাভ খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে। সকলকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিল, তাহার দ্বারাই তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। সুতরাং পুষ্টিকর আহার অল্পই তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। নিজের রোগ হইলেও অন্যের অসুবিধা হইবে এই আশঙ্কায় রোগকে উপেক্ষা করিয়া নিত্যকর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শয্যাগ্রহণের অবস্থা আইসে, ততক্ষণ তাঁহারা বিশ্রাম করেন না। রোগ প্রথমে উপেক্ষিত হইলে সাধারণতঃ প্রবল আকারই ধারণ করে।

নিজেদের শরীরের প্রতি এই প্রকার উপেক্ষার জন্যই আজ বঙ্গদেশে মায়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। একদিকে যেমন ইহারা নিজেরা স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবতী নহেন, অন্যদিকে কতকগুলি সামাজিক দুষ্টাচারও ইহাদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম—অবরোধ প্রথা; এই

পাপ পল্লীগ্রামে বিশেষ প্রচলিত নাই, সহরেই দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, মায়েরা আর আত্মরক্ষা করিতে একেবারে সমর্থা নহেন। কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি ইহা না থাকিত এবং মায়েরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহারা বিপৎকালে নিজেকে রক্ষা করিয়া অপরেরও সাহায্য করিতে পারিতেন। অবরোধ প্রথার আর একটী কুফল এই যে, সহরের বায়ু একে দূষিত, তাহার উপর অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকার দরুণ বিশুদ্ধ বায়ু, যাহা স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা পান না। ফলে দেখা যায় যে আজকাল অজীর্ণ, যক্ষ্মা, নানা প্রকার বায়ু রোগ সহরের স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে। যদি মুক্ত বায়ুতে তাঁহারা কিছুকাল থাকেন তাহা হইলে ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। দ্বিতীয়—অল্পবয়সে গর্ভাধান। গর্ভাশয়ে সন্তান ধারণ ও পোষণ জন্য এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পালন জন্য শরীরের পুষ্টি না হইতেই যে ক্ষয় হয় তাহা আর পূরণ হয় না। এক্ষেত্রে মনুর উপদেশ অনুসরণ করা উচিত। ঋতুকালের পর তিন বৎসরের মধ্যে যাহাতে গর্ভাধান না হয় তৎপ্রতি সচেষ্ট হওয়া উচিত।

দেশ যে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে ইহার জন্যও স্ত্রীপুরুষ দুইই স্বাস্থ্য সম্পদ হারাইতে বসিয়াছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতিতে ভুগিতে ভুগিতে যদি গর্ভ হয় তাহা হইলে গর্ভিণীর যে কি প্রকার বিপদ উপস্থিত হয় তাহা সহজে অনুমান করা যায়। এইরূপ অবস্থায় যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সেটী সমাজের ভার ছাড়া আর কিছুই নহে। এরূপ অবস্থায় যাহাতে গর্ভ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কর্ত্তব্য।

এই সকল বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ জাতির মঙ্গলের জন্য আমাদের মায়েরা যাহাতে যথার্থ স্বাস্থ্যবতী হইতে পারেন তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। ইহাতে যদিও বহির্দৃষ্টিতে তাঁহাদের নিজেদের সুখস্পৃহা দেখান হয়, তাহা হইলেও জাতির মঙ্গলের জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক।

ফুলের জন্ম

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

তরুর শাখে কোমল ফুল-মঞ্জরী
নয়ন মেলি চাহে ধরার পানে,
উষার বায়ু অঙ্গে স্নেহে সঞ্চরি
পুলক আনে গুঞ্জরণের গানে।

শিশির-মাখা আঁচল ধীরে সঞ্চলি
বনের ছায়া রাখে বুকের আড়ে,
আকাশ-পথে নীরদ নামে চঞ্চলি
গাহন তারে করায় জলধারে

সহসা এক প্রভাতে তার কর্ণেতে
তপন আসি ঢালে কি মধুগীতি,
শুভ্র কপোল ভরিয়া যায় বর্ণেতে,
লক্ষ যুগের সুপ্তিভরা স্মৃতি—

প্রাণের পুরে জাগিয়া ওঠে উচ্ছুলি
পুষ্প হয়ে মুকুল ওঠে ফুটি,
বাড়ায়ে বাহু তপনে কয় বিহ্বলি
লহ আমায় লহ সকল

ব্যথিতা

[ছোট গল্প]

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

(১)

হৃদয়ের অনেক তোলপাড়ের পর বৃন্দাবনে যাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া মেয়েটি তার মায়ের ভিটায় গিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইবার আশায় সেই দিকেই ছুটিল।

একদিন সে তার বাল্যলীলার নদীর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম আলোটুকু গাছের পাতার উপরে পড়িয়া চিকমিক করিয়া জ্বলিতেছিল। নদীবক্ষে সেই ম্লান রক্তচ্ছটা একটা অস্ফুটতর সুষমা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাখীগুলির উচ্চ কলরব বাতাসে মিশিয়া গিয়া দিগন্তকে শব্দ-তরঙ্গে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে কোনদিকে চাহিয়া দেখিল না, তাহার আয়ত চক্ষের ম্লান দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য ভাবে কোন্ একদিকে পড়িয়া স্থির হইয়া রহিল।

সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। এই গ্রামের বুকে তাহার জন্ম। একদিন তাহার বিধবা মাতা তাহাকে পাইয়া স্বামীর শোক ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুখে দুঃখে তিনি তাহাকে মানুষ করিয়া—বিবাহ দিয়া, তাহার শান্তিময় জীবন দেখিবার আশা করিয়াছিলেন।

আজ সেই মা কোথায়? দরিদ্রের কন্যা অবস্থাপন্নের হাতে পড়িলে সুখে থাকিবে ভাবিয়া তিনি তাহাকে একজন ধনবান প্রৌঢ়ের হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন। স্বামীও মৃত্যুকালে যথাসর্ব্বস্ব স্ত্রীর নামেই লিখিয়া দিয়া গেলেন, হয় ত তাঁহার মনে আশা ছিল, ইহার দ্বারাই তাঁহার স্ত্রী উত্তরকালে সুখী হইতে পারিবে।

কিন্তু সে স্ত্রীর মান—নারীর সম্মান রাখিতে পারে নাই। অগাধ সম্পত্তি হাতে পাইয়া, লালসার কুহকে পড়িয়া প্রবৃত্তির চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছিল। পরমুহূর্ত্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সে শান্তির আশায় ব্যাকুল হইয়া সমাজের বুকে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিল না।

সমাজের নেতা যাঁহারা, তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া উপহাসের হাসি হাসিলেন। সে হাসি তাহার আর্ত্ত অন্তঃকরণের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া আঘাত করিল। সে সবিস্ময়ে অনুভব করিল, তাহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবে—এমন লোক জগতে নাই। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অসুস্থ অবস্থায় সাগ্রহ-প্রতীক্ষমান নেত্রে সে মৃত্যুর পথ চাহিয়া ছিল। কিন্তু কৃতান্তও তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন! স্বামীর যাঁহারা আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তাঁহারাও এমন অসময়ে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবার, অথবা তাহার মুখে একবিন্দু জল দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। স্বজন-পরিত্যক্তা দুঃখিনী বুঝিতে পারিল, কত খানি আনন্দের বিনিময়ে আজ সে এই, যুগান্তরব্যাপী প্রলয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মা অনেকদিন আগেই চলিয়া গিয়াছেন। তবু সে আজ সান্ত্বনার আশায় গ্রামের বুকে ফিরিয়া আসিয়াছে। সুখ নাই, কিন্তু দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতিটুকুও যে বড় মধুর বলিয়া অনুভূত হয়।

আকাশে, বাতাসে, প্রকৃতির অনন্ত শ্যামতার মধ্যে সে আজ আপনার অতীত জীবনের অনাবিল অংশটুকু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। মনে পড়িল—সেই খড়ে-ছাওয়া ঘরখানি, প্রাঙ্গনে সেই তুলসীমঞ্চ, সামনেই করবী ফুলের ঝাড়—সে হাসিয়া খেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, মা স্নেহবিকশিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেন। তাহার চোখ দুটি ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দূরস্থিত দেবালয়ে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সহসা চমকিত হইয়া সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া কখন যে রাত্রির অন্ধকারের ভিতরে মিশিয়া গিয়াছে, সে তাহা ইহার আগে জানিতে পারে নাই।

মন্দিরের দিকে দৃষ্টি তুলিতেই বিগত দিবসের একটি ছবি অত্যন্ত উজ্জল হইয়া তাহার চিত্তপটে ফুটিয়া উঠিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রভাতে স্বামীর হাত ধরিয়া যেদিন সে এই মন্দিরে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সেদিন পুরোহিত মহাশয় বহুক্ষণ তাহার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। প্রৌঢ় স্বামীর বালিকা স্ত্রীর ভবিষ্যৎটা বোধ হয় তিনি সেই মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহারা দুইজনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি বালিকার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—"কল্যাণ হোক্।"

চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিয়া সে ভাবিল, সেই পবিত্র কামনা তাহাকে চিরদিন রক্ষা-কবচের মত ঘিরিয়া রাখিলনা কেন?

(২)

আরতি শেষ হইয়া গেলে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া পুরোহিত যখন মন্দিরের সর্ব্বনিম্ন সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সন্ধ্যার স্তিমিত চিত্রখানি রজনীর তিমিরাঞ্চলে অবলুপ্ত হইয়াছে। আশেপাশে লোকসমাগমের চিহ্নমাত্রও ছিল না। কচিৎ দুই-একজন পথিক মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বিগ্রহ-প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মন্দিরের নিম্নে নবোদ্ভিন্ন কিশলয় গুচ্ছের উপর দিয়া একটি পথের রেখা কিছুদূর পর্য্যন্ত সমানভাবে গিয়া সহসা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একটি গ্রামের দিকে অপরটি নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

নামিয়া আসিয়া পুরোহিত দেখিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কে?" মেয়েটি কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি "মণিমালা।"

মণিমালা? পুরোহিত কিছুক্ষণ বিস্ময়-চকিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরিশেষে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"ঠাকুর দেখবে? এসো মা।"

সে চট করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"আমাকে মন্দির ছুঁতে বলছেন? আপনি কি এখনো আমাকে চিনতে পারেন নি? আমি যে মণিমালা, এই গাঁয়ের-ই মেয়ে আমি।"

পূর্ব্ববৎ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর হইল—"জানি। কিন্তু দেবতার সঙ্গে সে সব কথার সম্বন্ধ নাই। আমরা মানুষ, আমরা যাকে পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম বলে মনে করি, তিনি সে-সবের অতীত। জগতে এমন কোনও অপবিত্র জিনিস নাই যার দ্বারা ঈশ্বর মলিন হতে পারেন। আমাদের ধারণাশক্তি এত বেশী পরিষ্কার নয় যে, আমরা নিখুঁৎ ভাবে ভাল-মন্দের বিচার করব, এবং—"

মণিমালা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। একটি একটি করিয়া পিছনে যে কতগুলি লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কথা কেহই জানিতে পারে নাই। সহসা একটা তীব্র আওয়াজ শোনা গেল—"ঠাকুর মশায়!" পুরোহিত বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

গ্রামের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"আপনি পুরোহিত, গ্রামের যাতে মঙ্গল হয় সেই দিকেই আপনার দৃষ্টি রাখা উচিত। আপনি কেন একটা পতিতা মেয়েকে এখনো মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?"

পুরোহিত একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, মণিমাল্লা বাধা দিল। সে নত হইয়া মন্দিরকে অথবা পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনি আমার জন্যে নিজের জীবনের মধ্যে অশান্তি টেনে আনবেন না।"

পরমুহূর্ত্তেই তাহার শ্রান্ত মূর্ত্তিখানি রজনীর গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

অন্তঃপুরে রন্ধনশালা

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এস্-সি।

আমাদের অন্তঃপুরের গৃহিনীদের কার্য্যের দোষ দেখাইয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া আমি তাহার ভূমিকা স্বরূপ দুইটী প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে 'মাতৃমন্দিরে' প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তারপর এই কয়মাস আর কিছু লিখি নাই, কারণ আমার পরিচিতা কোন কোন গৃহিণী আমাকে শাসাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমার প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিবেন। আমি নিয়তই তাঁহাদের কাজের খুঁৎ ধরি, ত্রুটী দেখাই ও দোষ বুঝাই; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই মানিতে চাহেন না। আমার যে সকল ব্যবস্থা ও উপদেশ, তাহাকে তাঁহারা খৃষ্টানী ও ম্লেচ্ছ আচার বলিয়া ঘৃণা করেন। অবশ্য আমি যে অপ্রিয় সত্য বলিবার ভয়ে নিরস্ত হইয়াছিলাম, তাহা নহে। এই সময়টা আমি আরও ভাবিয়া দেখিলাম। তারপর মনে হইল, চুপ করিয়া থাকিয়া ফল নাই। আমার কথাগুলি একবার সকলের কাছে প্রকাশ করি, বঙ্গের ও হিন্দুসমাজের গৃহিণীগণ বিচার করিয়া দেখুন।

সেইজন্য আজ আমি প্রথমে আমাদের রন্ধনশালা ও তাহার আসবাবপত্র সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিব। আষাঢ়ের মাতৃ-মন্দিরে "অন্তঃপুরের আলোচনা" ও শ্রাবণের মাতৃ-মন্দিরে "অন্তঃপুরে আচারনিষ্ঠা ও সংস্কার" এই দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাহাদেরই অনুবৃত্তি স্বরূপ; সুতরাং পূর্ব্ব প্রবন্ধদ্বয়ের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া যেন কেহ এই প্রবন্ধটী পাঠ না করেন, ইহাই আমার নিবেদন।

রন্ধনশালা আমাদের অন্তঃপুরের একটী প্রধান অঙ্গ। শুধু প্রধান কেন, একমাত্র প্রধান ও প্রথম বলা যায়। ইহা হিন্দুসমাজেরই বিশেষত্ব। অনেক দেশে ও সমাজে পারিবারিক নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বাহিরে প্রস্তুত হয় ও হাটে বাজারে বিক্রয় হয়। বাসগৃহের মধ্যে তাহাদের রন্ধনশালা না থাকিলেও চলে। কিন্তু আমাদের তাহা নয়। জীবনরক্ষার জন্য যা-কিছু খাদ্যদ্রব্যের দরকার সে সমস্তই আমাদের অন্তঃপুরে মাতা, কন্যা, ভগিনী, পত্নী ইঁহাদের হাতেই তৈয়ারী হয়। সেই জন্য আমাদের অন্তঃপুরে রন্ধনশালাই একমাত্র প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিভাগ। অন্তঃপুরে আরও কতকগুলি বিভাগের নাম আমি এখানে বলিয়া রাখিতেছি, যথা—সূতিকা-ঘর, শয়ন-গৃহ, গৃহদেবতার মন্দির বা উপাসনালয়, শাকসব্জীর বাগান, উঠান, খিড়কীর পুকুর, আস্তাকুঁড় ও গো-শালা। ইহার মধ্যে

দেবতা-মন্দির, বাগান, ও গো-শালা অনেক সময়ে বহির্ব্বাটীতেও থাকে ; কিন্তু নারীগণের সেখানেও কাজ করিতে হয়। সুতরাং আমি তাহাকে অন্তঃপুরের মধ্যেই ধরিয়াছি। অন্তঃপুরে আরও অনেক বিভাগ হইতে পারে। যাহা হউক এখন ভাবিয়া দেখুন রন্ধনশালা সকলের মধ্যে প্রধান কিনা।

রন্ধনশালার নির্ম্মাণে যাহা দোষ আছে, তার জন্য পুরুষ ইঞ্জিনিয়ার বা শিল্পী যতদূর দায়ী, রমণী রাঁধুনীও তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহেন। নারীগণই দিবারাত্রি সেই ঘরে বসিয়া রান্নাবান্নার কাজ করিবেন, তার দোষগুলি যদি তাঁহারা ধরাইয়া না দেন তবে ইঞ্জিনিয়ার কিরূপে বুঝিবে? বাড়ীর কর্ত্তা যখন ঘর তৈয়ারী করিবার নক্সা করেন, তখন গিন্নী কেন নিজের সুবিধা অসুবিধা চিন্তা করিয়া সেই নক্সার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করেন না? ইহার কারণ রন্ধনশালাকে কেহই এমন একটা ঘর বলিয়া মনে করেন না, যার উপরে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সদর মহলে বৈঠকখানা ও অন্দরমহলে শোবার ঘর, এই দুইটীকেই সকলে প্রধান বলিয়া বিবেচনা করেন। কলিকাতায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা বাসা ভাড়া করিবার সময় প্রথমেই দেখেন শোবার ঘরটী কেমন। রান্না করিবার জন্য কোন ঘরের প্রয়োজন নাই,—একটা কোণের মত জায়গা, চারিদিক অনাবৃত হউক আপত্তি নাই, তাহাতেই চলিয়া যায়। সিঁড়ির নীচে, পায়খানার পাশে, বারান্দার রেলিংএর ধারে অথবা ছাদের উপরে যেখানেই হউক একটা উনুন বসিতে পারে ও একজন লোক আড়ষ্ট হইয়া ঘুরিতে-ফিরিতে পারে এইরূপ একটু স্থান হইলেই রান্না চলিয়া যায়। ইহার কারণ দরিদ্রতা। যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সুখস্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করা যায় তবে ইহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কারণ নাই।

কোন রন্ধনশালাতেই প্রায় ধূম-নির্গমের পথ নাই। কয়লার অথবা কাঠের জ্বালের ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক, ঘরদুয়ারকেও নষ্ট করে। সেই ধূম যাহাতে সরল পথে সহজে বাহির হইয়া যায় তার বন্দোবস্ত কোথাও নাই—পল্লীগ্রামেও নাই, সহরেও নাই। নানাপ্রকারে ইহার উপায় করা যাইতে পারে কিন্তু কেহ এ বিষয়ে মনোযোগী হন না। যাঁহারা ধনীলোক, খরচপত্র করিয়া নিজের বাসের পাকা বাড়ী তৈয়ারী করেন, তাঁহারা অনায়াসে রন্ধনশালায় একটী চিমণী বসাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে এমন বিশেষ কিছু খরচ নাই। চিমণীতে সঞ্চিত কালী সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয়ের দ্বারা কিছু অর্থাগমও হইতে পারে। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগ্রামের ঘরগুলি এত নীচু যে, যখন রাঁধিবার জন্য উনুনে আঁচ দেওয়া হয়, তখন তাহা অন্ধকূপ অপেক্ষাও ভীষণ হইয়া উঠে। পূর্ব্ববঙ্গের খড়ো ঘরগুলি অনেক উঁচু ও প্রশস্ত এবং চারিদিকের দেওয়াল ও চালার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকে বলিয়া ধূম সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে। অবশ্য ধূমের আক্রমণে সেই সকল খড়ের ঘরের চালা, খুঁটী, বাঁশ, বাঁখারী ও পাতা প্রভৃতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু তাহার আর উপায় কি? পাঁচ ছয় বৎসর পরেই আবার নূতন ঘর তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।

সহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে, প্রত্যেক রন্ধনগৃহে ধূমনির্গমের চিমণী রাখিতে হইবে। যে বাড়ীতে একাধিক ছোট ছোট গৃহস্থ পরিবার বাস করে, অথচ রান্নাঘর আছে মাত্র একটী, সেইখানেই মুস্কিল। আমাদের সমাজের এখনও এমন অবস্থা আসে নাই যে, বিভিন্ন পরিবার এক বাড়ীতে থাকিয়া মেস্ অথবা বোর্ডিংএর মত একই রন্ধনশালা হইতে নিজেদের আহার গ্রহণ করিবে। যদি কোন বাড়ীতে পাঁচটী একই জাতীয় পরিবার থাকে, আর তাহারা যদি নিজেদের মধ্যে সুবন্দোবস্ত করিয়া একই রান্নাঘরে একসঙ্গে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে তবে তাঁ

আমি মন্দ মনে করি না। আজকাল মেসে ও বোর্ডিংএ ভিন্ন রুচির, ভিন্ন জাতির, ভিন্ন প্রকৃতির বহু লোক একসঙ্গে আহারাদি ও বসবাস করে। তাহাতে কাহারও কোন বাধা হয় না, বরং অনেক বিষয়ে সুবিধাই দেখা যায়। এক বাড়ীতেও স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পরিবার বাস করে। কেবল তাদের খাওয়াটা এক সঙ্গে হয় না। রুচির বিভিন্নতা ও প্রয়োজনের তারতম্যই ইহার কারণ নহে। মেসে ও বোর্ডিংএ পুরুষের বেলায় যদি তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক না জন্মায় তবে স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকিলেই বা একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় কেন? তাহার কারণ পুরুষেরা শিক্ষার দ্বারা ও বাহিরে চলাফেরা করিয়া অনেকটা সংস্কারমুক্ত ও উদারচিত্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত ও আবদ্ধ থাকাতে সংকীর্ণচিত্ত হয় ও তাহাদের চিরন্তন সংস্কার কিছুতেই যায় না।

বোর্ডিংএর নিয়ম অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের একসঙ্গে বাস করাকে আমি বেশ সুবিধাজনক মনে করি। যাহাদের পরিবারে দুই তিনজন লোক, তাহাদের পক্ষে ইহাতে খরচা অনেক কম পড়িবে এবং বাড়ীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে। এক বাড়ীতে সকাল বেলা পাঁচটা উনুনে যখন আঁচ দেওয়া হয় তখন ভাবিয়া দেখুন ব্যাপারখানা কি,—একেবারে চারিদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। তারপর পাঁচটা হেঁসেলের আবর্জ্জনা জমিয়া সমস্ত বাড়ীটা কি বীভৎস নরকের মতই না হয়! এদিকে জলের কল লইয়াই মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া ত লাগিয়াই আছে। ছোট পরিবারে যদি টাট্‌কা মাছ তরকারী খাইতে হয়, তবে দু'চার পয়সার বেশী কিনিবার উপায় নাই। একসের মাছ বা পাঁচটা কপি অথবা তিনসের আলু কিনিয়া এক সপ্তাহ বসিয়া খাইলে প্রকারান্তরে খাদ্যের নামে বিষই খাওয়া হয়। একমণ কয়লার স্থলে যদি দুই গাড়ী কয়লা আসে, দু'মণের স্থলে যদি দশমণ চাউল আসে তবে দরেও অনেক সস্তা হয়। ছোট পরিবারে কেহ ঝি-চাকর কিম্বা রাঁধুনী বামুন রাখিতে পারে না। পাঁচটা ক্ষুদ্র পরিবার মিলিয়া একটা ঝি-চাকর, একজন ঠাকুর রাখিতে পারে, ইহাতে মেয়েদের অনেক বাজে পরিশ্রমের কাজ কমিয়া যায়, তাঁরা একটু সোয়াস্তিতে থাকিতে পারে। ইহাতে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে স্বাধীনতা নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। মেসে বোর্ডিংএ আমরা ত দেখিয়াছি, কেহ রুটী খায়, কেহ ভাত খায়, কেহ মাছ খায় না, কেহ বা ডিম খায় না, কেহ পেঁয়াজ খায় না, কেহ মাংসের বদলে রাবড়ী খাইবে, আবার কাহারও জ্বরে সাবু চাই,—এ সমস্ত বন্দোবস্তই হইয়া যায়, কিছু গোলযোগ হয় না।

এক বাড়ীতে পাঁচটা রন্ধনশালা যাহাতে না হয় সেই জন্য আমি এই পারিবারিক বোর্ডিংএর কথা বলিলাম। সহরে যেখানে এক বাড়ীতে অনেক ভাড়াটে বাস করে, সেখানে গৃহিণীরা রান্না-বান্নার বিষয়ে এত অসুবিধার মধ্যে কাজ করেন যে দেখিলে মনে হয় মানুষ ইচ্ছা করিয়া এত নির্ব্বোধ হইতেছে কেন? যেখানে একবার ঝাঁট দিলে চলে সেখানে পাঁচবার ঝাঁট দিতেছেন, যেখানে একবার কল-তলায় গেলে চলে সেখানে পাঁচবার যাওয়া-আসা করিতেছেন, যেখানে একটু মাজা-ঘসায় চলে সেখানে সারাদিন বসিয়া মাজাঘসা করিতেছেন। এই নির্ব্বুদ্ধিতাকেই আবার কর্ম্মপটুতা ও শ্রমদক্ষতা নাম দিয়া তার কতই না গরব করা হয়!

কলিকাতায় যাঁহাদের নিজেদের বাড়ী আছে, তাঁহারা রন্ধনশালাকে একটী কেমিক্যাল লেবরেটরীর মত সাজাইতে পারেন। সমস্ত জিনিস হাতের কাছে থাকা দরকার। ভিতরে একটী ঘোলা গঙ্গার জলের ও একটী পরিষ্কৃত জলের টাপ থাকিবে। বাসন-কোসন ও হাতধুইবার জলপাত্র, জিনিসপত্র ও মালমশলা রাখিবার সেল্‌ফ্, মিট্ কেস্ ইত্যাদি হাতের কাছে রাখা দরকার। রাঁধুনী রসুই ঘরে আসিলে আর যেন তাহাকে বৃথা ছুটাছুটি করিতে না হয়। এ বন্দোবস্ত যে কেবল সহরের ধনীরাই

করিতে পারেন তাহা নহে, পল্লীগ্রামের দরিদ্ররাও ছোটখাটর মধ্যে ও সহজভাবে এরূপ করিতে পারেন। যেখানে জলের কল নাই সেখানে কাঠের অথবা গ্যালভেনাইজ্ লোহার বড় টবে জল তুলিয়া রাখা চলে। জল যাহাতে অপচয় না হয় সেইজন্য টবে পিতলের ট্যাপ লাগান থাকিবে, ঠিক যতটুকু জল দরকার ততটুকু ট্যাপের মুখ টিপিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। আমাদের এখনকার কলসী হইতে জল গড়াইয়া লওয়ার নিয়মটী বড় খারাপ। ইহাতে জল অপচয় হয়, চারিদিকে পড়িয়া যায়; মাটীর কলসী ভাঙ্গিবারও সম্ভাবনা।

রন্ধনশালার প্রধান জিনিস হইল উনুন। এই উনুন তৈরী করিবার সময় এতগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে;—(১) কম কয়লা পোড়ে, (২) শীঘ্র আঁচ উঠে, (৩) উত্তাপ চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে (৪) উত্তাপ অপচয় না হয়, (৫) আঁচ ইচ্ছামত কমান বাড়ান যায়, (৬) অল্প জায়গার মধ্যে থাকে, (৭) সহজে পরিষ্কার করা যায়। অনেকে হয়ত মনে করিবেন ষ্টীম্ ইঞ্জিনের বয়লারের চুল্লী তৈয়ারী করিতেই এত সব হিসাবের দরকার, অন্তঃপুরের রন্ধনশালার উনুন প্রস্তুত করিতে এত গণনায় কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিনা। ক্ষুদ্র হইতে সকল ব্যাপারে অপচয় বন্ধ করিতে না পারিলে কাহারও কখনও কোন সম্পদ্ সঞ্চিত হয় না। যাহারা ছোটখাট বিষয়ে হিসাব করেনা তাহারা বড় বড় বিষয়গুলিও হারাইয়া ফেলে। ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় সম্পদ অপচয়ে বাধা দিবার নিমিত্ত সে দেশের গবর্ণমেণ্ট কড়া আইন করিয়া দিয়াছিলেন। চা-এর সঙ্গে কতটুকু চিনি খাইতে হইবে, রুটীর সহিত কতটুকু মাখন লাগাইতে হইবে, পোষাক পরিচ্ছদ কি রকম ছাঁটিতে কাটিতে হইবে সব বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।" স্বাধীন দেশের রাজারা এইরূপে হিসাব করিয়া নিজ নিজ দেশের অন্নবস্ত্র রক্ষা করেন। ব্যক্তিগত ভাবেও সেই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ হিসাব করিয়া তৈয়ারী অনেক নমুনার উনুন আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। সেই সব দেখিয়া অথবা অভিজ্ঞতা হইতে গণনা করিয়াও গৃহস্থগণ নিজ নিজ উনুন তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন। আর একটী কথা, উনুনটী ঘরের মেজের সমানে সমানে থাকিবে না। এর কারণ, আজকাল রাঁধুনীরা যেমন ভাবে সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হইয়া মাটীতে বসিয়া রান্না করেন তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। উনুন টেবিলের সমান (আড়াই ফুটের কিছু বেশী—৩২ ইঞ্চি) উঁচু হইবে—যেন দাঁড়াইয়া রান্না করা যায়। ইহাতে রাঁধুনীরা অনেক সুবিধা ও আরাম পাইবেন এবং উনুনের নীচে অনেক জিনিসপত্র রাখিবার জায়গাও হইবে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা সাধারণতঃ মাটীর ভিতরে গর্ত্ত করিয়া উনুন তৈয়ারী করে। তাহাতে কাঠই পোড়ান হয়। সেই উনুন এই হিসাবে ভাল যে, তাহাতে অল্প পরিমাণ বায়ু চলাচলের মধ্যে আগুন জ্বলে, সুতরাং তাহার আঁচ বেশী হয় না, বিশেষতঃ কাঠের আঁচ স্বভাবতঃই কম। এই অল্প আঁচের দরুণই রাঁধা জিনিষগুলি বেশ সুস্বাদ ও স্বাস্থ্যকর হয়। কয়লার উগ্র আঁচে খাদ্যদ্রব্যগুলির ভিতরে এমন পরিবর্ত্তন হইয়া যায় যে, তাহা আর আমাদের শরীরের পক্ষে তেমন পুষ্টিজনক ও স্বাস্থ্যকর থাকে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণেরও এইরূপ মত। সেইজন্য ষ্টিমে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য অধিক পুষ্টিকর।

পল্লীগ্রামের এই সকল মাটীর ভিতরকার উনুনে রান্না করিবার সময় রাঁধুনীরা দাঁড়াইতে পারিবেন না। সেই স্থলে তাঁহারা এক খানা ছোট উঁচু চৌকিতে বসিবেন। ষ্টিমে অথবা অল্প আঁচে রান্না সব চেয়ে ভাল। তাহাতে ঝঞ্ঝাট কম, অথচ জিনিষটাও শরীরের পক্ষে অধিকতর হিতকারী হয়, এ বিষয়ে "কুকার" অনেক সাহায্য করিতে পারে।

কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণ

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর কানপুরে কংগ্রেসের চল্লিশ বাৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবেশনে তিনহাজারের উপর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় পাঁচশত জন বাঙ্গালী ছিলেন। মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে অন্যূন একহাজার মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ও সভানেত্রীর অভিভাষণ পঠিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি অবস্থার উপযোগী নানা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আলোচিত ও পরিগৃহীত হয়। সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা অতি মূল্যবান। যে সকল সমস্যা বর্ত্তমানে ভারতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, অভিভাষণের মধ্যে তিনি সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের সমাধানের নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণটি প্রকাশিত হইল।

বন্ধুগণ,

চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাঁহাদের সমুজ্জ্বল ও স্মরণীয় সফলতার দ্বারা যাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, আপনারা সেই মহৎ কার্য্যের গুরুভার ও দায়িত্ব আমার অপটু হস্তে বিন্যস্ত করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমার হৃদয়ে গভীর ও মিশ্রিত ভাবের উদয় হইতেছে। মানব ভাষার সমগ্র ভাণ্ডার আলোড়ন করিয়াও আমি সেই ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত, শক্তিমান ও সুন্দর ভাষার সন্ধান পাইব না।

আমি জানি যে, আপনারা আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছেন,—স্বদেশে বা বিদেশে আমি আমার দেশের জন্য যে সামান্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছি, আপনাদের এই দান যে তাহারই প্রতিদান তাহা নহে, বরং ভারতের নারীত্বের প্রতি সম্মান এবং জাতির সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় নারীর যে বিধিসঙ্গত অধিকার, সেই অধিকার আপনারা যে স্বীকার করিয়া লইতেছেন ইহা তাহারই লক্ষণ। এত জটিল সমস্যা সঙ্কুল এবং গভীর সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ বর্ত্তমান সময়ের জন্য আমাকে আপনাদের বিশিষ্ট সেবকগণের অধিনায়ক করিয়া আপনারা কোন নূতন প্রথার সৃষ্টি করেন নাই—আপনারা একটি প্রাচীন প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে নারীর যে স্থান ছিল, আপনারা তাহাকে সেই স্থানে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন। এই দেশে নারী একদিন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নির প্রতীক এবং অধিষ্ঠাত্রী ছিল। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই মহিয়সী নারীদের জ্ঞান, ভক্তি এবং ত্যাগের যে সুন্দর পবিত্র কীর্ত্তিকথায় আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ পরিপূর্ণ, আমার মধ্যে তাহা প্রকাশ করিতে যে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য, এ কথা সম্যক্ অবগত হইলেও আমার ধারণা,—যে অমর বিশ্বাস মহারণ্যে নির্ব্বাসিতা জাগরিতা সীতাকে আশার আলোক দেখাইয়াছিল এবং অবিচলিতা সাবিত্রীকে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, আপনারা আমার উপর যে গুরু কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য সেই জ্বলন্ত বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ আমাকেও সাহায্য করিবে।

* * * * *

আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জ্জাতিক কতকগুলি সমস্যার আকস্মিক সংযোগে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এমন কি, আমাদের অজ্ঞাতে আমাদিগকে এমন এক বিপদের চক্রজালে প্রতিত করিয়াছে, যাহার ফলে জাতীয় জীবনের একতা ও

দায়িত্ববোধ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, আমাদের শোচনীয় পরিণতি কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রসূত অনৈক্য এবং সাম্রাজ্যের কূটনীতির ফলেই আমাদের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে কি পন্থা আমরা অবলম্বন করিব, কি কার্য্যনীতি স্থির করিব? যে অত্যাচারমূলক মারাত্মক শক্তি মানবের স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমরা কি ভাবে সংগ্রাম চালাইব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের যে নিষ্পেষণের ফলে আমাদের নৈতিক ও আর্থিক জীবনের অবশিষ্ট অস্তিত্বও বিপন্ন, তাহা যাহাতে আরও ব্যাপক হইয়া না পড়ে—তাহাকে কি ভাবে বাধা দিব? আমাদের হতভাগ্য স্বদেশবাসিগণ উপনিবেশ সমূহে যে ভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে—তাহাই বা আমরা কি ভাবে নিরাকরণ করিয়া বিরুদ্ধ শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিব? আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদেরই বা কি ভাবে অবসান করিব?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগের বাণীর মধ্যেই খুঁজিয়া পাইতে পারি—এই বাণীর মধ্যেই তিনি জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের গুপ্ত তথ্য দেশবাসীকে বুঝাইতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা বহুদিন যাবৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, কাজেই এই মহান আদর্শ অনুসারে আমরা অতি অল্পদিন মাত্র চলিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইতিহাস যাহাই বলুক না, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে অসহযোগ আন্দোলন ঝড়ের মত আমাদের দেশের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলাইয়া দিয়া গিয়াছে। আজ যদিও উহা সুপ্ত, কিন্তু এখনও উহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। আমাদের দেশের অবস্থাকে উহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে।

ভবিষ্যতে মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মনীতি ও আদর্শ হইতে আমাদের কার্য্যধারা যতই বিভিন্ন হউক না কেন, যে কর্ম্মনীতি গত কয়েক বৎসর আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে তাহার শক্তি ভবিষ্যতের কর্ম্মনীতির উপর থাকিবেই।

আজ আমাদের এমন একজন অতি মনস্বী রাজনীতিজ্ঞের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, যিনি আমাদের ছত্রভঙ্গ ও বিধ্বস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ও তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ভারতকে রাজনৈতিক শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন এবং এমন এক কার্য্যধারা উদ্ভাবন করিবেন, যাহাতে দেশের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্প ও কলা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার প্রচেষ্টার স্থান হয় এবং যাহা ভারতের স্বাভাবিক অবস্থার কোন প্রকার বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া দেশকে আধুনিক ভাবে উন্নীত করে।

আমাদের এখানকার সিদ্ধান্তগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রমহাসভার কর্ত্তব্য এই যে, মহাসভা কতকগুলি বিভাগ স্থাপন করুন। এই সমস্ত বিভাগে যোগ্য এবং উৎসাহী পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ স্থান পাইবেন এবং তাঁহারা জনসাধারণের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অভাব পূরণে সচেষ্ট হইবেন। মোটামুটী রকম বিভাগগুলির সংখ্যা কম হইবে, তবে এই সমস্ত বিভাগের উপর দেশের সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারের দায়িত্ব থাকিবে। আমার মনে হয় দেশবন্ধু দাশের কল্পনা অনুযায়ী পল্লীসংগঠনের কোন স্থির কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য আমাদিগকে নিঃস্বার্থপরায়ণ ও উৎসাহী দেশপ্রেমিকের সাহায্য লইতে হইবে। উহারা প্রাচীন যুগের মত দেশের লোকের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অন্নবস্ত্রের দ্বারা পারিবারিক অভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত লাঙ্গল ও চরকা এই দুইটী অপরিহার্য্য প্রতীকের সহায়ে দেশের কৃষক-

গণকে চরম দুঃখদুর্দ্দশা, অজ্ঞতা, উপবাস এবং ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবেন।

পল্লীগঠনের সঙ্গে জনবহুল সহর সমূহে মজুরদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজও বিশেষ ভাবে জড়িত। উহারা এমন অবস্থায় বাস করে যাহাতে উহারা ক্রমে পশুতে পরিণত হয় এবং উদরান্নের সংস্থানের আশায় পল্লীর আবাস ও আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রলোভন ও পাপের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। যাহাতে উহারা উন্নত ধরণের আবাসস্থান, উচ্চতর বেতন ও ভাল আবহাওয়ার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির মূল বণিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাহাতে সাহচর্য্যের ভাব আসে তাহাও করিতে হইবে।

ভারতের শিক্ষা ব্যাপারে যে ঔদাসীন্য লক্ষিত হয় তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। পরাধীনতার নিগড় আমাদিগের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিকে পঙ্গু করিয়া জাতীয় শিক্ষাসম্পদ্ হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আজ আমরা এক সহকারী ও অনুকরণপ্রিয় শিক্ষাপদ্ধতির দাস। জাতির প্রয়োজনের পক্ষে উহা একেবারে অনুপযোগী। উহার ফলে আমরা নিজের মনোভাব পর্য্যন্ত প্রকৃতভাবে ব্যক্ত করিতে পারি না। আমাদের শিক্ষার আদর্শকে এমনভাবে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, যাহার মধ্যে আমাদের প্রাচ্যসভ্যতার সকল জ্ঞানবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য জাতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত শিল্পকলা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়।

অধিকন্তু আমি বিশেষ জোরের সহিত সামরিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার অঙ্গীভূত করিবার প্রস্তাব করিতেছি। ইহা কি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখময় ও লজ্জাজনক অদৃষ্টের পরিহাস নয় যে, যে জাতির বালকগণ মাতৃকোল হইতেই কুরুক্ষেত্র ও রাজপুত বীরত্বের মহিমার কথা শিক্ষালাভ করে, সেই জাতির বংশধরেরা তাহাদের নিজের গৃহ, নিজের মঠ মন্দির, নিজের পর্ব্বত ও সমুদ্র-সীমাগুলি রক্ষা করিতে বিদেশীর শরণাগত হয়? বর্ব্বর মাসাই, আদিমজুলু, আরব, আফ্রিদী, গ্রীক, বুলগার সকলেই নিজের স্বাধীনতা অব্যাহত করিবার জন্য অস্ত্রধারণের অধিকার রাখে, কিন্তু আমরা,—যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সর্ব্বপ্রথমে জগতে সভ্যতার দীপ জ্বালিয়াছিলেন—আজ সেই আমরা আমাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত। বাধ্য হইয়া আমরা কাপুরুষ হইয়াছি, আমাদের পৌরুষ সম্বন্ধে কেহ পরিহাস করিলে আমরা তাহার প্রত্যুত্তর দিতে পারি না—আমাদের গৃহ ও মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি না।

আমাদের এদেশের জনসাধারণের সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বর্ত্তমানে যে কমিশন বসিয়াছে তাহার অনুসন্ধান-ফল যাহাই হউক না কেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য স্বেচ্ছায় আগত লোক দ্বারা একটী রাষ্ট্রীয় সেনাদল গঠন করা। বর্ত্তমানে যে স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ আছে তাহা দ্বারাই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। তারপর যাহাতে জাতি বাহিরের সকল প্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে অক্ষত রাখিতে পারে, তজ্জন্য নৌ-যুদ্ধ ও এরোপ্লেন-যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

দেশের সাধারণ আইনের বহির্ভূত পথে দেশসেবা এবং স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টার ফলে যাঁহারা আজ নির্ব্বাসিতাবস্থায় পৃথিবীর সুদূর কোণে অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতেছেন এবং মাতৃভূমি ও গৃহে প্রত্যাগমনের প্রবল বাসনার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ রাখিবার জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ জানাইতেছি। যৌবনচাঞ্চল্যের একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহাদের অনেকেই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। দুঃখ দারিদ্র্যের ভীষণ অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া তাঁহারা দরিদ্রের, পতিতের এবং দলিতের সেবার জন্য নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন।

কোন প্রকার সংগ্রাম করিতে হইলে যথোপযুক্ত প্রচার কার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। আমাদের

ইহা না থাকাতে প্রবল বাধা হইতেছে। আমরা যে কেন যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করি নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বিস্তারিত ভাবে রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যের জন্য এবং জনসাধারণকে তাহাদের নাগরিক ও সামাজিক অধিকার, তাহাদের প্রতি কি অন্যায় করা হয়, আমরা কোন্ সংগ্রামে ব্যাপৃত এবং যে অর্থ-নীতি দেশের এত হানি করিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার জন্য আমাদিগকে অবিলম্বে একটি প্রচার বিভাগ খুলিতে হইবে। যাঁহারা অন্য প্রকারে সাধারণের কার্য্যে যোগ দিতে পারেন না, তাঁহারাও কুটিরশিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

দেশীয় ভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত জাতীয়ভাব প্রচারক সংবাদপত্র সমূহ আমাদের প্রচার-কার্য্যের বাহন স্বরূপ হইবে। সর্ব্বোপরি পৃথিবীর প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ভারত সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য একটি বিদেশী সংবাদ বিভাগ খোলা আবশ্যক। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করাও আবশ্যক।

দ্বিধাবিভক্ত দুঃখিত চিত্তে আমি এখন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার কথা বলিতেছি। হিন্দুমুসলমান মিলনের জন্য আমি জীবন পণ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া আমার আশার তন্ত্রীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাহার কথা ভাবিতে গেলে আমার চক্ষের জল রক্তধারায় পরিণত হয়। যে সমস্ত শোচনীয় ঘটনা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ আনয়ন করিয়াছে, সেই সমস্ত ঘটনা কতটা ন্যায়সঙ্গত তাহা আমি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শিক্ষাক্ষেত্রে, নাগরিকের কার্য্যে, রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া আমার মুসলমান ভ্রাতারা যে স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি প্রকট করিতেছেন, তাহারও কারণ আমি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মিলিতই হউক বা পৃথকই হউক, যে কোন নির্ব্বাচন মণ্ডলী হইতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন যে রাষ্ট্রীয় শক্তির পক্ষে হানিকর সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই।" আমি এ কথা মানিতে বাধ্য যে, হিন্দু এবং মুসলমান নেতৃগণের একান্ত চেষ্টা ভিন্ন বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা, ভয়, অবিশ্বাস, ও ঘৃণা—এই ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে আমাদের উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

আমি আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুন। তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করুন যে মুসলমানের 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কত দৃঢ়। বৈদেশিক প্রভুত্বের অত্যাচারে মুসলমান অধ্যুষিত দেশসমূহ আজ জর্জ্জরিত, ভারতের সপ্ত কোটি মুসলমান আজ তাহাদের দুঃখে সমদুঃখী। আমি আমার সহকর্ম্মী-দিগকেও অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যদিও সিরিয়া, ইজিপ্ট, ইরাক এবং আরবের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য ব্যস্ত, তথাপি তাঁহাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য আছে তাহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন। হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পর পরস্পরের মত সহ্য করিবার চেষ্টা করে, যদি কেহ কাহারও উপাসনায় বা জীবনযাপন-পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ না করে, একে অপরের ধর্ম্মবিহিত আচার এবং বলি প্রদানে বাধা না দেয়, যদি পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মের নিহিত সৌন্দর্য্য এবং সভ্যতার মহত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে, যদি উভয় সম্প্রদায়ের নারীগণ সখ্যবন্ধনে আবদ্ধা হইয়া স্ব স্ব সন্তানগণকে উভয়ের মাধুর্য্যের মধ্যে গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে আমাদের বাসনা পূরণ হইতে আর কয় দিন?

দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিপতি এবং প্রজাদের সহিত আমরা যদি সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের চেষ্টা না করি তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। আমরা তাঁহাদের অন্যান্য স্বার্থের জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছি।

সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহের কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ভৌগলিক বিশেষত্বের ফলে এই সমস্ত প্রদেশের শাসনপদ্ধতি, স্থায়ী সামরিক শাসনেরই রূপান্তর। তাহাদিগকে আমাদের যথাশক্তি সাহায্য করিতে হইবে।

এইগুলি আমাদের কার্য্যের অঙ্গস্বরূপ কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য অবিলম্বে স্বরাজ লাভ করা। এমন বহু প্রতিষ্ঠাবান্ কংগ্রেস ভক্ত আছেন, যাঁহারা এখন ব্যবস্থাপক সভাসমূহ দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া, মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত জনহিতকর কার্য্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং চরকার বাণী প্রচার করিতেছেন ও আমাদের সমাজের যাহাদিগকে আমরা মানুষের অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিত রাখিয়াছি, সেই দলিতদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজদলই মাত্র একমাত্র দল,—যাঁহারা আমলাতন্ত্রের সহিত প্রকৃত সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। এই সময়ে অন্যান্য সকল দলের কংগ্রেসে প্রবেশ করা উচিত নহে কি? অভীষ্ট সাধনের জন্য সমস্ত শক্তি মিলিত হইয়া কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস তাঁহাদিগকে উন্মুক্তদ্বারে আহ্বান করিতেছে।

তাঁহাদের সকলেই প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে শাসনসংস্কার নবযুগ আনয়ন করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহা মরীচিকা ভিন্ন আর কিছু নহে। শাসনসংস্কার জনসাধারণের হস্তে যে ক্ষমতা অর্পণ করিবে বলিয়া ভরসা দিয়াছিল তাহা শূন্যগর্ভ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কতটা অন্যায় সহ্য করা যাইবে এবং কতটা অধিকার বজায় রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। আমার ব্যক্তিগত মত যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা সকলেই স্বায়ত্তশাসনের প্রারম্ভ স্বরূপ ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা চাহেন। কমনওয়েল্থ অফ ইণ্ডিয়া বিলে এবং ব্যবস্থাপরিষদ হইতে প্রতিনিধিগণ যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতেও ইহা বিশেষ করিয়াই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মর্য্যাদা এবং আত্মদানের অপূরণীয় ক্ষতি না করিয়া ভারত এই দাবী আর কমাইতে পারে না; আমাদের ভবিষ্যৎ মনোভাব কি দাঁড়াইবে তাহা বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি গবর্ণমেণ্ট অকপট হন এবং তাঁহাদের সদিচ্ছার প্রমাণ দেন তাহা হইলে অবিলম্বে আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যদি আগামী বসন্ত কালের অধিবেশনের পূর্ব্বে কোন উত্তর না পাওয়া যায়, অথবা গবর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করেন, অথবা এমন কিছু প্রদান করেন, যাহা গ্রহণের অযোগ্য,—তাহা হইলে সকলকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া এবং কৈলাস হইতে কন্যাকুমারী, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসীকে জাগ্রত, সংহত ও শিক্ষিত করিয়া সম্মিলিতভাবে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হইবে। তাহাদিগকে আরও শিক্ষা দিতে হইবে যে, দাসত্বের অকথ্য গ্লানি হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিয়া আমাদের সন্তানগণের জন্য স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন ত্যাগই মহৎ নহে, কোন দুঃখই অসহনীয় নহে, কোন মৃত্যুই ভীষণ নহে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয়, বিশ্বাসঘাতকতা ও নৈরাশ্য অমার্জ্জনীয় পাপ।

করযোড়ে কাতর কণ্ঠে আমি ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আসন্ন সঙ্কটকালে যেন আমরা অটল বিশ্বাস এবং অদম্য সাহস পাই—যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া অদ্যকার কার্য্য আরম্ভ করিতেছি, তিনি যেন আমাদিগকে বিজয়ে নম্র রাখেন। উপনিষদের ললিত-ভাষায় প্রার্থনা করিতেছি—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা মৃতং গময়

—আমাদিকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

স্ত্রীশিক্ষা ও প্যারীচাঁদ মিত্র

শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র।

"মাসিক পত্রিকা" সম্পাদন ব্যতীত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় স্ত্রীপাঠ্য কয়েকখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বামারঞ্জিকা ও অভেদী-

বামাতোষিনী প্রধান। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রাচীন আর্য্যরমণীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রবর্ণিত প্রধান প্রধান আর্য্যনারীদিগের পরিচয় আছে, অধিকন্তু তাঁহাদের দায়াদি, বাসস্থান-গৃহ, পরিচ্ছদাদি, উৎসবে ও বিদ্যানুরঞ্জন সভায় গমন, রাজ্যগ্রহণ, বীরভাব, পতিব্রতা ধর্ম্ম ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজি পত্রিকায় Development of the female mind in India নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

সে সময়ে মহাত্মা কর্ণেল অলকট ও ম্যাদাম ব্লাভট্স্কিমহোদয়া আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরীতে অবস্থিতি করিতেন। ম্যাদম ব্লাভট্স্কি প্যারীচাঁদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অশেষ ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি সমালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ১২৯৯ সালের ২রা মাঘ তারিখের সঞ্জীবনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেনঃ—"ঘোর কুজ্ঝটিকা পূর্ণ অমানিশার অন্ধকারে গম্য স্থানে পৌঁছিবার পক্ষে যেমন আলোক, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী বাঙ্গালাভাষার পক্ষে সেইরূপ। যখন দেশে উপন্যাস লিখিবার ও পত্ত লিখিবার বেশী প্রচলন ছিল না এবং লোকে তাহা পারিতও না, তখন মহাত্মা

প্যারীচাঁদ যে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলেন সে বর্ত্তিকার আলোতে বাঙ্গলাভাষা এখন মহা জ্যোতি সম্পন্ন হইয়াছে। মৃত মহাত্মা যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান তাহার ফল ভোগ করিতেছে। ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ভাবে মগ্ন হইয়া বিলুপ্ত রত্ন সংগ্রহ করিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিয়াছেন। আশা করি সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে হারানো রত্নের সমাদর করিবেন।"

মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত আরও দুইটি আখ্যায়িকা প্রকাশ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। গতবারের ন্যায় এবারেও আমরা কোনরূপ বর্ণাশুদ্ধি বা ছেদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করি নাই।

(১)

দুঃখের সময় সুবোধ স্ত্রী স্বামীকে সুপরামর্শ দেন। (১২৬১ সাল, চৈত্র সংখ্যা)।

কমবেস্ পঞ্চাশ বৎসর হইল ফ্রান্স্ অর্থাৎ ফরাসীদিগের দেশের রাজশাসন উলটপালট হইয়া যায়। প্রজারা রাজার ও রাণীর প্রাণদণ্ড করে। রাজা মরিলে পর দেশের শাসনকর্ত্তা কে হইবেক এই বলিয়া দেশময় বড় গোলযোগ হয়, সে গোলযোগে অনেক ভদ্র লোক মারা পড়ে, অনেকেরও ধনসম্পত্তি সকল যায়। এই কারণ বশতঃ এক ভদ্র পরিবার সর্ব্বস্ব হারাইয়া দুঃখি হইলে, গৃহিনী বড় সুবিবেচনা পূর্ব্বক চলেন, সেই গৃহিণীর বৃত্তান্ত নিম্নে লেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পরিবারের কর্ত্তা স্বভাবতঃ বড় রাগী ছিলেন, অথচ পত্নী ও ছেলেদিগের প্রতি তাঁহার বড় স্নেহ ছিল। পরিবারের অন্ন বস্ত্রের দুঃখ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত কাতরতা পূর্ব্বক সর্ব্বদা বলিতেন,—আর ক্লেশ সহ্য হয় না, এক দিবস আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব, মরিলেই এই যন্ত্রনা হইতে মুক্ত হইব, মরণ ভিন্ন আমার আর কোন উপায় নাই। স্বামীর ব্যাকুল চিত্ত দেখিয়া গৃহিণী মনে ভাবেন,—কর্ত্তার রাগান্বিত স্বভাব, অল্প অল্প গোঁয়ারে বুদ্ধি, দুঃখের জ্বালায় কখন কি করিয়া বসিবেন বলা যায় না, তিনি ছেলেদিগের খাওয়াপরার দুঃখ দেখিয়া সর্ব্বদা কাতর হন, কি করিলে তাঁহার কাতরতা ঘুচিয়া যাইবে, তাহা কিছুই ঠাওরাইতে পারিনা, কেবল ভাবিয়া মরিতেছি। কর্ত্তা ভদ্র লোক, এ স্থানে তাঁহাকে সকলে চেনে, ছোট কর্ম্ম করিয়া সংসার চালাইলে তাঁহার অপমান বোধ হইবে, ইহা তিনি কখন করিবেন না। তিনি ভিক্ষাও মাগিবেন না, ভিক্ষা করিলেই যে ভিক্ষা পাওয়া যায় তাহা নয়, ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা না পাইলে বড় মনস্তাপ হয়। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া গৃহিণী বড় অস্থির হন, পরে তাঁহার মনে হঠাৎ একটি উপায় উদয় হয়, তাহা তখনি স্বামীর নিকটে আসিয়া বলেন,—প্রাণনাথ, ভাবিত হইও না, আমাদিগের সর্ব্বস্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু আমারা নিরুপায় নয়, আমার গতর আছে, ছেলেরাও দুর্ব্বল নয়, স্বদেশে আলাপি লোকের সম্মুখে ছোট কর্ম্ম করিতে হইলে বড় লজ্জা হয়, এই নিমিত্তে চল আমরা বিদেশে গিয়া বাস করি, সেখানে আমাদিগের জানাশুনা কেহই থাকিবেক না, সেখানে ছেলেদিগে লইয়া যেমন করে পারি গতরে খাটিয়া দিন নির্ব্বাহ করিব, ইহাতে যদি অকুলান হয়, তবে আমি লুকাইয়া ভিক্ষাও মাগিব। এই সকল কথা গৃহিণী কর্ত্তাকে বলেন। কর্ত্তা মৌনভাবে ক্ষণেক কাল সকল কথা বিবেচনা করেন, পরে উত্তর দেন, আমি যে পর্য্যন্ত বেঁচে থাকিব, তোমাকে কখন ছোটলোকের মতন ভিক্ষা করিতে দিব না, তুমি যেমন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিলে, তেমনি আমার কি করা উচিত তাহা আমি জানি। ইহা বলিয়া কর্ত্তার যৎকিঞ্চিৎ যে বিষয়আসয় ছিল, তাহা বেচিয়া ফেলেন, ইহাতে যাহা সঞ্চয় হয় তাহা লইয়া পরিবার সমভিব্যবহারে বিদেশে গমন করেন। রাস্তায় পরিবার সকলি আপন আপন পোষাক ছড়িয়া চাসাদিগের মতন কাপড় পরে। পরে এক দূর দেশে পৌঁছিয়া তথায় একখানি খড়ো ঘর ভাড়া করিয়া বাস করে, ঘরের নিকটে জমি লইয়া পুরুষেরা চাষ ও বাগান

করে, মেয়েরা পশম ও পোণ লইয়া কাপড় বুনে। এই সকল কর্ম্মের দ্বারা যাহা সঞ্চয় হয়, তাহাতে পরিবারের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল, পরে তাহারা কখন খাওয়াপরা উপলক্ষে কোন দুঃখ পায় নাই।

বাঙ্গালির মেয়েরা, দেখ দেখি, স্ত্রীলোকের সুপরামর্শের দ্বারা স্বামীর পরিবারের কত উপকার হয়।

(২)

রাণীর অসাধারণ সাহস। (১২৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা)।

যেমন পুরুষের প্রধান গুণ সাহস তেমন স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ সতীত্ব কিন্তু স্ত্রীলোকেরও সাহস থাকা আবশ্যক। স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত ভীরু হইলে নানা উৎপাত ঘটে ও সন্তানাদিরও ভীরু স্বভাব হয়। যৎকালীন আকবর খান হিন্দুস্থানের বাদশাহ ছিলেন, দক্ষিণ অঞ্চলস্থ গরা দেশের রাজার লোকান্তর হইলে তাঁহার পত্নী দুর্গাবতী রাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণীর অধীনে ৭০ হাজার নগর ছিল—দেশের আয়ব্যয় সকল স্বয়ং দেখিতেন ও প্রজাদিগের বিচার আপনি করিতেন। তাঁহার সুশাসনে কাহার কিছু অনিষ্ট হইত না—সুতরাং সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন।

এক ব্যবসায়ি লোকদিগের বন্ধুভাবে দীর্ঘকাল চলা কঠিন। কেহ বা মনেতে কেহ বা বাক্যেতে কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা হিংসা প্রকাশ করে। আকবর-খান রাণীর বিষয়বিভবের কথা শুনিয়া ভাবিলেন এ বেটী বড় বাড়িয়া উঠিল—ইহাকে বিনাশ করা শ্রেয়। এই স্থির করিয়া আসফ খান সেনাপতিকে, অনেক সৈন্য দিয়া গরা দেশ জয় করিতে পাঠাইলেন।

আকবর খানের সৈন্য উপস্থিত হইলে রাণী তৎক্ষণাৎ রণসজ্জা করিয়া আপনার যোদ্ধাদিগকে লইয়া রণস্থলে আসিলেন, সৈন্য সকলে কল ২ ধ্বনি বাহ্বা স্ফোটন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাণী স্বয়ং সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া সৈন্য সকল যুদ্ধে উৎসুক হইয়া একেবারে মার ২ শব্দে চলিতে লাগিল কিন্তু কাতরেবন্দীর গোলমাল হওয়াতে রাণী স্থির হইয়া বলিলেন তোমরা থাম, আমি হুকুম না দিলে যুদ্ধ করিও না। পরে ফউজের মিছিল করিয়া আপনি সম্মুখে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। আসফ খানের সৈন্য অনেক মারা পড়িল ও হটিয়া গেল।

শত্রু সৈন্য এত নষ্ট হইল যে রাণীর ফৌজ-দেরও আতঙ্ক হইল এজন্য আগুবেড়ে আর যুদ্ধ হয় না। রাত্রিতে রাণীর মন্ত্রি ও কর্ম্মচারিরা পলায়ন করিল তথাচ তাঁহার কিছুমাত্র ভয় হইল না। পরদিন প্রভাতে এই সংবাদ শুনিয়া আসফ খান নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিলেন। রাণী অবিলম্বে শত্রুপ্রতি স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা বিয়রজা মাতার পার্শ্বে যুদ্ধ করিতেছিলেন—দৈবাৎ অস্ত্রাঘাতে ঘোড়াথেকে নীচে পড়িয়া গেলেন। মাতা এই মনস্তাপে তাপিত না হইয়া বলিলেন ইহার শরীর এখান হইতে লইয়া পশ্চাতে রাখ কিন্তু সৈন্য সকল রাজার মৃত্যু দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল, রাণী একাকিনী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটা তীর তাঁহার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল, রাণী হাত দিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফলাটা ভাঙ্গিয়া লাগিয়া থাকিল। পরে আর একটা তীর গলায় প্রবেশ করিল—সে তীর বাহির করিয়া অজ্ঞান হইয়া হাওদার নীচে পড়িয়া গেলেন। মাহুত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বলিল মা ঘোরতর বিপদ, এক্ষণে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাব। রাণী চৈতন্য পাইয়া উত্তর করিলেন—যুদ্ধেতে পরাজয় হইলাম বটে কিন্তু অপমান স্বীকার কখনই করিব না। এই বলিয়া একখানা তলওয়ারের দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

লণ্ডনের উপপ্রান্তে

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

১৩ই জুলাই, রবিবার। সেদিন আর ঘড়ির কাঁটা মেনে চলতে ইচ্ছা হ'লনা, খুব অলস ভাবেই শুয়ে পড়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দিলাম। বিকাল পাঁচটায় বিছানা ছেড়ে একটু নিকটের কোন বাগানে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হল। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বেড়াতে যেতে ডাকতেই তারা আনন্দে সেজে এল। ডলি নামে মেয়েটি সকলের বড়, বয়স তার বার বছর, আর দুটি ছোট ছেলে—ফ্রাঙ্ক এগার বছরের, এরিক পাঁচ বছরের। বাড়ীতে আড়াই বছরের আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম বিলি; সেও যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল কিন্তু তার পিতা তাকে ভুলিয়ে উপরে নিয়ে গেলেন।

ডলির মা আমাদের পরামর্শ দিলেন সহরের বাইরে একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে বেড়াতে যেতে। আমরা ঠিক ছটার মধ্যে চা পান ও খাবার খাওয়া শেষ করে বের হলাম। ১৫২ নং বাসে চড়ে Edgware Road ধরে ১৫ মিনিটের মধ্যে সহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়ে সেই ছোট খালের ধারে নামলাম। চারদিকেই বেশ ফাঁকা জায়গা, সহরের গণ্ডগোল থেকে বাইরে গিয়ে প্রাণটা যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রথমেই আমরা একটা ছোট পাহাড়ে উঠলাম, পাথুরে পাহাড় নয়—মাটির পাহাড়। সেখানটা ঘাস আর ছোট ছোট ফুলে ভরা। আমরা সকলেই ছোট্ট ছোট ফুল তুললাম। আমাদের দেশের ফসলের জমি নষ্ট করা ফুলকাঁটা গাছও সেখানে দেখলাম।

ক্রমে আমরা সেই ছোট পাহাড়টির একেবারে মাথায় গিয়ে উঠলাম। অমনি আমাদের চোখে নানা দূরবর্ত্তী স্থান ভেসে উঠল,—দক্ষিণে সহর, উত্তরে খাল, পাহাড়, ফাঁকে ফাঁকে সহরতলীর, ছোট ছোট সুন্দর পল্লী, মাঝে মাঝে শস্যের ক্ষেত।

পাহাড়ের উপর চারদিক দেখে আমরা ঐ খালের ধারে বেড়াতে যেতে মনস্থ করলাম। খালের ধারে গেলাম, ছোট পোল পার হয়ে অনেক লোকে ওপারে বেড়াতে যাচ্ছে। ওপারের গাছের তলায় কত লোক বসে গল্প করছে, কত লোক বেড়াচ্ছে। আমরা পোল পার না হয়ে এখানেই খালের ধারে ধারে চললাম। এক বুড়ো তার সঙ্গের কুকুরটিকে নিয়ে বেশ মজা করছিল। একগাছ খাটো লাঠি খালের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছিল আর কুকুরটা তৎক্ষণাৎ সাঁতরে গিয়ে সেই লাঠিটা কামড়ে ধরে এনে বুড়োকে দিচ্ছিল। আমরাও বুড়োর সেই খেলায় যোগ দিলাম।

তারপর খালের ধারে ধারে আমরা আরও খানিক চললাম। ফ্রাঙ্ক ভারি দুষ্ট, সে একটা লাঠি দিয়ে পচা পানা টেনে টেনে উপরে আনছিল। জলে নামা চলেনা, সকলেরই পা জুতা-ষ্টকিংএ আঁটা। খানিকদূর গিয়ে নদীরতীরে একটা মটর শাকের জমী পেলাম। দুচারটা মটরের সীম তুললাম। ওদেশে মটরের সীম খুব আদরে খায়, কাঁচা মটর সবুজ অবস্থায় শুকিয়ে রেখে অনেকেই সারা বছর ধরে খায়। মটরের শাক যে একটা সুখাদ্য এটা ছেলেরা জানতো না। দেশে আমরা কেমন করে শাক খাই তা আমি তাদের কাছে বর্ণনা করলাম। মটরের ক্ষেত পার হয়ে আমরা খালের ধারে বড় একটা নোংরা জায়গায় গিয়ে পড়িলাম। জল কমে ধাপ বেরিয়ে পড়েছে। সেখানটা কাদা, আবর্জ্জনা ও হাড়গোড়ে ভরা। একটা মরা কুকুর, একটা মরা মোরগ আর একটা মরা পাখী—এইসব দেখলাম। সেখানে সবই আমার বড় ভাল লাগছিল, লণ্ডন সহরের বৈভব দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছল। লণ্ডনের বাইরের ওই অঞ্চলের মানচিত্রের বই

আমাদের সঙ্গে ছিল, কখন কোথায় গিয়েছি সবই মানচিত্রে দেখছিলাম।

তারপর বাঁয়ে খাল ও ডাইনে সারি সারি গৃহস্থ বাড়ী রেখে আমরা আরও দূরে চললাম। বিকালে গৃহস্থেরা নদীর তীরের দিকে তাদের ছোট ছোট বাগানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে গল্প করছিল। অনেকে বাগানে কাজও করছিল। ছোট ছেলেরা আমার পানে চেয়ে অপূর্ব্ব কালো দাড়ীযুক্ত নরদেহ-ধারী জীবটিকে দেখে বড় আনন্দ পাচ্ছিল। লণ্ডনের সে রকম জায়গায় বঙ্গবাসীরা কখন বোধ হয় আর যান নি।

খালধারে চলতে চলতে একটা খুব বড় রাস্তা পাওয়া গেল। সেখানে নদীর পোলের উপর দিয়ে অনবরত ট্রাম, বাস, মোটর আর লোকজন যাতায়াত করছে দেখলাম। ম্যাপে দেখলাম রাস্তাটা বহু দূর চলে গিয়েছে। আমরা পোল পার হয়ে রাস্তার অপর পারে একটা পোড়ো বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম—ভাঙ্গা দালান কোটা, ভাঙ্গা একখানা মালটানা মটরগাড়ী পড়ে রয়েছে, একধারে প্রকাণ্ড খড়ের পালা। ফ্রাঙ্ক গিয়ে ভাঙ্গা মটরগাড়ী খানার মধ্যে লুকাল। এদিকে এরিক (৫ বছরের ছেলেটি) একটা কালো বিড়ালের সঙ্গে ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিল। কিছুক্ষণ ছুট ছুটি করে সে বিড়ালটাকে ধরে আনল। ডলি সেই বাড়ীর পাশে জঙ্গলে ফুল তুলতে গেল।

সকলেই এইসব বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত, আমি অতি কষ্টে সবাইকে একত্র করে আরও খানিক দূর গিয়ে দেখে আসবার মতলব করলাম। ঘড়িতে তখন আটটা, আমরা আরও একঘণ্টা বেড়াব ঠিক হল। জুলাই মাস, নটার পর সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হয়। আমরা এক ফাঁকা মাঠে খড়ের জমীর দিকে চললাম। ডলি তার ফুলের তোড়াটি সুন্দর করে সাজিয়েছিল। সে তোড়া হাতে, ফ্রাঙ্ক আগাছা সমেত ফুল হাতে আর এরিক সেই কাল বিড়াল কোলে ক'রে - সবাই আমরা চললাম; জমীর মধ্যে আমরা খুবই আনন্দে ছুটাছুটি আরম্ভ করলাম। খড় কোথাও লম্বা, কোথাও খাট, কোথাও একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ আমি একটা লম্বা শনের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম—হো হো করে তিন জনে দৌড়ে এসে আমাকে খুঁজে বের করল। লণ্ডন সহরের বাইরে ফাঁকায় গিয়ে কি আনন্দ যে পেলাম তা বলতে পারিনে।

তারপর আমরা একটা বাগানের পাশ দিয়ে চললাম। তার চারদিক এমন সুন্দর করে সাজান যে, হঠাৎ দেখলে আকাশ-ছোঁয়া দেওয়ালে ঘেরা বাগানটি বলে বোধ হয়। বাগানের শেষ সীমানায় বড় রাস্তার ধারে এসে উঠলাম। সেখানে রেল গাড়ীর মত গাড়ীর মধ্যে অতি ছোট ছোট দোতলা কুটুরীতে অনেক গরীব পরিবার বাস করছে দেখলাম। গাড়ীতে চাকা আছে, দরকার মত স্থানান্তরে যাতায়াত করতে পারে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম ইংলণ্ডে গরীব বা পথের লোকদের বাসের জন্য সরকারী গাড়ী আছে,—এ সব দেখে সে কথা মনে হল। ও, কত কষ্টে যে তারা বাস করে তা বলা যায় না। দেখলাম গায়ে তাদের ময়লা জামা; ছেলেদের গায়ে ছেঁড়া জামা, পরণে ময়লা প্যাণ্ট, ছেঁড়া জুতো পায়। দেখে বড়ই কষ্ট হল। অল্প পরে আমরা সদর রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তায় ট্রাম চলছিল। তখন আমরা ঘরে ফিরব, কিন্তু এক মুস্কিল হল। এরিক তার বিড়াল কিছুতেই ছাড়বেনা, ডলিও নিয়ে যেতে দেবেনা। আমি নিজে যেতেই বললাম। ডলি বুঝিয়ে বলল, পথের বিড়াল নেওয়া উচিত নয়। অবশেষে এরিক বিড়ালটাকে ছেড়ে দিল।

তারপর আমরা আর খানিকটা ঘুরে ফিরে চারদিকের দৃশ্য দেখলাম। ভাবলাম সভ্যতার প্রভাব কি এতই গুরুতর যে, সহর ছেড়ে মাঠঘাটে এসেছি তবুও চারদিকে যেন সব সুসজ্জিত রয়েছে, প্রত্যেক গাছপাতাদি পর্য্যন্ত মানুষের পরিণত বুদ্ধির

পরিচয় দিচ্ছে। মনে মনে বললাম, লণ্ডন, তুমি এখানেও এত সুন্দর!

নটার সময় সূর্য্য ডুবে গেল। দশটারি পর দিনের আলো নিভে যাবে—আমরা ফিরবার জন্য ট্রামপোষ্টের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেদিন রবিবার। এত লোক সহরের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল যে, পর পর ১২।১৪ খানা ট্রাম ও মোটর বোঝাই হয়ে আমাদের পোষ্টে না থেমে চলে গেল। অতি কষ্টে আমরা খানিকটা পথ মোটরে, খানিকটা পথ বাসে করে ঘরে ফিরলাম।

বঙ্গমাতা

শ্রীরাখালদাস গোস্বামী বি-এ।

বঙ্গ মা তোর অঙ্গ সোনার
কেমন করে হচ্ছে মলিন,
অশ্রু-নীহার করছে যে ক্ষীণ
মা তোর দুটি অক্ষি-নলিন
বনভূমির মুক্ত কেশে
কই মা জোনাক্ বেড়ায় হেসে
নদীকূলের আকুল তানে
পায়ের নূপুর কই মা বাজে?
ত্যক্ত নূপুর সতই আজি
রুদ্ধ নদী পড়েই আছে!

অঙ্গনে তোর বঙ্গবধূর
কঙ্কণতাল আর না বাজে,
স্নিগ্ধ চপল শিশুর হাসি
কই মা ফোটে ভবন মাঝে?
স্নানের ঘাট আজ নীরব বিজন,
বারি লবার কই আয়োজন
বধূর কাঁকে কলসী হতে
উথলে জল কই বা উঠে;
সিক্ত পদের অলক্ত-দাগ
বালির মাঝে আর না ফুটে!

ঘরের যত মুক্তা মণি
মাটির দরে বিকায় হাটে,
কই মা সোনার ধানের রাশি
তোমার শ্যামল বিপুল মাঠে?
বিভব মাঝে রিক্ত তুমি
আঁধার উজল বক্ষ-ভূমি
দীপালোকে তাঁতির মাকু
মাতায় না আর গভীর রাত,
ঘরে ঘরে বধূর করে
কই মা উঠে চরকা মাতি?

মা তোর অযুত তনয় আজি
কঙ্কালসার অঙ্গ ব'য়ে
মরণ-পথে যাচ্ছে চলে
দৈন্য-চাপে হতাশ হয়ে।
তোমার বিপুল পয়োধরে
পীযূষধারা পড়ত ঝরে
দেশে দেশে অসার জাতি
নবীন হয়ে উঠত পানে,
বন্ধ ধারা! শুষ্ক কোটি
নয়ন চেয়ে বক্ষ পানে!

নানাকথা

ময়মনসিংহে ধাত্রী-বিদ্যালয়—

সম্প্রতি ময়মনসিংহে একটি ধাত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা রমণীগণ এখানে বিনা বেতনে সরকার প্রদত্ত পুস্তক ও যন্ত্রাদির সাহায্যে ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন। আমরা এই বিদ্যালয়ের উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কাঁঠালপাড়ায় মহিলা-সমিতি—

মহিলাদের মানসিক বৃত্তি সজাগ করিবার উদ্দেশ্যে, গত ৭ই ডিসেম্বর নৈহাটী, কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-বালিকা-বিদ্যালয়ে একটি মহিলা সমিতি শ্রীমতী শৈলবালা রায় ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির বিশেষ উদ্দেশ্য - ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান প্রভৃতি একস্থানে উপবেশন এবং পরস্পরের সহিত নির্ব্বিচারে মেলামেশা করিয়া নারীকল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা ও কার্য্য করা। সকলের সুবিধার জন্য বেলা বারটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন হইতেছে। ইহার মধ্যে তিনটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ষাট জন মহিলা সভ্য হইয়াছেন। শ্রীমতী নরেন্দ্রবালা দেবী সভানেত্রী, শ্রীমতী সুধাবালা দেবী কোষাধ্যক্ষ, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী সম্পাদিকা এবং শ্রীমতী ভক্তিলতা রায় সহকারী সম্পাদিকা নিযুক্তা হইয়াছেন।

ছাত্রীগণের ব্যায়াম প্রতিযোগিতা—

বরোদা রাজ্যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্যায়াম প্রভৃতির প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় মহারাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ এবং বরোদা কলেজের ছাত্রীগণ অবতীর্ণ হন. চৌদ্দ বৎসর ও তদধিক বয়স্কা বালিকাগণের প্রতিযোগিতায় পর্দ্দার বন্দোবস্ত ছিল। মহারাণী সাহেবা পারিতোষিক প্রদানের পর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চায় প্রয়োজনীয়তার বিষয় ব্যক্ত করেন। বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্রই মেয়েদের মধ্যে এই প্রকার অল্পবিস্তর ব্যায়াম চর্চ্চা হওয়া আবশ্যক।

বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ—

শান্তিপুর রামনগর মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাণাঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোক এবং কয়েকজন মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। রাণাঘাট মহকুমার মধ্যে বালিকাদের জন্য মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আর নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এবং সার্কেল অফিসার মিঃ মির্জ্জা সাহেব বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে স্বীকৃত হইয়া বিদ্যালয় পরিচালকগণের প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বিদ্যালয়টি সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত হইয়া রাণাঘাট মহকুমায় নারীশিক্ষার পথ প্রসার ও দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করুক।

রন্ধন প্রতিযোগিতা—

সম্প্রতি শ্রীহট্টে সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে একটি রন্ধন প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। ১৮ জন মেয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমতী সুনীতিবালা কর নাম্নী একটি বালিকা প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। প্রত্যেক স্থানে এই প্রকার রন্ধন প্রণালীর আলোচনা হওয়া ও উৎকর্ষের জন্য পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

লেডি রেডিংএর দান—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দরিদ্র রোগীদের ব্যবহার জন্য বড়লাট-পত্নী লেডি রেডিং সম্প্রতি দশহাজার টাকা ব্যয়ে একটী "এক্সরে" যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। সহরের দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে।

তুরস্কের মহিলার দাবী—

কনষ্টান্টিনোপলের সংবাদে প্রকাশ যে তুরস্কের নারীসমাজের। একটি বিশেষ পরিবর্ত্তনের ভাব আসিয়াছে। তাঁহারা বর্ত্তমানে মহিলা সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের দাবী নিজেরাই বুঝিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রতিসপ্তাহে তাঁহারা একদিন মসজিদে সমবেত হইয়া তাঁহাদের দাবী ও অভাব অভিযোগের বিষয় আলোচনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তাঁহারা সপ্তাহে একদিন করিয়া কনষ্টান্টিনোপলের মসজিদ অধিকারে পান তজ্জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারের ডাইরেক্টরকে অনুরোধ করিয়াছেন। বায়স্কোপে যে সব নারীচিত্র দেখান হয় অতঃপর তাহা একজন মহিলা ইন্‌সপেক্টর কর্ত্তৃক যাহাতে অনুমোদিত হয় তদ্বিষয়ে উক্ত মহিলা সমিতি শীঘ্রই সরকারপক্ষকে অনুরোধ করিবেন।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে দাদাভাই নৌরজীর দশটি উপদেশ—

পরলোকগত দাদাভাই নৌরজির ৮৬ বৎসর বয়সের সময়ে জনৈক সংবাদপত্রের সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেন যে, এই অধিক বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য এত ভাল আছে কি করিয়া। উত্তরে তিনি বলেন—আমি মাংস মদিরা প্রভৃতি কখনও আহার করিনা এবং মনে কোন তামসিক ভাব আনি না। তিনি বলেন যে, আমি নিম্নলিখিত দশটি নীতিবাক্য মানিয়া চলি—

(১) স্থূলদেহ ভাল থাকার নামই স্বাস্থ্য নহে। শরীর ও মন উভয় ভাল থাকার নামই স্বাস্থ্য।

(২) শরীর, মন ও আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতিই স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ।

(৩) কেবল খাওয়া দাওয়াতেই স্বাস্থ্য লাভ হইতে পারে না। স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ সদগুণ। মানুষের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সদগুণ দ্বারাও স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(৪) স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের পরস্পর সম্বন্ধ বর্ত্তমান; এই কারণে উভয় শরীরেরই আহার যোগান দরকার। পান, ভোজন স্থূল শরীরের এবং সদাচার সূক্ষ্ম শরীরের আহার।

(৫) জ্বর, কাসি, ক্ষয় ইত্যাদি স্থূল শরীরের এবং কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, আলস্য ইত্যাদি সূক্ষ্ম-শরীরের ব্যাধি।

(৬) স্থূল-শরীরের রোগ প্রথমে স্থূল-শরীরকে আক্রমণ করিয়া পরে বিকার আনে আর মানসিক রোগে শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

(৭) সাত্বিক আহারবিহার শরীরকে নীরোগ করিয়া মনকে সত্বগুণসম্পন্ন করিয়া তুলে।

(৮) মদ, মাংস প্রভৃতি আহার মনকে তমোগুণী ও নীচ করিয়া তুলে।

(৯) পরোপকার, দয়া, ক্ষমা, নির্ভীকতা, উৎসাহ, সাহস, স্বজন-বাৎসল্য স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি উত্তম গুণ মনকে উন্নত করে এবং শরীরকে আরোগ্য আনিয়া দেয়।

(১০) যাহার শরীর ও মনে কোন ব্যাধি নাই, সেই যথার্থ নীরোগ ও যথার্থ সুখী।

বিকলাঙ্গ মানুষের ব্যবহার—

বিলাতে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ মানুষদের থাকবার জন্য সাধারণের সাহায্যে সুন্দর আশ্রম আছে। সেখানে তাহাদিগকে তাহাদের উপযোগী কাজ দেওয়া হয়। সেই সব কাজে তাহাদের ভরণপোষণের উপায় যদিই হয় না, তথাপি কাহারও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যাহারা একেবারে অক্ষম তাহারাও সকলের সঙ্গে সমান ভোগের অধিকারী। এ ছাড়া অনেক বামন, বিকৃত-মুখ, এক [illegible] বিহীন লোককে থিয়েটার ও ভোজবাজীওয়ালা লয় এবং তাহাদের দ্বারা নানা কৌতুকের অভিনয় [illegible]

নিখিল ভারত কংগ্রেস—

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর ক[illegible] ভারত কংগ্রেসের ৪০শ অধিবেশন হইয়া গিয়[illegible] সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়[illegible] তিন হাজার প্রতিনিধি এই অধিবেশনে [illegible] অধিবেশনকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিলেন। [illegible] ছিলেন প্রায় পঞ্চাশত জন। অন্যূন এক হা[illegible] অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে যোগদান [illegible] অধিবেশনের জন্য কেবল মাত্র খদ্দরে আবৃত করিয়া প্রকাণ্ড একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল ও তাহার চারিদিকে অভ্যাগতদের জন্য বাসস্থান তৈয়ারী করা হইয়াছিল। সমগ্র স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছিল তিলকনগর।

২৬শে ডিসেম্বর শনিবারে বেলা তিনটার সময় কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সঙ্গীত "বন্দেমাতরম" ও আরও কয়েকটি সঙ্গীত গীত হয়। তাহার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ মুরারীলাল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সভানেত্রীর অভিভাষণ পাঠের পর এই দিনের কার্য্য স্থগিত থাকে। ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার ও সোমবারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের অধিবেশন সম্পন্ন হয়। এই দুইদিন বর্ত্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের উপযোগী নানা আবশ্যকীয় প্রস্তাব উত্থাপিত, আলোচিত ও পরিগৃহীত হয়। এই কংগ্রেস উপলক্ষে কানপুরে স্বদেশী শিল্পের, বিশেষতঃ খদ্দরের একটী প্রদর্শনী হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী উহার দ্বার মুক্ত করেন।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা সভানেত্রী। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারত-মহিলা এই পদে বরিত হন নাই। শ্রীমতী নাইডুকে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া ভারতের জনগণ নারীশক্তি ও মাতৃজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমতী নাইডু যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। যে সমস্ত সমস্যা এই দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত ভারতের সম্মুখে আজ উপস্থিত, তিনি সংক্ষেপে সেই সকল বিষয়ের সমাধানের প্রয়াস করিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ অসার কথা বা অযথা বাগাড়ম্বর নাই। তিনি যে কবিত্বশক্তি ও বাগ্মীতার জন্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ

পরিবর্তন তাঁহার অভিভাষণের প্রতি ছত্রে এবং কবিতার ভঙ্গীতে তাহা সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা অভিভাষণটি স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছি।

কংগ্রেস সপ্তাহ—

কংগ্রেস সপ্তাহে কানপুরে যে সমস্ত সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) নিখিল ভারত কংগ্রেস, সভাপতি—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

(২) হিন্দু মহাসভা, সভাপতি—লালা লাজপৎ রায়।

(৩) খিলাফৎ কনফারেন্স, সভাপতি—আবদুল কালাম আজাদ।

(৪) আর্য্যসমাজ সম্মেলন, সভাপতি—টি, এল, বিশ্বানী।

(৫) রাজনৈতিক-বন্দী সম্মেলন, সভাপতি—স্বামী গোবিন্দানন্দ।

(৬) কৃষক ও শ্রমিক সম্মেলন, সভাপতি—লালা লাজপৎ রায়।

(৭) কবি সম্মেলন, সভাপতি—পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ বি,এ।

(৮) হিন্দুস্থানী-সেবাদল, সভাপতি—টি, সি, গোস্বামী।

(৯) সনাতন ধর্ম্ম সম্মেলন, সভাপতি—আচার্য্য রঘুবীর দয়াল এম, এ।

(১০) অস্পৃশ্য সম্মেলন, সভাপতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

(১১) মেথর সম্মেলন, সভাপতি—ডাক্তার সত্যপাল।

(১২) রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন, সভাপতি—কোন্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া।

(১৩) সাম্যবাদী সম্মেলন, সভাপতি—সিঙ্গুরা ভেলু চেট্টি।

(১৪) দেশীয় রাজ্যপরিষদ, সভাপতি—টি, সি, গোস্বামী।

(১৫) শিখ ধার্ম্মিক দীওয়ান, সভাপতি—সর্দ্দার মহতাব সিং।

(১৬) সঙ্গীত কনফারেন্স, সভাপতি—বিষ্ণু দিগম্বর।

(১৭) কুর্ম্মী ক্ষত্রিয়সভা, সভাপতি—বাবু বৃন্দাবন লাল।

(১৮) স্বদেশী প্রদর্শনী, সভাপতি—মহাত্মা গান্ধী।

(১৯) বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা।

(২০) আর্য্য-স্বরাজ্য সভা।

(২১) অধ্যাপক সম্মেলন।

(২২) লোকাল বোর্ড কনফারেন্স।

(২৩) আয়ুর্বিদ্যা পরিষদ।

(২৪) কনৌজিয়া মহাসভা।

(২৫) রাজপুত ধর্ম্মসভা।

(২৬) চৌরাশীয়া রাজপুত সভা।

(২৭) বর্ণঅরায় বৈশ্য সভা।

(২৮) গো-রক্ষিণী মহাসভা।

(২৯) শুদ্ধি সভা।

(৩০) তাম্বুলি সভা।

(৩১) ওমর বৈশ্য সভা।

(৩২) বিদ্যার্থী সম্মেলন।

(৩৩) পাঠাগার সম্মেলন।

(৩৪) পরলোক তাত্ত্বিক সম্মেলন।

পরলোকে মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ—

গত ২১ পৌষ মঙ্গলবার নাটোরের স্বনামধন্য মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মহোদয় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। এক শোচনীয় মোটর-দুর্ঘটনাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অশেষ সদ্‌গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর বংশধর ছিলেন। সাহিত্য সেবায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। তিনি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামক মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার "সন্ধ্যাতারা" ও "নূরজাহান" দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। আমরা মহারাজের পরলোকগত আত্মার সদ্গতি ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের দেশের অবস্থা—

ভারত এবং তাহার প্রত্যেক প্রদেশ এক সময়ে কত সৌন্দর্য্যে, কত ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের কি দুর্দ্দশা তাহারই একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। শিক্ষিতের হার শতকরা—জাপান ৯৭·৮, আমেরিকা ৯৫·৪, ইংলণ্ড ৯৭·৫, ভারত ৫·২, বাংলা ৯·৭।

২। মৃত্যুর হার হাজার করা—জাপান ১৫·৩, ইংলণ্ড ৯·৮, আমেরিকা ৮·৮, ভারত ৩০·৫, বাংলা ৩০·৯।

৩। শিশু মৃত্যু হাজার করা—জাপান ও আমেরিকা ৬৫, ইংলণ্ড ৬৬·২, ভারত ২৭৫, বাংলা ২১৩।

৪। গড়পরতা আয়ু—ইংলণ্ডে ৫০ বৎসর, আমেরিকা ৫৩ বৎসর, জাপান ৪৭ বৎসর, ভারতে ২২·৯ বৎসর।

৫। জন প্রতি দৈনিক আয়—ইংলণ্ড ৬৸০, আমেরিকা ১৪৷৷০, জাপান ৪৷৵০ ভারত /১০, বাংলা /১০।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৩য় বর্ষ { ফাল্গুন—১৩৩২ }

গান

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মা! তোমার সুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম;
কাণে কেবল তোমার বাণী আস্‌ছে ভেসে অবি....

পূবের পথে অরুণ-রথে
প্রভাত যখন ছুটে ধায়,
সাতটা রঙে রঙিয়ে দিয়ে
নৈশাকাশের নীলিমায়;
তখন তোমার বীণার তানে
পুলক-জাগা জীবন আনে,
পাখীরা তাই তোমার গানে
শুনায় কাণে তোমার নাম।

আবার যখন প্রদোষকালে
অস্তাচলে যান তপন,
শ্যামার গায়ে নীলাম্বরীর
জড়িয়ে স্নেহ-আবরণ;
সন্ধ্যাবধূ নীল আকাশে
দীপাবলী জাল্‌তে আসে,
তোমার সুরেই আনমনা সে,
দুলিয়ে চলে অলকদাম॥

নিঝুম রাতে স্তব্ধ ধ
স্বপ
সিমন্তে লাখ হীরা
কণ্ঠে
ঝিল্লি তখন তোমা
তন্দ্রামাখা ছন্দ আ
চেয়ে তোমার চর
গায়

তরঙ্গিনীর কলনা
সমী
মেঘের গুরু গরজ
উঠ্‌ছে ধ
বর্ষাধারায় শুন ও
কোমল, কড়ি সব
(আমার) প্রাণের তারে তো
তার

ণী

শাস্ত্রী

ছিলেন। তিনি অনেক রাজসভায় সুপরিচিতা ছিলেন, অনেকের অনেক বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুশ্রুতা হইয়াছিলেন এবং অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দীর্ঘদর্শিনী হইয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুদেশের নিকটবর্ত্তী সৌবীর রাজার মহিষী ছিলেন। তাঁহার পুত্র সঞ্জয় এক সময় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া উদ্যমশূন্য বিষন্ন চিত্তে শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকিলে মহারাণী বিদুলা যে উৎসাহবর্দ্ধিনী বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর জীবত্বের উদ্দ্যোতক বাক্যের ইতিহাসে অপূর্ব্ব। কুন্তীদেবী বিদুলার জ্বালাময়ী ভাষণের আশ্রয় লইয়া নিজ পুত্রদিগকে এক সময়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত উপদেশের সহিত ভারত-রমণী আবার পরিচিতা হউন—আবার ভারতের গৌরব আনয়ন করুন। এই উপদেশ পরম্পরা পুস্তকমধ্যে না থাকিয়া ভারতীয় নরনারীর ওষ্ঠস্থ হউক, ইহা যপের বিষয় হউক। ধ্যান ও ধারণার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অন্য উৎকৃষ্ট বিষয় আমাদের জানা নাই। তিনি পুত্রকে বলিয়াছিলেন—

"রে শত্রুনন্দন, তুমি আমার নন্দন নহ, আমার গর্ভেও তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ, তোমার না আছে শক্তি, না আছে পুরুষকার, তোমার আকার বুদ্ধি প্রবৃত্তি সকলই ক্লীবের ন্যায়। তুমি চিরকালের নিমিত্ত একেবারে নিরাশ হইয়া বসিয়াছ। রে দুর্বুদ্ধে, যদি কল্যাণের কামনা থাকে তবে পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর। অল্পর দ্বারায় পরিতৃপ্ত হইয়া অপরিমেয় আত্মাকে অপমানিত করিও না। নির্ভীক হও, উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা জয়ী হও। রে কাপুরুষ, পরাজিত, মানশূন্য এবং বন্ধুবর্গের শোকপ্রদ হইয়া অরাতি...র আনন্দবর্দ্ধন করতঃ এরূপে শয়ন করিয়া থাকিও না, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। হায়, ক্ষুদ্র নিম্নগাসকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয়, মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হয়, সেইরূপ কাপুরুষেরা অল্পতেই পরিতৃপ্ত হইয়া সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

"হে পুত্র, শীঘ্র উঠ, শত্রুনির্জ্জিত হইয়া এখন শয়ন করিবার সময় নহে। দীনভাব অবলম্বন করিয়া লোকের স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হইও না, নিজের পুরুষকার দ্বারা সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ কর। হে পুত্র। তুমি অনলসংলগ্ন তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠ। চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার মত এই যে, কোন রাজার গৃহে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা অত্যন্ত মৃদু স্বভাব পুত্র যেন জন্মগ্রহণ না করে। অতএব হে পুত্র, তুমি হয় বাহুবীর্য্য প্রকাশ কর নতুবা নিত্য সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া অনর্থক জীবন বহনের প্রয়োজন কি? রে ক্লীব, তোমার পূর্ব্বের কীর্ত্তিকলাপ সকলই বিলুপ্ত হইল এবং ভোগসুখের মূল একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অতএব এরূপ অসার হইয়া আর জীবিত থাকিবার ফল কি?

"হে অবোধ পুত্র! যে কর্ম্ম দ্বারা আপনার পুরুষকার প্রকাশিত হয় তাহা অবগত হও। তোমার নিমিত্ত যে কুল নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে, তুমি আপনিই তাহার উদ্ধারার্থ যত্ন কর। লোকে যাহার অনুষ্ঠিত কোন অদ্ভুত মহৎকর্ম্মের জল্পনা করে না, সে কেবল লোকসংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র। তাহাকে না স্ত্রী না পুরুষ কিছুই বলা যায় না, ক্লীবের মধ্যেই গণনা করিতে হয়। দান তপস্যা সত্যবিদ্যা বা অর্থলাভ বিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সঙ্কীর্ত্তিত না হয় সে পশু মাত্র। যে মহীয়ান্ ... শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, ধনসম্পত্তি, বিক্রম ও অন্যান্য

পুরুষকার দ্বারা সকলকে অতিক্রমণ করেন যথার্থ পুরুষ। রে মূর্থ, কাপালিকের কাপুরুষোচিত, ঘৃণার্হ, দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তির করিও না। হে সঞ্জয়, সাধু জনসমাজে ব্যবহারী, বংশধ্বংসকারী তোমাকে উৎপন্ন আমি পুত্ররূপী সাক্ষাৎ কলির জননী হইয়াছি। আমার মত—আর কোন সীমন্তিনী যেন ঈদৃশ নিরুৎসাহ, নির্বীর্য্য পুত্রকে গর্ভে ধারণ না করে। হে বৎস! হৃদয়কে লৌহনির্ম্মিতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া স্বকীয় সম্পত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।

"হে পুত্র! আমি রাজ্য লোভেই তোমাকে এইরূপ উত্তেজিত করিতেছি এমন নহে। কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, অনাদৃত নিকৃষ্ট লোকেরা যে লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে আমাদিগের শত্রুরা সেই সকল প্রাপ্ত হউক, আর মহৎ মানবগণের যে লোক প্রাপ্ত হওয়া উচিত আমাদিগের সুহৃদ্বর্গ সেই লোকে গমন করুন। হে বৎস! দীনহীন কাপুরুষগণের সমুচিত জঘন্য বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ যেমন জলধরের অনুজীবী হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণবর্গ ও সুহৃদবৃন্দ তোমার উপরে জীবিকা নির্ভর করুন। হে সঞ্জয়, সুপক্ক ফল নিচয় পরিকীর্ণ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিহঙ্গমেরা যেমন জীবন ধারণ করে, সেইরূপ অখিল প্রাণিবর্গ যে ভাগ্যধর পুরুষের আশ্রয়ে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই সার্থক। যে ভাগ্যবান মানব স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সমুন্নত জীবনভার বহন করেন, তিনিই ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করিয়া পরকালে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

"হে সঞ্জয়। সিন্ধুরাজ অজর অমর এরূপ না। হে পুত্র, তুমি [illegible]র্য্য যা কিছু তোমাতে কিছুই বলিতেছি ব্যর্থ- সার্থকতা কর এবং

আমার বিজয়ের আশা কা[illegible] তোমাকে এরূপ আগ্রহ[illegible] করিতেছি ও পরেও বার[illegible] আমার পূর্ব্বসঞ্চিত বিষয়ের[illegible] ক্ষয়ই হউক কিছুতেই আমি দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া তুমি যুদ্ধার্থে[illegible]

"হে সঞ্জয়! তুমি যথ[illegible] ভার্য্যাকে দীনহীনা অতিমা[illegible] আর তোমার জীবিত থাকি[illegible] দাসদাসী, ভৃত্যবর্গ, আচা[illegible] প্রভৃতি সকলেই জীবিকা বি[illegible] পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, জীবনেরই বা প্রয়োজন কি[illegible] সমস্ত শ্লাঘনীয় ও যশস্কর[illegible] করিতে এক্ষণে যদি তৎসমুদ[illegible] হইলে আমারই বা হৃদয়ের[illegible] ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাজ্ঞ[illegible] "নাই" এই কথাটী বলিতে হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হই[illegible] আমি "নাই" এ বাক্য কখ[illegible] করি নাই। আমাদিগকেই আমরা কোনকালে কাহার[illegible] নাই। সুতরাং যদি পরের[illegible] করিতে হয় তাহা হইলে [illegible] পরিত্যাগ করিব।"

মহারাজ্ঞী বিদুলার এই জীবনে নবীন উৎসাহ, নব[illegible] তাহাকে কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত ক[illegible]

পল্লীগ্রামের নারী

শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী।

সবাই বল্‌ছে—এইটে নাকি নারীজাগরণের যুগ। কথাটা কতদূর সত্য, তা আমি জানিনে, কারণ কোন্ দিক থেকে এই কথাটিকে নিয়োগ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই। আমার বল্‌বার কথা হল এই—পল্লী-নারীদেরও যদি এই সমস্যার ভেতর টেনে আনা হয়, তা হলে এটা কখনো নারীজাগরণের যুগ হ'তে পারে না। তার মানে, এই নারী-সমস্যা নিয়ে যতকিছু আন্দোলন, [illegible] ভাঙ্গা-গড়া তা যেমন সৃষ্টি করচেন অধিকাংশই সহরের মেয়েরা, তার ফলভোগও করচেন তেমন তাঁরাই। পল্লী-নারী তার স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার রন্ধনাগারের ধোঁয়ার ভেতর থেকে সারাজীবন কেবল চোখের জলই ফেলচে; কোনো কথাই তাদের কাণে পৌচচ্ছেনা। তাদের জন্যে অন্ততঃ একটু সহানুভূতি জানাবারও যে কেউ আছে—সেইটেও তারা জান্‌লে না। এই তো হল আমাদের পল্লী-রমণীর আভ্যন্তরিক অবস্থা।

তারপর একটা মোটা কথা, যা সহরের শিক্ষিতা মেয়েরা শুনে বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। তাঁরা হয়তো ভাববেন—স্ত্রী-শিক্ষা যে খুব প্রয়োজনীয় এটা পল্লী-রমণীরাও বুঝেছেন। কিন্তু এ কথার উত্তরে আমি বল্‌বো—না, তাও তারা এখন পর্য্যন্ত বোঝেনি। এই অল্পদিনের কথা একটা বলছি। আমার দিদি শ্রীউষারাণী দেবী ও শ্রী[illegible] দেবী কোনও দু'টি প্রতিযোগীতায় প্রবন্ধ দিয়ে উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলতে লজ্জা করে, আমাদের গ্রামে তা নিয়ে এমন সব কথা উঠেছিল, যা শুনে সহরের শিক্ষালোক-প্রাপ্তা মেয়েরা হেসে আকুল হবেন। মোট্ গ্রামের মেয়েদের বিশ্বাস নেই যে, তাদের মেয়েরা লেখাপড়া জান্‌লেও একটা উন্নত অবস্থার ভেতর আস্‌তে পারে। আর লেখা-পড়া জানাই বা কি, তাদের ধারণা মেয়েদের স্বামীর কাছে কোনও প্রকারে পত্র লিখতে জান্‌লেই হল। এর বেশী লেখাপড়া তাদের দরকার করে না। 'দরকার করে না' হলেই যদি হত তা'হলেও কথা ছিল না, তার উপরেও তাদের মত—মেয়েরা বেশী লেখাপড়া জান্‌লে সংসার চলে না, তারা নাকি তা হ'লে আর স্বামীকে মান্‌বে না, অহঙ্কারী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কথা আমাদের হাঁস্‌বার উপকরণ হলেও পল্লী-নারীদের এ সব প্রাণের কথা।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের বৃদ্ধদের কি রকম ধারণা, আমাদের গ্রামেরই আর একটা উদাহরণ দিয়ে তা বুঝাচ্ছি। এ কথা বল্‌তে যে আমার খুব ভালো লাগ্‌ছে, তা তো নয়ই—বরং কষ্টই হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। তবু বল্‌ছি এই জন্যে, যাঁরা নারী-সমস্যার আন্দোলনকারী, নারী-জাতির অভাব-অভিযোগের দিকে যাঁরা অন্ততঃ একটু দয়া করে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁরা দেখুন যে, যতটা আশার বাণী তাঁরা পত্রিকার পাতায় পাতায় আমাদের শুনাচ্ছেন, তার কতটা সত্য।

যাক্, কথাটা এই—আমাদের গ্রাম থেকে 'অঞ্জলি' বলে একখানা হাতের লেখা পত্রিকা বেরোত। আমার দাদা ছিলেন তার গোড়ায়। তাঁর ই[illegible] আমাদের গ্রাম থেকে তিনি হাতে ধরে ধরে [illegible]ক-লেখিকা সৃষ্টি করবেন। প্রথমটা [illegible] [illegible]। ক্রমশঃ তা গ্রামের বুড়োদের কাণে উঠতে লাগ্‌লো। তাঁরা দলে দলে এখানে-সেখানে নানারূপ আলোচনা আরম্ভ করলেন। পল্লীগ্রামের অবস্থা যাঁরা একটু

অভাগী

(ছোট গল্প)

শ্রীমতী সুধীরা মজুমদার

"আজ বহুদিন বাদে অতীতের বিস্মৃতির অতল তল থেকে একটা কথা মনের মাঝে বারে বারেই মাথা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে—আমি "নারী।" হাঁ, ছিলাম বটে এককালে, যখন স্বামী-গৃহে ছিলাম; কিন্তু এখন আর আমি "নারী" নই। আমি যে জগতের ঘৃণ্য, নরকের কীট, তবে রমণী বটে। অসতীর সঙ্গে সতীর সঙ্গে আকাশপাতাল তফাৎ। তারা স্বর্গের ফুল, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না। আর—আর—আমি, তাদের কত নীচে, ভাব্‌তে হয়। না, না ভাব্‌ব না; মনে হ'লে শরীর আমার শিউরে উঠে, কিন্তু হায় মিছে কান্না! অনেক কেঁদেছি, কোন ফল ত পেলাম না! আর সময় নেই, বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে। জীবন-তরী ঘাটে লেগেছে, শিয়রের কাছেই শমন খাড়া। এইবার যে হাসিকান্নার পালা চুকিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে কোথায়? এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে। হ'লেও যেতেই হবে। জীবনের প্রথম বয়সে ছিলাম বড় সুখে। এত সুখ যে মানুষের ভাগ্যে হ'তে পারে এ ধারণাটা আমার ছিল না। আমি বাবার আদরের ধন, স্বামীর হৃদয় রতন ছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা, তাঁর চোখে সইল না; তাই তিনি সব কেড়ে নিয়ে আমাকে পথের কাঙাল করে দিলেন। পথের কাঙালই বা বলি কেন? কাঙালের প্রতিও মানুষ একবার দয়া দৃষ্টি করে, কিন্তু আমার মুখ দেখলে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভগবান আমায় তার চেয়েও ঘৃণ্য নরকের কীট করে দিয়েছেন। উঃ, আর ভাবতে পারছি নে, ওগো আর পারি নে যে—"

"থাক্ তবে বলো না মা।"

"না, না, বল্‌তে দাও, আমায় বারণ করো না। আমার মোটেই কষ্ট হ'চ্ছে না। বল্‌তে দাও—জগৎকে জান্‌তে দাও, বঙ্গের মেয়ে সতী হ'লেও অযথা যদি কেউ তার অপমান করে, তবে সে সমাজের কাছে কত লাঞ্ছিত, কত অপমানিত হয়!"

"মা-গো, তুমি অমন করো না। আমার বড় ভয় কর্‌ছে।"

"কে, রাণু নাকি? আয় মা, বুকে আয়। ভয় কি মা, জগৎ জানুক নির্দ্দোষীর কত অপমান—কত লাঞ্ছনা। বল্‌ব না, তা হলে বিশ্ববাসী এর প্রতিবাদ কর্‌বে কেমন করে মা? চিরকালই কি তবে দুর্ব্বল প্রবলের চাপে নিষ্পেশিত হবে? না—না, তা হবে না, হ'তে দেব না।"

"মা, ওগো মা গো, অত উত্তেজিত হ'য়োনা, একটু ঘুমাও।"

"আচ্ছা, আহা, বাছার আমার ভয় করছে। থাক্, তবে আয় মা বুকে আয়, একবার মা বলে ডাক্ ত। না, না, আমি ত তোর মা নই, আমি তোর সর্ব্বনাশিনী। যে তোর মা, সে সতীসাধ্বী যেদিন পতিগৃহ হ'তে বিতাড়িত হ'লো, সেইদিনই মরে স্বর্গে চলে গেছে, শুধু পড়ে আছে তার ঘৃণ্য দেহটা। উঃ, আর পারি নে! যাই—যাই—"

"মাগো, আমায় ফেলে তুমি কোথায় যাবে? আমি যে এই বিরাট বিশ্বে এক তোমা বই আর কিছু জানিনে। জীবনে বাবাকে দেখিনি মাঝে মাঝে তোমার মুখে শুনেছি তিনি নাকি বিনা দোষে তোমায় ত্যাগ করেছেন।"

"আজ তাঁর কাছেই বা যাব, কোথায় ... কি অধিকার আছে ?"

* * * * *

"দিদি, দিদি, আজ যে ভেবেছিল ... ফিরিয়ে নিয়ে যাব, বাবা যে পথ চেয়ে বসে আছেন।"

"কে রে এলি ?"

"দিদি, দিদি, আমি যে তোমার বড় আদরের সত্যেন। একবার চোখ মেলে দেখ দিদি, আমি এসেছি তোমায় পিতৃ-গৃহে ফিরিয়ে নিতে।"

"একি সত্য, না স্বপ্ন ? আমি ত ভাবতে পারিনে। না না, আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখ্‌ছি। হে নারায়ণ, তুমি কি আমায় ছলনা করছ ? আজ কি সত্যই আমার স্নেহের ভাইটী শিয়রে এসে দিদি বলে ডাক্‌ছে! ভাই রে, বাবা কি এখনও তাঁর অভাগী মেয়েটার জন্য চোখের জল ফেলেন ? বল্ ভাই, সত্যি করে বল্, আজ কেন তুই আমার শিয়রে ?"

"দিদি, অনেক দিনের কথা, তুমি নির্দ্দোষী হ'য়েও যখন অসতী বলে স্বামীগৃহ হতে বিতাড়িত হ'য়ে পথে দাঁড়ালে তখন আমার বয়স ষোল বছর। প্রথম যেদিন বাবার মুখে এই কথাটা শুন্‌লাম, সেইদিন মনের মধ্যে একটা বিষম ওলটপালট হ'য়ে গেল। আমাদের সমাজের উপর একটা ঘোরতর বিদ্বেষ হ'লো। শাস্ত্র মিথ্যা, শাস্ত্রকারেরা ভণ্ড—এই কথাটাই বার বার বিদ্রোহী হ'য়ে মাথা খাড়া করে উঠেছিল। প্রাণে বড় আঘাত পেলাম। সমাজের উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণা হ'ল। হায় সমাজ, এই কি তোমার শাসন! পুরুষ, দোষী হয়েও নির্ব্বিবাদে তোমার বুকে বেড়াতে পারবে, আর যে নারী নির্দ্দোষী, দুর্ব্বলা বলে নিজকে রক্ষা করতে পারে না, সে নির্য্যাতিতা, সমাজে পতিতা! ধিক্ তোমাদের সমাজপতিগণ! আজ নারী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হয়ে তোমাদের দুয়ারে করুণা প্রার্থী, কোথায় তোমরা তাকে আদরে তুলে নেবে, না তাকে পথের মাঝে অসহায় ভাবে দাঁড় করিয়ে ... পাব ? তোমায় দেখলে যে সে আশা আ...

"সত্যেন, সত্যেন, ভাই, ছিঃ তুমি ... আমার জন্য কেঁদ না। শোন ভাই ... কথা শোন, সময় হ'য়ে এসেছে, এ যাত্রা ... পারব না ভাই। রাণু কোথায় ? ও... কাছে, শুনে রাখ অভাগী মায়ের জীবন ...

* * * *

"মা, মা, ডাকছ ?"

"আয় মা রাণু, কাছে আয়, কো... বলিনি পাছে তোর মনে আঘা... তোর কষ্ট হয়। কিন্তু মাগো আজ ... চল্‌লাম। মা, ভয় কি, যার কেউ ... আছেন। তোমার ভগবান আ... শোন—

তখন আমার বয়স বছর ষোল ... সুন্দরী না হ'লেও মোটের উপর ... না। যৌবন তখন আমার সারা ... মোহন কাঠিখানা সবে বুলা... বাবার বড় আদরের মেয়ে ছিলা... সমস্ত বঙ্গ বাছাই করে জাম... মহা কুলীনকে। হায়রে কুলীন মর্য্যাদা! তাই আজ নি... তোমার গৃহ হ'তে বিতাড়িত ... আমি আজ পাথর হ'য়ে ... নেই, ওই শোনা যাচ্ছে ম... তাড়াতাড়ি বলি। কিছুদি... সুখে। স্বামী আমায় বড় ... স্বামী, কোথায় গেল ... ভালবাসা ? তুমি যে দুম... আমায় পিতৃগৃহে রেখে ...

আজ আট বৎসর হ'লো তুমি আমায় না দেখে কেমন করে আছ ? তুমি রাণু হ'লে তাকে একদণ্ড না দেখে বাইরে থাক্‌তে পারতে না ; আর আজ যে তোমার সেই রাণু পথে দাঁড়াবে, সে খোঁজ ত রাখ না ! হায় ভগবান, এই তোমার বিচার ! আজ মৃত্যুশয্যায় যদি একবার দেখা পেতাম, তবে বলে যেতাম,—ওগো চির আরাধ্য দেবতা আমার, আমি তোমারই পায়ে বাঁধা।”

“দিদিমণিটী, একটু চুপ কর। আর অত কথা বলো না।”

“কে-ও সত্যেন্ ? আর দেরী নেই ভাই, এই কটা কথা শেষ করতে দে, তারপর চুপ করব, একেবারে চুপ। একদিন শুন্‌লাম পাড়ার মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যাবে। তখন রাণু খুব ছোট। আমিও স্বামীর কাছে বললাম—আমি গঙ্গাস্নানে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যাব। শুনে হেসে বল্‌লেন—কেন ঘরে পতিদেবতা থাক্‌তে গঙ্গাস্নান করে লাভ কি ? তা ছাড়া রাণু ছোট। শুনে বড় অভিমান হ'লো, রাগ করে কথা বন্ধ করে দিলাম। তারপর অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে যেতে বল্‌লেন। আমি যদি জান্‌তাম সেই যাওয়াই আমার সর্ব্বনাশের মূল হবে, তবে কি যেতাম ! স্নান সেরে রাণুকে নিয়ে সঙ্গীদের পিছন পিছন চলেছি। ঘোমটার আড়ালে দেখ্‌তে পাইনি ভুল করে অন্য পথে চলে এসেছি, সঙ্গীরা অন্যপথে চলে গেছে। কিছুদূর এসে দেখি আমি দল ছাড়া হয়ে পড়েছি। পথ চিনি নে, কোন পথে বাড়ী যাব কিছুই জানি নে। নানা চিন্তায় অস্থির হয়ে রাস্তার ধারে একটী গাছের তলায় বসে পড়্‌লাম। সূর্য্য মাথার উপরে, রাণু কোলের মাঝে থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে। এমন সময় একটা লোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল— কে গো তুমি এমন করে কাঁদছ ? আমি অকূলে কূল পেলাম। বুঝ্‌তে পারলাম না যে মিত্র-রূপী সে আমার পরম শত্রু। সে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল, আমিও যন্ত্রচালিতের মত তার পিছন পিছন চল্‌লাম। অনেক ঘুরে একটা গলির মাথায় দাঁড়িয়ে একটা বড় বাড়ী দেখিয়ে বলল—চলে যাও, আর কেন মিথ্যা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ ? এক মুহূর্ত্তে আমার মাথা ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হতভাগা আমায় ধরতে এল, দেখে অমনি নারীত্বের সুপ্ত সিংহ আমার ভিতর জেগে উঠ্‌ল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্‌লাম— খবরদার, আমায় ছুঁলে ভাল হ'বে না। আর যদি এক পা সর, ত পাড়ার লোক ডেকে জড় করব। তেমনি হাস্‌তে হাস্‌তে হতভাগাটা বল্লে— এপাড়ার সবই আমার লোক। দেখতে দেখতে ভিতর থেকে একজন মেয়েমানুষ আমায় টেনে নিয়ে গেল। তারপর কি হ'য়েছিল মনে নেই, হঠাৎ চেয়ে দেখি তারা আমায় একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। আমি চোখ মেলে, দেখলাম ভিতর দিয়ে বন্ধ কর্‌বার শিকল আছে, তাড়াতাড়ি উঠে শিকল বন্ধ কর্‌লাম। তিনদিন অনাহারের পর পুলিশের লোক আমায় উদ্ধার করে। উঃ, আর পারিনে !”

“থাক্ দিদি চুপ কর।”

“না, না, আর একটু ! আমি যখন স্বামীর কাছে ফিরে গেলাম তিনি আমায় গ্রহণ করবেন না বল্‌লেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে হ'লো, পৃথিবী পায়ের তলা থেকে সরে গেছে, চন্দ্র সূর্য্য যেন জলে জলে নিভে যাচ্ছে। মনে হ'লো এই আমার স্বামী, যিনি আমায় প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তবে কি তাঁর প্রেম কিছুই নয় ! আমায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী জেনেও তিনি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। ওগো স্বামী, তুমিই না আমার ইহ পরকালের দেবতা ! তুমিই না আমার বিপদের রক্ষাকর্ত্তা ! সমাজ তোমায় ঠেলবে ? প্রেমের কাছে সমাজ বড় হ'লো ? হতে পারে, আমি ত সামান্য নারী, আমার জন্য কেন তুমি ভুগবে ? আজ আমার জায়গায় তোমার আর একজন আসবে, কারণ তুমি পুরুষ। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ আমাদের পথে দাঁড় করায়, তার হাত

হতে মুক্ত হয়ে তোমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করলে তোমরা অসতী বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাও, রক্ষা না ক'রে, নরকে ফেলে দাও—এই তোমাদের ধর্ম্ম! ভাই, শেষ হ'য়েছে আমার কথা। শরীরটা বড় অস্থির হ'য়ে এসেছে, দোর জানলা সব খুলে দাও। রাণু, কোথায় রাণু ?"

"এই যে মা আমি।"

"সত্যেন্ সত্যেন্, কার পদশব্দ শুনছি না ? কে, কে ? কে এলে গো ?"

"দিদি, দিদি চেয়ে দেখ একবার, দাদাবাবু এসেছেন।"

"মণি, মণি, চেয়ে দেখ, চোখ মেল, আমি তোমার হতভাগ্য স্বামী এসেছি। তোমাকে আমি বিনা অপরাধে ঠেলেছি। গৃহলক্ষ্মী আমার, গৃহে ফিরে চল ? মণি আমার বল, আমায় ক্ষমা করেছ ? আজ আমি সব বাধা ছিঁড়ে এসেছি।"

"দেবতা আমার, তুমি এসেছ ? ... শ্রান্ত আমি। আবার সামনের ... সঙ্গে মিলব প্রভু। দয়াল ঠাকুর ... পূর্ণ হয়েছে। স্বামী আমার, ... তোমার চরণধূলি আমার মাথা ... ভগবান···

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম, এ

সব দুখে দরদিয়া
সব সুখে গরবী,
খোঁপায় চাঁপার কলি,
আঁচলেতে করবী,
কথা তার মধু-ঝরা,
চির হাসি অধরে,
সে যে হাওয়া ফাল্গুনী
বিদ্যুৎ বাদরে!

সদা ভয় সাবধানে,
সদা খোঁজ, "কোথা, কই ?"
এই, "সব চুপ, চুপ !"
এই কথা ফুটে খই।
এই মুখ গম্ভীর,
এই হাসি চঞ্চল,
এই উদ্বেগ, এই
উল্লাস বিহ্বল।

কে এমন অনসূয়া,
এত প্রিয়ব
কোন ফুলে এত সুধা,
কোথা এত
লীলাময়ী ব্রীড়াময়ী
কে এমন
কার এত ভালবাসা,
এত কার

অঘটন কে ঘটায়
নিতি ন
কে শিখায় অভিমান
কে মিল
দিনকে কে রাত কা
কে মো
সে যে সই, সই মে

শিশু-পালন।

ডাঃ শ্রীরামনন্দাস মুখোপাধ্যায়, এল্-এম্-এস্।

শিশুর প্রয়োজনীয়তা।—শাস্ত্রে লিখিত আছে, "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন। আধুনিক সমাজ ইহা বিশ্বাস করুন আর না করুন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, শিশুর ভবিষ্যৎ জাতীয়-জীবনের প্রধান বল ও ভরসা। শিশু ভিন্ন অন্য কেহই বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু যদি সেই শিশু সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা—কোন কাজই হয় না। যদি সে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক ও দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হওয়া যে কি নিদারুণ, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ, পিতামাতার সে যে কি জীবন্ত দহন, তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারাই জানেন, অন্যের ধারণা করা সম্ভবপর নয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শিশু এরূপ হয় কেন?

শিশুর শিক্ষা।—যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতেই আহার, বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে 'পালন' করা হয় না। সন্তান যথারীতি 'পালন' করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তানও সৎ হয় না—হইতে পারেও না। গর্ভধারিণী হওয়া সহজ কিন্তু 'মা' হওয়া সহজ নয়। জননি! যদি তুমি সন্তানের 'মা' হইতে চাও, প্রথমে নিজেকে সংশোধিত করিয়া পরে তোমার কোলের শিশুর শিক্ষা বিধানে যত্নবতী হও। বাল্যে মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহা প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। স্কুলকলেজে অধ্যয়ন করিয়া তোমার সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম দিন হইতে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সুশৃঙ্খলতা শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবেই। তাই আমার সকাতর নিবেদন—মা, যদি তুমি সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাও, যদি তোমার সন্তানকে বংশের গৌরব—জাতির গৌরব—দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাও, তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও, তোমার বংশ ধন্য হউক; সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি গৃহে সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।

শিক্ষারম্ভের প্রকৃত কাল ও স্থান, প্রকৃত শিক্ষা, বাল্যের শিক্ষা।—আঁতুড়ে জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃ সন্নিধান ও পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। বাল্যকালে শিক্ষা যত সহজে হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত সহজে হয় না। বাল্যের শিক্ষা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত দীর্ঘস্থায়ী হয় না—হইতে পারেও না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়, সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না—ইহাই প্রকৃত নিয়ম। স্কুল কলেজে অর্থকরী বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞানলাভ হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আজকাল

পিতৃমাতৃ সন্নিধানে ও নিজ পরিজন মধ্যে শিশু যে শিক্ষা পায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহাতে সুফল হইতে দেখা যায় না। কোন কোন বাড়ীতে দেখিয়াছি, শিশু যখনই যাহা চায়—সে যখনই যে আবদার ধরে, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, স্নেহবশতঃ পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন তখনই তাহাকে সে দ্রব্য দিয়া থাকেন বা তাহার সেই আবদার পূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্নপর হন। এরূপ করিলে শিশুর লালসা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎজীবন বড় ক্লেশকর হয়। বাল্যকাল হইতেই সন্তানকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে; দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বিভিন্ন সৎবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি যাহাতে উদয় না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই অসৎপ্রবৃত্তিগুলি শিশুর নির্ম্মল হৃদয়ে সাধারণতঃ জাগাইয়া দিয়া থাকেন।

শিশু যখন প্রথম পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র গঠনের দায়িত্ব গুরুমহাশয়ের উপরও কতকাংশে নির্ভর করে; কারণ তিনিও একজন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক। পাঠশালাতে শিশুর গুরুকরণ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত মাতৃগুণ লাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকে "মা" হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয় যথোপযুক্ত গুরু-জ্ঞান-বিহীন হইয়াও সেইরূপ অনেকেই গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। মা ই হউন আর পাঠশালার গুরুমহাশয়ই হউন—যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই তিনি অপরের, বিশেষতঃ ভাল-মন্দ জ্ঞানশূন্য শিশুর চরিত্রগঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিজের কাম-ক্রোধাদি রিপু দমন করিতে অক্ষম, তিনি অপরকে রিপু দমন করিতে শিক্ষা দিবেন কিরূপে? কেবল-মাত্র মৌখিক উপদেশ দানে অপরের চরিত্র গঠন করা যায় না। অপরের চরিত্র গঠন করিবার উপায়—নিজের চরিত্র গঠন করিয়া সেই চ[illegible] অপরের সম্মুখে স্থাপন করা। পিতমাতা, আত্ম[illegible] স্বজন প্রভৃতি বাল্যের শিক্ষকগণের সর্ব্বদা রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের চরিত্রই—তাঁহ[illegible] শিক্ষাই শিশুতে দর্পণে প্রতিবি[illegible] প্রতিফলিত হয়।

শিশুর স্বাস্থ্য।— শাস্ত্রে আছে [illegible] ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের যতগু[illegible] তন্মধ্যে শরীর অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা সব[illegible] সুস্থ শরীরই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে[illegible] শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার স[illegible] উপর ন্যস্ত। সে সম্পূর্ণ অসহায় ত[illegible] তখন তাহার শরীর রক্ষার জন্য [illegible] দরকার, তৎসমস্তই মাতার হাতে[illegible] শীত-উষ্ণ ইত্যাদি অভাব-কষ্ট [illegible] প্রকাশ করিতে পারে না। এম[illegible] ত্যাগ করে, অন্যে যতক্ষণ পরিষ্কা[illegible] ততক্ষণ তাহাকে সেই অবস্থাতে[illegible] সে এত অসহায়। ক্ষুধার তাড়না[illegible] শীত উষ্ণাদি দৈহিক ক্লেশ ব্যক্ত[illegible] মাত্র এক অস্ত্র আছে। সে [illegible] কান্না মাতৃহৃদয়ে যেমন প্রতিঘাত [illegible] কোথাও হয় না। এই জন্যই [illegible] রক্ষার্থই ভগবান্ একাধারে [illegible] স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসা ও [illegible] পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া রাখিয়াছেন। [illegible] শিশু কাঁদিলেই মনে করেন [illegible] পাইয়াছে। তাই শিশু যখনই [illegible] তাহাকে স্তন্য-পান করান বা [illegible] করা শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশে[illegible] বলে "ছেলে মানুষ করিতে হই[illegible] আন্দাজে খাওয়াও, আর বাধে[illegible] এটা মায়েদের মনে রাখা দরকা[illegible]

আমাদের একখানা চিঠি

শ্রীমতী সুরবালা দত্ত আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিধবা কন্যা। সম্পাদিকা হিসাবে মাতৃ-মন্দিরে তাহার কোন সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি না থাকলেও মাতৃ-মন্দিরকে পরিপুষ্ট করবার জন্য—দেশের মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার জন্য মাতৃ-মন্দিরে তাহার প্রভাব কম নয়। সুরবালা ছাত্রী হিসাবে নারী শিক্ষা সমিতির অন্তর্গত বিদ্যাসাগর বাণী ভবন থেকে খদ্দর সম্পর্কীয় কিছু কিছু কাজ শিখবার জন্য সম্প্রতি বোলপুর গিয়াছে। সেখান থেকে প্রেরিত তার পত্রখানা নিয়ে প্রকাশ করা গেল। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করবেন, যেন শ্রীমতীর কার্য্য দেশের কল্যাণের কিঞ্চিৎ সহায়তা করে। শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

শ্রীশ্রীহরি

সহায়।

সুরুল, বোলপুর

২২শে জানুয়ারী, ১৯২৬।

।৭ কমলেষু—

খুড়ামহাশয়, আপনার ৪ঠা মাঘ শ্রীপঞ্চমীর পত্র আজ ৭ই বৃহস্পতিবারে বিকালে পেলাম। * *

আমরা গত ১১ই ডিসেম্বর সাড়ে দশটার ট্রেনে কলিকাতা থেকে রওনা হয়ে ৪টায় বোলপুর ষ্টেশনে পৌচেছি। শান্তিনিকেতনে যাইনি, সুরুল কুঠীতে এসেছি। শ্রীযুক্ত কালিমোহন ঘোষ আমাদের নিয়ে এসেছেন। আমি ও শান্তি নামে আর একটি মেয়ে—এই দুজন মাত্র এসেছি।

১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল থেকে আমরা তাঁত আরম্ভ করেছি। এই তাঁতের কর্ত্তা মণিকুমার সেন; তিনিই আমাদের শিখাচ্ছেন। এখানে মস্ত কারখানা চলছে। সতরঞ্চ, আসন বোনা, সুতা রং করা, কাপড়ে ছাপ দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে অনেক ছেলে এই সব কাজ শিখে যাচ্ছে। এতদিন ভিন্ন দেশ থেকে মেয়েদের এখানে এসে ঐ সব শিখবার সুযোগ হয়নি। আমরাই মেয়েদের মধ্যে প্রথম এলাম। মাত্র দুই বৎসর এখানে তাঁত আরম্ভ হয়েছে। তাঁতের কর্ত্তা মণিবাবু আপনাকে চেনেন।

এখান থেকে শান্তিনিকেতন দেড় মাইল। লোকের বসতি খুব কম; তবে যে কয় ঘর লোক সকলেই বেশ ভদ্র। আমাদিগকে সকলেই বেশ সম্মানের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করেন। কালিমোহন বাবুর পাঁচটি ছেলে একটি মেয়ে, ইঁহার একটি বিধবা ভগ্নী আছেন, তাঁর নাম প্রভা, আমাদেরই বয়সী, তিনিও তাঁত শিখছেন। আমরা এই তিন জন নিয়মিত তাঁত শিখছি। কেহ কেহ নিজেদের ঘরেও কাজ করছেন। ননীবালা নামে একটি মেয়ে ডাক্তারি (নার্সিং) শিখেছেন, খুব সুচতুরা মেয়ে, তিনিই এখানকার হাঁসপাতালে কাজ করেন। একটী স্কুল আছে, ছোট ছোট মেয়েরা সেখানে পড়ে। তাদের টিচার দুজনার নাম ননীবালা ও প্রভা, দুজনকেই দিদি বলে ডাকি। আমাদের থাকবার জন্য এই স্কুলেরই কাছে একটা ঘর দেওয়া হয়েছে।

এ অঞ্চলে নারিকেল গাছ, সুপারী গাছ নাই, তবে ছোট ছোট ফুল গাছ যথেষ্ট, তাতে প্রচুর ফুল হয়েছে বড় সুন্দর। চারদিকে খোলা মাঠ ধু ধু করছে, তাতে কৃষি খন্দ রবিশস্যাদি দেখতে পাই না; তবে আলু, কপি, পেঁপে, শালগম ইত্যাদি যথেষ্ট আছে। আম জাম নিম গাছ যথেষ্ট। নদী নাই, কল নাই, পুকুরে স্নান করি, খাবার জল মালী দেয়। এখানটা বড়ই নির্জ্জন স্থান। শীত অত্যন্ত বেশী তবে দিনে খুব রোদ হয়, রাতে শীতে একটু কষ্ট হয়। যশোর জেলার রার্ শৈলেন্দ্র বাবু পরিবার সহ এখানে বাস করছেন।

৪ঠা মাঘ সোমবার রাত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় তাঁর সংকার হয়। আমরা ঐ দিনে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর সংকার দেখেছিলাম।

এখানে আসবার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে মনের মধ্যে একটু চিন্তা উপস্থিত হয়েছিল; কিন্তু এখানে এসে আর তা বিশেষ কিছু নাই, তবে সময়ে সময়ে মনে একটু কেমন কেমন লাগে, কেন তা বুঝি না। আসবার পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু (বাণী ভবনের সহকারী সম্পাদক) আমাকে বলে দিয়েছেন—প্রাণ দিয়ে কাজ করতে, যাতে আমাদের দিয়ে দেশের মেয়েদের কাজের নূতন পথ মুক্ত হয়।

আমাদের ভবনের লেডী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কত বুঝিয়েছেন—যেরূপ চলতে ফিরতে কাজ করতে হবে; সে মায়ের চেয়েও বেশী। আমাদের তিনটি বিষয় শিখতে হবে—তাঁতের কাজ, রং করা ও ছাপ দেওয়া। এখন আমরা তাঁত আর সুতা রং করা শিখছি। দুজনে মিলে বুনছি। কাপড় বোনাও আগে চি উঠিয়ে দিয়েছেন, কারণ যায়গা কম। কাজ ছেলেরা গ্রামের উপর গিয়ে নানারকম ডিজাইনের নানা প্রব দেখতে কি সুন্দর! কাপড়, ে আমার শিখতে ইচ্ছা করে। দুই শুধু আসন ও রং করা এই পারব। এক বৎসর থাকবে শেখা যায়?

আমাদের এখানে দু মা আপনি যদি একবার এখানে এসে দেখে যান, তাহলে খুব ভাল হয়।

তাঁতের কাজ আমাদের খুব ভাল লেগেছে। ইচ্ছা হয় এক বৎসর থেকে সমস্তটা শিখি। দেশের কাজে সত্যই একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাচ্ছি। ইতি—

প্রণতা—সুরবালা।

নারীর স্থান

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি, এল।

তুমি ব্রাহ্মণ—কর পবিত্র সিঞ্চিয়া স্নেহ বারি,
ক্ষত্রিয় তুমি—তুলে দাও হাতে কর্ম্মের তরবারী,
তুমি যে বৈশ্য—পালিছ বিশ্ব বক্ষ-রক্ত দানে,
শূদ্র তুমি যে—যতনে সেবিছ পৃথ্বিরে প্রাণপণে;
তুমি আদি মাতা, আদি গুরু তুমি, জীবন করেছ দান,
নিখিল বিশ্ব মনে-প্রাণে জানে, কোথায় তোমার স্থান।

নারী-কলঙ্কের প্রতিবাদ

গত মাঘের মাতৃ-মন্দিরে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতাটির প্রতি ছত্রে নারীর মহত্ত্ব সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু মাঝে দুটি ছত্র সম্বন্ধে আমাদের একটু বলিবার আছে। একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"এ বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী।"

নরনারীর সাম্যের গান গাইতে গিয়া কবি নারীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। নারীর পক্ষে এ কথা গ্লানিকর দাঁড়াইয়াছে। নারী সর্ব্বত্রই নিরপরাধ, ধর্ম্মপরায়ণা; পুরুষ পাপের পথে ধাবিত হয়,—নারী তাহাকে ফিরাইয়া আনে। কত অনাচার অত্যাচার প্রতিনিয়ত পুরুষের দ্বারা ঘটিতেছে, সামাজিক অপরাধে পুরুষ কত মারামারি-কাটাকাটি করিতেছে, তেমনই আবার দলে দলে রাজদ্বারে শাস্তি পাইতেছে; নারী কিন্তু এই সমস্তের শতাংশের এক অংশের মধ্যেও নাই। এমতাবস্থায় কবি নারীকে পুরুষের সমান দোষী বলিতে গেলেন কেন? আমরা এ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করি,—

মুসলমানদের আদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, জগতের আদি দম্পতি আদম আর হবাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া একটি রমণীয় উদ্যান মধ্যে, বাস করিতে দিয়াছিলেন। ঐ সময় ঈশ্বর একটি মাত্র বৃক্ষের ফল খাইতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পের বেশ ধরিয়া হবাকে ঐ ফল খাইতে প্রলুব্ধ করে। হবার ইচ্ছাক্রমে আদম ঐ ফল পাড়িয়া আনিল এবং উভয়েই উহা ভক্ষণ করিল। ভক্ষণ করিবামাত্রই পাপ-জ্ঞান উপস্থিত হইল, তখনই তাহারা তাহাদের নিজেদের উলঙ্গতা অনুভব করিয়া লজ্জাবশতঃ উদ্যানের লতার আড়ালে লুকাইল।

নারী হবা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া জগতে প্রথমে পাপের সৃষ্টি করিল—এই ধারণার বশে মুসলমানগণ নারীকেই পাপের সৃষ্টিকারিণী বলিয়া কল্পনা করেন। মানুষের সংস্কার সহজে যাইবার নয়, সত্য-মিথ্যার প্রভাব পূর্ব্ব সংস্কারের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। তাই উদীয়মান উদার কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানের পূর্ব্ব সংস্কারের উপর দোষারোপ করিয়া বলিতেছেন, কেবলমাত্র নারীর দ্বারাই যে জগতে পাপ আসিয়াছে তাহা নহে "অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর অর্দ্ধেক তার নারী।" কবিকেও এস্থলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ব সংস্কারে আক্রান্ত দেখিতেছি, নতুবা কবি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন—জগতের পাপরাশির মধ্যে অতি কম পরিমাণ পাপই নারী কর্তৃক আসিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমানে যাহা দেখিতে পাই তাহাতে বলিতে ইচ্ছা করে—পুরুষই পাপের সৃষ্টি করিতেছে। জগতের যত রকম পাপের চিন্তা প্রথমে পুরুষের মনেই সৃষ্টি হয়। নারী সর্ব্বকর্ম্মে পুরুষের অনুগামী হইলেও অন্যায় অপরাধের বেলায় পুরুষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, এবং তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কোন কোন পুরুষের অন্যায় অপরাধের প্রভাব নারীতে ক্রিয়াশীল হইলেই বা নারীকে তাহার জন্য কতটুকু দোষী করিতে পারি?

নারীর পবিত্রতা চিরদিনই জগতে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলার একজন দেশমান্য ধর্ম্মপ্রাণ স্বর্গগত ব্যক্তি * বলিয়া গিয়াছেন—"ইহ-জগতে যদি ভগবানের সন্ধান না পাইতাম তবে নারী-জাতিকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম।"

সম্পাদক।

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

গৃহচিকিৎসা*

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

সত্যই আমরা একদিন মায়ের "শিশু সন্তান" ছিলাম। আমাদের সেই শৈশব ও বাল্যকালে পীড়া হইলে ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ খুব কমই ব্যবহৃত হইত। এখনকার মত তখন গলিতে গলিতে বা পাড়ায় পাড়ায় এম, ডি, এম, বি, প্রভৃতি ডাক্তার, এবং বৈদ্যরাজ, কবিভূষণ প্রভৃতি কবিরাজ পাওয়া যাইত না। তখনকার দিনে অবশ্য শিক্ষিত অনেক কবিরাজ ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রথিত যশা ও চিকিৎসাকুশল ছিলেন। তাঁহাদের অনেকের নামই চিরস্মরণীয়। কিন্তু তখন প্রাচীনা গৃহিণীগণ—আমাদেরই ঠাকুরমা দিদিমা প্রভৃতি গৃহচিকিৎসায় আই, এম, এস, অথবা ভিষকরত্ন উপাধি পাইবার যোগ্য ছিলেন। মা, শাশুড়ী প্রভৃতি ঠাকুরাণীরাও গৃহচিকিৎসায় সুনিপুণা ছিলেন। কত লোকের রোগক্লিষ্ট শিশু ও বালক যে আমার মাতৃদেবীর চিকিৎসা গুণে নবজীবন পাইয়াছে তাহা বলিতে যেমন গৌরব অনুভব করি, সেইরূপ নিজেদের অযোগ্যতার জন্য অনুতপ্তও হইয়া পড়ি। যাহা হউক আমরা সেই পূজনীয়াদিগের নিকটে গৃহচিকিৎসা বিষয়ে যতটুকু শিক্ষা পাইয়াছি, যে সকল ঔষধ প্রয়োগে সফলতা লাভ করিয়াছি, আজি মাতৃমন্দিরের পাঠিকাদের অবগতির জন্য তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমাদের দুরাশা—তাঁহারা আজিকার দিনেও ইহা পড়িবেন এবং আবশ্যক হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিবেন। কেবল শিশু নহে, প্রাপ্তবয়স্ক অনেকেও গৃহচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। তবে এখানে এ কথা বলাও কর্ত্তব্য যে, পীড়ার গুরুত্ব বুঝিলে গৃহচিকিৎসার উপরে নির্ভর না করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানই উচিত।

১। পেটের অসুখ—

পেটের অসুখ ছেলেদের গুরুতর পীড়া। প্রধানতঃ অধিক পরিমাণে দুগ্ধাদি খাওয়াইলে প্রসূতা গুরুপাক দ্রব্য খাইলে অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে শিশুর পেটের ব্যারাম হয়। যদি শিশু ছ্যাকড়া দুধ তোলে, মলে অম্ল গন্ধ হয় তাহা হইলে অম্ল জনিত পেটের অসুখ বুঝিতে হইবে। ঐরূপ পেটের অসুখে (সকলপ্রকার পেটের অসুখে দুগ্ধ শুধু না দিয়া) শঠীর পালো বা বালি মিশানো দুধে, ৬।৭ ফোঁটা পরিষ্কার চুণের জল দিয়া খাওয়াইলে অম্ল জনিত পেটের অসুখ আরোগ্য হইবে।

যদি আমজনিত পেটের অসুখ হয়, তবে তিন চারিমাসের শিশুকে আপাঙের শিকড় এক রতি একটী গোলমরিচের চারিভাগের একভাগ দিয়া পরিষ্কার শিলে বাটিয়া সকালে ও বিকালে খাওয়াইবে। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ সকল ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। যে কোন পেটের অসুখ হউক না কেন, একটী রসুনের গায়ে মাটি মাখাইয়া কাঠের আগুনে পোড়াইয়া রাখিতে হইবে, ঠাণ্ডা হইয়া গেলে (তাহার ভিতরের শাঁসটী খুব নরম হইয়া থাকে) একখানি শাঁসের আধখানি লইয়া মায়ের দুধের সহিত ঝিনুকে মাড়িয়া সকালে খাওয়াইবে। সেই সিদ্ধ শাঁসের বাকী আধখানি ঐরূপে বিকালে খাওয়াইবে। পোড়া রসুনের শাঁসে তিন চারি মাসের ছেলের

---

* শ্রদ্ধেয়া কবি মানকুমারী বসু কবিতার পরিবর্ত্তে সেকালের গৃহচিকিৎসা লিখিতেছেন, আমরা ইহাতে অত্যন্ত সুখী বাংলার প্রাচীনাদের কাছ থেকে পাওয়া এরূপ দান দেশবাসীর অমূল্য সম্পদ। মাঃ সঃ।

তিন দিন চলিবে। তার পরে উহা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া পোড়াইতে হইবে। আমরা তিন চারি মাসের শিশুর ঔষধের পরিমাণ লিখিলাম, বয়োবৃদ্ধির সহিত পরিমাণ বেশী করিয়া দিতে হয়।

কৃমি জনিত পেটের অসুখ হইলে আনারসের পাতার গোড়ার দিকে যে সাদা অংশ থাকে, তাহাই রস করিয়া মিছরীর গুঁড়ার সহিত সকালে ও বিকালে ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক খাওয়াইবে।

কৃমির উপদ্রবে আইসশৃটীর পাতার রস পরিষ্কৃত চূণের জলের সহিত সকালে এক ঝিনুক খাওয়াইবে। বেণে মশলার দোকানে (শসার বীজের মত) ইন্দ্রযব পাওয়া যায়, তাহার ২।৩ টি বাটিয়া পরিষ্কৃত চূণের জলের সহিত এক ঝিনুক খাওয়াইবে।

দাস্তের সহিত পেট কামড়াইলে কাঠের আগুনের তাপ পেটে দিলে উপকার দর্শে।

(ক্রমশঃ)

মাতৃ-মন্দিরের তিনটি নিবেদন

শিক্ষার্থে—

পল্লী-মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু লিখিতে চান, তাঁহারা মাতৃ-মন্দিরের জন্য প্রবন্ধ বা স্থানীয় সংবাদাদি দিলে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের গ্রাহিকাদের মধ্যে যাঁহারা সামান্য কিছুও লিখিতে পারেন, তাঁহাদের লেখা পাঠাইলে আমরা যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া লইব। এই হিসাবে প্রবন্ধাদি লেখা শিখিবার পক্ষে মাতৃ-মন্দিরের গ্রাহক হওয়া সুবিধাজনক,

প্রচারার্থে—

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাহক করিবার উদ্দেশ্যে যদি দুই-তিনটি ঠিকানা পাঠান, তবে চৈত্র সংখ্যার মাতৃ-মন্দির ঐ সকল ঠিকানায় বিনামূল্যে প্রেরণ করা যাইবে। অবগত থাকিবেন যে, অন্য কোন সংখ্যা প্রেরণের জন্য লিখিলে পাঠান সম্ভব হইবে না। আশা করি, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ঐ সকল ঠিকানায় পত্র লিখিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিয়াও মাতৃ-মন্দিরের সহায়তা করিবেন।

প্রসারার্থে—

আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে যিনি ১৩৩৩ সালের মাতৃ-মন্দিরের তিনটি নূতন গ্রাহক ঠিক করিয়া তাহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা আমাদিগকে পাঠাইবেন, তাঁহাকে ১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে এক বৎসরের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।

গয়া-কাশী

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

স্ত্রীর বহুদিনের একটা আবদার পূরণের জন্য এবার একটু গয়া-কাশী ঘুরে এলাম। মকর সংক্রান্তিতে এবার সূর্য্যগ্রহণ ছিল, তাই এ স্নানের সময়টা কাশীতে কাটাতে আমাদের ইচ্ছা ছিল। গয়া-কাশীর কথায় নূতনত্ব কিছু না থাকলেও বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচির ভ্রমণের মধ্যে কিছু না কিছু থাকাই সম্ভব।

আমাদের তিন বছরের ছেলে 'গোরা' আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল, আর গিয়েছিলেন দাদাবাবু অর্থাৎ আমার স্ত্রীর ছোট্দা। গয়া কাশী অনেক আগেই আমার দেখা আছে, তবে এ যাত্রায় আমি হয়েছি এঁদের Guide অর্থাৎ 'সেতো'।

দিনের বেলায় পথের দৃশ্য সব দেখে শুনে যেতে পারবো বুঝে সকাল নটায় দিল্লী এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। একেবারে বেনারস-ক্যান্টনমেন্টের টিকিট করা হল। তিন শত মাইলের উপর পথে ই, আই রেলের বর্ত্তমান মূল্য-হ্রাসের হারে থার্ড ক্লাসের টিকিট জনপ্রতি সাত টাকা সারে তিন আনা। গোরা মাত্র তিন বছরের ছেলে তাই 'ফ্রি'।

রাত্রি আটটায় আমরা গয়া নামব। বর্দ্ধমানের কয়েক ষ্টেসন পরেই বাঙ্গালার সমতল জমির পরিবর্ত্তে পাহাড়ে জমির আভাস; দ্রুত চলন্ত ট্রেনে মনে হয় জমিগুলি ঢেউ খেলছে।

রাণীগঞ্জের আশে পাশে অনেক কয়লার খনি দেখা গেল। ক্রমে দূরে ছোট বড় পাহাড়ি। নূতন যাত্রীর পক্ষে এসব অতি আনন্দদায়ক। আসানসোল মস্ত বড় ষ্টেসন, চারি দিকে পাথুরিয়া কয়লার বিরাট আমদানী রপ্তানী। সীতারামপুর ষ্টেসন থেকে ডাইনে মেইন-লাইনের রেলপথ গেল, আমরা বামে গ্রাণ্ডকর্ড-লাইনে গেলাম। দুই পথেই কাশী যাওয়া যায়, তবে মেইন-লাইন বৈদ্যনাথ (জসিডি), পাটনা হয়ে গিয়েছে, আর গ্রাণ্ডকর্ড লাইন গয়ার পথে গিয়েছে। পথে দেখা গেল ছোট-নাগপুরের কুলীরা মেয়েপুরুষে কাজ করছে। ট্রেন ধরলে মেয়েরা ছোট ছোট কালো জামের মত কি ফল এনেছিল, আমরা দু-চার পয়সার কিনে খেলাম। গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের পাহাড় অঞ্চলের দৃশ্য পরম রমণীয়; বিশেষতঃ এ পথের পরেশনাথ পাহাড়টি যিনি দেখেছেন তিনি এ জীবনে তার সৌন্দর্য্য ভুলতে পারবেন না। সর্ব্বোচ্চ চূড়াটির উপরে প্রায় ছয় হাজার ফীট উচ্চে পরেশনাথ দেবের বিরাট মন্দির, দূরে থেকে পাহাড়ের চূড়াটির উপর একটি সাদা নিশানের মত দেখা যায়। এই সমস্ত দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সারাটি দিন কাটিয়ে, রাত্রি আটটায় আমরা গয়াধামে পৌছলাম।

চারিদিক থেকে পাণ্ডা এসে ভয়ানক ভীড় করল। কেউ জিজ্ঞাসা করে 'আপনাদের পাণ্ডা কে' কেউ জিজ্ঞাসা করে 'বাড়ী কোন জিলা'। তীর্থের পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য সকলেরই জানা আছে, বিশেষতঃ গয়া আর প্রয়াগের পাণ্ডাদিগকে একপ্রকার 'গুণ্ডা' বললেও চলে। যা হ'ক পাণ্ডাদের হাত থেকে কোন মতে অব্যাহতি নিয়ে আমরা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় গিয়ে সে রাত্রি থাকলাম। রান্নার বেশ বন্দোবস্ত ছিল, ডাল ভাত করে খাওয়া হল।

গয়া সহরের নিকটে চারিদিকেই পাহাড়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার স্ত্রী ও দাদাবাবুর উৎসাহে আমরা একটা পাহাড়ের একেবারে উপরে গিয়ে উঠলাম। পাহাড়টি বড় ভয়ানক, নিরেট পাথুরে। পাহাড়ের উপর থেকে সহর ও চারি দিকের দৃশ্য বড় সুন্দর।

গয়া সহরে খুব গরীবের বাস। মেয়েরা রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করে। গায়ে একটা জামা সব মেয়েরাই পরে, সেগুলি তাদের নিজ হাতের মোটা শেলাই।

বেলা দশটায় আমরা ৺গদাধরের পাদপদ্ম ও

ফল্গুনদী দর্শনে গেলাম। আমার স্ত্রী ও দাদাবাবু যথারীতি পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন করলেন। পূর্ব্বেই বলেছি আমি এ যাত্রায় এঁদের সেজো মাত্র। তীর্থের ক্রিয়া কর্ম্মাদি যা করবার পূর্ব্ববারেই করে গিয়েছিলাম। গদাধরের পাদপদ্ম কাল পাথরের উপর বড় করে পদচিহ্ন আঁকা।

ফল্গুনদীতে আমাদের বড়ই আনন্দে কাটলো, যত ক্ষণ আমার স্ত্রী ও দাদাবাবু শ্রাদ্ধকার্য্য করছিলেন, আমি আর গোরা ততক্ষণ ফল্গুর বালি নিয়ে খেলা করছিলাম। ফল্গুনদী বালিতে ভরা, একটা ক্ষীণ জলধারা মাত্র মাঝখান দিয়ে চলেছে। বালি একটু খুঁড়লেই নিচেয় নির্ম্মল জল বের হয়। গোরা হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে ছোট ছোট গর্ত্ত করে জল তুলছিল, আর বালির মুঠা করে করে তার মায়ের শ্রাদ্ধকর্ম্ম দেখে দেখে পিণ্ড দানের অনুকরণ করছিল।

শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে আমরা বোধগয়া দর্শনের জন্য একটা ঘোড়াগাড়ী করে চললাম। বোধগয়া ৺গয়াধাম থেকে সাত মাইল দক্ষিণে। যাতায়াত বন্দোবস্ত হল মাত্র তিন টাকা। পথে নিরঞ্জনার তীর বেয়ে গাড়ী চলল, নিরঞ্জনার ওপারে বরাবর পাহাড়ের শ্রেণী, কি মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমরা চলছিলাম। বোধগয়া গিয়ে পাথরে গাঁথা সেখানকার বুদ্ধদেবের বিরাট মন্দির দেখে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হলেন। ভিতরে গৌতমবুদ্ধের সুন্দর মূর্ত্তি। আমার স্ত্রী বুদ্ধের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, বার বার সে মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করলেন। তখন বহু ঘৃত দীপ সহকারে বৌদ্ধ ভক্তগণ আরতি করছিলেন। সকলেই ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। আমাদের গোরার প্রণামের ভঙ্গিটি বরাবই বড় সুন্দর।

পরে আমরা মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে বোধিদ্রুম দেখতে গেলাম। বোধিদ্রুম একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। আড়াই হাজার বছর আগে এখানেই বোধিদ্রুম তলে বসে বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর ধ্যানের পর সিদ্ধি লাভ করেন। এখানেই জগতের দুঃখের নির্ব্বানের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। দেখলাম চীন তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধগণ স্ত্রী-পুরুষে নানাপ্রকার সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন। তাঁদের মন্ত্রজপ, মালাজপ, প্রণাম সবই অত্যন্ত বিভিন্ন রকমের। আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বোধিদ্রুমের তলে বসে তাঁদের এই সব পূজা-পদ্ধতি দেখলাম। বারো বছর আগে যখন একবার এসেছিলাম তখন কিন্তু এত বিদেশী বৌদ্ধ দেখি নাই।

আমরা বোধগয়ার ভগ্ন প্রস্তরের কীর্ত্তি ও আর আর কীর্ত্তি সকল একে একে দেখলাম। এ সমস্তই বুদ্ধভক্ত মহারাজ অশোকের দ্বারা তৈরী। দাদাবাবুর নজরটা একটু বড়লোকী ধরণের, তিনি প্রাণভরে মন্দিরের বিশালতা দেখছিলেন, আর চারিদিকের অফুরন্ত প্রস্তর-শিল্পের প্রশংসায় নিযুক্ত ছিলেন। একটা প্রকাণ্ড পাথরের গেট্ প্রস্ফুটিত ফুলসহ চীনে লতাপাতায় চমৎকার সাজান দেখে "বিশল্যকরণীসহ গন্ধমাদন বহনের মত" দেশে নিয়ে যাওয়া চলে কিনা দাদাবাবু সেইটা মনে মনে ঠাওরাচ্ছিলেন।

ওদিকে গাড়ীওয়ালা ডাক হাঁক আরম্ভ করল, সন্ধ্যাও প্রায় হয়ে এসেছে, আমরা ঘোড়া গাড়ীতে আবার সেই নিরঞ্জনার সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে গয়াধামে ফিরলাম

শেষ রাত্রি তিনটায় রথে মেলে কাশীযাত্রা করব। ষ্টেসনে লোকারণ্য দেখে প্রাণ চমকে গেল। ভাগ্যি কাশী পর্য্যন্তের টিকিট কলিকাতায়ই করা হয়েছিল। কিন্তু যাত্রীর ভীড়ে প্লাটফর্ম্মে ঢোকা দায়। অবশেষে আপিসের একজনকে অনুরোধ করে আপিসের মধ্য দিয়ে প্লাটফর্ম্মে ঢুকতে হল। সকাল ৭টায় ট্রেন মোগলসরাই ধরল; শোন নদীর সুদীর্ঘ পোলটি কোন সময়, পার হয়েছে, কেউ তা টের পাই নাই। আমরা গাড়ী বদল করে কাশীর লাইনের গাড়ীতে উঠলাম। মোগলসরাই ষ্টেসনের চমৎকার গাছপাকা বড় পেয়ারা আর দই-রাবড়ীতে প্রাতর্ভোজন হল, ভাল জিনিস, বেশ সস্তা।

ট্রেন কাশীর কাছে গিয়ে গঙ্গা পার হতেই

"গঙ্গামায়ী কী জয়" "কাশী-বিশ্বেশ্বর কী জয়" রবে যাত্রী-পূর্ণ সমস্ত ট্রেনটা জয়ধ্বনি করে উঠল। উল্লাসে গোরাও বার বার দুহাত তুলে ঐ জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করল। গঙ্গার পোলের উপর হতেই কাশীর রমণীয় দৃশ্যটা মোটামুটী দেখা গেল। ট্রেন কাশী ষ্টেশনে ধরলে অনেক লোক নেবে গেল, ৮টায় আমরা বেনারস-ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে নামলাম। ষ্টেসনে ঘোড়াগাড়ীর খুবই আমদানী। নূতনত্ব ভোগের জন্য আমরা একা গাড়ী করলাম। সেই বটতলার মহাভারতে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের রথ দেখে থাকি, সে নমুনাটা বোধ হয় এই একা থেকে নেওয়া। একা ত গাড়ীই নয়, কোনমতে চলা যায় মাত্র। গাড়ী চলছিল বেশ। আমাদের গাড়ীর ঘোড়াটি ছিল সাদা, তাই আমার স্ত্রী গীতার শ্লোকটি মনে করে বলছিলেন—"বসিয়া শ্বেতাশ্ব-রথে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।"

আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে সুবিশাল প্রস্তর সোপানাবলীর উপর দিয়ে খানিকটা পথ ভ্রমণ করলাম। কাশীর রমণীয় দৃশ্য বিশেষতঃ গঙ্গা তীরটি ভারতের গৌরবের দৃশ্য। প্রস্তর নির্ম্মিত সুবিশাল হর্ম্মাবলি, মাঝে মাঝে প্রস্তর নির্ম্মিত বিখ্যাত কারুকার্য্যময় মন্দির।

আমরা ঘাটে বিশ্রাম করছিলাম; একজন পোঢ়া আমাদিগকে সঙ্গে করে নিয়ে বাসস্থান ঠিক করে দিলেন। পরিচয়ে জানলাম তিনি আমাদের এক বন্ধুলোকের মাসীমা। তাঁর ব্যবস্থার গুণে বেশ একটি পাথরের বাড়ীতে আমাদের স্থান হল। বাসায় বিশ্রামের পর আমরা মণিকর্ণিকা ঘাট ও মহাশ্মশান দর্শন করলাম। মণিকর্ণিকায় পরম তৃপ্তির সহিত আমাদের স্নান হ'ল। তথায় বহু সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন করা গেল। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের স্বর্ণচূড়াটি দূর থেকে দেখা গেল। তারপর আমরা বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনে চললাম। সেদিন বড় যাত্রীর ভীড় ছিল। ভলেণ্টিয়ার ছেলেদের অনুগ্রহে আমার স্ত্রী আর দাদাবাবু অতি কষ্টে বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা দর্শন করে এলেন। এই সব দর্শনেই প্রায় দিন কেটে গেল। রাত্রিতে রন্ধন ও আহার কাশীর নূতন শাক-সবজীতে মা অন্নপূর্ণার কৃপায় ভালই হল।

পরদিন সূর্য্যগ্রহণের স্নান। এবার মকর সংক্রান্তিতে সূর্য্যগ্রহণ হওয়ায় তীর্থযাত্রী অত্যধিক হয়েছিল। ১২ টায় সূর্য্যগ্রহণ, দশটার পর থেকেই কাশীর দুইক্রোশব্যাপী গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। কত দেশের কত রকম মানুষ, কত ভাবের তাদের পরণ-পরিচ্ছদ। মেয়েদের গায়ে কত রকম সোণা রূপা কাঁসা পিতলের গয়না। চারিদিকে কীর্ত্তনের দল। সর্ব্বত্র ভিক্ষুকের চেঁচামেচি। আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটের ভীড়ের মধ্যে না গিয়ে দক্ষিণে কয়েকটি ঘাট অতিক্রম করে সুপ্রশস্ত কেদার-ঘাটে গেলাম। গ্রহণ আরম্ভের পূর্ব্ব থেকেই লোকে স্নান-দান আরম্ভ করল, লোকারণ্যের ভিতর উপরে স্থির হয়ে টিকে থাকাও দুঃসাধ্য। গ্রহণ আরম্ভে স্নানযোগে মন্ত্রধ্বনিতে ও লোকের কোলাহলে কিয়ৎকালের জন্য কাশীধাম ভৈরবনাদ-পূর্ণ হয়ে উঠলো। লোকের চঞ্চলতার সীমা নাই। ভীড়ের মধ্যে আমরাও যথারীতি স্নান দান সমাপন করলাম। স্নান-পূত ভক্তিমান নরনারীর মুখের সেদিনকার পবিত্রতা দর্শনেও মানবের পাপক্ষয় হয়।

এ সময়ে গঙ্গার ভিতরে বহু রকম বজরা নৌকা বের হয়েছিল—তাতে কত রকম স্নান-যাত্রীর দল "গঙ্গামায়ীকি জয়" ধ্বনি করছিল। বড় বড় বজরায় সাহেব-মেমরা কূল বেয়ে বেয়ে হিন্দুর স্নান দেখছিল, তাদের অনেকেই ঘাটে ঘাটে যাত্রীদের স্নানের ফটো তুলছিল। বহু লক্ষ নিষ্ঠাবান লোকের স্নানের এদিনকার দৃশ্য বস্তুতঃই পরম আনন্দদায়ক।

বিকালে আমরা কাশীর প্রধান দর্শনীয় বিষয়গুলি দেখলাম। জগন্নাথবাড়ী, ভাস্করানন্দ-মঠ, দুর্গাবাড়ী, কালীবাড়ী প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকারের দৃশ্য দেখে সকলেই পরিতৃপ্ত হলেন।

পরদিন সকালে দেশে ফিরবার জন্য তাড়াতাড়ি স্নান আহারাদি শেষ করে আমরা 'মথুরা এক্সপ্রেস'

নামক দ্রুতগামী ট্রেনটি ধরবার জন্য রওনা হলাম। পথে ব্যস্ততার সহিত সিল্কের সাড়ী, 'কাঠের খেলনা,' সিন্দুর কৌটা প্রভৃতি কাশীর নিদর্শন কিছু কিছু কিনলাম। আবার সেই একা-রথের আশ্রয় নিয়ে ষ্টেসনে এলাম। ১১টায় ট্রেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত ঠিক-ঠাক চলেছি, ঠিক-ঠাক মনোনীত ট্রেন ধরেছি, এবার ১৫ মিনিট লেট্ করায় মথুরা এক্সপ্রেসটি ফেল্ করলাম। যাক সে কথা, ৫টি ঘণ্টা ষ্টেসনে কারাগার ভোগের মত কাটিয়ে বিকালের ডেরাডুন এক্সপ্রেসে চাপলাম। বন্দোবস্তের হের-ফের হলে অনেক অসুবিধাই হয়। আমরা এবার মেইন লাইনে ফিরছি, দিনের বেলায় নূতন পথের দৃশ্যগুলি দেখব আশা ছিল। একে একে বক্সার, পাটনা, আরা, দানাপুর, মোকামা-ঘাট প্রভৃতি বড় বড় স্থানগুলি রাত্রির ক্ষীণ আলোকেই দেখে নিতে হল। স্ত্রী একটু আপশোষ করছিলেন, "পাটনা অঞ্চলের কত মটর, অরহর, ছোলা আমরা খেয়ে থাকি কিন্তু ক্ষেত-খন্দ গুলির মধ্যদিয়া চলেও ভাল করে দেখা হল না।" মানুষের বাসনার কিছু-না-কিছু অপূর্ণ থেকেই যায়। শেষ-রাত্রে আমরা বৈদ্যনাথের জন্য জসিডি ষ্টেসনে নামলাম। সকালে ভিন্ন ট্রেনে ৪ মাইল এসে বৈদ্যনাথধামে পৌছলাম।

বৈদ্যনাথের কথা সংক্ষেপেই শেষ করি। বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি, কাশীর বিশ্বেশ্বরও লিঙ্গ-মূর্ত্তি, তবে বৈদ্যনাথের মূর্ত্তি বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তির চেয়ে বড়। সকাল সকাল পূজা ও আহারাদি শেষ করে বিকালে আমরা দেড় মাইল দূরে নন্দন পাহাড় দেখতে গেলাম। নন্দন পাহাড়ের উপর আমার পূর্ব্বে ভাল করেই দেখা আছে, আমি পায়ের বেদনায় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ভাই গোরাকে নিয়ে পাহাড়ের নিচেতেই রইলাম, দাদাবাবু আর আমার স্ত্রী ভাই-বোনে পাহাড়ের উপর গিয়ে ঘণ্টাদেড়েক বেড়িয়ে এলেন। গোরার সঙ্গে আমি এই অবকাশে, ভাঙ্গা ইট-পাথর দিয়ে একটি মন্দির গড়ার খেলায় বেশ কাটালাম।

সেদিন বিকাল ৪টায় ট্রেনে চেপে আমরা ভোরেই কলিকাতা পৌছলাম। কয়েক দিন পর্য্যন্ত গোরার মুখে তীর্থধামের সে আনন্দের ধ্বনি লেগেই ছিল,—"কাশী বিশ্বেশ্বর কী জয়" "গঙ্গামায়ী কী জয়" "বাবা বৈদ্যনাথ কী জয়!"

পাঠক পাঠিকা আমার এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত দেখে কি মনে করবেন জানি না—হয়ত বলবেন এই না ইনি একটি বৎসর ধরে বিলেত ভ্রমণ লিখলেন, বিলেতের সমাজের, বিলেতের ধর্ম্মের কত বাহবা দিলেন, এ আবার কি! আমার জবাব এই যে—জনসমাজে স্থানভেদে সমাজভেদে বিভিন্ন প্রকারের ভাব থাকবেই কিন্তু এই প্রত্যেক ভাবের মধ্যেকার সত্যধারা টুকু গ্রহণ করাই মানুষের জ্ঞান লাভের উপায়। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চাপা পড়ে মানুষ জগতের অনেক থেকে বঞ্চিত থাকে। ইউরোপের ঐশ্বর্য্য দর্শনের পরেও আসবার পথে, সিংহলের বৌদ্ধমন্দির সমূহ, দাক্ষিণাত্যের রামেশ্বর, মাদুরা, শ্রীরঙ্গপত্তন, তাঞ্জোর প্রভৃতির ভুবন-বিখ্যাত হিন্দু-মন্দিরসমূহ দর্শনের প্রলোভন ছাড়তে পারি নাই। সেই সেই স্থান দর্শনে ও তথাকার যৎকিঞ্চিৎ ভাব গ্রহণে আনন্দ লাভ করেছি।

তীর্থের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার নিজের আর একটু ব্যক্তিগত কথা বলেই শেষ করব। বারো বছর আগে সত্যই একবার সংসার-তাপক্লিষ্ট হয়ে শান্তি লাভের আশায় তীর্থ ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। সাড়ে তিন মাস পর্য্যন্ত মথুরা বৃন্দাবনাদি তীর্থে ঘুরেছিলাম। জীবনের অপবিত্রতা—যার জন্যে সংসারে দুঃখ পেতাম, তার থেকে মুক্তিলাভের কোন সন্ধানই কোন খানে না পেয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে দেশে ফিরবার পথে আশ্চর্য্য উপায়ে দীক্ষালাভ করি। বুঝি তীর্থের দেবতা এ দীনের প্রার্থনা শুনেছিলেন—পবিত্র হয়ে দেশে ফিরে-ছিলাম; তীর্থ ভ্রমণ সার্থক হয়েছিল। ভগবানের দয়া কোন পথে কি ভাবে আসে, কোন পথে চলে যায়, তা বলা যায় না। শ্রীভগবানের কাছে এই নিবেদন—জীবনে আর যেন কোন অপবিত্রতা স্পর্শ না করে।

বেকার-সমস্যায় নারীর স্থান

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্

আমরা যখন দেশব্যাপী বেকার-সমস্যার কথা আলোচনা করি, তখন সাধারণতঃ পুরুষের বেকার-সমস্যার কথাই ভাবি, নারীজাতির মধ্যেও যে বেকার-সমস্যা থাকিতে পারে এবং আছে, তাহা তলাইয়া দেখি না। তাছাড়া, এই দেশ-ব্যাপী বেকার-সমস্যায় নারীর স্থান এবং নারীর কাজ কতটুকু তাহা ত আমরা ভাবিয়া দেখি না।

আমাদের একটা প্রধান দোষ এই, সমাজে নারীর যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, নারী যে সমাজ দেহের অর্দ্ধাঙ্গ, ইহা আমরা অনুভব করি না। নারীর ভাল-মন্দ, শিক্ষা-দীক্ষা, দোষ-গুণ আমাদের সমাজের উপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, তাহা আমরা তলাইয়া দেখি না। সমাজে নারীর যে একটা বিশেষ অধিকার আছে, তাহাও আমরা আমল দিতে চাহি না। আমরা আমাদের সমাজ দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে চাই, কিন্তু আমাদের অর্দ্ধাঙ্গই যে রুগ্ন ও অবশ হইয়া আছে,—গোটা দেহকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে অবশ অর্দ্ধাঙ্গকেও যে চিকিৎসা করা দরকার—তাহা আমরা মানিতে চাহি না। অনেকে বলেন, যে অংশ কিছু সুস্থ আছে আগে তাহাকেই সবল করিয়া তোল, রুগ্ন অংশের চিকিৎসা পরে করিবে। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই জানেন, কোন ব্যাধি দেহের কোন অংশকে আক্রমণ করিলে সে কেবল সেই অংশ বিশেষকে লইয়াই ক্ষান্ত থাকে না; দেহের অন্যান্য অংশ ও গোটা দেহটাকে আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকে। আজ আমাদের স্ত্রীজাতির ভিতর অজ্ঞতা, কুসংস্কার, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি ব্যাধিগুলিকে অবাধে বিচরণ করিতে দিয়া আমরা আমাদেরই মরণ ডাকিয়া আনিতেছি মাত্র। আজ দেশের পুরুষের ভিতর বেকার-সমস্যা যে এত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার একটা প্রধান কারণ আমাদের মনে হয় নারীর বেকার-সমস্যার বৃদ্ধি। কথাটা প্রথম শুনিতে যেন কেমন ঠেকে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে।

সন্তানপালন ও সংসারের ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম ছাড়া আজকাল আমাদের দেশের নারীগণের আর বেশী কিছু কাজ আছে বলিয়া দেখি না। কোন কোন মহিলা কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক আমাদের দেশে কোন উপার্জ্জন করেন না। ইহার সঙ্গে য়ুরোপ আমেরিকা বা জাপানের নারীগণের তুলনা করুন। এই সকল দেশে অনেক স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় নিজের জীবিকা নিজেরাই অর্জ্জন করেন। তথায় স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত, তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা ও যোগ্যতা অনেক বেশী। মেয়েরা যে সংসারের সকল কাজেই যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, এবার য়ুরোপীয় মহাসমরে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় যখন য়ুরোপের পুরুষগণ সাধারণ কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সহস্রে সহস্রে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন দেশের আভ্যন্তরীণ সকল কাজকর্ম্মই চালাইয়াছিলেন য়ুরোপের নারীগণ, এই বিরাট মহাদেশের জটীল জীবন-যাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন—য়ুরোপের নারীরা। তাঁহারা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়াছেন, বস্ত্রহীনের বস্ত্র বুনিয়াছেন, নিরানন্দের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছেন, বাণিজ্য-ব্যবসায়, আফিস-আদালত, যান-বাহন, কলকব্জা, চিকিৎসা-সেবা, দেনা-পাওনা, কাগজপত্র, হিসাব-নিকাশ, সকল ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানই তাঁহারা করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় বৃটীশ সাম্রাজ্যের শিল্পব্যবসায়ের রক্ষা ও বাণিজ্য-চালনার কার্য্যে মেয়েরা যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্টে সহযোগী সৈন্যাধ্যক্ষ

বলিয়াছিলেন,—"প্রায় সমস্ত কার্য্যক্ষেত্রেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান দখল করিয়া সফলতা দেখাইতে পারেন, তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"

যুদ্ধের সময়ই যে করিয়াছেন তাহা নয়, এক্ষণে যুদ্ধ বিরামের পরও য়ুরোপ আমেরিকার নারীরা জীবনের বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে স্ব স্ব যোগ্যতা দেখাইয়া একদিকে নিজেদের জীবিকার্জ্জন করিতেছেন, অপরদিকে পুরুষের জীবন-যাত্রাকেও সহজ ও লঘু করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করেন না। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়কেই তাঁহারা জীবিকার্জ্জনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করেন। ফলে তথাকার পুরুষরা নারীকে জীবনযাত্রা-পথের অন্তরায় বা বোঝা বলিয়া মনে করে না, পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও সহকর্ম্মী বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত।

আমাদের দেশের নারীদের পক্ষে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের কল্পনা করাও কষ্টকর। প্রায় সকল নারীকেই স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। পুরুষ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া দিবে, তবেই নারী তাহার দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নারীগণ ঘরকন্নার কাজ ছাড়া অন্য কোন ভাবে আর্থিক হিসাবে সংসারের সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা আমাদের দেশে কেহ বড় করিতে পারে না। এই জন্য দেখা যায়, আমাদের দেশের অনেক পুরুষ নারীকে একটা গলগ্রহ বলিয়া মনে করে। এই জন্যই গৃহে কন্যা-সন্তান জন্মিলে লোকে প্রমাদ গণে এবং এই জন্যই মেয়ের বিবাহ-ব্যাপার আমাদের দেশে এতবড় একটা গুরুতর সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। শুধু পুরুষরাই মেয়েদিগকে গলগ্রহ মনে করে না, মেয়েরাও অনেকে নিজের জীবনকে অকিঞ্চিৎকর ও পুরুষের গলগ্রহ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যে মানুষ, তাঁহাদের জীবনেরও যে একটা মূল্য আছে ইহা আমাদের দেশে মেয়েরাও স্বীকার করিতে চান না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, মেয়েরা দেখেন আপাতদৃষ্টিতে তাঁহারা সংসারের বড় বেশী কাজে আসেন না, ঘরকন্না গৃহস্থালীর কাজ ব্যতিত আর্থিক হিসাবে তাঁহারা সংসারের কোন উপকার করিতে পারেন না। নারী বিধবা হইলে এ অবস্থাটা আরও স্পষ্ট হয়। খাটিবার ইচ্ছা সত্বেও নারীরা কাজ করিবার পথ পান না। সুতরাং নারীর কাছে নারীজীবনটা যে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

পূর্ব্বে কিন্তু আমাদের দেশে নারীর এরূপ অবস্থা ছিল না। আমরা সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের কথা বলিতেছি না, এক শত বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ অবস্থা ছিল না। তখন নারীর কাজ এখনকার মত শুধু ঘরকন্নাতেই পর্য্যবসিত হইত না। সংসারের সকল কাজ করিয়াও তাঁহারা অবসর-সময়ে সূতা কাটিয়া সংসারের একটা মস্ত বড় অভাব পূরণ করিতেন। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটি বস্তুই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ। সেকালের নারী কেবল অন্নপ্রস্তুতই করিতেন না, সংসারের সকলের বস্ত্রের অভাবও পূরণ করিতেন। মানুষের আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক বোধ হয় বস্ত্রে ব্যয়িত হয়। তখনকার মেয়েরা শুধু বস্ত্রের খরচই বাঁচাইতেন তাহা নহে, পরন্তু নিজেদের তৈরী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করিয়া দেশের ধনাগমেরও সহায়তা করিতেন। ইহা আমাদের মনগড়া কথা নয়, ইহা ইতিহাসবর্ণিত খাঁটি সত্য কথা। একশত বৎসর আগেও কেবল কলিকাতার বন্দর হইতেই অন্ততঃ দুই কোটি টাকার বস্ত্রাদি রপ্তানি হইত। বর্ত্তমানের বাজারের হিসাবে এই দুই কোটির অর্থ অন্ততঃ দশকোটি টাকা। স্মরণ রাখিতে হইবে তখন এ দেশে সূতা বা কাপড়ের কল ছিল না, মেয়েরা অবসরসময়ে চরকায় সূতা কাটিয়াই এই সকল বস্ত্রের সূতা যোগাইতেন। সংসারের বস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়াও তাঁহারা বিদেশে বস্ত্র পাঠাইয়া দেশে কোটি কোটি টাকা আনয়ন করিতেন। তখন তাঁহারা

পুরুষের গলগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইতেন না, বরং জীবন-যাত্রা-পথে পুরুষকে বিশেষ সাহায্য করিতেন; এজন্য দেশের জীবনসংগ্রামও তখন এত কঠোর ছিল না—অন্নের জন্য দেশে এত হাহাকারও ছিল না।

কিন্তু এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ কোটি টাকার তুলার বস্ত্রাদি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমাদানী করা হয়; যে মেয়েরা এক কালে অবসর সময়ে সূতা কাটিয়া সংসারের সকলের বস্ত্র যোগাইয়াও বিদেশ হইতে প্রচুর অর্থ আনয়ন করিতেন, আজ তাঁহারা সংসারে বস্ত্র যোগান দূরে থাকুক, নিজেদের একখানা গামছার অভাবও দূর করিতে পারেন না—অন্ন এবং বস্ত্রের জন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যাঁহারা সংসারে এত বড় একটা কাজের লোক ছিলেন, আজ তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা। যে অবসর সময় তাঁহারা সূতা কাটিতেন সে অবসর সময় তাঁহারা এখন কি করিয়া থাকেন, কেহ তাহার হিসাব দিবেন কি? সংসারের দিক হইতে তাঁহাদের কার্য্যকারিতাশক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাই আজ তাঁহাদের আদর যত্নও কমিয়া গিয়াছে—শুধু পুরুষের কাছে কমে নাই, তাঁহাদের নিজেদের কাছেও কমিয়াছে।

আমাদের দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইলে, নারীর দুরবস্থা দূর করিতে হইলে ভারতের বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করা দরকার। বস্ত্রশিল্পের দ্বারাই ভারতবর্ষ একদিন সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের হৃত সম্পদ উদ্ধার করিতে হইলে, দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার নরনারীকে কাজ দিতে হইলে দেশের বস্ত্রশিল্পকে উদ্ধার করিতে হইবে, বস্ত্রবিষয়ে দেশকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। শুধু মিলের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহা হইবে না, ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁতের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহা হইবে। চরকার উপযোগিতা সম্বন্ধে আজকাল বেশী কথা বলা দরকার করে না—মহাত্মা গান্ধী; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মহামনীষিগণ নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, চরকাই দেশব্যাপী দৈন্য ও দারিদ্র্য দূর করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। চরকা শুধু আমাদের বস্ত্রের অভাব দূর করিবে না, ইহা আমাদের অনেক অভাব দূর করিবে। আমাদের মনে হয়, সার্ব্বজনীন ভাবে আমাদের মেয়েদের দুঃখলাঞ্ছনা দূর করিবার পক্ষে এমন সহজ, সরল অথচ প্রকৃষ্ট উপায় আর দ্বিতীয়টি নাই। চরকা নারীর বেকার-সমস্যা দূর করিবার প্রধান অস্ত্র। মেয়েরা অবসর সময় চরকা কাটিলে তাঁহাদের যে একটা কেবল কাজ জুটিবে তাহা নয়, ইহা দ্বারা তাঁহাদের সংসারের বস্ত্রের অভাব অনেক পরিমাণে দূর করিতে পারিবেন, আর্থিক হিসাবে সংসারের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন। ফলে তাঁহাদের লুপ্ত সম্মান ফিরিয়া আসিবে, তাঁহারা আর সংসারের গলগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। কুললক্ষ্মীরা চরকা ধরিলে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে।

নারীর বেকার-সমস্যা দূর করিবার অন্যতম প্রধান উপায় নারীজাতির মধ্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে আমাদের নারীগণও বিদেশীয় নারীদের ন্যায় বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, ইহার প্রমাণ আমরা অহরহঃ পাইতেছি। প্রতিভা, বুদ্ধিবৃত্তি বা কর্ম্মশক্তিতে ভারতীয় নারীগণ বিদেশীয় নারীর অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। যতই দোষ দেখাই না কেন, ভারতের নারীই ভারতের গৌরব। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"ভারত তাহার যশ, মান, ঐশ্বর্য্য সবই হারাইয়াছে, কিন্তু এখনও যদি কোন একটি বিষয়ে তার গর্ব্ব করিবার থাকে, তবে সে তার স্ত্রীজাতি। ভারতের এ দুর্দ্দিনেও ভারতীয় মহিলাগণ ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।" ভারতের হৃত ঐশ্বর্য্যও ভারতের নারীই উদ্ধার করিবেন—এ বিশ্বাস, এ ভরসা আমাদের আছে।

ভার্ণাকিউলার টিচারশিপ পরীক্ষার ফল

ইং ১৯২৫ সালের ভার্ণাকিউলার টিচারশিপ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত মহিলাগণ উত্তীর্ণা হইয়াছেন

সিনিয়রস্, প্রথম শ্রেণী—

সুরবালা চক্রবর্ত্তী—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
যামিনী মজুমদার— „

সিনিয়রস্, দ্বিতীয় শ্রেণী—

অমিয়প্রভা বোস—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
প্রতিভা চৌধুরী— „
কাননবালা দাস—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
প্রতিভাবালা দাস—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
সুসঙ্গিনী দাস— „
শ্যামমোহিনী দেবী—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
কমলা ঘোষাল— „
সূর্য্যমোহিনী হালদার—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
নলিনী মণ্ডল—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
সেপোরা মণ্ডল—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
সুকুমারী মুখোপাধ্যায়—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
ভবসুন্দরী মুকুম—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
স্নেহলতা পাত্র—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
সাবিত্রী সিংহ—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
শান্তিশীলা তুঙ্গ—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।

জুনিয়রস্, প্রথম শ্রেণী—

শৈবলিনী দাস—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
নীহারবালা নাড়ু— „

জুনিয়রস্, দ্বিতীয় শ্রেণী—

আকালাড়া—মোসলেম টেনিং ক্লাস।
সৈদা বেগম— „
এলাইস মরিয়ম্—সি, ই, জেড্ নর্ম্মাল স্কুল, কৃষ্ণনগর।
বিন্দুবাসিনী—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
কৃষ্ণদাসী বিশ্বাস—সি, ই, জেড্ নর্ম্মাল স্কুল, কৃষ্ণনগর।
রাণীবালা বিশ্বাস—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
রেণুবালা বিশ্বাস—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
সুহাসিনী বোস—হিন্দু ফিমেল টেনিং ইনষ্টিটিউসন্।
দৌলতমণি বিশ্বাস—ইউনাইটেড মিশনারী টেনিং কলেজ।
কাননবাসিনী চৌধুরী—সি, ই, জেড্ নর্ম্মাল স্কুল, কৃষ্ণনগর।
বিনয়বালা দাস—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
কুসুমকুমারী দাস— „
নীলিমা দাস—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
রমণীবালা দাস—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
সুন্দরীবালা দাস—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
সুধীরাবালা দাস গুপ্ত—ফিমেল টেনিং ইনষ্টিটিউসন্।
সুনীতিবালা দাস গুপ্ত— „
সরযূবালা দত্ত— „
শোভারাণী দত্ত—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
ভবরাণী ঘোষ—হিন্দু ফিমেল টেনিং ইনষ্টিটিউসন্।
বনলতা ঘোষ—সি, ই, জেড্ নর্ম্মাল স্কুল, কৃষ্ণনগর।
পারুলবালা ঘোষ—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
প্রতিভাসুন্দরী ঘোষ—সি, ই, জেড্ নর্ম্মাল স্কুল, কৃষ্ণনগর।
রাণীবালা ঘোষ—ইউনাইটেড মিশনারী টেনিং কলেজ।
প্রতিভা গুপ্ত—ব্রাহ্ম টেনিং ক্লাস।
প্রতিভাময়ী হড়—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
উষাপ্রভা কবিরাজ— „
জহিদা খাতুন—মোসলেম টেনিং ক্লাস।
বনলতা লী—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
ইন্দিরাশোভনা মাইতি—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
মানদা মণ্ডল— „
পারুলবালা মণ্ডল—সি, ই, জেড্ নর্ম্মাল স্কুল, কৃষ্ণনগর।
রেজিনা মণ্ডল—সেণ্ট মরিস্ রোমান ক্যাথলিক টেনিং ক্লাস।
লেনা আখতার— „
নীতিকালতা প্রধান—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।
কামরুন্নেসা—মোসলেম টেনিং ক্লাস।
হিরণ্ময়ী রায় কানুনগো—হিন্দু ফিমেল টেনিং ইনষ্টিটিউসন্।
প্রভাবতী সেনগুপ্তা— „
কিরণবালা সাহা—লী মেমোরিয়াল টেনিং ক্লাস।
হেলেনা সরকার—সেণ্ট মরিস্ রোমান ক্যাথলিক টেনিং ক্লাস।
হীরাপ্রভা সরকার—ইউনাইটেড্ মিশনারী টেনিং কলেজ।

কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবিকার রিপোর্ট

শ্রীমতী উর্মিলতা ঘোষ।

জাতীয় মহাসম্মিলনীর স্বেচ্ছাসেবিকা দলের নেত্রী শ্রীযুক্তা সাঙ্গাবাই দীক্ষিতের অনুরোধে আমরা ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস্ মণ্ডপের সাহায্যার্থে কানপুরের প্রান্তভাগে নব প্রতিষ্ঠিত "তিলকনগরে" রওনা হইলাম। আমরা তিনজন মাত্র বাঙ্গালী মহিলা, তদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয়, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, হিন্দুস্থানী ও মান্দ্রাজী প্রায় সত্তর জন ভদ্র উচ্চবংশীয়া মহিলাও এই স্বেচ্ছাসেবিকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যখন তিলকনগরে আমাদের ক্যাম্প (camp) এর নিকটে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা প্রায় ১২॥ টা, নব নির্ম্মিত তিলকনগরী তখন শীতের তীক্ষ্ণ হরিতাভ রৌদ্রে ঝক্‌মক্ করিতেছিল, চারিদিকে বিপুল জনস্রোত সকলেই এই নগর দেখিতে আসিয়াছিল। আমরা প্রথম চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের শিবিরশ্রেণীর দুয়ারে বহুদূর পর্য্যন্ত বেড়া দিয়া ঘেরা, তাহার মধ্যে একটী "ঝাণ্ডা" দণ্ডায়মান। জাতীয় পতাকা যেন নবীন উৎসাহে—নবীন আশায় উড়িতেছিল। বেড়ার দুইপাশে দুইটি গেটের মতন করা হইয়াছিল, একদিক দিয়া প্রবেশের ও একদিক দিয়া বাহির হইবার পথ। গেটের মাথায় খদ্দরের লম্বা রঙীন্ কাপড়ের উপর বড় বড় হিন্দী অক্ষরে লেখা "হিন্দুস্থানী-সেবাদল-শিবির।"

আমাদের কাপ্তেন শ্রীযুক্ত ভূদেব শর্ম্মা একজন শিক্ষিত ও বিনয়ী ভদ্রলোক, তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া সম্মানের সহিত সমস্ত Camp, Pandal ও ভোজন-ভাণ্ডার ইত্যাদি দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কারণ কংগ্রেস্ আরম্ভ হইলে কাজ করিবার সময় যেন স্থান সুন্দর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। প্রত্যেক Campএর গায়ে Bengal, Behar ইত্যাদি লেখা ছিল, তবুও কাজের দিনে আমরা যে কত খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দেখা শুনা হইবার পর সন্ধ্যার সময় আমরা "ঝাণ্ডার" নীচে একত্রিতা হইলাম এবং "বিজয়ী বিশ্বতিরঙ্গা পেয়ারা, ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা,"—এই গানটী সকলে মিলিয়া গাহিবার পর "ঝাণ্ডা" নামাইয়া রাখা হইল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল; ডিসেম্বর মাস্ তাহাতে এদেশের প্রবল শীতে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে আমরা কাঁপিতে আরম্ভ করিলাম। অল্প পরে Campএ যাইবার আদেশ পাইলে ১২ জন করিয়া সহায়িকা ও একজন করিয়া নায়িকা এক একটী Campএ আমরা আশ্রয় পাইলাম। ভিতরে বৈদ্যুতিক আলো (Electric light) ছিল, তাহার উজ্জ্বলতায় আমাদের মন কতকটা প্রফুল্ল হইল। আমরা সেখানে সকলে বিছানা পাতিয়া বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিয়া দিলাম।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় নেত্রী বংশীধ্বনি করিলে আমরা সকলে খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। আমাদের সকলকে একখানি করিয়া টিকিট দেওয়া হইয়াছিল, সেই টিকিট ভোজনালয়ের দ্বারে স্বাক্ষর করিয়া লইয়া তবে আমরা ভিতরে গিয়া খাইতে পাইব, বলিয়া দেওয়া হইল। টিকিটের উপর "কাচ্চি" ও "পাক্কি" জানিবার জন্য দুই প্রকার দাগ দেওয়া ছিল। পাক্কি অর্থাৎ পুরী ও কাঁচ্চি অর্থাৎ ভাত ইত্যাদি খাওয়া যাইবে। যাঁহার যাহা অভিরুচি তিনি সেই প্রকার টিকিট লইলেন। আমরা ভেতো বাঙ্গালী, কাঁচ্চি টিকিটই গ্রহণ করিলাম। ভোজনালয়ে গিয়া দেখি

লাম, এক একখানি বড় পিতলের থালা ও কটোরা আমাদের জন্য পাতিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা বসিলে সকলে অতি যত্নের সহিত আমাদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অপর সকলের পক্ষে বিশেষ ভাল খানা যে হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন দেখিয়াই অনুমান করিতেছিলাম। তাঁহারা পশ্চিমের লোক, ডাল-রুটী তাঁহাদের নৈমিত্তিক খাদ্য, তাহার উপর পুরী, পাঁপর, কড়ী, বড়ী, রেওতা, আলুর শাক, চাটনী ইত্যাদি অপরূপ খাদ্য তাঁহারা পাইয়াছিলেন। আমাদের ভাগ্যে কিন্তু সেই অড়হর দাল, আলুর শাক ও ভাত। প্রায় আধপোয়া পরিমাণে কাঁচা ঘৃত পাতে আসিয়া পড়াতেও আহারে যে আমরা মন বসাইতে পারিতেছিলাম না, তাহা আমাদের মুখ ও পাত দেখিয়াই তাঁহারা অনুমান করিয়া লইয়া আমাদের তিনজনকে বলিতে লাগিলেন "আপ্‌লোক্‌কা হিন্দুস্থানী খানা আচ্ছা নেই লাগ্‌তা হায়? মছলী নেহি হ্যায়, এইসে, নেহি ?" আমরা কি যে বলিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না, কারণ আমরা স্বেচ্ছাসেবিকা—এখানে নিমন্ত্রণ খাইতে আসি নাই, কাজ করিতে আসিয়াছি এবং এই কয়দিনের জন্য আমাদের লোভ ক্রোধ ইত্যাদি রিপু যে বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে ইহা নেত্রী, ক্যাপ্টেন ও আমাদের বিবেক বার বার বলিয়াছিলেন। কাজেই কাঠ হাসি হাসিয়া আমরা বলিলাম "ইসসে কেয়া হ্যায়? খানেকে ওয়াস্তে হিঁয়াপর থোড়াই আয়া!" তাঁহারা সকলেই ইহাতে সমর্থন করিলেন। তরকারী থাকিলে অবশ্য আমাদের খাওয়ার কোনও কষ্ট হইত না। যাহা হউক প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সকলের আহার শেষ হইল, তখন আবার দুয়ারের নিকট হইতে টিকিট লইয়া আমরা ক্যাম্পএ ফিরিয়া আসিলাম।

প্রায় রাত ৯ টার সময় আমাদের ক্যাপ্টেন আসিয়া বলিলেন, "আপনারা খুব সাবধান থাকিবেন, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে সভানেত্রী করিবার জন্য পাঞ্জাবীরা ভীষণ চটিয়া গিয়াছে, অনেকে বলিতেছে আগুন দিয়া সমস্ত তিলক নগর জ্বালাইয়া দিব, এখনি দাঙ্গাও হইতে পারে, আপনাদের সারারাত দুই জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবিকাকে মহিলা campএর চারিদিকে পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দিতে হইবে।" কথাটা শুনিয়া আমাদের অবলা মনে একটু ভয় যে না হইয়াছিল একথা বলা যায় না, কিন্তু কৌতূহলও যে না হইয়াছিল এমন নয়। মনের কোণে এই ভীষণ ব্যাপারের উপভোগ স্পৃহাও বোধহয় একটু জাগিয়াছিল, কিন্তু সেইসঙ্গে পাছে তিলকনগর পুড়িয়া গিয়া জাতীয় মহাসম্মিলনীতে বাধা পড়ে ও কোন লোকের মৃত্যু হয়, সেই ভয়ও সঙ্গে সঙ্গে হইতেছিল।

পরদিন ভোর ৪টার সময় আমাদের প্রস্তুত হইবার জন্য বংশীধ্বনি হইল। সকল campএর লোক জাগিয়া উঠিলেন ও আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাত মুখ ধুইয়া আমাদের খদ্দর ইউনিফরম্ পরিয়া "ঝাণ্ডার" নীচে একত্রিতা হইলাম। তখনও চতুর্দ্দিক অন্ধকার, হুহু করিয়া শীতের প্রচণ্ড বায়ু হাড় পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিতেছে। আমাদের পরণে হাতকাটা সাদা খদ্দরের ব্লাউস ও একখানি গেরুয়া রঙের খদ্দরের সাড়ী। দারুণ শীতে পা-হাত এমন অবশ হইয়া গিয়াছে যে, সে দুটী আছে কি নাই তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না—আর সবেমাত্র হিমপড়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়াছি। যাহা হউক সেখানে আমরা সকলে গোল হইয়া দাঁড়াইলাম, নেত্রী মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইলেন ও আমাদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "নমস্তে,"—আমরা সকলে একসঙ্গে নমস্তে করিলাম। তিনি আবার বলিলেন "হুসিয়ার,"—আমরা একসঙ্গে যথাসাধ্য দুইহাত পার্শ্বে রাখিলাম। তার পর "বন্দেমাতরম্" ও "ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা"—সকলে মিলিতা হইয়া এই গান দুটী করার পর নেত্রী ধীরে ধীরে লাল সবুজ ও সাদা "ত্রিরঙ্গা" জাতীয় নিশান উড়াইয়া আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

"বন্দে,"—আমরা সকলে বলিলাম "মাতরম্।" তিন বার এইরূপ বলিবার পর প্রাত্যকৃত্য সমাধা হইল।

বাহির আঙিনায় যে বড় "ঝাণ্ডা" খাড়া করা হইয়াছিল তাহার নীচে স্বেচ্ছাসেবকগণও এইরূপে প্রত্যহ প্রাত্যকৃত্য সমাধা করিতেন, তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় তিনশত ছিলেন। মাত্র একদিন আমরা সকলে একসঙ্গে এই কাজ সমাধা করি। শুনিলাম "কাশী ইউনিভারসিটী" হইতে দেড়শত শিক্ষিত যুবক এই কার্য্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। আজ এই স্বেচ্ছাসেবকগণের একটী কথা আমি শ্রদ্ধার সহিত উত্থাপন করিতেছি যে, তাঁহারা যেমন করিয়া নিজেদের গৃহে আপনার মা ও ভগ্নীদের রক্ষা করেন ঠিক তেমনি করিয়াই তাঁহারা আমাদের দশদিন এই কংগ্রেস মণ্ডপে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাত্রে আমাদের শিবিরে পাহারা দেওয়া, দিবসে জল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া দেওয়া, "নাস্তা" আনিয়া দেওয়া, ঘাটে পথে ভিড় দেখিলে রাস্তা করিয়া দেওয়া, এই প্রত্যেক প্রয়োজনে তাঁহারা ভায়ের মত আমাদের সেবা ও সহায়তা করিয়াছেন। কাপ্তেন ভূদেব শর্ম্মাও আমাদের ভদ্র ও বিনয় ব্যবহারে অতিশয় প্রীত করিয়াছেন। বাহিরে এরূপ সুসজ্জত সম্ভ্রম ও সমাদর পাইলে প্রত্যেক ভারতমহিলা নির্ভয়ে যে ঘরের বাহিরে গিয়া কাজ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বেলা ৮ টার সময় আমরা "নাস্তা" খাইয়া ডেলিগেট্ camp দেখিতে ও প্রয়োজনীয় কাজে বাহির হইলাম। বেলা ১১ টার সময় ভাত রুটী খাইয়া প্যাণ্ডাল্ ও একজিবিসনে Duty করিয়া রাত সাড়ে সাতটার সময় campএ ফিরিয়া আহারাদি করিয়া আবার বিশ্রামের পালা। প্রতিদিন এই ভাবে আমদের কাজ চলিত।

২০শে ডিসেম্বর আমাদের এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন প্রথম কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হয়। সেদিন বেলা ৯টার সময় আমরা Pandalএ যাই। ৩ টা গেটে ৬ জন টিকিট্ লইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন ও বাকী সকলে অভ্যাগতদের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সকলে সেদিন হাসিমুখে জীবনের সব দুঃখতাপ ভুলিয়া গিয়া কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন। অবশ্য সাধারণের চ'ক্ষে আমাদের কার্য্যে হয়ত অনেক ক্রটী হইয়াছিল, এবং ইহা খুব সম্ভব, কিন্তু কাহারও প্রাণে বোধহয় সেদিন কাজ না করিবার মত ইচ্ছা ছিল না। স্বেচ্ছাসেবকরা অবশ্য আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিয়াছিলেন, দাঙ্গাহাঙ্গামায় শান্তিরক্ষা করিতে গিয়া প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস মণ্ডপের বিস্তারিত বিবরণ এখানে আর উল্লেখ করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না, কারণ নানা পত্রিকা ও সংবাদপত্রে সকলেই তাহা পাঠ করিয়াছেন; আমি শুধু এখানে আমাদের কয়েক দিনের কার্য্যাবলীর সামান্য আভাস দিব। ২২শে ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডু ও মাহাত্মা গান্ধীজী কানপুরে পদার্পণ করেন। সেদিন রাস্তা ঘাটে অসম্ভব ভীড় হইয়াছিল। সরোজিনী নাইডুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমাদের নেত্রী সাঙ্গাবাই আমাদের পদব্রজে শোভাযাত্রা করিয়া সরোজিনী নাইডুর বাস-বাংলায় লইয়া গেলেন যখন, তখন সন্ধ্যা ৬টা। বাংলার সামনে গেটের ভিতর দুই লাইন করিয়া আমাদের দাঁড়াইতে বলিয়া শিখাইয়া দিলেন, যেন নাইডুর মোটর দেখিলেই আমরা বন্দেমাতরম্ ও তাঁহার জয়ধ্বনি করি। ৬।০টায় নাইডুর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু ৭টা বাজিয়া গেল তবুও তাঁহার মোটরের দেখা নাই। ঝাড়া একঘণ্টা আমরা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের পা গুলি অবশ হইয়া আসিয়াছিল, উন্মুক্ত আকাশের নীচে হিমে ও ঠাণ্ডা বাতাসে আমাদের হাত পা অসাড় হইয়া গিয়া সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিয়া গিয়াছিল।

আমাদের অবস্থা দেখিয়া এক ভদ্র মহারাষ্ট্রীয় সাঙ্গাবাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইহাদের

অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন, আপনি ইঁহাদের লইয়া যান, নাইডুর মোটর এখনও মলুয়োড পার হয় নাই, অত ভিড় ঠেলিয়া আসিতে ৮টা বাজিবে।" নেত্রী বলিলেন "না, স্বেচ্ছাসেবিকা হইয়া ইঁহারা যদি এইটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে না পারেন তবে কি হইবে? আমি তো বুড়ো মানুষ; আমার ত কোন ও কষ্ট হইতেছে না।" অগত্যা আমরা আরও একঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহার মধ্যেই অনেকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের চঞ্চলতা দেখিয়া নেত্রী অগত্যা বলিলেন "ঐখানেই সকলে ততক্ষণ বসিতে পার।" আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও দলের সহিত উঁচু হইয়া তথায়ই বসিতে বাধ্য হইলাম। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের এই দুর্গতিতে অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "নাইডুর আসিতে অনেক দেরী আছে, এই হিমে কাঁহাতক এইরূপ অপেক্ষা করিবেন, আপনারা বাংলার মধ্যে গিয়া বসুন।" অনেকেরই যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু নেত্রীর বিনা অনুমতিতে কেহ যাইতে পারিলেন না। তখন বাংলার মধ্য হইতে কতকগুলি কম্বল ও সতরঞ্চ আনিয়া আমাদের বসিতে ও আচ্ছাদন করিতে দেওয়া হইল কিন্তু লজ্জার খাতিরে কেহ তাহা লইলাম না। তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেত্রীকে বলিলেন, "আপনি ইঁহাদের শীঘ্র লইয়া যান, ইঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, নাইডুর আসিতে রাত ৯টা, কতক্ষণ এরূপে অপেক্ষা করিবেন?" কিন্তু নেত্রী তবুও অটল, তিনি বোধহয় আমাদের রাতারাতি 'সৈনিক-রমণী' বানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বসিয়াও যখন কষ্ট হইতে লাগিল, তখন আমরা আবার উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এইরূপে ৮৷৷০টা বাজিলেও যখন নাইডুর মোটর ডুমুরের ফুল হইয়া উঠিল, তখন সাক্সাবাই অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে আমাদের campএ ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন, সে যাত্রা আর সরোজিনী নাইডুকে অভ্যর্থনা করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

২৩শে ডিসেম্বর স্বদেশী প্রদর্শনী বিভাগের দ্বার উন্মোচন করায় সেদিন সেখানে আমরা উপস্থিত ছিলাম। মহাত্মা গান্ধী সেখানে যে কয়েকটী কথা বলেন তাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার প্রধান বক্তব্য চর্‌কা চালানর বিষয়, আমি রাত্রে ঘুমাইয়াও চর্‌কার স্বপন দেখি।" তিনি প্রথম সভাতলে প্রবেশ করিয়াই আমাদের সকলের গেরুয়া রঙের খদ্দর কাপড় দেখিয়া শিশুর মত সরল হাসিমুখে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ও ভলান্টীয়ার্স আচ্ছা খদ্দর পিহিনী।" শ্রীযুক্তা নাইডুও সেখানে একটী অভিভাষণ পাঠ করেন। মহাত্মা গান্ধীজী তাঁহার পবিত্র হস্তে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তা, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু এই মহাসম্মিলনীতে প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে বালিকাবিদ্যালয়ে স্থানীয় দেশহিতৈষী মাননীয় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন একটী নারীসম্মিলনীর সুবিধা করিয়া দেন। তথায় সরসীবালা বসু একটী কবিতা ও একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উর্ম্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী, ও সন্তোষকুমারী উপস্থিত মহিলামণ্ডলীর সহিত সনম্র মধুরভাবে বাক্যালাপ করেন ও দেশের কথার আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার আমাদের আগ্রহে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তাঁহার সুললিত ও স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতাটী সকলের মনকে বিশেষ আকর্ষণ করে। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার বল্‌বার আর কি আছে? আমি যা বল্‌বো তা সবাই মনে মনে বোঝেন, শুধু বুঝলেই হবেনা—সকলকে এর জন্য কাজ কর্‌তে হবে। নারীর কর্ম্মভূমি গৃহে বটে কিন্তু দিন এসেছে যখন, আমাদের বাইরে বেরিয়ে কাজ করবার সময় হয়েছে। এখন শুধু আর আমাদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও বাপের মুখে রক্ত-ওঠা

পয়সা দিয়ে গয়না কাপড় প'রে—সুখে খেয়ে দেয়ে—নিজের স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করলেই চল্‌বে না। এখন আমাদের বাইরে অসংখ্য কাজ ছড়ান রয়েছে, বিলাসিতাকে—পরাধীনতাকে—দুর্ব্বলতাকে আজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের জেগে দাঁড়াতে হবে, নিজেদের অধিকার নিজেদের বুঝে নিতে হবে, নিজেদের ক্ষুদ্র সংসার ছেড়ে বাইরের সংসারকেও দেখতে হবে। সমাজের অত্যাচার মাথা পেতে সইবার দিন আর নেই। এই দেশে একদিন এমন মেয়ে ছিলেন, যাঁরা স্বামী যুদ্ধে হেরে এলে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিতে আদেশ কর্‌তেন। এত তেজ আমাদের মধ্যে ছিল কিন্তু আমরা আজ স্বার্থের মোহে—বিলাসের মোহে কত ছোট হ'য়ে গেছি, আমরা ঘুমিয়ে রয়েছি. এ কালঘুম আমাদের ভাঙ্গছে না কিছুতেই, তা না হ'লে কি আজও আমাদের পরণে বিলাতী কাপড় শোভা পায়, বিলাতী আসবাবে—বিলাতী খাদ্যে আমাদের গৃহ ও উদর পূর্ণ হয়?—" ইত্যাদি। এই বক্তৃতার পর ৪।৫ জন মেয়ে আর বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন না ও চর্‌খা কাটিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।

২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর—"ভলান্টীয়ার্স মার্চ্চিং" হয়। কেল্লার ময়দান নামক স্থানে শ্রীযুক্তা নাইডু, মহাত্মা গান্ধীজী ও সমাগত দেশ নায়কগণ আমাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন এবং যাহাতে সকলে এই কংগ্রেসের পর হইতে একেবারে দেশের কাজে ইস্তফা না দিই তাহার জন্য উপদেশ ও অনুরোধ করেন। ঐদিন ভলান্টীয়ারগণ জনসাধারণকে তাঁহাদের শিক্ষা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের ড্রিল ও ও কৃত্রিম রণচাতুর্য্য দেখিয়া সকলেই খুব মুগ্ধ হন। রণক্ষেত্রে শব-বহন প্রভৃতি কর্ম্ম কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়াছিলেন। আমরা শুধু মার্চ্চিং করিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। নাইডু আমাদের সকলের সম্মুখে আসিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যান—"আপনাদের দেখিয়া আমি খুব খুসী হইয়াছি।" ৩০শে তারিখে প্রাতে গান্ধিজী হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি আমাদের campএ আসিয়াছিলেন। মহাত্মা তাঁহার মধুর ব্যবহারে ও সরল কথাবার্ত্তায় সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী নাইডুরও আসিবার কথা ছিল, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত বলিয়া তিনি আসিতে পারেন নাই।

কংগ্রেসের একটী পবিত্র চিত্র যাহা আমাদের মনকে বড় স্নিগ্ধ করিয়াছিল, তাহা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব; মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্যা ইংরাজ নৌসেনাপতি-দুহিতা মিস্ শ্লেড সমস্ত সময় গান্ধিজীর সঙ্গে থাকিয়া একনিষ্ঠা ভক্তিমতীর মত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। মুখের পবিত্রতায় ও খদ্দরের গাত্রাবরণে ভূষিতা হইয়া তাঁহাকে দেবকন্যার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বহুবর্ষ পূর্ব্বের আর একজন সাধিকার কথা মনে পড়িতেছিল, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের পদে উৎসর্গীকৃত ফুলের মত আসিয়া ভারতবর্ষে গুণের সৌরভ বিলাইয়া গিয়াছেন, সেই ভগিনী নিবেদিতার কথা।

৩০শে ডিসেম্বর বেলা নাগাইদ ১টার সময় আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কয়েক দিনের মাত্র পরিচিতা নানাদেশীয়া সঙ্গিনীরা ছল্‌ছল্ নেত্রে বিদায় লইলেন।

কংগ্রেস্ ফুরাইয়া গিয়াছে, সহকর্ম্মিণীদের অনেকের মুখ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু এই মহাসম্মিলনীর অপূর্ব্ব স্মৃতি ও তিলক-নগরের পথ ঘাট দৃশ্যাবলী ও আমাদের কাজকর্ম্মের স্মৃতি আজিও অন্তরে ছবির মত আঁকিয়া রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শ্রীচৈতন্য—এই নামে যে কত মধু আছে তাহা কেমনে বলিব? ভিখারীর খঞ্জনীতে, বৈষ্ণবের খোল-করতালে, ভক্তের প্রাণের সুরে সুরে মধুময়, "শ্রীচৈতন্য" "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম এখনও অচল, অটল, নিত্য শাশ্বত হইয়া রহিয়াছে! নবদ্বীপ ও নীলাচল, বৃন্দাবন ও খড়দহে এ নাম যেন প্রতি তরুশিরে, প্রতি তৃণশীর্ষে বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে নাচিতেছে—দুলিতেছে!

শঙ্করের গভীর অদ্বৈতবাদ ও বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যখন হিন্দুর পক্ষে দুজ্ঞেয় ও অনধিগম্য হইয়া উঠিল, কাপালিক নামধারী নররাক্ষসেরা যখন "পঞ্চমকারে" বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া ফেলিল তখনই বৃন্দাবন-নন্দ-দুলাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপধামে, নদীয়ার চাঁদরূপে আবির্ভূত হইলেন। পূর্ব্বলীলায় তিনিই যে বলিয়াছিলেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি নিজকে সৃজন করি। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নদীয়া-নগরে শচীমাতার গর্ভে নরদেহে আবির্ভূত হইলেন।

কিন্তু এবার আসিলেন কি রূপে? আসিলেন—রাধাকৃষ্ণ দুইভাবে একদেহ হইয়া। গত লীলায় শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া যত কিছু আনন্দ—যত কিছু রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতী বড় আনন্দ পাইয়াছেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পান নাই। তাই এবার রাধাকৃষ্ণ দুইরূপে একরূপ হইয়া আমার সোনার গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি॥"

-চৈতন্য চরিতামৃত।

তাই এবার তাঁহার হাতে আর সে বাঁশী নাই, অঙ্গ আর নীলবরণ নহে, ঘর্ন মসী-কৃষ্ণ চিকুর জালে আর শিখীপুচ্ছ শোভে না। এবার তিনি সোনার গৌরাঙ্গ, তপ্ত কাঞ্চন দেহসন্নিভ আমার সোনার নিমাই! কেন তিনি এবার গৌরাঙ্গ রূপে আসিলেন? তাঁহার নিজের কথাতেই বলি—

"আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
সেই সুখ আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিতে বিবিধ প্রকার॥
রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিক্ষাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধা ভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।"

—শ্রীমতী বড় চতুরা রে বড় চতুরা! গতবারে সে আমায় বৃন্দাবনের বনে বনে লইয়া বেড়াইয়া সব সুখ নিজে ভোগ করিয়াছে, আমাকে একটুও ভোগ করিতে দেয় নাই। আমাকে নাগর সাজাইয়া নিজে নাগরী সাজিয়া কান্তাশক্তির ও পরাভক্তির যা কিছু রস রাধা নিজেই ভোগ করিয়াছে, আমি আরাধ্য বলিয়া কিছুই ত ভোগ করিতে পারি নাই। এবার তা হইবে না। এবার আমি রাধার চোখে ধুলি দিব। রাধাকে এবার নিজের দেহে মিলাইয়া সব সুখ নিজে ত উপভোগ করিবই, 'তার' উপর জগতে ভক্তির মাহাত্ম্যও প্রচার করিব

আ মরি, মরি, কি রূপের মাধুরী রে, কি অপরূপ রূপের মাধুরি!

"কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্ত ভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥
ভক্ত ভাব অঙ্গী করি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥"

—চৈতন্য চরিতামৃত।

ভক্তগণ সঙ্গে ভাববিহ্বল গৌরাঙ্গ আমার নাচিয়া নাচিয়া হরিনামামৃত পান করিতেছেন। গৌরাঙ্গের সর্ব্বরূপের উপর এই কীর্ত্তনের রূপটি যেন বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে! প্রতি চরণক্ষেপে যেন সোনার কণা ছিটকাইয়া পড়িতেছে! মুমুক্ষু মানব যদি গৌরাঙ্গকে চিনিতে চাও তবে এই নামসুধা কীর্ত্তনে আপনভোলা হও।

নানাকথা

প্রত্যাবর্ত্তন—

মাতৃমন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র নন্দী মহাশয় বিলাত হইতে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা পৌছিয়াছেন। দুই মাস পূর্ব্বেই তাঁহার দেশে ফিরিবার কথা ছিল, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভের জন্ম তাঁহাকে আরও দুই মাস কাল বিলাতে কাটাইয়া আসিতে হইয়াছে।

শান্তিপুরে সারস্বত উৎসব—

বিগত শ্রীপঞ্চমীর দিবসে শান্তিপুরে স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মহা সমারোহে সারস্বত উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উৎসবের সভায় বহু শিক্ষিতা ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কয়েকটি মহিলা সভার কার্য্যের মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত সাতটি সুমধুর,উৎসবোপযোগী সঙ্গীত গাহিয়া উৎসব ক্ষেত্র আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহিলাদের বসিবার জন্ম পৃথকভাবে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। নগর-পল্লীর উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের অনুরোধ, এরূপ পবিত্র উৎসবাদিতে যেন সর্ব্বত্রই তাঁহারা মহিলাদের যোগ দিবার জন্ম এই প্রকার বন্দোবস্ত করেন।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন—

দুঃস্থ বিধবাদের সাধারণ শিক্ষা ও তৎসহ কিঞ্চিৎ শিল্প শিক্ষার জন্ম বাংলা-সরকার বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্ম ৩০০৲ টাকা মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বরিশালে প্রসূতি-হাসপাতাল—

সম্প্রতি বরিশাল হাসপাতালে একটী প্রসূতি বিভাগ খোলা হইয়াছে। ডিভিশনাল কমিশনার মিঃ কেটস্ ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। আমরা ইহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চট্টগ্রামে ধাত্রী-বিদ্যালয়—

চট্টগ্রামের জেলাবোর্ড সম্প্রতি পাসোয়া ও ফটিকছড়ি নামক স্থানে দুইটী ধাত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ সেখানে বত্রিশ জন স্ত্রীলোক সুদক্ষ চিকিৎসকের অধীনে ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। জেলার হেলথ্ অফিসার বিদ্যালয় দুইটির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সকল জেলাবোর্ডেরই এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

বিধবা নিবাস—

আচার্য্য হরিদাসের তত্ত্বাবধানে পুরীধামে একটী বিধবা নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে অসহায়া বিধবাদের জন্ম এরূপ প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে।

শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী—

গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে সিউড়ী মহিলা-মন্দিরে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর বক্তৃতা সময় পঞ্চশত মহিলা ও বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্রই এই প্রকার প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গীয় বিধবা-বিবাহ সমিতি—

আমরা এই সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক (১৯২৫) কার্য্য বিবরণী পাইয়াছি। সমিতি অতি ক্ষীণভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে মাত্র এই সমিতির সহায়তায় ছয়টী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি ব্রাহ্মণ, তিনটী কায়স্থ, একটি শূদ্র। বাঙ্গালার বহু উচ্চশ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এই সমিতির সহিত যুক্ত দেখিয়া ইঁহাদের কার্য্য প্রসার লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। কার্য্যালয়—শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বর্ম্মায় স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব—

ব্রহ্মদেশের কুলী মেয়েরা পর্য্যন্ত লেখাপড়া জানেন। তাঁহারা তাঁহাদের দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব পেন্সিল দিয়া লিখিয়া থাকেন। ১৯২৪ সালে ২৫১৩০টি ব্রহ্ম-মহিলা মাত্র বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন দেখিবার জন্যই বিলাতে গিয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার প্রতিবাসী বর্ম্মার মেয়েদের এ দৃষ্টান্ত কি বাঙ্গালী মেয়েদিগকে লজ্জা দেয় না?

রাণী নিরুপমা দেবী—

কুচবিহারের ঈশারাণী নিরুপমা দেবীর প্রতি তাঁহার স্বামী প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের দুর্ব্ব্যবহার সম্পর্কীয় ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত মোকর্দ্দমার বিষয় পূর্ব্বে মাতৃমন্দিরে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীর সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মোকর্দ্দমা করিয়া রাণী ইতিপূর্ব্বে ডিক্রী পাইয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা উপস্থিত হওয়ায় ঐ ডিক্রী বহাল রহিয়াছে। আহা, রাণী নিরুপমার মত মহিমময়ী নারীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার অবগত হইয়া সমস্ত বাংলার লোক মর্ম্মাহত হইয়াছে। রাজারাজড়ার ঘরেই এই আচরণ, আর দরিদ্রের ঘরে কত নারী যে আঁধারে লুকাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, কে তাহার সন্ধান করিবে?

চুলকাটার আইন—

ব্রেজিলের সান্-পালের মেয়র এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, যদি কোন নাপিত, স্বামী, পিতা বা অপর বয়স্থ অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে নারীর কেশ কর্ত্তন করে তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডিত করা হইবে। আমাদের দক্ষিণ ভারতে কিন্তু স্ত্রীলোক বিধবা হইলে প্রায়ই তাঁহাদের চুল কাটিয়া দেওয়া হয়।

রাজার কুলিগিরি—

পশ্চিম আফ্রিকার মেটি জাতির সম্রাট সাওয়াল্যাণ্ড কর্পোরেশনের অধীনে সাধারণ কুলির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার নাম হইয়াছে রবার্ট টেলার। ইনি শক্তি সেনায় একজন প্রচারক। প্রজাদের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত ইনি তিন বৎসর পর কুলিগিরি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শিক্ষার ব্যয়—

বিভিন্ন দেশে প্রতিজনে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ বার্ষিক ব্যয়—হল্যাণ্ড—১১।০, ডেনমার্ক—১৭৲, আমেরিকা—১৬।০, জার্ম্মাণী—১৩৲, ইংল্যাণ্ড—৯।০, জাপান—৯৲, নিউজিল্যাণ্ড—৮।০, ফিলিপাইন—৮৲, বৃটিশ-ভারত—মাত্র দুই আনা।

ভারতের শিক্ষিতের হার—

নিম্নে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সংখ্যার শতকরা হার প্রদত্ত হইল—

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
বাংলা	৫·৫	৬ ৭	৭·৫	৯ ৭
বিহার-উড়িষ্যা	৩ ২	৩ ৯	৪·১	৫·১
বোম্বাই	৫ ২	৬·২	৬·৭	৯·২
মান্দ্রাজ	৬·২	৬·৪	৭ ৫	৯·৫
পাঞ্জাব	৩·১	৩৬	৩·৪	৪·২
মধ্য-প্রদেশ	২·৪	৩·১	৩·২	৪·৯
যুক্ত-প্রদেশ	২·৮	২·৯	৩·৩	৪·১
আসাম	৩·১	৩ ৫	৪·৪	৭·২

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়—

জাপানে একটি পত্রিকায় প্রকাশ যে নিম্নলিখিত দশটী নিয়ম পালন করিয়া চলিলে খুব কম হইলেও দুইশত বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায়।

(ক) দিনের মধ্যে একবারের বেশী আমিষ খাদ্য খাইও না।

(খ) প্রত্যহ একবার করিয়া (শীতের দেশ হইলে গরম জলে) স্নান করিবে।

(গ) সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া অন্ততঃ ৬ঘণ্টা ঘুমাইবে কিন্তু ৭ ঘণ্টার বেশী যেন না হয়।

(ঘ) সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম করিবে।

(ঙ) কখনও অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা বা ক্রোধ করিও না।

(চ) বিপত্নীক বা বিধবা হইলে পুনর্ব্বিবাহ করিবে।

(ছ) পরিমাণ মত বিশ্রাম করিবে।

(জ) বেশী কথা বলিও না।

(ঝ) যতক্ষণ সম্ভব খোলা যায়গায় থাকিবে।

(ঞ) সর্ব্বদা মোটা কাপড় ব্যবহার করিবে।

নাটোরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়

[জন্ম—৪ঠা কার্ত্তিক, ১২৭৫ ; মৃত্যু—২১এ পৌষ, ১৩৩২। রাজা হইয়াও বাঙ্গালি ছিলেন, কবি ও সুলেখক ছিলেন ; সুপ্রসিদ্ধ মানসী ও মর্ম্মবাণীর সম্পাদকতা ইঁহার সাহিত্য-সাধনার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি]

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

৩য় বর্ষ } চৈত্র—১৩৩২ { ১২শ সংখ্যা

চৈত্র

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

চৈত্র বলে, বিদায় বিদায়,
এবার মিটিল সব দায়,
পাতা ঝরাবার পালা করিয়াছি শেষ,
রক্ত পীত ধূসর পাটল ছদ্মবেশ,
বাকী আর নাই তার লেশ।

বিহগের শাবকের মত,
নবজাত কিশলয় যত,
শ্যামল কোমল তনু, ভাবে অভিনব
মুক্তবনে সহজের* সাজাবে উৎসব
গাবে গান, কিশোর শৈশব।

---

* প্রকৃতির।

একান্নবর্ত্তী পরিবার

শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী।

(১)

সম্মিলিত অবস্থা যে সর্ব্ববিষয়েই কল্যাণকর ইহা জগতের নিয়মের সাধারণ সূত্র। সমাজে, ধর্ম্মে, গৃহাশ্রমে এই মিলিত অবস্থার মধ্যে আমরা পরম সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকি। আত্মীয়স্বজন মিলিয়া বহুলোকে একান্নবর্ত্তী হইয়া বসবাস করা যে কল্যাণকর এবং আনন্দদায়ক সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

বহু আত্মীয়স্বজনে একান্নবর্ত্তীতা পাশ্চত্যদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশেই বেশী। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ আমার মনে হয় এই যে, আমরা এখনও পাশ্চাত্যের মত বিলাস-সাগরে নিমগ্ন হই নাই। সামান্যেই আমাদের অভাব পূরণ হয়। বিলাস বাসনার প্রাবল্যই মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তোলে; আর সেই স্বার্থপরতাই মানুষকে সমষ্ট হইতে পৃথক করিয়া ফেলে।

জড় জগতের বস্তুরাশির উপর আমাদের বিতৃষ্ণা হউক, আমি এমন বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, বরং ঐ সকল ভোগের সম্যক বিধানের সন্ধানেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাঁহারা প্রকৃত ভোগ করিতে জানেন—তাঁহারা কোন বস্তু একাকী ভোগ করিতে সচেষ্ট হন না, তাঁহারা জানেন—বহুকে লইয়া ভোগ করাই ভোগের প্রকৃষ্ট উপায়।

সকলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন—প্রিয় জনকে ফেলিয়া, ব্যথার ব্যথীকে ফেলিয়া কোন সুখভোগই মানুষের ভাল লাগেনা। ইহার কারণ অনুসন্ধানে বোঝা যায়, 'একাকী' ভাবনা জীবের পূর্ণ অবস্থা নহে, উহা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাই একাকী কোন ভোগের সম্যক আস্বাদন হয় না। যে প্রেম জগতের সারবস্তু, তাহারও অস্তিত্ব অপরকে লইয়া। দয়া, মমতা, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি প্রেমের স্বর্গীয় ভাবগুলি সমস্তই আর-আরকে লইয়া। আমরা আমাদের বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমার এখানকার বক্তব্য এই যে, আমরা দিনদিন আমাদের দেশের প্রাচীন কালের সেই বহুজনে একান্নবর্ত্তীতার মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। বহু পূর্ব্বকার যশস্বী শক্তিশালী একান্নবর্ত্তী পরিবার বহুবিভক্ত হইয়া পড়িতেছি। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া প্রথমে মনোমালিন্য, পরে কলহ বিবাদ করিয়া পৃথকান্নের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি। ইহার মূলে মনের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কোন পরিবার সকল দিকে বলশালী হইতে থাকে, তখন সকলেরই মন একত্বের বন্ধনে আরও শক্তিশালী হইবার আকাঙ্খায় ভরপুর থাকে। আর যখন মন দুর্ব্বল হইতে থাকে তখনই একত্বের বন্ধন শিথিল হইয়া বিভিন্নতার সৃষ্টি করে। এখানে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মন বেশী দুর্ব্বল, অনেকস্থলে সংসারে গৃহস্থালীর খুঁটি-নাটি বিষয় লইয়া মেয়েদের মধ্যে মনান্তরের সৃষ্টি হয় এবং তাহাই ক্রমে পুরুষে সংক্রামিত হইয়া বৃহৎ পরিবারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে।

যেখানে পরিবারের সমস্ত লোক এক কর্ত্তার অধীনে থাকিতে ভালবাসে, সেখানেই একান্নবর্ত্তীতা স্থায়ী হয়। পরিবারস্থ সকলেরই যদি এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য হয় তবে সেই পরিবারে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়। লক্ষ্মণ-ভরতের মত ভ্রাতাই রামরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, ভীমার্জ্জুনের মত ভ্রাতাই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে সমস্ত সমর্থ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে বহুজনে একান্নবর্ত্তীতা শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা অশিক্ষিত সমাজেই বেশি দেখা যায়; কৃষক

পরিবারের মধ্যেই একান্নবর্ত্তীতা দৃঢ়তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতেও বোঝা যায় যেখানে বিলাসিতা নাই, যেখানে নিত্য নূতন লোভনীয় বস্তুর আবির্ভাব নাই, সেখানেই বহুজনে একান্নবর্ত্তীতা দৃঢ় থাকে। একটি উন্নত কৃষক পরিবারের সংবাদ জানি—তাহাদের চারি ভাইএর মধ্যে ছোট ভাইএর একটু ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় গ্রামের আর পাঁচটি ভদ্রছেলের সঙ্গে তাহার গতিবিধি হয়; কাজেই তাহাকে একটু বাবুগিরিও করিতে হইত। একসময়ে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের কাছে পৈত্রিক বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া পৃথক হইবার প্রস্তাব জানাইলে ভ্রাতৃগণ কনিষ্ঠকে বলিয়াছিল—"সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোর থাকুক, আমরা জমি ক্ষেতে কাজ করব, তুই কেবল আমাদেরকে দুটো খেতে পরতে দিবি।" জ্যেষ্ঠগণের এই উদারতা দেখিয়া কনিষ্ঠ পৃথক হইবার কথা একেবারে ভুলিয়া গেল, অতঃপর বাবুগিরির দিকেও আর সে মন দেয় নাই।

পরিবারের কর্ত্তাকে অনেক সহ্য করিতে হয়, অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; এমন সমদর্শী হইতে হয়, যাহাতে পরিবারস্থ কেহই অসন্তুষ্ট না থাকে। কর্ত্তা কোন অন্যায় কার্য্য বা পক্ষপাতিতায় পরিজনগণের নিকট শ্রদ্ধা হারাইলে তিনি আর কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ হন না। এ অবস্থায় হয়—সংসার ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, না হয় অনেকে স্বাধীন মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়া কলহ বিবাদে অশান্তিতে একত্র কালযাপন করিতে বাধ্য হন।

পরিবারস্থ সকলের মনের গতি সর্ব্বত্রই এক হইবে, ইহা অনেকস্থলে সম্ভব হয় না; এমন স্থলে, পারিবারিক নিয়মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রধান বিধানগুলি মানিয়া চলিলেও একান্নবর্ত্তীতা রক্ষিত হইতে পারে।

পরিবার, সমাজ, সভাসমিতি যৌথ কারবার ইত্যাদি প্রত্যেক মিলিত বিষয়েই একজনকে কর্ত্তা হইতে হয় এবং সেই একের আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলকে চলিতে হয়। এই সঙ্ঘবদ্ধতার ভিতর দিয়া বহু বহু বৃহৎ কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

(২)

একান্নবর্ত্তীতার স্বপক্ষে অনেক কথা বলা হইল। এখন দেখা যুক্তিক ইহার বিপক্ষে অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবার গঠনের দিকে কি কি বলা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে দেখা যায়, যিনি পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা তিনিই জ্ঞান-বুদ্ধি এবং কার্য্য-কুশলতায় সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এমন হইবে ইহার কোন কারণ নাই। অনেকস্থলে পরিবারস্থ অপরাপর লোকের মধ্যেও বিভিন্নমুখী শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ দেখা যায়। সেস্থলে কেহ যদি পূর্ব্বতন কর্ত্তার অনুগামী না হইয়া বিভিন্ন সংসার গঠন করিয়া স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে প্রয়াস পান—তবে তাহাতে মন্দের আশঙ্কা কিছুই নাই, বরং নূতনের সৃষ্টিতে নূতন আনন্দ আনয়ন করিবে।

জামাতা, ভাগিনেয়, শ্যালক, ভগ্নিপতি প্রভৃতি ভিন্নবংশীয় বা দূর সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের সহিত কোন কারণে সাময়িক একান্নবর্ত্তীতা চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকাই সঙ্গত।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থলেই পৃথক পরিবারের সৃষ্টি হইতেছে—অসদ্ভাবের ভিতর দিয়া। এগুলি ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি এবং অপরিণামদর্শিতারই পরিচায়ক। অনেক স্থলে দেখা যায় যে পিতার পরলোকগমনের পর পুত্রগণ অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের পারিবারিক ঐক্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। তার পর বিষয়াদি বণ্টন করিতে গিয়া অনেক গোলযোগের সৃষ্টি করেন, এমন কি রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইতে গিয়া বহু অর্থনাশ করিয়া ক্ষীণশক্তি হইয়া কালযাপন করিতে বাধ্য হন। পৃথক হইবার সময় নানা বিষয় লইয়া যে সকল বিরোধ করেন তাহার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের নিতান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, পৃথক পরিবার গঠন করিতে হইলে, পরস্পর পরামর্শ করিয়া—ভবিষ্যতের জন্য পরস্পরের অধিকতর কল্যাণের ন্যায্য যুক্তি দেখাইয়া পৃথক পরিবারের গঠন করিয়া থাকেন। এরূপ ভাবে পৃথক হওয়ায় পার্থক্যের সার্থকতা আনয়ন করে, সন্দেহ নাই।

(৩)

অনেকে মনে করিতে পারেন পৃথক পরিবার গঠন করিলেই বুঝি বেশ সুখ শান্তিতে কালযাপন করা যাইবে, কিন্তু অনেক সময় তাহা হয় না। পৃথক্ হইবার পরেও যে কোন বিষয় লইয়াই তাঁহাদের বিবাদ বরাবর চলিতে থাকে। পরিজনগণের মন উদার হইলেই বহুজনে একান্নবর্ত্তীতা শান্তিজনক হয়। তার মধ্যে যাঁর মন ক্ষুদ্র তাঁহাকেই সংসারে অশান্তিতে বাস করিতে হয়। যেখানে মনের দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা সেখানেই অশান্তি, মনোমালিন্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়ে নিজের অশান্তির কারণের জন্য পরিবারস্থ অন্যের প্রতি দোষারোপ করা হয়, কিন্তু মানুষের শান্তি-অশান্তির উৎপত্তি ক্ষেত্র—তার আপন মন; এজন্য বাহিরের কিছুকে দোষী করা তার বৃথা কৈফিয়ৎ মাত্র। এমন কি দৈবদুর্ব্বিপাকজনিত যে দুঃখ বা মনোকষ্ট ভোগ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক—মনের বিশালতা দ্বারা মানুষ সে দুঃখ কষ্ট হইতেও মুক্ত থাকিতে পারে।

পরিবারে যিনি সমদর্শী হইবেন তিনি সংসারে যতই বাহ্যিক দুঃখ ক্লেশ ভোগ করুন না কেন, অন্তরে তাঁর শান্তি বিরাজিত থাকে; সে শান্তি বাহিরের দুঃখক্লেশকে তুচ্ছ করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যক্তিগণের দ্বারাই বহুজনে একান্নবর্ত্তীতা রক্ষিত হয়, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় থাকে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মানুষ যখন বিষয় বৈভব অপেক্ষা তাহার নিজের মনুষ্যত্বের মূল্য বেশি বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন একান্নবর্ত্তীতা বা পৃথকান্নবর্ত্তীতায় তাহার বেশি কিছু আসে যায় না; বিষয় বৈভবের হ্রাসবৃদ্ধিতে তাহার কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং জ্ঞাতি-বিচ্ছেদ ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি হীন বৃত্তির দিকে তাহার মন যায় না। সে সকলের প্রতি সমদর্শী হইয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। চরিত্রের উদারতায় তাহাকে মহৎ করিয়া তোলে। তাহার কাছে জ্ঞানী-মূর্খ সৎ-অসৎ সকলেই প্রিয়, সকলেই আপন, সকলকেই সে এক পরিবারের মানুষ বলিয়া মনে করে। সারা জগৎ লইয়া তাহার প্রেমের পরিবার একযোগে বিরাজমান। মানুষ, তুমি সেই পরিবারের মানুষ হও।

সম্প্রসার

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

কূপ কহে—হে আকাশ ধরিব তোমারে
বক্ষে মোর এই বড় সাধ।
নভ কহে—এস সঙ্কীর্ণতার বাহিরে
মুক্ত যেথা অনন্ত অবাধ!

আমারে ধরিতে যদি সাধ, তত্ত তবে
মম সম বিশাল বিস্তার,
দূর কর সীমা, কর গণ্ডীরে খণ্ডিত
অনন্তের আন সম্প্রসার!

বিরাটের প্রতিরূপ আমার আধার
একমাত্র আছে শুধু মহা পারাবার।

শিশু-মঙ্গল

শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ।

শিশুই ভাবী মানব। শিশুগণই ভবিষ্যৎবংশ ও জাতির আশা। রেভারেণ্ড মাষ্টারম্যান বলেন, মৃতের প্রতি সম্মান ও শিশুগণের প্রতি যত্ন দ্বারা জাতির মহত্ব জানা যাইতে পারে। (There are two supreme tests to the greatness for a nation —its care for its cradle and its graves— Rev. Masterman) যে জাতির মধ্যে স্বাস্থ্যবান শিশু নাই সে জাতির ভবিষ্যৎ কখনও উজ্জ্বল হইতে পারে না। শিশু-মঙ্গলই জাতির কল্যাণ—শিশু-মঙ্গলই স্বরাজ লাভের প্রথম সোপান।

বাংলা আজ রুগ্ন, কঙ্কালসার শিশুতে পরিপূর্ণ। চোখে দীপ্তিহীন, কর্ম্মে নিরুৎসাহ, মৃতপ্রায় এই শিশুদল দেখিলে স্বতঃই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মায়ের প্রাণে এই নিরুপায় শিশুর অব্যক্ত ব্যথা বাজিয়াছিল তাহাতেই শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের (Baby week) উৎপত্তি। নিবার্য্য ব্যাধিতে, অজ্ঞতায় ও দারিদ্র্যের ফলে প্রতিদিন বাংলামায়ের কোল হইতে ৮১৬টী শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়, প্রতিদিন ১৫টী শিশু কেবল ধনুষ্টঙ্কারে মরে। যেখানে বিলাতে প্রতি ২০০০ প্রসূতির মধ্যে মাত্র ১টী মরে সেখানে বাংলাদেশে প্রতি ৫০টী প্রসূতির মধ্যে ১টী মরে। প্রসূতি-মৃত্যু, ধনুষ্টঙ্কারে শিশুমৃত্যু সকলই নিবার্য্য ব্যাধি। অন্যান্য দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রচার ও ধাত্রীবিদ্যার প্রসারে এই কাল ব্যাধি দূরীভূত হইয়াছে। বাংলাই কি কেবল পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে? বাঙ্গালী পিতা ও মাতা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃত্যুর এই তাণ্ডব লীলা দেখিবেন আর অদৃষ্টকে দোষারোপ করিবেন?

শিশু-মঙ্গল সপ্তাহরূপ শুভ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মহীয়সী লেডী লিটন মহোদয়া বাংলাদেশে শিশু-কল্যাণ পন্থার নির্দ্দেশ ও প্রচার করিতে চান। কি করিয়া মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, গর্ভাবস্থায় কি ভাবে চলিতে হয়, প্রসবকালে দাইএর কি করা প্রয়োজন, প্রসবের পর শিশুকে কি ভাবে মানুষ করিতে হইবে, সহজ ও সরল উপায়ে আনন্দ ও কৌতুকের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা দেওয়া এই শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

মা হওয়া কি মুখের কথা?
প্রসব করলে হয়না মাতা।

মা হওয়ার জন্য যোগ্যতা ও সাধনা চাই। বাংলাদেশের জননীদিগের মধ্যে শিশুপালন-প্রণালী প্রচার এই শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের অন্যতম আদর্শ। বাংলার পিতৃকুলকেও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। পিতারও অসীম দায়িত্ব আছে। পিতাদিগকেও আজ প্রসূতির স্বাস্থ্য, দাইয়ের কার্য্যকলাপ ও শিশু পালন নীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে চলিবেনা। সাধারণ দেশবাসীকেও আজ গ্রামে গ্রামে গর্ভিনীর কর্ত্তব্য, দাইশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন, প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। শিশুকে বাঁচাইতে হইলে, পেঁচোয় পাওয়া বন্ধ করিতে হইলে, মাতৃহত্যার হার কমাইতে হইলে আজ প্রত্যেক দেশবাসীকে ভাবিতে হইবে। নেলসন একদিন যেমন বলিয়াছিলেন—England expects every man to do his duty. আমরাও তেমনি প্রত্যেকে অপরের জন্য—সমাজের জন্য না ভাবিতে শিখিলে এই দুঃখ,

ভদ্রিপাড়া (হুগলী) শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

দুর্দশা ও মৃত্যুহার কমিবেনা। শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। "শিশুকে বাঁচাইতে হইবে" আজ দেশের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে—শিশু-মঙ্গল সপ্তাহ এই চেতনা জাগাইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন শিশু-মঙ্গল সপ্তাহে কেবল সুস্থ ও সবল শিশুই প্রদর্শিত হইবে এবং উহারা পারিতোষিক পাইবে, কিন্তু তাহা নহে, শিশু-মঙ্গল সপ্তাহে রুগ্ন দুর্ব্বল শিশু ও তার জননীরও স্থান আছে। আজ যে রুগ্ন, স্বাস্থ্যনীতির পালনে কাল সে বলীয়ান হইতে পারে। শিশু-মঙ্গল সপ্তাহে আসিয়া রুগ্ন শিশুর জননী এই মহাশিক্ষা লাভ করিবেন এবং ফলে তাঁর শিশুও পরবর্ত্তী সময়ে পারিতোষিক লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে।

শিশু-মঙ্গলের জন্য সর্ব্বপ্রথম চাই—শিশুর জননীর স্বাস্থ্য। গর্ভিনীকে বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। গর্ভাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক চাঞ্চল্য বিশেষ হানিকর। গর্ভিনীর শরীর অসুস্থ বোধ করিলেই চিকিৎসক ডাকিতে হইবে।

অশিক্ষিত ও নোংরা দাইদিগকে নাড়ী কাটিবার জন্য বাঁশের নীলের পরিবর্ত্তে পরিস্কার কাঁচি ব্যবহার করিতে দিতে হইবে। ঐ কাঁচি ও নাড়ী বাঁধিবার সূতা জলে ফুটাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। নাড়ী কাটার দোষেই ধনুষ্টঙ্কার হয়। পেঁচোয় পাওয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগেরই নাম। ওঝা না ডাকিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষিতা দাই ডাকিলে পেঁচো আর আসিবেনা।

আঁতুর ঘরের জন্য খারাপ, রৌদ্র-বাতাসহীন, স্যাঁতসেঁতে ঘরের পরিবর্ত্তে বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরটী ব্যবহার করিতে দিতে হইবে। ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর না দিয়া প্রসূতিকে পরিস্কার ও যথেষ্ট বস্ত্র ও বিছানা ব্যবহারের জন্য দিতে হইবে।

প্রসবের পর প্রসূতির ও শিশুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতি বৎসর এক সূতিকা রোগেই ৩০,০০০ প্রসূতি মাতা মরে। প্রসূতির অসুখ হইলে চিকিৎসক ডাকিতে হইবে।

শিশুকে যখন-তখন কাঁদিলেই মাই দেওয়া উচিত নহে। পুষ্টিকর গো-দুগ্ধ শিশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারে শিশুর অনিষ্ট হয়। চুষি ব্যবহার করিতে দেওয়া অথবা feednig bottle ব্যবহার সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে হইবে।

শিশুমৃত্যুর অসংখ্য সামাজিক কারণ আছে, যথা—বাল্যবিবাহ ও অকাল মাতৃত্ব, বহুপ্রসব ও অসংযম, কুসংস্কার ও উপদংশ ব্যারামজনিত রক্তের দোষ। কিন্তু এই শিশুমৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। গো-দুগ্ধের অভাববশতঃই বাংলাদেশ আজ অপুষ্ট, রুগ্ন ও দুর্ব্বল শিশুতে ভরিয়া গিয়াছে। দারিদ্র্য ও গো-দুগ্ধের অভাব শিশুমৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিল।

অজ্ঞতার ফলে প্রতি বৎসর তিন লক্ষ শিশু জন্মিবার একবৎসর মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। কলিকাতার মত সহরেই হাজারকরা ৩০০ শিশু মরে, পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই। অজ্ঞতার ফলেই পেঁচোর এই উপদ্রব কমিতেছে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির প্রচার দ্বারা এই অজ্ঞতা-ব্যাধি দূরীভূত করিতে হইবে। শিশু-মঙ্গল সপ্তাহ প্রতি গ্রামে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যনীতির বহুল প্রচার আবশ্যক। শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের মধ্য দিয়া নূতন জাতি গঠিত হইবে। রুসভেল্ট সত্যই বলিয়াছেন—শিশুই জাতির মালিক—Behold a nation marching on the feet of children. বাংলাকে আজ শিশু-কল্যাণরূপ মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

বাংলায় হিন্দুর হ্রাস

শ্রী বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

অধুনা সমগ্র বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা ৪৬২৯৫২৭২; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২০৮০৯১৪৮, অর্থাৎ বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৪৬৭৬৯৭৬ বেশী। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না। তখন হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা চার লক্ষের অধিক ছিল। ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা অতি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সেন্‌সস্ রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৯১১ সালে সমগ্র বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ২০৯৪৫৩৭৯ ছিল। কিন্তু ১৯২১ সালে সেই সংখ্যা হ্রাস হয়ে দাঁড়ায় ২০৮০৯১৪৮, অর্থাৎ দশ বৎসরে ১লক্ষ ৩৬ হাজারের উপর হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। ইহা হতে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, হিন্দুর মৃত্যুর হার জন্ম অপেক্ষা অধিক। যে জাতির মৃত্যুর হার জন্ম অপেক্ষা অধিক, সে জাতি ধরাবক্ষে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। যেরূপ দ্রুত গতিতে হিন্দুর ধ্বংস কার্য্য চলছে তাতে মনে হয় যে, শীঘ্রই তাকে ধরাবক্ষ হতে নিশ্চিহ্ন হতে হবে। হিন্দুর এই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

সকল সভ্য দেশেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম। কিন্তু বাংলায় কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় সমাজেই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক। যে সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা যত অধিক, সে সমাজে লোকসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতিরও তত বেশী প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু মুসলমান-সমাজে বিধবাবিবাহ-পদ্ধতি প্রচলন থাকায় বিপত্নীক পুনরায় যেমন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন, বিধবাও সেরূপ স্বামী গ্রহণে অধিকারিণী হন। দুই পক্ষেরই সমান অধিকার—সমাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সমদর্শী। মুসলমানরা বিধবাবিক্বাহ প্রচার ক'রে নিজেদের সমাজকে কেবল যে দুর্নীতির কবল থেকে রক্ষা করে সমাজে পতিতার সংখ্যা হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছেন তা নয়, তাঁরা নিজ সমাজ থেকে বিধবার সংখ্যা একরূপ মুছে ফেলে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আর হিন্দুর সমাজসংস্কারকরা বিধান করলেন যে, অশীতি বর্ষ বয়সের বিপত্নীক ষোড়শী ভার্য্যা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু একাদশ বর্ষীয়া বিধবা-বালিকা পুনরায় স্বামী গ্রহণে অধিকারিণী নন। এরূপ বিধি ব্যবস্থা যে একেবারেই ভুল কিংবা ইহার স্বপক্ষে যে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না, সে ক'ন্ন্জামরা বলি না; বরং সে সময়ে যে কারণে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, সে কারণে ইহার প্রয়োজনীয়তা যে খুব বেশীই ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা যে হিন্দুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পথে পাকাপাকী ভাবে বাধা দিচ্ছে এবং সমাজে দুর্নীতির বিস্তার করে হিন্দুজাতিকে নির্জীব জড়ে পরিণত করে তুলছে, তা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে বেশ বুঝতে পারাস্যায়।

বয়স	হিন্দুবিধবা	মুসলমানবিধবা
১ হইতে ৫ বৎসর	১৪৩৯	১৪০৬
৫ " ১০ "	৮৭৫১	৭৫৫৪
১০ " ১৫ "	৩৬৩২৩	২৩৪৮০
১৫ " ২০ "	৯৬৪৭৬	৫২১৭৯
২০ " ২৫ "	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫ " ৩০ "	২৩০৭৯৩	১২৪৪৬৯

সেন্‌সস্ রিপোর্ট পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে বাংলায় হিন্দু বিপত্নীকের সংখ্যা মুসলমান বিপত্নীকের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিধবার ন্যায় সমাজে বিপত্নীকের সংখ্যাধিক্যও লোকসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। তার উপর শ্রমজীবী এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অর্থদ্বারা স্ত্রী সংগ্রহের নিয়ম বাংলার প্রতি পল্লীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই অর্থদ্বারা স্ত্রীসংগ্রহের মূল্য ধনবিজ্ঞানের দিক দিয়া যাই হোক না কেন, ইহা যে সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এই সকল জাতির বংশবৃদ্ধি রহিত করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে অনেক পুরুষকে বিবাহের জন্য খুব বেশী বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, অনেকে বা বৃদ্ধবয়সে বালিকা স্ত্রী লাভ করে। কিন্তু তাকে তার বালিকা স্ত্রীর যৌবন প্রারম্ভের পূর্ব্বেই ধরাধাম ত্যাগ করতে হয়। শুধু ইহাই নহে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি নানা রোগের অত্যাচারে তারাই বেশী মরে। যারা কোন রকমে বেঁচে থাকে তারা ক্রমাগত ভুগে ভুগে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, আর তাদের প্রজনন-শক্তিও খুব কমে যায়। ফলে কম শিশু জন্মায় আর তাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যাও খুব বেশী হয়। এইরূপে হিন্দুদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে কমে যাচ্ছে। তাদের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন খারাপ হচ্ছে,—তারা সকল কর্ম্মক্ষেত্র হতে ক্রমে ক্রমে হটে আস্‌ছে। হিন্দু জেলের স্থান, কুলির স্থান, তাঁতির স্থান মুসলমান দখল করছে। রেলের ইঞ্জিনচালক, কল-কারখার ইঞ্জিনচালক সবই মুসলমান। সাহেবের খানসামা, আফিসের বেহারা, ডকের কুলি, কলের মজুর, নৌকার মাঝি, জাহাজের খালাসী সবই মুসলমান। মুসলমান শ্রমজীবী সকল বিষয়ে হিন্দু শ্রমজীবীকে পরাস্ত করেছে। প্রকৃতির রাজ্যে দুর্ব্বলের স্থান নেই, ক্ষমা নেই—ধ্বংসই তার একমাত্র পরিণতি। তাই আজ দুর্ব্বল হিন্দু শ্রমজীবীকে প্রতিযোগিতায় প্রবল মুসলমান শ্রমজীবীর নিকট প্রতি পদে হার মানতে হচ্ছে। হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতি তার এই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ নয় কি?

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা নানাকারণে হুহু করে কমে যাচ্ছে। বাংলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের সংখ্যা মাত্র ২৬ লক্ষের কিছু অধিক। অবশিষ্ট সবই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, তাদের নিয়েই সমাজ, তারাই সমাজের প্রাণ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সহানুভূতির অভাবে ও নানারূপ অত্যাচারে তারা বাধ্য হয়ে প্রতি বৎসর দলে দলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করছে। তারা হিন্দুর নাপিত পায় না, হিন্দুর ধোপা তাদের কাপড় কাচে না। তারা অস্পৃশ্য, তাদের জল খেলে কিংবা ছুঁলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর জাত যায়, এমনি ঠুনকো তাদের ধর্ম্ম। এইরূপে বহুদিন হতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সকল রকমে নির্য্যাতিত হয়ে আসছে। মানুষ মাত্রেরই একটা সহ্য করবার সীমা আছে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অত্যাচার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, তাই তারা আজ দলে দলে খৃষ্টান আর মুসলমান হচ্ছে। বাংলায় ইহাদের মধ্যে নমঃশূদ্রের সংখ্যাই অধিক। ঠিক এইরূপ অবস্থা হয়েছে মাদ্রাজের মালাবার প্রদেশে। যেদিন থেকে নায়াররা থিয়ান জাতির উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করলেন, সেইদিন থেকে অত্যাচারের প্রতিফল স্বরূপ তারা দলে দলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হতে লাগল। সমগ্র মালাবার প্রদেশে হুহু করে খৃষ্টানের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল, ফলে সেখানে আজ শতকরা ৮০ জনের অধিক খৃষ্টান। যেরূপ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে বাংলার অবস্থা শীঘ্রই মালাবারের মতন হয়ে উঠবে। অনেকে হয়ত বলবেন, তাতে, বিরাট হিন্দুসমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হতে পারে না। তার উত্তরে আমরা বলি যে, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, অর্থদ্বারা স্ত্রী সংগ্রহের নিয়ম, অস্পৃশ্যতা, অজ্ঞতা প্রভৃতির অত্যাচারে হিন্দুসমাজের সকল

অঙ্গই যদি একটার পর একটা করে খসে পড়ে, তবে তার বিশালত্ব থাকে কোথায়? যদি হিন্দু জাতিকে সজীব রাখতে হয়, তা হলে সর্ব্বাগ্রে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করতে হবে, আর যাতে নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্য জাতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে না পারে তারও উপায় স্থির করতে হবে। হিন্দুকে বাঁচতে হবে,—তা না হলে দু-এক শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

দিন-মজুরের বউ

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুটনাটি ভরা ভাঙ্গা চালা ঘর,
চালে খড় আছে দুটো,
বরষার জল নিবারিতে নারে
তাহার শতেক ফুটো।
গাছপালা ভরা আনাচে কানাচে
লুকায় আঁধার আসি,
ভোরের বেলায় মজুরের বউ
কাজ সারে তার বাসি।
তেলহীন তার ধূসর চাঁচর,
গিঁট দেওয়া ছেঁড়া শাড়ী-
ক্ষার দিয়া কাচে, পয়সা অভাবে
দিতে নারে ধোপা বাড়ী।
কুড়াইয়া আনা ভেজাপাতা জেলে
রাঁধে দুটী ডাল ভাত,
ভাঙ্গা হাঁড়িকুঁড়ি সাজায় গুছায়
পরিপাটী দুটী হাত।

প্রহরেক কালে স্বামী চলে' যায়
দিন-মজুরীর কাজে,
দুপুর বেলায় পুকুরে বাসন
মাজিতে একটা বাজে।
গোবর কুড়ায়ে ফেরে পথেপথে
কাঁকে ল'য়ে ভাঙ্গাঝুড়ি,
করে নাই কভু কারো দাসীপনা,
ঘরে বসে বেচে মুড়ী।
মুদির দোকানে কয় পয়সার
সওদা নিতি সে কেনে,
মেটে কলসীতে ওপাড়া হইতে
ভাল জল আনে টেনে।
সাঁঝের বেলায় ডিবাটী জালিয়ে
পথপানে চেয়ে থাকে,
স্বামী তার এসে এ সময় নিতি
নাম ধরে তারে ডাকে।

সহজ রন্ধন-প্রণালী

[ঘরে তৈরী ষ্টোভ্]

শ্রীমতী সুশীলাবালা নন্দী।

গত কার্ত্তিকের মাতৃ-মন্দিরে আমরা একটি উনানের আগুণের সাহায্যে দুইটি উনানের কাজ দেখিয়েছিলাম। মাতৃ-মন্দিরের পাঠিকারা কেউ কেউ সেই রকম উনান তৈরী করে নিয়ে তাঁদের রান্নার অনেক সুবিধা লাভ করেছেন, শুনে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

আজ আমরা আপনাদিগকে আর একটি শুভ সংবাদ দিব; এতে আপনারা অল্প জিনিস রান্নার পক্ষে অনেক সাহায্য পাবেন—খাবার জিনিসগুলি সহজে সুপাচ্য রান্না হবে—স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ কল্যাণকর হবে। খুব মন দিয়ে এটি বুঝতে চেষ্টা করুন।

বিষয়টি হচ্ছে এই—আপনাদিগকে ঘরে বসে একটি ষ্টোভ্ তৈরী করে নিতে হবে। ষ্টোভ্ তৈরীর কথা শুনে চমকে যাবেন না। দুটি কেরোসিনের টিন আর একটি চৌদ্দ লাইটের (14 candle light) আলো হলেই এই ষ্টোভ্ অনায়াসে তৈরী হবে। কেরোসিনের টিন আর ডিট্‌মারের চৌদ্দ লাইটের ঝুলানো আলো প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরেই থাকে। না থাকলেও সব জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়। ঐ আলোর উপরের ঢালটি আর ঝুলাবার জন্য লোহার ফ্রেমটি রান্নার সময় কোন কাজেই লাগবে না। কেবলমাত্র চিমনি-সহ আলোটি দরকার।

সচরাচর যেমন টিনের উপরে একটি কোণ থেকে খানিকটা কেটে কেরোসিন বের করা হয়, তেমন না করে উপরের একটি কোণে যথাসম্ভব ছোট ছিদ্র করে অথবা উপরের চাকৃতিটা ছিদ্র করে কেরোসিন বের করে নিন। তারপর টিনের উপরের দিকে ঠিক মাঝখানে দু ইঞ্চ পরিসর (ব্যাস) একটি গোল ছিদ্র করে ছোট একটি চাকৃতি কেটে ফেলুন। টিনের তলাতেও ঐরূপ করে ঠিক মাঝখানে ৪।০ কি ৪৸০ ইঞ্চ পরিসর করে বড় একটি গোল ছিদ্র করে চাকৃতি কেটে ফেলুন, আর টিনের একদিক থেকে সাত ইঞ্চ চওড়া, দশ ইঞ্চ লম্বা (৭"×১০") করে খানিকটা টিন কেটে একটি দরজার মত ফাঁক তৈরী করুন। চারধারে চারখানা ইট রেখে তার উপর টিনটি বসিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে চিমনি সমেত বাতিটি পরিয়ে দিন। এখন টিনের মধ্যে বাতিটি বসান থাকল। চিমনির মাথা টিনের ঠিক উপরের ছোট দু ইঞ্চ পরিসরের ছিদ্রের মাথায় উঠবে। এখন বাতিটি জ্বেলে দিলে উপরে যে আঁচ উঠবে তাতেই রান্না হবে।

এই সামান্য বাতির আগুনের উত্তাপটুকু দিয়ে কেমন করে রান্না হবে তাই একটু পরিষ্কার করে বলব।

অন্য আর একটি টিন কেটে একটি বেড় তৈরী করুন। এই বেড়ের ভিতরে একটি এলুমিনিয়মের পাত্র রেখে রান্না হবে। এমন ভাবে টিনের বেড়টি তৈরী করতে হবে যেন প্যানটি বেড়ের মধ্যে বসালে প্যানের উপরের দিকের ছড়ান কানা বেড়ের উপরে আটকে যায়, আর বেড়ের তলায় তিন চার ইঞ্চ ফাঁক থাকে অর্থাৎ প্যানের কানা বেড়ে আটকে ভিতরে গিয়ে প্যানের তলা শূন্যে থাকবে।

আপনারা জানেন, অল্প আঁচের আগুনের উপর রান্না করতে এলুমিনিয়মের বাসন বড় সুবিধাজনক। দুজনের বা তিন জনের ভাত রান্না করার মত একটা এলুমিনিয়মের প্যান নিন। হাঁড়ির গঠনের পাত্র হলেও চলতে পারে, তবে প্যানের গঠনের পাত্র হলেই বেশী আঁচ পাওয়া যাবে। প্যানের তলাটি সমান, আর উপরের কানা বাহিরের দিকে ছড়ান থাকে।

আপনার প্যানটি যদি আট ইঞ্চ পরিসর (ব্যাস) আর পাঁচ ইঞ্চ খাড়াই (উঁচু) হয়, তবে সাতাইশ ইঞ্চ লম্বা আর আট ইঞ্চ চওড়া একটা টিনের পাত দিয়ে বেড় তৈরী করতে হবে। টিনের বেড়ের ধার

ছুটো জুড়তে এক ইঞ্চ কমে যাবে। বেড়ের মুখ বেশ গোল হওয়া চাই, তাহলেই বেড়ের মধ্যে পাত্রটি সহজে ঢুকে কানায় গিয়ে আটকে যাবে, আর তলায় তিন ইঞ্চ ফাঁক থাকবে।

এখন আগেকার ঐ টিনটা চারখানা ইটের উপর রয়েছে। তার মধ্যে চৌদ্দ লাইটের আলোটি জ্বেলে দিন। টিনের উপরের ছিদ্র-পথে চিমনির আগুনের আঁচ উঠবে। তারপর শেষের তৈরী টিনের বেড়টি ঐ টিনের উপরে রাখুন। এই আপনার উন্নুন হয়ে গেল। এইবার প্যানটি বেড়ের মধ্যে রেখে রান্না করুন।

চৌদ্দ লাইটের বাতিটির আগুনের তাপ প্যানের তলায় আবদ্ধ হয়ে খুব জোর আঁচ হবে। ভাত, ডাল রান্না করতে বা দুধ গরম করতে প্রথমে বাতিটা পুরা জোরে জ্বেলে দিতে হবে। তারপর উতুলে এলেই বাতি খুব কম করে রাখলেও ফুটতে থাকবে। সব সময়ই প্যানটি ঢাকনি দিয়ে ঢেকে

ঘরে তৈরী ষ্টোভ্
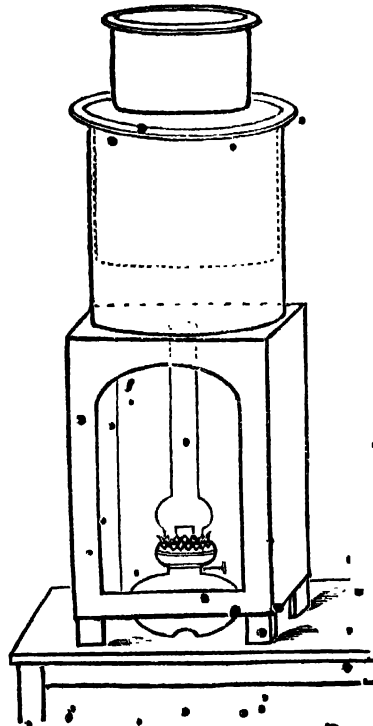
রাখবেন। ঐ ঢাকনির উপর একটা ভার জিনিসের চাপ রাখলে আরও ভাল হয়। তাতে গরম বাষ্প পাত্রের ভিতরে থেকে বেশী বেরুতে পারে না, তাই কম আঁচেই ফুটবার সাহায্য করে। চাপের জন্য আপনি জলপূর্ণ কোন পাত্র প্যানের উপরে রাখলে আপনার গরম জলের কাজ হবে।

তরকারী বা মাংস রান্নার জন্য প্রথমে বাতিটিতে উপর চাপ এতে যেন অবশ্যই থাকে। এখন মাংস বা তরকারী অল্প আঁচে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওর থেকে যে জল বেরুবে সেটাই বাষ্প হয়ে পাত্রের ভিতর আটকে থেকে মাংস বা তরকারীকে সিদ্ধ করতে থাকবে। এতে বেশী আঁচ দিলে তলা ধ'রে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু জানবেন, আপনার এই নূতন প্রণালীর রান্নাতে ধ'রে যাবার আশঙ্কা খুবই কম।

করা যেতে পারে। লুচি কচুরী ভাজা, আলু বেগুন ভাজা প্রভৃতি অল্প ভাজার কাজ সহজে হবে, তবে বেশী পরিমাণে জিনিস ভাজতে অনেকটা সময় নেবে।

এক রকম সিদ্ধ-ভাজা এতে বড় সুন্দর হয়। তরকারী মাছ যা কিছু ভাজবার জিনিস নুন ঘি ঝাল মসলা সব দিয়ে বেশ করে মাখিয়ে প্যানের মধ্যে রেখে উপরে একটা বাটি বা অপেক্ষাকৃত ছোট প্যান উবুর করে দিয়ে সেগুলি এমন ভাবে ঢাকা দিতে হবে যেন ঢাকনাটির ধারি ভাজনার প্যানের তলায় গিয়ে লাগে, অর্থাৎ উপরের উবুড় করা বাটি বা ছোট প্যানের ভিতরেই সবগুলি জিনিস আবদ্ধ থাকবে। এইভাবে ঢাকা দিয়ে মৃদু আঁচ দিলে ভিতরের জিনিসগুলি ভাজা-ভাজা হবে অথচ সুসিদ্ধ হবে। এ রকম খাদ্য ভাজা জিনিসের চেয়ে উপকারী আর সহজে পরিপাক হয়।

এবার দু জনের মত ডাল আর ভাত একবারে একই সময়ে রান্নার উপায় শুনুন—

আপনার বড় প্যানটির মাপ আছে—৮"×৫" ইঞ্চ। এখন ৬"×৩" ইঞ্চ আর একটা ছোট প্যান নিন, আর লোহার সিক বা অন্য কিছু দিয়ে ৫ ইঞ্চ ব্যাস একটা গোল চাকা তৈরী করে তাতে চারটি ২॥• ইঞ্চ লম্বা পায়া করুন; অর্থাৎ একটা চৌপায়া তৈরী হল। এখন একপোয়া ডাইলে আধসের জল দিয়ে তার মাঝখানে ঐ চৌপায়া লোহার জিনিসটা ডাইলের মধ্যে রেখে তার উপর ছোট প্যানে আধসের চাউল আর একসের জল দিয়ে ছোট পাত্রটি ঢাকা দিন। তার পর বড় পাত্রটিও ঢাকা দিন। উপরে চাপ দিতে ভুলবেন না। এখন বাতি জোরে জেলে দিন। আপনার চাউল পূর্ণ পাত্রটি চৌপায়ার উপরে ডাইলের পাত্রের মধ্যে তলা ছেড়ে দেড় ইঞ্চ উঁচুতে রয়েছে। নিচের ডাইলে জোর আঁচ পাচ্ছে আর উপরের চাউলের পাত্রে মৃদু বাষ্প পাচ্ছে। কিন্তু ডাইলে বেশী জাল দরকার হয় বলে আধঘণ্টার মধ্যে একই সময়ে ডাল ভাত দুইই হবে।

ঐ চারপায়াটি আর এক ভাবে সহজে তৈরী হতে পারে। ১৬"×২" অর্থাৎ ১৬ ইঞ্চ লম্বা আর দেড় ইঞ্চ চওড়া এক খানা টিনের পাতকে চিরুণীর দাঁতের মত করে চারটা দাঁত কাটুন, দাঁতের ফাঁকের টিন কেটে ফেলে দিতে হবে। এখন এই চার দাঁতের চিরুণী খানাকে গোল করে নিলেই আপনার চারপায়াটি হয়ে গেল।

এই সমস্ত সরঞ্জাম তৈরী করে নিতে প্রথমে আপনার একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু একবার তৈরী করে নিলে তার দ্বারা আপনি অনেক সুবিধা ভোগ করবেন। ষ্টোভ তৈরীর সব কাজগুলি টিনের মিস্ত্রি বা পিতলের কারিকর দিয়ে করাতে হলে আপনার মাত্র চার ছয় আনা মজুরী নেবে। আর টিন দুটোর দাম বারো আনার বেশী নয়।

রান্না আরম্ভ করতে প্রথমে আপনাদের একটু অসুবিধা বোধ হতে পারে, কিন্তু কাজটি ছাড়বেন না, দু-চার দিনের চেষ্টায়ই বেশ শিখতে পারবেন।

বড় বড় পরিবারের রান্নার জন্য এই ষ্টোভ্ ব্যবহারের দরকার না হতেও পারে কিন্তু ছোট পরিবারের বা আপিসের বাবুদের বাসার রান্নায় এটি চমৎকার কাজ দেবে। এই প্রণালীর রান্না স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ভাল। রান্নায় সব সময়েই ঢাকনা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; এটি সাধারণ নিয়ম। দুধ গরম করা, লুচি হালুয়া প্রভৃতি তৈরী করার জন্য প্রত্যেক ঘরেই এর একটি করে রাখা অনেক সুবিধাজনক।

আপনাদের এখন একটা প্রশ্ন রয়েছে—"এতে কত সময়ে রান্না হবে?" আর "কেরোসিনের কি পরিমাণ খরচ হবে?" উত্তরে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যত রকম উনানে রান্নার প্রণালী আমাদের দেশে আছে, আর যত রকম ষ্টোভ্, কুকার্ এ পর্য্যন্ত বের হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম সময়ে আর কম খরচে আপনার এই 'ঘরে তৈরী ষ্টোভে' রান্না হবে। আধ ঘণ্টায় ডাল চমৎকার সিদ্ধ হবে, বিশ মিনিটে ভাত হবে। দু আনার এক বোতল কেরোসিনে দুজনের মত ডাল ভাত

আট বেলা রান্না হবে। রান্নার সময়ের মধ্যে আপনি আর আর কাজেরও সময় সুযোগ পাবেন।

রাত্রিতে এই রান্নায় আলোর কাজ চলবে। এমন কি কেউ যদি পছন্দ করেন তাঁ টেবিলের উপর এই রান্না চাপিয়ে পড়াশুনার কাজ করতে পারেন।

কয়েকটি বিষয় শিখে রাখতে হবে—

টিনের নিচের বড় ছিদ্র দিয়ে বাতির তলাটি টিন ছেড়ে খানিকটা নিচেয় নেমেছে। আপনার ইট ক'খানি যেন এমন পুরু হয় যে, বাতির তলাটি নিচের জমী থেকে এক-আধ ইঞ্চ উপরে থাকে; কারণ বাতির নিচে দিয়ে বাতাস ঢুকতে না পেলে বাতি ঠিক জ্বলবে না, শিষ্ টেনে কালি উঠবে।

বাতি পুরা জোরে জ্বালা থাকলে মাঝে মাঝে দেখতে হবে আলো বেড়ে গিয়ে শিষ্ উঠছে কিনা। শিষ্ উঠলে বাতির জোর একটু কমিয়ে দিবেন। শিষ্ টানার উপর রান্না করলে কালি উড়বে। বাতি ঠিকভাবে জ্বললে একটুও কালি উঠবে না, পাত্রের তলায় একটুও কালি ধরবে না।

রান্নায় সব সময়েই ঢাকনি ব্যবহার করবেন। ঢাকনির কানা আর পাত্রের কানা যেন একটুও আঁকা বাঁকা না থাকে, ঢাকা দিলে যেন সর্ব্বাংশে মুখে মুখে মিলে যায়। ফাঁক থাকলে রান্নায় দেরী হতে পারে।

ভাত বা ডালের জল উত্‌লাবার পর আলো খুবই কম করে রাখতে হবে, নইলে উত্‌লে উঠে পাত্র বেয়ে জল পড়ে চিমনিতে লাগতে পারে। গরম চিমনিতে জল লাগলেই ভেঙ্গে যায়।

চিমনিটি খুব সাবধানে রাখবেন—যেন গরম অবস্থায় জলের ছিটেফোটাও না লাগে। এমন কি হাত-ঝাড়া একবিন্দু জল গরম চিমনিতে লাগলেও চিমনি ফেটে যাবে।

চৌদ্দ লাইটের চিমনি দুই রকম থাকে। একরকমের তলা অর্থাৎ যেখানে বাতিটি জ্বলে সেইখানটা গোল কমলার মত; আর একরকমের তলা লাউয়ের গলার মত। প্রথমটি অর্থাৎ গোল তলাওয়ালাটি ব্যবহার করবেন, শেষেরটিতে আঁচ জোর হয় না। আপনারা বোধ হয় জানেন, নূতন চিমনি প্রথমেই একটু কম আঁচে জ্বালতে হয়, আগুন একবার স'য়ে গেলে চিমনি টেঁকসই হয়।

কেরোসিন্ তেলটি খুব ভাল হওয়া চাই, যেমন রাণী মার্কার চেয়ে হাতি মার্কা ভাল। ভাল কেরোসিনের বর্ণ জলের মত সাদা।

এলুমিনিয়মের পাত্রগুলি রান্নার পর ধুয়ে মুছে শুক্‌নো রাখতে হয়। জল বা কোন ভিজে জিনিস আটদশ ঘণ্টার বেশী এলুমিনিয়মের পাত্রে রাখতে নেই, রাখলে পাত্রে জং ধরবার সম্ভাবনা। এলুমিনিয়মের পাত্র সাবানে ভাল পরিষ্কার হয়।

বাতি ও বাতির ফিতে কি করে পরিষ্কার রাখতে হয়, কেমন করলে ভাল জ্বলে, তা সকলেই জানেন। বাতির ফিতেটি খুব ভাল ভাবে কাটা চাই, যেন ফিতের সব দিকে সমান ভাবে জ্বলে। একধারে বেশী জ্বললে সেইদিক দিয়ে শিষ্ টানতে পারে।

আপনারা এই রকম ষ্টোভ্ তৈরী করে ডাল, ভাত, তরকারী রাঁধতে থাকুন। এর পর আমরা এই ষ্টোভের আরও উন্নত প্রণালী এবং নানাপ্রকার জিনিস রাঁধবার নিয়মাবলী আপনাদের প্রিয় এই পত্রিকার ভিতর দিয়ে জানাব। আর পাঁচ রকম কুকারের চেয়ে এতে রান্না বেশী সহজ হবে, খাদ্যগুলিও বেশী সুস্বাদু হবে।

এই ষ্টোভের সাহায্যে তিনটি পাত্র পরপর রেখে একই সময়ে কেমন করে তিনটি জিনিস রান্না হতে পারে এ সব জানতে পারলে আপনারা খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। এইসব রন্ধনপ্রণালী সম্পর্কে আমরা দশ-বারো বৎসর অনুশীলনের পর যে সাফল্যে উপস্থিত হয়েছি' তা, বাস্তবিকই আপনাদের রন্ধনপ্রণালীকে অনেক সহজ করে দেবে। আমরা এতে রান্না করে খেয়ে সকল রকমেই সুবিধা ভোগ করছি, বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রান্নার কাজ চলছে, ডাক্তাররা খুবই পছন্দ করছেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

নারী-মঙ্গল

[রচনা—অধ্যাপক শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্‌-এ]

জাগো, নারী-গৌরব মঙ্গলে জাগো ;
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

গৃহ-কারা-বন্দিনী স্বার্থের পণ্যা,
প্রমোদের সঙ্গিনী আভরণ-গণ্যা ;
অধিকার-বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

কোথা বিধি বন্ধনে অন্তর সুপ্ত,
প্রভু-আঁখি গঞ্জনে প্রাণধারা লুপ্ত ;
লাজ-অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

পায়ে পায়ে ধর্মের শৃঙ্খল বন্ধ,
যুগ যুগ মর্মের তমসায় অন্ধ ;
দেহ-শোভা-সজ্জিতা লজ্জিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

পুরুষের বন্দিনী পিঞ্জর-কক্ষে,
পরমনোরঞ্জিনী তৃষাতুর বক্ষে ;
প্রাণহীন অন্ধের বন্ধনে জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো

স্তনধারা-বঞ্চিত সন্তান-ধাত্রী,
চিরব্যাধি-সঞ্চিত দেহ দিবা রাত্রি ;
হেলা-ভয়-শঙ্কিতা কম্পিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো !

জাগো দেবি বিশ্বের গৌরব-তীর্থে,
দীন হীন নিঃস্বের অবনিত চিত্তে ;
নিখিলের নন্দিতা বন্দিতা জাগো—
বাঙ্‌লার ভগিনী বাঙ্‌লার মা গো ।

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

হরশৃঙ্গার—কাওয়ালী ।

২´ ৩ ০
II{সা রা -া গমা | পা পা ধা পা | ধা -পা মা গা |
(১) জা গো ০ নারী গ ঔ র ব ম ঙ্ গ লে

১ ২´ ৩
| রা -সা ন্‌া -সা I গা -মপধা র্রা র্সা | নাঃ ধঃ পা -মগা |
জা ০ গো ০ (২) বা ০০০ঙ্ লা র ভ গি নী ০০

০ ১
| রা -গা মঃ পাঃ | গা -রগা মা -া}II

২				৩				০			
II{মা	ধা	ণা	ধা |	পা	-ধা	ণা	ধা |	পা	ধা	ণা	ধা |
(৩) গৃ	হ	কা	রা	ব	ন্	দি	নী	খা	র্	থে	র
(৭) কো	থা	বি	ধি	ব	ন্	ধ	নে	অ	নু	ত	র
(১১) পা	য়ে	পা	য়ে	খ	র্	মে	র	শৃ	ঙ্	খ	ল
(১৫) পু	রু	ষে	র	ব	ন্	দি	নী	পি	ঞ্	জ	র
(১৯) স্ত	ন	ধা	রা	খ	ঞ্	চি	ত	স	ন্	তা	ন
(২৩) জা	গো	দে	বী	বি	শ্	শে	র	গ	উ	র	ব

১				২				৩			
| পা	-র্সা	র্সা	-া	I ধা	পা	মা	গা |	পা	-া	ধা	পা |
(৩ক) প	ণ্	ণ্যা	০	(৪) প্র	মে	দে	র	স	ঙ্	গি	নী
(৭ক) স্ব	প্	ত	০	(৮) প্র	ভু	আঁ	খি	গ	ঞ্	জ	নে
(১১ক) ব	ন্	ধ	০	(১২) যু	গ	যু	গ	ম	র্	মে	র
(১৫ক) ক	ক্	কে	০	(১৬) প	র	ম	নো	র	ঞ্	জি	নী
(১৯ক) ধা	ৎ	রী	০	(২০) চি	র	ব্যা	ধি	স	ঞ্	চি	ত
(২৩ক) তী	র্	থে	০	(২৪) দী	ন	হী	ন	নি	:	শে	র

০				১				২			
| মা	গা	রা	গা |	রা	-গা	মা	-া}	I সা	রা	গা	মা |
(৪ক) আ	ভ	র	ণ,	গ	ণ্	ণ্যা	০	(৫) অ	ধি	কা	র
(৮ক) প্রা	ণ	ধা	রা	লু	প্	ত	০	(৯) লা	জ	অ	ব
(১২ক) ত	ম	সা	য়	অ	ন্	ধ	০	(১৩) দে	হ	শো	ভা
(১৬ক) তু	খা	তু	র	ব	ক্	কে	০	(১৭) প্রা	ণ	হী	ন
(২০ক) দে	হ	দি	বা	রা	ৎ	ত্রি	০	(২১) হে	লা	ভ	য়
(২৪ক) অ	ব	নি	ত	চি	ৎ	তে	০	(২৫) নি	খি	লে	র

৩				০				১			
|পা	-া	ধা	র্ণা |	ধা	-পা	মা	গা |	রা	-মা	মা	-া I
(৫ক) ব	ঞ্	চি	তা	লা	ঞ্	ছি	তা	জা	০	গো	০
(৯ক) গু	ণ্	ঠি	তা	কু	ণ্	ঠি	তা	জা	০	গো	০
(১৩ক) স	জ্	জি	তা	ল	জ্	জি	তা	জা	০	গো	০
(১৭ক) অ	নু	ধে	র	ব	ন্	ধ	নে	জা	০	গো	০
(২১ক) শ	ঙ	কি	তা	ক	ম্	পি	তা	জা	০	গো	০
(২৫ক) ন	ন্	দি	তা	ব	ন্	দি	তা	জা	০	গো	০

ধুয়াঃ—

২								০			
I সা	-গমপধা	র্রা	র্সা |	নাঃ	ধঃ	পা	-মগা |	রা	-গা	মঃ	পাঃ |
বা	০০০ঙ্	লা	র	ভ	গি	নী	০০	বা	ঙ্	লা	র

১			
|গা	-মা	গরা	-গমা II
মা	০	গো০	০০

৬, ১০, ১৪, ১৮, ২২, এবং ২৬।

বিয়োগ ব্যথা

(মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়োগে)

শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

বাঙ্গালীর 'বড়দাদা' গিয়াছ চলিয়া,
লভিয়াছ চিরশান্তি শান্তি-নিকেতনে।
কিন্তু কহ তোমাহারা—কাহারে লইয়া
জননী আমারে গর্ব্ব সমস্ত ভুবনে?
যাও তুমি, জয় দৃপ্ত সংযমী তাপস!
যাও তুমি ভারতীর প্রিয়পুত্র বীর!
যাও তুমি পুণ্যবন্ত কর্ম্মী অনলস!
যাও তুমি কীর্ত্তিমান সুখদুঃখে স্থির!
বাঙ্গালীর মহাপ্রাণ অগ্রজের বেশে,
চিরদিন বিরাজিলে এই দীন দেশে,
আজি যদি চলি গেছ দূরে—সুরধাম,
নিত্য নিও আমাদের সহস্র প্রণাম।

যমুনার কেশীঘাট হইতে শ্রীবৃন্দাবনের দৃশ্য।
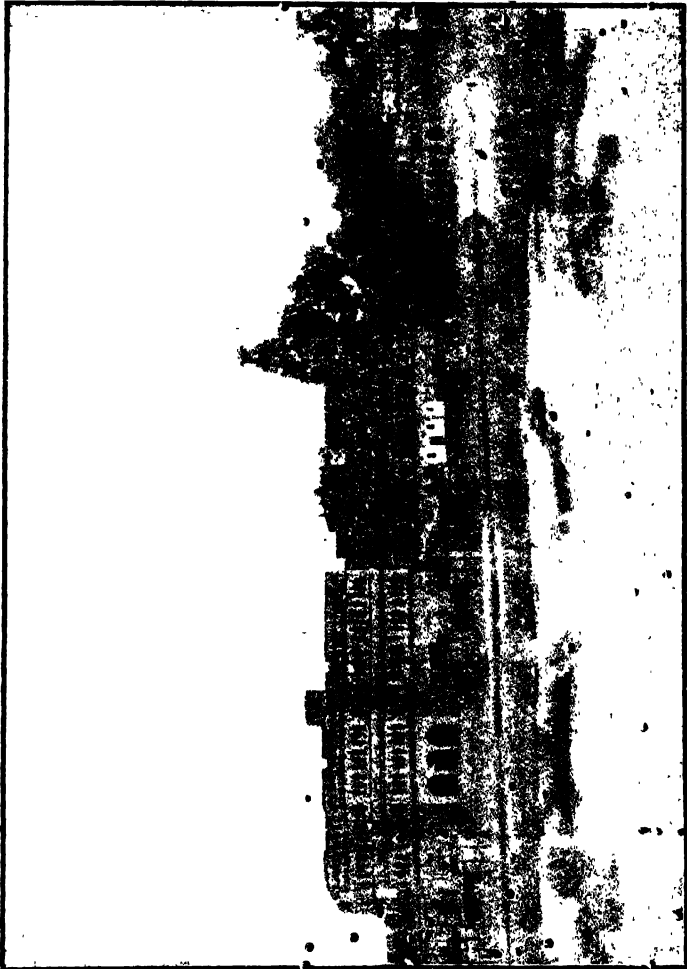
পরশমণি

(গল্প)

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী বসু।

(১)

বৈকালে চা লইয়া বসিয়া আছি এমন সময় বৌদি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "একি, এখনো চা নিয়ে ব'সে আছ যে?" আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম "কি করি, আমার খাওয়া হয়ে গেলে সেফি কি আর রক্ষে রাখবে?"

"গেরো আর কি, সে কি আর বাড়ীতে আছে!"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বৌদির দিকে চাহিয়া বলিলাম "সে কি!" বৌদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সে কি আজকাল বাড়ীতে থাকে, চব্বিশ ঘণ্টা ঐ পাশের বাড়ীতে আছে, সেখানে ওর কে জ্যোতিদি আছে জানি না, সে নাকি ওকে খুব ভালবাসে। স্কুলটা খুল্লে বাঁচা যায়।"

বৌদির কথা শেষ হইতে না হইতে ঝড়ের মত সেই ঘরে আসিয়া সেফি বলিল "তোমার বুঝি চা খাওয়া হয়ে গেছে ছোড়দা?" বৌদি বলিলেন "তা হবে না ত কি? তোমার জন্যে বসে থাকবে? তুমি আরো একটু ওদের বাড়ী বসে থাক না।" সে তাহার ম্লান চক্ষু দুটি বৌদির দিকে তুলিয়া বলিল "আমি বল্লুম যাই, জ্যোতিদি যে ছাড়লে না।"

বৌদি যথাসম্ভব হাসি চাপিয়া বলিলেন "কেন, সে তোমায় ধরে রেখেছিল নাকি? তুমি জান না যে তোমায় বাড়ী আসতে হবে?" সেফি চুপ করিয়া রহিল। আমিও তখন চুপ করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া আর নীরব থাকিতে না পারিয়া জোর করিয়া একটু রাগত স্বরে বলিলাম "আয়, এই তোর চা রয়েছে, আর কখনো এ রকম করিস নে।"

সে হাসিমুখে ছুটিয়া আসিল। তার পর বৌদি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "সেফি, আজ তোর জ্যোতিদি কি বল্লে রে?"

সেফি তাহার ক্ষুদ্র মাথা দোলাইয়া বলিল "আজ কিছু বলে নি, আজ জ্যোতিদির একজন দাদা এসেছেন। জ্যোতিদি কেমন সুন্দর গান গাইলে জান ছোড়দা, বৌদির মতন বাজনা নয়, সে আর এক রকম খুব সুন্দর।" বলিয়া সে বৌদিকে ছাড়িয়া আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বলিলাম "কি রকম বাজনা রে?" সেফি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল "সে খুব সুন্দর।"

দু'চার দিন আগে বৌদির জন্মদিনে আমি তাঁহাকে একটা এস্রাজ উপহার দিয়াছিলাম, সেটা সেফি দেখে নাই, সেইটা বাহির করিয়া আমি বলিলাম "দেখ, ঐ রকম?"

সে উচ্ছ্বসিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া "হাঁ এই রকম, দাও না ছোড়দা আমি একটু বাজাই" বলিয়াই বাজাইতে আরম্ভ করিল। একটুখানি নাড়াচাড়া করিয়া শেষে "এত হচ্ছে না, তুমি বাজাও না ছোড়দা, আমি জ্যোতিদির মত গাইব" বলিয়া আমার বাজান'র অপেক্ষা না করিয়াই মাথা নাড়িয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল—

"রূপসী পল্লিবাসিনী
শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী সুহাসিনী"

কি আশ্চর্য্যের বিষয় সুর তালটিক পর্য্যন্ত সে সম্পূর্ণ

আয়ত্ত করিয়াছে। বৌদি তার গান শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির, হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোর জ্যোতিদি শুধু এই গান গাইলে, আর কিছু গাইলে না?"

সেফি বলিল "কেন গাইবে না?" বলেই, আর একটা কি আরম্ভ করিতে যাইতেছিল এমন সময় দাদা আসিয়া পড়িলেন, কাজেই আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল, সে নিতান্ত ভাল মানুষটির মত আমার পাশের সোফাটায় বসিয়া পড়িল। দাদা ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাদের সভা দর্শন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোমাদের এ সময়েও যে মিটিং বসে গেছে?"

বৌদি বলিলেন "মিটিং আবার কোথায়? এই আমরা সেফির একটু গান শুনছিলাম।"

"হাঁ, আদর দিয়ে দিয়ে তোমরা ওর মাথাটা খেয়ে দিচ্ছ, একবারও ত ওকে পড়তে দেখি না।"

"আদর আবার কোথায়? রাতদিনই কি পড়বে?" বলিয়া বৌদি চলিয়া গেলেন, দাদাও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(২)

বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া বৌদির ঘরে গিয়াছি, দেখি বৌদিও নাই, সেফিও নাই। ব্যস্তভাবে এঘর ওঘর খুঁজিতেছি, পাঁড়েজি বলিল পাশের বাড়ী গিয়াছেন। একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে নিজের ঘরে চলিয়া গেলাম। একটু পরেই বৌদি আসিলেন একেবারে আমার জলখাবার লইয়া। আমি একটু রাগত স্বরে বলিলাম "তুমিও সেফির মত মেতে গেলে নাকি?" বৌদি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেন?"

নিরপরাধীর মত কেন বলিতে আমি আরও একটু চটিয়া বলিলাম "তা না ত কি? তুমি ওদের বাড়ী হঠাৎ যেতে গেল কেন?"

বৌদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ও, এইজন্যে এত অভিমান? আমি মনে করেছি না জানি কি আমি তোমার দাদাকে বলে একটা রাঙা টুকটুকে বৌ আনিয়ে দেবো।"

রাঙা টুকটুকে বৌয়ের লোভে নয়, বৌদির কথা বলিবার ধরণে আমি হাসিয়া ফেলিলাম, ভীষণ ক্রোধ, অটল সংযম কোথায় ভাসিয়া গেল, সুবোধ বালকের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলাম। বৌদি আমার নিকটেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন "আমার পিসিমা আজ দুদিন হ'ল এসেছেন, ওটা পিসিমাদেরই বাড়ী, জ্যোতি পিসেমশায়ের ছোট ভায়ের মেয়ে।"

আমি একটু আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম "কে পিসিমা? সুবোধের মা?"

স্মিতমুখে বৌদি বলিলেন 'হাঁ, সুবোধও এসেছে, দুদিন কি কাজের জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি, আর একটু পরেই আসবে বলে। সেই-ত দুপুর বেলা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।"

আমি জলযোগ সমাপন করিয়া একটু বাহিরে যাইব বলিয়া উঠিয়াছি এমন সময় সুবোধ আসিয়া হাজির। সুবোধ আমার বাল্যবন্ধু, বি-এস্ সি অবধি তাহার সঙ্গে পড়িয়াছি, তারপর আমি ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রবেশ করি, সুবোধ তাহার পিতামাতার নিকট পশ্চিমে চলিয়া যায়। প্রায় চারি বৎসর আর তাহার সহিত দেখা শুনা হয় নাই। সুবোধ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল "বেড়াতে যাচ্ছ নাকি?"

"হাঁ একটু যাচ্ছিলাম। কি রকম আজ দুদিন'ত এসেছ বৌদির মুখে শুনলাম, কিন্তু দেখা ত নেই, ব্যাপারটা কি?"

সুবোধ বলিল "দুদিন ধরে একটা কাজে রয়েছি তাই আসতে পারিনি, তা চল না, কোথায় যাবে? চল আজ আমাদের বাড়ী পানেই যাওয়া যাক্।"

(৩)

সুবোধ আমাকে লইয়া ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিল,

চলিতেছিল। সুবোধের বাবা, কাকা, মা, জ্যোতি সকলে মিলিয়া বেশ জমাইয়া তুলিয়াছেন। আমরা যাইতেই সকলে এক প্রকার চুপ করিলেন।

সুবোধ বলিল "এই দেখ জ্যোতি, এই অতীন বাবু তোর শিস্থার ছোড়দা।" জ্যোতি স্মিতমুখে আমাকে নমস্কার করিল। আমি সকলকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলে পর সুবোধ বলিল "জ্যোতি, অতীন বাবু চমৎকার গান গাইতে পারেন, কবিতা লিখতে পারেন।"

সুবোধের মা বাবা ততক্ষণ আমাকে নানা বিষয় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থার কথা উঠিতেছিল, জ্যোতি মধ্যপথে বাধা দিয়া সবিনয়ে বলিল "আজ ওসব কথা থাক, অতীন বাবু ত আমাদের আপনার লোক হলেন আর একদিন ওসব কথা হবেখন। আজ আমাদের একটা গান শুনিয়ে দিন অতীন বাবু।"

আমি তাহার ও সুবোধের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া উঠিয়া পিয়ানোর নিকট গেলাম এবং সুবোধের ইচ্ছায় গাহিলাম—

"অয়ি ভুবন মনমোহিনী,
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী—
জনকজননী-জননী"

গান শেষ হইলে সুবোধ খানিকটা বাহবা দিয়া বলিল "জ্যোতি, এবার তুই একটা অতীনকে শুনিয়ে দে।" জ্যোতি ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল "না, আমি আজ নয়, আজ অতীন বাবু আর একটা শুনিয়ে দিন।" সুবোধের মা একটু মৃদু তিরস্কারের সহিত বলিলেন "ওকি জ্যোতি, তোমার দাদা তোমাকে গাইতে বলছেন তুমি গাও; অতীনও ত একটা গাইলে।" জ্যোতি আর কোন কথা না বলিয়া লজ্জিতভাবে উঠিয়া পিয়ানোর নিকট গেল এবং খানিকটা বাজাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আপনি কি গান ভালবাসেন?"

আমি বলিলাম "করুণ।"

সুবোধ লাফাইয়া বলিয়া উঠিল "করুণ, করুণ করেই এ আড্ডাটা নষ্ট হয়ে গেল।" জ্যোতি ততক্ষণে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—

"বাঁশরী বাজায় ফিরে ফিরে চায়
কদম তলায় কে-রে—"

কতদিনের সেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান, কতদিন হইয়া গিয়াছে, কতবার শুনিয়াছি, তবুও যেন জ্যোতির গান সজীবতা লাভ করিয়া আমার কাণে বাজিতে লাগিল। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, তবুও যেন নূতন হইয়া সেই মধুরতা বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

তাহার গানটি শেষ হইলে আমি উঠিয়া পড়িলাম, জ্যোতি আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "কাল আবার আসবেন।" আমি শুধু ঘাড় নাড়িয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম, সুবোধ আমাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত দিয়া গেল। আমি যখন আমার ঘরে উঠিতেছি তখনো আমার কাণের ভিতরে সেই করুণ সুরটুকু বাজিতেছিল—

"মরণ সময় ওহে রসময়
দিও দেখা দাসী বলে
(দিও দেখা দাসী বলে, মনে রেখ দাসী বলে)"

(৪)

সেইদিন হইতে রোজই প্রায় বিকাল বেলা সুবোধ আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইত। একদিন কলেজ হইতে আসিয়া দেখি বৌদির ঘরে খুব একটা সোরগোল চলিতেছে, সবই বৌদির বন্ধুবান্ধব, কাজেই আমি আর সেখানে না গিয়া নিজের ঘরই অধিকার করিলাম। একটু পরেই দেখি সেফি একটা রেকাবিতে আমার জলখাবার লইয়া আসিল এবং তাহা রাখিয়া বিজ্ঞের ন্যায় বলিল "ছোড়দা, তোমার জলখাবার নাও, বৌদি বড় ব্যস্ত রয়েছেন বলে আসতে পাল্লেন না; যাঁরা এসেছেন তাঁরা এখনি যাবেন কি না।"

সেফির ভাব দেখিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম,

বলিলাম "কেন রে আজ এত ভীড়, আজ তোদের কি? দেখি দেখি এটা কি পরেছিস্।" বলিয়া তার গায়ের নূতন সুটটা পরীক্ষা করিতেই দেখি খদ্দরের। হঠাৎ তার গায়ে খদ্দর উঠিতে দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তবে দাদাও আজকাল ঐ হুজুগের দলে মিশিয়াছেন নাকি? একটু পরেই সেফির কথায় আমার চিন্তা দূর হইল। সেফি বলিল "বাঃ রে তুমি জান না নাকি আজ যে আমার জন্মদিন। জ্যোতিদি আমায় আজ এই পোষাকটা দিয়েছেন, জ্যোতিদির যে চরকা আছে।"

"তা বেশ" বলিয়া আমি আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। যাইহ'ক দাদা যে ওদলে মেশেন নাই শুনিয়া তবু একটু আনন্দ হইল, কারণ ওসবগুলো আমি একদম পছন্দ করিতাম না। লোকগুলো যে মাঝে মাঝে কেন এক-একটা হুজুগ করে তাহাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় বৌদির সহিত জ্যোতি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি নমস্কার করিল। এ কথা ও কথার পর বৌদি বলিলেন "ঠাকুরপো, তোমার কবিতা গোটা কতক দেখাও না, জ্যোতি দেখতে চাইছে।" আমি বলিলাম "কবিতা, কই দেখানর মত কিছু নেই ত।"

বৌদি শুনিলেন না, নিজেই উঠিয়া এটা ওটা নাড়িয়া বাহির করিবার উপক্রম করিলেন, কাজেই আমি ভীত হইয়া গোটাকতক বাহির করিয়া দিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম "আর যা আছে তা পড়বার উপযুক্ত নয়।"

জ্যোতি কবিতাগুলি পড়িয়া আমার হাতে ফেরৎ দিয়া স্মিতহাস্যে আমার দিকে চাহিয়া বলিল "খুব সুন্দর হয়েছে, আপনার কবিত্বশক্তি চমৎকার।

বৌদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোমার গানের চেয়ে কি? ঠাকুরপো, চল জ্যোতির একটা গান শুনবে।" আমি উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম "উনি যদি দয়া করে শোনান ত আমি রাজি আছি।"

বৌদি তাহাকে একপ্রকার ধরিয়া লইয়া গেলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। জ্যোতি আমার দিকে চাহিয়া বলিল "আপনি ত করুণ সুর ভালবাসেন।" আমার উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সে গাহিল—

"কি আর কহিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে—"

গানটি শেষ করিয়া সে মিনতির স্বরে বৌদিকে বলিল "আজ তবে যাই দিদি।"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখখানি অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ-ছটায় রঞ্জিত সান্ধ্যগগনের ন্যায় রক্তিমাভ ধারণ করিয়াছে।

(৫)

রাত্রে বৌদিদি আসিয়া একেবারে আমার পাশে বসিয়া বলিলেন "আমার একটা কথা রাখবে ঠাকুরপো?" আমি আশ্চর্য্যভাবে বলিলাম "কি না বল্লে কি করে বলব।"

"বেশী কিছু নয়, আমাকে একটি বৌ এনে দিতে হবে, কেমন পারবে ত?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কেন, আমি কি বলেছি দেবো না, তবে এখন নয়, পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক।" বৌদি কৌতুক হাস্যে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেন, বৌ এসে কি তোমায় পরীক্ষা দিতে দেবে না?"

মাটি করিয়াছে, ওকথা কি আমি বলিতে পারি, বিশেষ বৌদির সামনে! দাদা আমার ম্যাট্রিক পাশ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন, তারপর এখন একজন নামজাদা উকিল। কাজেই একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলাম "না না, তা নয়, তবে কেমন বৌ আসবে তাত জানি না।"

বৌদি সকৌতুকে বলিলেন "কেমন বৌ কেন? তার সঙ্গে তোমার ত বেশ চেনা পরিচয় হয়ে গেছে, তোমার ইচ্ছে থাকে ত বল, আমি সব ঠিক করি, কারণ জ্যোতির মা বাপ তাকে আর বেশী দিন রাখবেন না।"

সর্বনাশ! বৌদি কি আমার মনের খবর জানিতে পারিয়াছেন, না কবিতাগুলি দেখিয়াছেন, কিম্বা জ্যোতির সেদিনকার গানেতে কিছু মনে করিয়াছেন! কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না, তথাচ উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া কোনপ্রকারে বলিলাম "যার কথা বলছ, তার সঙ্গে কি আমার বোনবে? যে রকম নন্‌-কোঅপারেটার!"

বৌদি হাসিয়া বলিলেন "পরশমণির স্পর্শে রাংও সোণা হয়।" আমিও হাসিয়া বলিলাম "তা যেন হ'ল, কিন্তু দাদা কি রাজি হবেন?"

"সে ভার আমার" বলিয়া বৌদি উঠিয়া গেলেন।

সামনের লগ্নেই জ্যোতির সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল। এখন বলিতে লজ্জা হয়, আপনারা শুনিলে হয়ত হাসিবেন, বৌদির সে কথা তখন আমি অত তলাইয়া বুঝি নাই, বাস্তবিক পরশমণির স্পর্শে আমা হেন রাংও সোণা হইয়াছে, সুবোধই এখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, দাদারও মত বদলাইয়া গিয়াছে; তাই এখন বড় সাধে বলিতে ইচ্ছা করে—

"তোমারি নির্ম্মল শান্ত আলোকে
দীপ্ত হয় যেন দেহ মন,
তোমার কার্য্যের মধুর সফলতা
হাতে মাখি যেন হাতে গো—"

শিমুল

শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ।

আমার প্রাচীর পার্শ্বে আছে উর্দ্ধে চেয়ে
তরুণ শিমুল তরু, নগ্ন শাখা ছেয়ে
ফুটিয়াছে শত শত রক্তরাঙ্গা ফুল,
শোকাহত কবিচিত্ত মথিত ব্যাকুল
যেন সে কবিতামালা,—বাহিরি আলোকে
উৎসবের বর্ণ দিয়া ঢাকিয়াছে শোকে।
বুকে তার কাঁটা, নাহি চিক্কণ পল্লব,
নির্গন্ধ কুসুমে সাজি নয়ন বল্লভ।
আমি তোর অনুরক্ত, তোরে ভালবাসি
হে শিমুল, সূর্য্যোদয়ে তোর তলে আসি
চাহি মুগ্ধ নেত্রে তোর দীর্ঘ দেহ পানে;
তোর রক্তসিক্ত পুষ্প দৃষ্টি মোর টানে,
দিবা মধ্যে বার বার, বাতায়নে তাই
তোরে দেখিবার লাগি নীরবে দাঁড়াই।
স্বর্গের সম্পদ তব ধরা হ'তে তুলি
ধরেছ মাথায় তুমি, আমি যাই ভুলি
আছে কি না আছে গন্ধ। কিবা আসে যায়
যা পেয়েছ ধরেছ তা দেবতার পায়;
তাই করে মানবের আনন্দ বিধান।
বর্ণ গন্ধ রূপ রস হাসি অশ্রু গান
যার যাহা আছে, আছে যতটুকখানি
কিছু ব্যর্থ নহে, যদি নিবেদিতে জানি।

গ্রন্থ-সমালোচনা

সরোজ-নলিনী—

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস্ প্রণীত, মূল্য আট আনা। প্রকাশক—দি বুক্ কোম্পানি, ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

পরলোকগত সরোজ নলিনী বাংলার আদর্শ নারী ছিলেন। নারীচরিত্রে যতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক একাধারে সরোজ-নলিনীতে তার সবগুলি ছিল। নারী কল্যাণে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি পাঠে আমরা উপকৃত হইয়াছি; লেখকের সরল উদার চরিত্রের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সরোজ-নলিনী ভাগ্যবতী ছিলেন তাই গুরুসদয় দত্তের মত সদন্তঃকরণ স্বামী লাভ করিয়াছিলেন,—মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

"সরোজ-নলিনী" গ্রন্থখানি দেখিয়া সেই তাজমহলের কথা মনে পড়ে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা তাজমহলটিতে রূপময় হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে—আর "সরোজ-নলিনীতে" তাহা আজ প্রাণময় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সরোজ-নলিনীর কর্ম্মজীবনের অনেক সুন্দর ছবিতে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত। সে হিসাবে আট আনা মূল্য অতি কম। স্ত্রীলোক-দিগকে উপহার দিবার পক্ষে চমৎকার বই। আমরা স্থানান্তরে গ্রন্থখানির কয়েক স্থান হইতে দু-চার লাইন উদ্ধৃত করিয়া মাতৃ-মন্দিরের পাঠক পাঠিকগণকে উপহার দিলাম।

ব্রহ্মচর্য্য—

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রাচীন ভারতীয় দৈনন্দিন কার্য্যপদ্ধতি কেমন উন্নত ছিল আজকালকার লোকের সে সকল জানিবার সুযোগ একরকম নাই বলিলেই চলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় সে সবই ভাসিয়া গিয়াছে। রমেশ বাবুর "ব্রহ্মচর্য্য" বইখানির ভিতর দিয়া আমরা সেই সকল নিত্য কর্ম্মের অনেক সুধারা পাইতেছি; এগুলি ঋষিবাদীসম্মত সদাচার পদ্ধতি। অধিকন্তু 'পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান ইহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারিবে না। আমরা বাঙ্গালার প্রত্যেক যুবক যুবতীর হাতে এই বইখানি দেখিতে চাই। দাম চারি আনা মাত্র। প্রকাশক সেন, রায় কোং, কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিং, কলিকাতা।

দেশ পরিচয়, পল্লীসংগঠন—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ প্রণীত। ৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য প্রত্যেক খানা চারি আনা।

শ্রীশবাবু বহুদিন হইতে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর ভিতর দিয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যের কথা বাঙ্গালায় শিক্ষিত সমাজ বিদিত আছেন। "দেশ পরিচয়" পুস্তক খানিতে বাংলার ব্যাধি, লোকক্ষয় প্রভৃতি দুর্দ্দশার হিসাব দেখান হইয়াছে এবং তাহার প্রতিবিধান জন্য দেশবাসীকে জাগ্রত হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের সংগৃহীত তালিকা অতি মূল্যবান। "পল্লী সংগঠন" বইখানি, বাস্তবিকই শ্রীশবাবু পল্লীর দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছেন। ঘরে বসিয়া কল্পনা করিয়া যাঁহারা পল্লীর কল্যাণের কথা লেখেন তাঁহাদের উপদেশ অপেক্ষা এই প্রত্যক্ষদর্শী কর্ম্মীর উপদেশ পল্লী গঠনে অধিক সাহায্য করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে অনেক লোক এখন পল্লীগঠনে মন দিয়াছেন। পল্লীর লাইব্রেরীগুলিতে এরূপ বইগুলি না রাখিলে লাইব্রেরী স্থাপন ব্যর্থ হইবে।

সাধু সুন্দর সিং এর জীবনী—

সাধু সুন্দর সিং জাতিতে শিখ। যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া পরে খৃষ্ট ভক্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি রাজসিক খৃষ্টধর্ম্মের সংস্কার জন্য জগতের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রিত হইতেছেন। চীন, তিব্বত, ইউরোপ, আমেরিকায় তাঁহার প্রচার কার্য্য দেখিয়া লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার বেশ ভারতীয় সন্ন্যাসীর মত, তাঁহার প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পূর্ণ প্রাচ্যের সাত্ত্বিকতা পূর্ণ।

তাঁহার অলৌকিক সাধুজীবনী পাঠে মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইতেছে। মিস্ জে, এইচ, রোল্যাণ্ডস, মিশন হাউস, সিলেট হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সুন্দর সিংএর জীবনী দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। মূল্য আট আনা মাত্র।

স্মৃতিপূজা—

কবিতার বই। লেখক—শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী, বাণী-বিনোদ, প্রকাশক—হিতৈষিণী সভা, পুরাতন চক, বর্দ্ধমান, মূল্য দুই আনা। প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ—লেখক নবীন, কবিতাগুলিতেও নূতন হাতের পরিচয় পাইলাম। কয়েকটি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কবির হাত আছে, ভবিষ্যতে জয়যুক্ত হইতে পারিবেন।

আলুর চাষ—

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রণীত। কি করিয়া আলুর চাষ করিতে হয়, চাষের জমী ও সময় কিরূপ, কি প্রকার সারে প্রচুর আলু জন্মে, কীট-পতঙ্গাদি কি ভাবে নষ্ট করিতে হয়, চাষে ব্যয় কিরূপ পড়ে—ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু এই গ্রন্থখানির মধ্যে সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কৃষি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট পুস্তকখানি খুবই উপকারে আসিবে। আলু অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, বাংলা দেশে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। এই অন্ন-সমস্যার যুগে গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। মূল্য অতি সামান্য, এক আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় হিতসাধনী মণ্ডল, ৭৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সপ্তমীর বলিদান—

কবিকঙ্কামৃত শ্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত একখানি কাব্য। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী ও আফজাল খাঁয়ের যুদ্ধের বিবরণ লইয়া এই কাব্যখানি লিখিত হইয়াছে। লেখক স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধের" অনুসরণে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানির ভাষা বেশ সরল ও ললিত এবং ভাবের সচ্ছলতা কোথাও নষ্ট হয় নাই। নানাবিধ ঘটনাবৈচিত্রে পূর্ণ হওয়ায় 'সপ্তমীর বলিদান' বেশ প্রাণস্পর্শী—পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। ছাপা, কাগজ পরিষ্কার। মূল্য ১৴ টাকা। প্রকাশক—শ্রীহেরম্বজীবন চট্টোপাধ্যায়, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

লেখক—পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী। প্রকাশক—সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১ টাকা। রঘুনাথ দাস, রূপ সনাতন, রামদাস, কবীর, জীবগোস্বামী, বিদুর, তুলসীদাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সরল গদ্যে গোস্বামী মহাশয় এই পুস্তকখানির মধ্যে বিবৃত করিয়াছেন। এই গল্প-উপন্যাস প্লাবিত যুগে এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশ যে বিশেষ প্রয়োজন,' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই সুন্দর। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

জাতিভেদ—

পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রণীত "জাতিভেদ" নামক গ্রন্থ পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলাম। হিন্দুসমাজের কল্যাণের পক্ষে এমন মূল্যবান গ্রন্থ আর দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানে সামাজিক কল্যাণকর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন, ফলে তাঁহারা পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা পাইতেন তাহাও হারাইতে বসিয়াছেন।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই আমরা ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রথমে দেখিলাম, যাঁহার প্রাণ ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি ব্রাহ্মণের ব্যবহার দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর জাতির সামাজিক দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়াছে। "জাতিভেদ" গ্রন্থের ভিতর এই সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সমদর্শিতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতের এই সামাজিক অধঃপতনের দিনে এ গ্রন্থ প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। গ্রন্থকার প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মূল্য দুই টাকা। সিরাজগঞ্জ (পাবনা) গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা—

প্রচলিত আর আর পঞ্জিকার মত সমস্ত বিষয়ই ইহাতে আছে, অধিকন্তু স্বাস্থ্যধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্য-নীতি বিষয়ক অত্যাবশ্যক নানা বিষয় স্থান পাওয়ায় আর আর পঞ্জিকা অপেক্ষা ইহা অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছে। কয়েক বৎসর মধ্যেই এই পঞ্জিকা শিক্ষিত মহলে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৩৩৩ সালের স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকাখানি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে। মূল্য।৵০ পাঁচ আনা। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত।

সরোজ-নলিনী

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস, মহোদয় লিখিত তদীয় পরলোকগত পত্নী সরোজনলিনী দত্তের জীবনীর কয়েকটি স্থান হইতে উদ্ধৃত হইল সরোজনলিনীর সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় বলিতেছেন—

তাঁহার বাল্যজীবনে স্কুলে শিক্ষার অভাবে যে সব শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল সেগুলি কিছু কিছু করিয়া আমার কাছে অতি পরিশ্রমের সহিত শিখিতেন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ আমাকে "গুরুদেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

তিনি হিন্দু মহিলার প্রিয় শাঁখা সিন্দুর ও নোয়া অতি আগ্রহে পরিতেন। * * তিনি বলিতেন "স্বামীর কল্যাণের জন্য শাঁখা পরিতে হয়।" * * বিবাহে "স্ত্রী-আচার" গুলির আমোদ তিনি বড় ভালবাসিতেন।

প্রাতঃকালে জাগিয়াই তিনি ঈশ্বরের কাছে অল্পক্ষণ প্রার্থনা করিতেন। * * আমার চিত্ত-বিনোদনের জন্য সাধারণ সঙ্গীত ও পরে ধর্ম্মসঙ্গীত গান করা ছিল তাঁহার সন্ধ্যার কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কাছে অল্পক্ষণ প্রার্থনা না করিয়া তিনি শয়ন করিতেন না।

*

তিনি বরাবর বলিতেন "দামী গহনার উপর আমার মোটেই লোভ হয় না

আমার খাতিরে পড়িয়া বাঙ্গলা কথা বর্জ্জন করিয়া কিছুকাল কেবল ইংরাজী কথাতেই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন, পাশ্চাত্য ধরণের উঁচু করিয়া কেশবিন্যাসও আমার অনুরোধে করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। * * কিন্তু ক্রমে তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এগুলির মধ্যে কোনটিই এদেশের পক্ষে স্বাভাবিক বা উপযোগী নয়। শেষটা তাঁহার প্রভাবেরই জয় হইয়াছিল, আমাকে তিনি আবার বাঙ্গালী করিয়াই তুলিয়া-ছিলেন। তাঁহার উদার গভীর রক্ষণশীলতার নিকটে আমার উচ্ছৃঙ্খলি পরিবর্ত্তনশীলতাকে এই সকল বিষয়ে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

যে সকল ক্ষেত্রে মানসিক জ্ঞান ও প্রয়োগের প্রয়োজন হইত সে সকল বিষয় সরোজ-নলিনী আগ্রহের সহিত আমার কাছে শিক্ষা ও উপদেশ লইতেন, কিন্তু চরিত্রগত যাবতীয় ব্যাপারে আমি তাঁহার কাছেই শিক্ষালাভ করিয়াছি।

*

সরোজনলিনীর চরিত্র ভারতনারীর স্বাভাবিক প্রগাঢ় ধর্ম্মপ্রাণতায় ও ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসে কানায় কানায় ভরা ছিল। তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মল পবিত্র প্রভাব ও আদর্শ আমার জীবনে নাস্তিকতার স্রোতকে রোধ করিয়া পুনরায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতার দিকে চালনা করিয়াছিল।

তাঁহার নিকট হইতে আমি এই শিখিয়াছি যে, জীবনের চরম সত্যগুলি কেবল প্রেমের ভিতর দিয়াই উপলব্ধি করা যায়, যুক্তির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করা যায় না।

সরোজনলিনী বলিতেন "কি জানি কেন, কাহারো দেনাদার হইয়া একদিন মাত্র থাকিলেও আমার প্রাণে অশান্তি হয়।"

*

গ্রামের নারীদিগের দুঃখকষ্টপূর্ণ জীবনের সকরুণ ক্রন্দন সরোজনলিনীর কাণে দিনরাত বাজিত ও তাহাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ প্রতিদিন কাঁদিত।

আমি পরম সৌভাগ্যবান, আমার জীবনকে তিনি তাঁহার আত্মার ও স্বভাবের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, প্রেমে ও গরিমায় পরম পবিত্র করিয়া গৌরব মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

অসমীয়া মহিলাদিগের কর্ম্মকুশলতা

আসাম পর্য্যটক—শ্রী বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার বহুস্থানে স্ত্রীশিক্ষার অল্প-বিস্তর আন্দোলন চলিতেছে। সেকালে কি ভাবে স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিশেষ আলোচনা সাময়িক কাগজপত্রে বড়-একটা দেখা যায় না। আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্ট ছিল। আসাম অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

সমগ্র আসামে কি উচ্চ-শ্রেণীর কি নিম্ন-শ্রেণীর মহিলা মাত্রেই সাংসারিক কাজকর্ম্ম ও খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলেই তাঁতে গিয়া আপনাদের পরণ-পরিচ্ছদ বয়ন করেন। বাঙ্গলায় বহু পরিবার-বিশিষ্ট অস্বচ্ছল ব্যক্তির সংসারের ললনাদিগের ন্যায় সেখানকার কোন মহিলাকে বস্ত্র-চিন্তায় বিব্রত হইতে হয় না। অধিকাংশ অসমীয়া মহিলাই অনর্থক কালক্ষেপণ করেন না।

অসমীয়া মহিলাগণ বাড়ীতে কি প্রকারে সরিষা হইতে তৈল বাহির করেন, এক্ষণে আমরা তাহাই বিবৃত করিব। আমরা কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানান্তে বলিতেছি যে, ভারত মহাসাগরস্থ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, নেপালে ও আসাম অঞ্চলের তেজপুর মহকুমা হইতে আরম্ভ করিয়া লখিমপুর জেলা পর্য্যন্ত সরিষা হইতে নিম্নলিখিত প্রণালীতে তৈল বাহির করা হয়। আসামের ঐ অঞ্চলে সাধারণতঃ মহিলারা এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের প্রথমে আমরা আসাম পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। ঐ সময় আমরা মধ্য-আসাম অঞ্চলের বহু অসমীয়া মহিলাকে সেকালের 'ঘানি' হইতে তৈল বাহির করিতে দেখিয়াছি।

বাঙ্গলা দেশে যাহাকে "ঘানির তৈল" বলে, আসামে তাহাকে "পেরা তেল" বলা হয়। 'পেরা' শব্দের অর্থ পেষণ। সরিষার উপর পেষণ বা চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয় বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যে প্রণালীতে তৈল বাহির করা হয়, মধ্য-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলের মহিলারা সে প্রণালীতে তৈল বাহির করেন না। সেদেশে "গছ শাল" ও "বান্ধা শাল" নামক দুই প্রকার ঘানি গাছ আছে। ক্ষেত্র অথবা দোকান হইতে আনিত সরিষা হইতে তৈল বাহির করিবার জন্য সেখানকার মহিলারা যে প্রণালী অবলম্বন করেন, এক্ষণে তাহা বলা যাউক। যাহাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে, তজ্জন্য সরিষাগুলিকে জলধৌত করিবার পর রৌদ্রে দেওয়া হয়। সেগুলি শুকাইয়া খড়খড়ে হইলে মহিলারা ঢেঁকি দিয়া কুটিয়া ফেলেন। এই কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা গুঁড়া সরিষাগুলি চালুনিতে চালিয়া তিন দিন ঘরে রাখিয়া দেন।

উপরে আমরা "গছ শাল" ও "বান্ধা শাল" নামক দুই প্রকার ঘানির কথা বলিয়াছি। এক্ষণে "গছ শাল"এর কথা বলা যাউক। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১।০ ফুট উপরে বাড়ীর মধ্যস্থ অথবা বহির্ভাগস্থ অন্যূন ৫।৬ হাত দীর্ঘ একটী গাছের গায় ৭" ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৬" ইঞ্চি প্রস্থ একটী ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রের মধ্যে ৬" ইঞ্চি চওড়া, ৬" ইঞ্চি পুরু ও ৬।৭ হাত দীর্ঘ একটী তক্তা প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া

হয়। এই তক্তার নীচে "বহনা" (নামান্তর চরীয়া) নামক একটী নিরেট কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। "বহনা"র উপরিভাগে চারি পার্শ্বের কিয়দংশ বাদ দিয়া মধ্যভাগ একটু গভীর করিয়া কাটিয়া একদিকে একটী "নালা" করিয়া দেওয়া হয়। এই নালার মুখের নিম্নে একটী পাত্র বসাইয়া রাখা হয়। তাহার মধ্য দিয়া এই বাটীতে যে প্রণালীতে তৈল গড়াইয়া পড়ে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইল।

গুঁড়া সরিষাগুলি চালুনিতে চালিয়া তিন দিন ঘরে রাখিবার কথা উপরে আমরা বলিয়াছি। এই তিন দিন অন্তে সেগুলিতে অল্প জল-ছড়া দিবার পর অসমীয়া মহিলারা মাটীর খোলায় অথবা লৌহ কটাহে তাহা ভাজিতে থাকেন। ভাজিতে ভাজিতে অগ্নির তাপে সেগুলি হইতে তৈল বাহির হব হব সময়ে নামাইয়া লইয়া বেতের তৈয়ারী পলা*র মধ্যে ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরাইয়া দিয়া ঐ 'বহনা'র উপর বসাইয়া রাখেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত ঐ ৬৷৭ হাত দীর্ঘ তক্তার উপর ৫৷৬ জন পুরুষ কিংবা মহিলা উঠেন অথবা তাঁহাদের গুরুত্বের অনুপাত-মত মাটী অথবা পাথর চাপাইয়া দেন। 'পলা'র উপর ঐ চাপ পড়িবার ফলে উহার গা বহিয়া তৈল বাহির হইয়া 'বহনা'স্থ গর্ত্তে পড়িয়া নালার মধ্য দিয়া নিম্নস্থ পাত্রে ঝরিয়া পড়ে।

"বাক্স শাল"এর জন্য প্রায় ৮৷৯ হাত দীর্ঘ, ৮ ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পুরু এবং ১২ ইঞ্চি চওড়া দুইটী তক্তার আবশ্যক হয়। ইহাদের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সরু করিয়া কাটা। সর্ব্বাপেক্ষা এই সরু প্রান্তভাগের প্রসারণ সাধারণতঃ ১॥০ ফুট করিয়া লওয়া হয়। ইহার মাথার দিক—যেদিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, সেই দিক হইতে প্রায় ১॥০ হাত ব্যবধানে দুইটী স্বতন্ত্র কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া সেই দুইটী কাষ্ঠ গজাল (pin) দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এই গজালের গোড়ার দিকটা খুব মোটা থাকে। মাটীতে তাহা পুতিয়া দেওয়া হয়। গজাল মারিবার স্থানের সন্নিকটে ঢিলা বেতের বাঁধনি দেওয়া হয়। অসমীয়া মহিলাগণ বেতের বাঁধনীকে "নগরা" বলেন। যাহা হউক, উক্ত ৮৷৯ হাত তক্তাদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত 'পলা' (নামান্তর বেতেরি) দিয়া তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা সরু প্রান্তভাগ সুদীর্ঘ বেত্র দ্বারা ক্রমাগত কসিয়া কসিয়া বাঁধা হয়। ইহার ফলে তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

উপসংহারে বক্তব্য—বাঙ্গালাদেশ-জাত ঘানির তৈলের মত আসামের তৈলে তীব্র ঝাঁজ নাই। সেদেশে উপরিউক্ত প্রণালীতে সরিষা প্রস্তুত করিবার জন্য সরিষা তৈলসংযুক্ত ব্যঞ্জনাদি আমাদের নিকট একটু বিকৃত গন্ধযুক্ত বোধ হয়। এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের পল্লীগ্রামে আমরা ভেজাল তৈল দেখিতে পাই নাই। সে দেশের নগরে, বন্দরে ও রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে মাড়োয়ারী কেঁঞার আবির্ভাবের ফলে যথেষ্ট ভেজাল তৈলের আমদানী দেখা দিয়াছে।

---

* পলা—ইহার আকৃতি বাঙ্গলা দেশের চাউলের কুনকের মত।

দ্রব্য গুণ

তিক্তদ্রব্য :—চৈত্র মাস, পিত্ত প্রকোপের সময়। এ সময় আমরা একটু দ্রব্য গুণ ব্যাখ্যা করিব।

নিমপাতা :—নিমপাতার গুণ অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সময় প্রতিদিন নিমপাতার ঝোল খাওয়া উচিত। পাতা ভাজা খাওয়া অপেক্ষা ঝোল খাওয়াই ভাল। সকল রকম চর্ম্মরোগে নিমপাতা নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

হিঞ্চে (হেলাঞ্চ) :—হিঞ্চে এই গরমের সময় আর একটি উপকারী জিনিস। 'হিঞ্চের' ঝোল পিত্ত নাশক ও মুখরোচক। প্রতিদিন সকালে হিঞ্চের রস কাঁচা দুধের সহিত মিশাইয়া খাইলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে।

ঝাল :—গরমের দিনে লঙ্কা বড় অনিষ্টকারী। লঙ্কার ঝাল অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক। যাঁহারা বেশী ঝাল ব্যবহার করেন তাঁহারা সাধারণতঃ উগ্র প্রকৃতির হন। ঝাল ব্যবহারে নারীসুলভ কমনীয়তাও নষ্ট হয়। যদি মধুর প্রকৃতির হইতে চাও, তবে বেশী ঝাল খাইও না।

টক :—গরমের দিনে একটু টক খাওয়া বেশ স্নিগ্ধকর ও উপকারী। এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাদের বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না,—কচি আমের ঝোলের জন্য সকলের রসনাই লালায়িত হইয়া আছে।

তামাক, দোক্তা, নস্য :—এগুলি গরমের দিনে অনেকটা বিষের মত কাজ করে। অনেক নারী তামাকের গুঁড়া দাঁতে ব্যবহার করেন, অনেকে আজকাল দোক্তা খান, ইহার গন্ধে শারীরিক যন্ত্রসকল বিষাক্ত হইতে থাকে। বিশেষতঃ তামাকের গুঁড়া ব্যবহারে মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। নস্যও আর-এক উপদ্রব হইয়া উঠিতেছে। বাজারে নস্যের মধ্যে এমন অনেক বিষাক্ত পদার্থ থাকে যাহাতে শরীরের ক্রীয়া নিস্তেজ করিয়া দেয়। এই সব কদাচার যথাসাধ্য চেষ্টায় বর্জ্জনীয়।

রান্নায় মশলা—গরমের দিনে উগ্র জিনিষ যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। এই হিসাবে রান্নায় পেঁয়াজ, রশুন, ঝাল, মশলা ব্যবহার কমাইয়া যত সাদাসিধে করা যায় ততই মঙ্গল

মাতৃ-মন্দিরের তিনটি নিবেদন

শিক্ষার্থে—

পল্লী-মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু লিখিতে চান, তাঁহারা মাতৃ-মন্দিরের জন্য প্রবন্ধ বা স্থানীয় সংবাদাদি দিলে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের গ্রাহিকাদের মধ্যে যাঁহারা সামান্য কিছুও লিখিতে পারেন, তাঁহাদের লেখা পাঠাইলে আমরা যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া লইব। এই হিসাবে প্রবন্ধাদি লেখা শিখিবার পক্ষে মাতৃ-মন্দিরের গ্রাহিকা হওয়া সুবিধাজনক।

প্রচারার্থে—

আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাহক করিবার উদ্দেশ্যে যদি দুই-তিনটি ঠিকানা পাঠান, তবে বর্ত্তমান চৈত্র সংখ্যা মাতৃ মন্দির ঐ সকল ঠিকানায় বিনামূল্যে প্রেরণ করা যাইবে। অবগত থাকিবেন যে, অন্য কোন সংখ্যা প্রেরণের জন্য লিখিলে পাঠান সম্ভব হইবে না। আশা করি, গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ঐ সকল ঠিকানায় বন্ধুবান্ধবগণকে পৃথক পত্র লিখিয়া বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিয়া মাতৃ-মন্দিরের সহায়তা করিবেন।

প্রসারার্থে—

আগামী ৩০শে চৈত্রের মধ্যে যিনি ১৩৩৩ সালের মাতৃ-মন্দিরের তিনটি নূতন গ্রাহক ঠিক করিয়া তাহার বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা আমাদিগকে পাঠাইবেন, তাঁহাকে ১৩৩৩ সালের এক বৎসরের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান চৈত্র মাসে যে সকল গ্রাহকের মূল্য শোধ হইয়াছে আগামী বৈশাখ, সংখ্যা তাঁহাদিগকে ভিপিতে পাঠাইয়া ১৩৩৩ সালের মূল্য অগ্রিম আদায় করা হইবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইতে হইলে ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পাঠান আবশ্যক।

চাটনি

—বেরোষ পুজো—

বৃষোৎসর্গের শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে শিবু বাগ্দী লুচি ভাজবার কাঠ যুগিয়েছিল। নিমন্ত্রণের আহারের দিন বিকাল বেলা শিবু খেতে বসে বেশ পরিতোষ হয়ে খেয়েছে,—শিবু পাতা তুলবে, এমন সময় গিন্নি ঠাকরুণ এসে বললেন—"শিবু, তুই আর কিছু নিলি নাতো?" শিবু বললে—"খুব খেয়েছি মা ঠাকরুণ, ভগবান করুক বচ্ছর বচ্ছর তোমার বাড়ী এমনিতর বেরোষ পুজো হ'ক।"

—নাম করবে কি করে?—

শাশুড়ী বাড়ীতে ছিলেন না, এমন সময়ে কবিরাজ এসে খোকার অসুখের ব্যবস্থা করে ঔষধ দিয়ে গিয়েছেন। শাশুড়ী বাড়ী আসতেই বউ ছেলের ঔষধের কথা জানালে। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন—"ঔষধের অনুপানের ব্যবস্থা কবিরাজ কি বলে গিয়েছেন?" বউ বললে—"ভাসুরের রস, আর তার সঙ্গে আমাদের ওঁর কয়েক ফোঁটা।" আপনারা অনুপান বুঝলেন কি? বউ সে নাম করবে কি করে! সে যে নামে আটকে গেছে—ভাসুরের নাম তুলসীদাস আর স্বামীর নাম মধুসূদন।

—কান মলবে ত মলে নাও—

মাধব সাহা পান বেচে খায় বটে কিন্তু কাউকে ভয় ক'রে কথা কয় না। নায়েবের গোমস্তা পানের বাকী পয়সার জন্যে তাকে বড় ধুর'চ্ছিলেন, তাই গোমস্তাবাবুকে সে "বড় কুটুম" বলে গাল দিয়েছে। এই অপরাধে নায়েবের কাছারীতে মাধব সাহার নামে নালিস হয়েছে। যথা সময়ে মাধব কাছারীতে হাজির, নায়েবমশায় বিচার করবেন, কিন্তু তখন তিনি কালুসেখের বিষয় বাজেয়াপ্ত করার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত। মাধব ব্যবসায়ী মানুষ, কাছারীতে বসে সময় নষ্ট করা তার পোষায় না, তাই সে নায়েবকে বললে—"নায়েব মশায়, কান মলবে ত মলে নাও, আমার হাটের বেলা যায়।"

—ঢেঁকে বুড়ো—

বুড়ো ঢেঁকী মাথায় নিয়ে হাটে বেচতে চলেছে, পথে একটি লোক জিজ্ঞাসা করলে—"ঢেঁকী নিয়ে চলেছ কোথা?" বুড়ো উত্তর করলে—"পোনে পাঁচ হাত।" লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—"বেচবে কত?" বুড়ো বললে—"তেঁতুলের কাঠ"। লোকটি ঢেঁকিটা কিনতে চায়, কিন্তু কোন রকমেই বুড়োর কানে ঢুকাতে না পেরে রাগের ভরে হাত নেড়ে বললে—"কত দেবো?" বুড়ো এবার শুনেছে—"কেড়ে নেবো,"—কাজেই ঢেঁকী মাথায় ভোঁ। ভোঁ দৌড়!

—গাভীন আছে—

নতুন উড়ে চাকর, সে বাংলা ভাল করে বোঝে না। তাকে হাটে গাই বেচতে পাঠান হয়েছিল। বাড়ীর কর্তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন পুরা দাম না উঠলে খদ্দেরকে বলবি যে গাভীন আছে। হাটে গিয়ে খদ্দেরকে ঐ কথাটা বলতেই বেশী দামে গাইটা বিক্রি হয়েছিল। আর একদিন তাকে একটা কাঁটাল বেচতে পাঠান হয়েছে, বেশী দামে বিক্রি করবার আশায় সে প্রত্যেক খদ্দেরকেই বলছে—"গাভীন আছে।"

—দরদী—

দুই বউএ খুব ঝগড়া; এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বন্ধ, কথা বন্ধ। এমনিভাবে কিছু দিন যায়, পরে দুই বউ একই সময়ে গর্ভবতী হয়েছে। একদিন বড় বউ কয়েতবেলের ঝাল-চাটনী করেছে, সেদিন আর একলা খেতে তার মন গেল না, ছোট বউকে ডাক দিলে—ঝগড়াঝাটিও মিটে গেল।

—পৃথিবীর আকার লুচি—

ইন্স্পেক্টরবাবু পাঠশালা পরিদর্শনে এসে ছাত্রগণকে প্রশ্ন করলেন—"বল দেখি পৃথিবীর আকার কি?" পণ্ডিত মশাই ছিলেন ইন্স্পেক্টরবাবুর পেছন দিকে। তিনি ছাত্রগণকে ইসারায় আঙুল ঘুরিয়ে গোলাকার দেখালেন; অমনি একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে চিৎকার করে প্রশ্নের উত্তর করলে—লুচি—লুচি—লুচি।"

—শিয়ালের মন বোঝা—

বুড়ীর তেলের ভাঁড় শিয়ালে নিয়ে গেছে; অতি দুঃখে সে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে—"গেল গেল আমার পাঁচ পয়সার তেলের ভাঁড়, তবু শিয়ালের মনটা তো বোঝা গেল!"

—পুড়িয়ে খাবো—

বুড়ী বেগুন তুলছে, একটি অনেকদিনের চেনা লোক বুড়ীকে দেখে বললে—"বুড়ী কেমন আছ?" বুড়ী বললে—"দুটো বেগুন বাবা।" লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলে—"ছেলে কোথা?" বুড়ী বললে "পুড়িয়ে খাবা।"

—হরিঠাকুর পায়ে ঠেকিস্—

মালী বউ পুকুরে স্নান করতে—নাকের নথটি তার বুকজলে পড়ে গেছে। সে পা টিপে টিপে খুঁজছে আর হরিঠাকুরের দোহাই দিচ্ছে—"দোহাই হরিঠাকুর পায়ে ঠেকিস্।"

বর্ষশেষে

ক্রমাগত তিনটি বৎসর মাতৃ-মন্দির নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছে। মাতৃ-মন্দিরের প্রধান উদ্দেশ্য পল্লীর সাধারণ শিক্ষিতা মেয়েদের উপযোগী একখানি লঘু সাহিত্যের মাসিক পত্রিকার প্রচার করা। সে বিষয়ে মাতৃ-মন্দির যে কিঞ্চিৎ কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে এবং নানা সাময়িক পত্রিকার ভিতর দিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

সকলেই অবশ্য বোঝেন যে, পত্রিকা পরিচালন কার্য্য মাত্র দু-চার জনের চেষ্টায় হয় না। দেশের চিন্তাশীল লোকদের বিভিন্ন প্রকারের চিন্তাধারা পত্রিকায় স্থান পাওয়া আবশ্যক।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি—পত্রিকাখানি আমাদের অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব নহে, ইহা দেশের সাধারণের জিনিস। আমাদিগকে ইহার দোষ দেখাইয়া দেওয়া এবং কি ভাবে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া দেশসেবীগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যে সকল লেখক-লেখিকা তাঁহাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও নানা বিষয় দিয়া মাতৃ-মন্দির পরিচালনের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পত্রিকার আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া অনেক ভাল ভাল লেখক-লেখিকার লেখা আমাদের হস্তগত হইয়াও মাতৃ-মন্দিরে স্থান পাইতেছে না; সেই সকল লেখক-লেখিকার প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন—তাঁহারা যেন মাতৃ-মন্দিরের উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া নিয়মিত লেখা পাঠাইতে থাকেন; আগামী বৎসর হইতে আমরা ঐ সকল লেখাগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে না পারিলেও উহা হইতে কিছু কিছু সার সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রতি
পত্রিকাখানির প্রতি দিন
সহানুভূতি দেখাইতেছেন,
সহিত তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব
দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদে
কৃতজ্ঞ। বাস্তবিক তাঁহ
মাতৃ-মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সাধি

বাংলার প্রতি জেলার
পল্লীতে মাতৃ-মন্দির যাইে
যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁ
নারী-অনুকূল সংবাদগুলি
পাঠাইয়া দেন, তবে বহু
স্থান পাইতে পারে।
এবিষয়ে মনোযোগী হইবে

দেশের মহিলাদের উ
অতি দায়ীত্ব পূর্ণ কা
আমাদের নাই। এ
স্ত্রী-পুরুষগণকে স্মরণ র
একটু বিশেষভাবে ম
মেয়েদের পক্ষে একথা
পরিণত হইতে পারিবে

বিগত দুইটি বৎসর
এক এক বৎসর করিয়া
খানির আশানুরূপ উৎ
যায় নাই। আগামী
আরম্ভ হইবে। অতঃ
নব বর্ষের আয়োজনে
শ্রীভগবান আমা
থাকুন। তাঁহারাই ইচ
নারীকল্যাণে সহায়তা

নানাকথা

মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী—

গত ১৯শে, ২০শে, ২১শে ফেব্রুয়ারী, কলিকাতা আপার সার্কুলার রোড়ে ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের বিস্তৃত উদ্যান প্রাঙ্গণে নারীশিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে একটি মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্রে চরকার সূতা, গামছা, তোয়ালে, টেবিল ক্লথ, কার্পেটের আসন, সতরঞ্চ, প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রশিল্প; বেতের তৈরী নানাবিধ আসবাবপত্র; মৃত্তিকার মূর্ত্তি, পুতুল প্রভৃতি; ফলের মোরব্বা আচার জ্যাম-জেলি প্রভৃতি মহিলাদের হাতের প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রদর্শনী মাত্র মহিলাদের দর্শনের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অপরাহ্নে সুকবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ রচিত অৰ্ঘ্য অভিনয় দর্শকবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। নারীশিক্ষা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী) অতি শৃঙ্খলার সহিত প্রদর্শনীর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া আরও সুখী হইয়াছি যে, এই প্রদর্শনীটি প্রতি বৎসরেই নিয়মিতভাবে হইবে। এইরূপ বিশুদ্ধ মহিলা-শিল্পের প্রদর্শনী বাংলায় সর্ব্বত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বিলাস-শিল্পের দিকে বেশী মন না দিয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য নিত্য আবশ্যক দ্রব্য সম্বন্ধীয় শিল্পীদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিতে প্রয়াস পান।

শিশু মঙ্গল—

গত শিশুমঙ্গল-সপ্তাহে বাংলার নানা স্থানে শিশুমঙ্গল-সভা, শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে শিশুদের কল্যাণ-বিষয়ক অনেক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা যে দেশের পক্ষে কত কল্যাণকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠানে যুবকদের সুমতি হউক।

বীর রমণী—

কয়েকমাস পূর্ব্বে ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে কৈলাশচন্দ্র সাহা মণ্ডলের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। ঐ ডাকাতিতে হেম গোপিনী ও তাঁহার তিন ভাই ডাকাতদিগকে আক্রমণ করিয়া দুইজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেন। ডাকাতদের যথারীতি শাস্তি হইয়াছে। নারী হেম গোপিনী তিন ভাই সহ সশস্ত্র ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট হেম গোপিনীকে দেড়শত টাকা এবং তাঁহার তিন ভাইকে মোট দেড়শত টাকা, একুনে তিন শত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। নারীর এই সাহসিকতা বাংলার নারীদিগকে উৎসাহিত করুক।

নারীর দান—

মুর্শিদাবাদ-জঙ্গীপুরের পরলোকগত উকিল ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী জগদীশ্বরী দেবী মির্জ্জাপুর বেলুরিয়ায় একটি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি আরও কিছু দান করিবেন। এরূপ দানে নারীদের সুমতি হউক।

অশিক্ষিতার পরিণাম—

কলিকাতা শ্যামপুকুর থানার এলাকায় ত্রিগুণাসুন্দরী দাসী নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের উদরাময়ের জন্য 'পলসেটিলা' ঔষধ আনা হইয়াছিল। তাহার স্বামী আফিসে যাইলে উক্ত স্ত্রীলোক 'পলসেটিলা' পরিবর্ত্তে পার্শ্বের একটি শিশি হইতে ভুলক্রমে নাইট্রিক এসিড লইয়া পান করে। তৎক্ষণাৎ ভীষণ যন্ত্রণার সহিত তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আহা! স্ত্রীলোকটির যদি একটু বর্ণজ্ঞানও থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় অপমৃত্যু ঘটিত না।

সন্দিগ্ধ স্বামী

কলিকাতার দক্ষিণে বজবজে নুর মহাম্মদ নামক একটি যুবকের ছয়মাস কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। নবিজান নাম্নী তাহার অষ্টাদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী স্ত্রীকে সে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। সে মনে করিত, তাহার সুন্দরী স্ত্রী পাছে পরের নজরে পড়ে। তাহার কি দুর্ব্বুদ্ধি,—একদিন নবিজান শয্যায় ঘুমাইয়া ছিল এমন সময় সে তাহার নাকটি কাটিয়া ফেলে। হতভাগা আদালতে স্বীকার করিয়াছে যে, সে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছে। আমরা আর কি বলিব—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার।"

কন্যাবিক্রয়ে পৈশাচিকতা—

গৌরীদাস নামে বাংলার এক অর্থপিশাচ তাহার নয় বৎসরের বালিকা কন্যাকে এক পাঞ্জাবীর নিকট দুইশত টাকা লইয়া বিক্রয় করিয়াছিল। পরে ঐ কন্যা যুবতী হওয়ায় পাঞ্জাবী তাহার দ্বারা ঘৃণিত উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে প্রয়াস পায়। বালিকা তাহাতে রাজি না হওয়ায় তাহার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হয়, ফলে সে পলাইয়া গিয়া গিরিবালা নাম্নী আর একটি স্ত্রীলোকের আশ্রয় গ্রহণ করে। বালিকাটির অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, সে অল্পদিনেই বুঝিতে পারে গিরিবালা পতিতা নারী—সেখানে থাকিলে তাহাকেও পতিতা হইতে হইবে। তাই সে কলিকাতার নারীরক্ষা-সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বালিকাটির নাম লক্ষ্মী দাসী। লক্ষ্মী মেয়ে বটে।

সাম্যনীতি—

পারস্যরাজ মুস্তাফা কামালপাশা স্ত্রীপুরুষের সম-অধিকারের এক নূতন আইন করিয়াছেন। দেশের কোন পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে বিবাহ-বিচ্ছেদ কেবল মাত্র পুরুষের সম্মতিতেই হইতে পারিত, অতঃপর স্ত্রীরও এ বিষয়ে সম্মতির আবশ্যক হইবে। পুরুষের একাধিক বিবাহ না করা এ দেশের পক্ষ হইতে আমরাও সমর্থন করি।

সাত্ত্বিক দান—

জনৈকা ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়ে দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। সাত্ত্বিকতার চরমোৎকর্ষ!

বিচিত্র গতি—

যুদ্ধের পর ফ্রান্সদেশে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় অধিক সংখ্যক সন্তানের পিতাকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে বলা আছে, সুস্থ ও সবলকায় সন্তান হওয়া চাই। গত বৎসর প্রতিজনে তিনহাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন—বিরানব্বই জন, এবং দেড় হাজার টাকা করিয়া পাইয়াছেন—একশত জন। দেশকালের কি বিচিত্র গতি! বাংলায় আমরা কিন্তু সন্তান জন্মান সম্বন্ধে খুব সংযত হইতে পরামর্শ দিই।

বহুমুখী কৃতিত্ব—

একটি কর্ম্মকুশলা ইউরোপীয় রমণীর সংবাদ শুনুন! ছাব্বিশ বৎসর বয়স, অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না—নাম তাঁর লেডি ক্লিপটন। প্রথমে তিনি থিয়েটারে অভিনয়ে ভদ্রভাবে যশোলাভ করেন। (বিলাতে অনেক ভদ্রমহিলার রঙ্গালয়ে অভিনয় করার রীতি আছে)। তাহার পর এক্‌টি সংবাদপত্র সেবাতেও দ্রুত গতিতে সুনাম অর্জ্জন করেন। দুই বৎসর হইল তিনি ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া দক্ষতার সহিত ব্যা[illegible] করিতেছেন। এদেশে অনেক ভদ্রমহিলা [illegible] বটে কিন্তু এরূপ বহুমুখী কৃতিত্ব কই?

পরলোকে লক্ষ্মীদেবী—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীশ্রী[illegible] ভ্রাতুষ্পুত্রী, শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী চৌ[illegible] তাঁহার লক্ষ্মী-নিকেতনে সমাধিস্থ হই[illegible] লক্ষ্মীদেবীর পরলোকগমনে তাঁহার ভক্ত[illegible] ছেন। তিনি ভক্তদের নিকট "লক্ষ্মীদিদি"[illegible]

দশ হাজার টাকা দান—

নোয়াখালির উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] তাঁহার স্বগ্রাম চৌপলীতে একটি [illegible] মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের [illegible] করিয়াছেন। আদর্শ দান বটে।

স্ত্রীশিক্ষায় সাঁওতাল—

বাকুড়া অঞ্চলের অসভ্য সাঁও[illegible] প্রবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া আমরা [illegible] দুইটি সাঁওতাল বালিকা মাট্রিক [illegible] বালিকা মাসিক তিন টাকা হিসা[illegible] পাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রায় অশি[illegible] মিশনারী সাহেবদের দ্বারা হইয়া থা[illegible]

বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ-সমিতি[illegible]

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে উক্ত সমিতির দ্বিতীয় বাৎসরি[illegible] গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টে[illegible] সরকার মহাশয় সভাপতির [illegible] মহিলাবৃন্দ, ছাত্রগণ ও অন্যান্য [illegible] জন লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী, শ্রীযুক্তা রজনী মিত্র, শ্রীযুক্তা ইন্দু[illegible] দেবী, শ্রীযুক্তা কিরণবালা রায়, দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযো[illegible] আন্দোলন সভায় বাঙ্গালী হি[illegible] করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না

পাঞ্জাবে বিধবা বিবাহ—

পাঞ্জাবে বিধবাবিবাহ-সভার উদ্যোগে, গত ডিসেম্বর মাসে মাত্র একমাসের মধ্যে সমগ্র ভারতে মোট প্রায় তিন শত 'বিধবাবিবাহ' হইয়া গিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে মোট আড়াই হাজারের উপর বিধবাবিবাহ হইয়াছিল। গত বৎসর ঐ উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে ৭তের শত টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। বাংলায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র তিয়াত্তরটি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। বিধবাবিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে যত কথাই থাকুক, কোন কোন ক্ষেত্রে যে বিধবার বিবাহ হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বর্ণখনি—

দক্ষিণভারতের মহিশূর প্রদেশে কোলার স্বর্ণখনি হইতে গত জানুয়ারী মাসে পনের দিনের মধ্যে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই সহরে প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐ মাসে মোট আঠার লক্ষ টাকার স্বর্ণ ঐ খনি হইতে পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণের নামে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে বটে—কিন্তু বেল পাকিলে কাকের কি?

রেলপথের আয়—

ভারতের সমস্ত রেল পথের মধ্যে মাত্র সরকারী রেলপথেই (ষ্টেট রেলওয়েতে) সপ্তাহে দুই কোটি টাকার উপর আয় হয়। বাংলার ধনী ব্যবসায়ীদের জন্য কি কেবল রামকৃষ্ণপুর আর উল্টাডিঙ্গি?

বিড়ালের লঙ্কাকাণ্ড—

গত ২৬শে মাঘ কলারোয়া থানার অন্তর্গত হলদেপুর গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটি বিড়াল মাছ চুরি করিয়া খাইয়াছিল এই অপরাধে গ্রামের কতকগুলি জ্ঞানহীন লোক তাহার গায়ে ও লেজে পাট জড়াইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। বিড়ালটী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া একলাফে একখানি চালাঘরের উপর উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানিতে আগুন লাগিয়া যায়। এইরূপে পর পর সাত খানি চালার উপর দিয়া ছুটাছুটি করার পর বিড়ালটির মৃত্যু হয়। ক্রমে গ্রামের অনেক ঘরে আগুন লাগে। ফল অতি ভীষণ হইয়াছে, সাতষট্টি খানি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে, দুইটি শিশু সন্তান পুড়িয়া মরিয়াছে, অনুমান দশ হাজার টাকার জিনিষপত্র নষ্ট হইয়াছে। দেখুন বর্ব্বরতার পরিণাম! এইসূত্রে আমরা পল্লীগ্রামবাসীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—চৈত্র মাস—আগুনে সাবধান।

ধর্ম্মের প্রচার—

ইংলণ্ডের বাইবেল সোসাইটি এ পর্য্যন্ত পাঁচশত বাহাত্তরটি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়াছে। গত বৎসর এক কোটি বাইবেল বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে। গত দশ বৎসর কাল প্রতি দেড় মাসে এক একটি নূতন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে। এক ইংলণ্ডের চেষ্টাতেই এই, পৃথিবীর আর আর শক্তিশালী খৃষ্টান জাতি কত বাইবেল প্রচার করে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? ভারতের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি এবং তাহার প্রচার কোথায়?—কোন্ ঠাকুরের নামে ভারতের সকলে একযোগে সাড়া দিবে?

মাতৃ-মন্দিরের বর্ষ শেষ—

বর্ত্তমান চৈত্র-সংখ্যায় মাতৃ-মন্দিরের ৩য় বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখে ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইবে। লেখক-লেখিকা এবং গ্রাহক গ্রাহিকাদের সাহায্য ও সহানুভূতি আমাদিগকে যে ভাবে শক্তি যোগাইয়াছে, সেই শক্তির ভরসায় আমরা আগামী বর্ষের কার্য্যের আয়োজনে রহিলাম।

বর্ত্তমান চৈত্র মাসে যে সকল গ্রাহকের মূল্য শোধ হইযাছে, আগামী বৈশাখ সংখ্যা মাতৃ-মন্দির তাঁহাদিগকে ভিঃ পিতে পাঠাইয়া ১৩৩৩ সালের মূল্য অগ্রিম আদায় করা হইবে। মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইতে হইলে ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পাঠান আবশ্যক।